উদ্‌ভাসিত শরৎচন্দ্র
পত্রে ও সাময়িক পত্রে

সুদীপ বসু

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৫

প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

শ্রীমতী মৌসুমী বসু-কে

নিবেদন

অর্ধ শতাব্দীবও আগে শবৎচন্দ্র প্রযাত হযেছেন। ইতিমধ্যে নতুন শতকে আমবা প্রবেশ কবেছি। মিডিযাব সর্বগ্রাসী প্রভাব, সুগম যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভিন্ন সংস্কৃতিব মাযাচ্ছন্ন কপ—এসব সত্ত্বেও শবৎচন্দ্র এখনো সাবা ভাবতবর্ষে সর্বাধিক জনপ্রিয লেখক। বাংলা সাহিত্যেব ক্ষেত্রেও তা সত্য। কিন্তু তিনি যে-মাপেব লেখক, সেই-মাপে আলোচিত হযেছেন কি? তাব সংকলিত পত্রেব মধ্যে তাব বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনেব বহু কথা ছড়িযে আছে। তা যেন দুটি মানুষেব মৌখিক আলাপ -এমনই জীবন্ত। তাছাড়া বযেছে তাব সম্বন্ধে স্মৃতিকথাগুলি। এসবেব মধ্য থেকে তাব যে মূর্তি বেবিযে আসে, তা আমাব কাছে দীর্ঘদিন ধবে আকর্ষণ ও কৌতূহলেব বিষয। তাব জীবনকালে একেব পব এক প্রকাশিত তাব গ্রন্থগুলি পাঠক মহলে নিন্দা ও প্রশংসাব ঝড তুলেছিল। চবিত্রহীন এবং শেষ প্রশ্নেব কথা এক্ষেত্রে মনে বাখতে হবে। বিপ্লবীদেব প্রেবণাস্থল এবং বাজবোষে নিষিদ্ধ পথেব দাবী সম্বন্ধে জনগণেব সুবিপুল আগ্রহ সেকালেব পক্ষে চাঞ্চল্যকব ঘটনা। এসবেব কিছু পবিচয সেকালেব জীর্ণ বিবর্ণ পত্রিকাব পৃষ্ঠাগুলিব মধ্যে বযে গেছে। কোনো কোনো পত্রিকা আজ অবলুপ্ত। তাদেব কিছু বচনা ব্যবহৃত হলেও অব্যবহৃত বচনাব সংখ্যা কম নয। আমবা সে সকল যথাসাধ্য সংগ্রহ ক'বে, শবৎসাহিত্যেব বিচাবে উক্ত বচনাসমূহেব মূল্য নির্ধাবণেব চেষ্টা কবেছি। সব জড়িযে একথা হযতো বলা যাবে, শবৎচন্দ্রেব জীবন ও সাহিত্যেব কোনো কোনো অনালোকিত দিকেব উপব আলোকপাত এই গ্রন্থে বযেছে।

এই গ্রন্থেব দ্বাবা অনেক প্রচলিত ধাবণায হযতো আঘাত লাগবে। কিন্তু সত্যভিত্তিতে যেসব কথা বলেছি তা আলোচ্য চবিত্রকে স্পষ্টতব এবং দৃঢতব আকাবেই উপস্থিত কবেছে— এই বিশ্বাস আমাব আছে। শবৎচন্দ্র আমাদেব সমাজেব অনেক ক্লেদাক্ত কপকে তুলে ধবেছেন। ফলে প্রচণ্ড সামাজিক চাঞ্চল্যেব কাবণ হযেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচলিত। এমন দুঃসাহসী, শক্তিমান মানুষেব সত্যচিত্র উন্মোচন কবাব দাযিত্ব একালেব পাঠক ও লেখকেব আছে—এও আমাব বিশ্বাস।

এই গ্রন্থ বচনাসূত্রে কিছু মানুষেব কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে। যেমন শবৎ-গবেষক গোপালচন্দ্র বায। দীর্ঘদিনেব অক্লান্ত পবিশ্রমে তিনি চাব খণ্ডে 'শবৎচন্দ্র' গ্রন্থ বচনা কবেছেন, যাব তৃতীয খণ্ডটি শবৎচন্দ্রেব পত্রসংকলন। তা আমাদেব কাছে বত্নসংকলন

শবৎ-গবেষক অজিতকুমাব ঘোষ তাঁব গ্রন্থে বহু যত্নে শবৎচন্দ্রেব জীবনীসহ সাহিত্যবিচাব কবেছেন। বর্তমান গ্রন্থ বচনাকালে তাঁব সঙ্গে আলোচনা ক'বে উপকৃত হযেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, সাহিত্যতাত্ত্বিক ড: বিমলকুমাব মুখোপাধ্যাযেব কাছে বিশ্ববিদ্যালযে পাঠগ্রহণেব সমযে, তাবপবে তাঁব অধীনে গবেষণাকালে নন্দনতত্ত্বেব নানা ধাবা বিষযে অবহিত হবাব সুযোগ পেযেছি। এই গ্রন্থে শবৎচন্দ্রেব নন্দনতত্ত্ব অধ্যাযটি লেখাব সমযে তাঁব শিক্ষাব কথা স্মবণে ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষের সস্নেহ পরামর্শ বর্তমান গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ দেখে অনুভব করেছি—সকল বুদ্ধিজীবীই শরৎচন্দ্রকে অবজ্ঞা করেন না।

আমার বিশেষ ভাগ্য, সরাসরি শিক্ষক অথবা শিক্ষকতুল্য কয়েকজন মানুষ দীর্ঘদিন আমার পোষকতা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে খ্যাতিমান অরুণকুমার বসু, বিজিতকুমার দত্ত, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

মনস্বী লেখক ও শিক্ষাবিৎ হিসাবে সমুজ্জ্বল শিশিরকুমার দাশের উদার আনুকূল্য পেয়েছি। তা পেয়েছি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক বিশিষ্ট গ্রন্থকার ভবতোষ দত্ত এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ, ভাষাতাত্ত্বিক, লেখক পবিত্র সরকারের শুভেচ্ছা দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে আসছি।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক বঙ্কিম-জীবনীকার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের পরামর্শ আমাকে উদ্দীপিত করেছে।

তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যাঁরা অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আসবেন —উনিশ শতকীয় বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ-লেখক স্বপন বসু। সেইসঙ্গে সুনীলবিহারী ঘোষ (প্রাক্তন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা), লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, ড: সুজাতা বাহা, ড: সর্বানন্দ চৌধুরী, নারায়ণচন্দ্র সাউ এবং অরিজিৎ কুমারের সহায়তার কথাও স্মরণ করছি।

প্রয়াত লেখিকা রাধারানী দেবীর 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প' গ্রন্থটি সানন্দে ব্যবহার করেছি। তার কন্যা, প্রতিষ্ঠিত লেখিকা এবং অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেনের এ বিষয়ে আগ্রহের কথা মনে রেখেছি।

গ্রন্থপ্রস্তুতি পর্বে কল্যাণীয় শঙ্খ বসু ও কল্যাণীয়া অনিন্দিতা বসু, কল্যাণীয়া মৌমিতা ঘোষ নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার (বিশ্বভারতী) ব্যবহার করেছি। সেখানকার কর্মীবন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থজগতে এই আকালের সময়ে অগ্রজতুল্য সুধাংশুশেখর দে মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। সেজন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। অনেকদিন ধরেই তাঁর প্রশ্রয় পেয়ে আসছি।

আমার মা শ্রীমতী মায়া বসুর আশীর্বাদ আমাকে ঘিরে আছে—সর্বদাই অনুভব করি।

সুদীপ বসু

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পত্রে জীবনের পট

লেখক-জীবনের অভিজ্ঞতা সাহিত্যে রূপায়িত হয়—মুখস্থ বচনের মতো এই কথাটা বলার সময়ে প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্যে সে অভিজ্ঞতার চরিত্র কী—তা কি লেখকের মানব-নিরীক্ষণ কিংবা তাঁর পঠিত বিষয়-সঞ্চয়, নাকি তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনুপ্রবেশ সাহিত্যের প্রেক্ষিত ও চরিত্রের মধ্যে! শেষোক্ত ব্যাপারটি ঘটেই থাকে। কখনো তা লেখকের দ্বারা স্বীকৃত, কখনো স্পষ্টভাবে স্বীকৃত না হলেও নানা সূত্রে লব্ধ তথ্যের দ্বারা সমর্থিত। আত্মজৈবনিক উপন্যাস বা কাহিনী কথাটার বিশেষ চল সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এই বিষয়টিতে সর্বাধিক সাহায্য করে লেখকের আত্মজীবনী, সেইসঙ্গে তাঁর পত্রাবলী। পত্র তাৎক্ষণিক হলে তার মূল্য সবিশেষ, লেখকের অবিলম্ব আত্মপ্রকাশ সেখানে ঘটেছে। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে তা প্রায়শ হয়না। অনেক সময়ে লেখকের জীবনপ্রান্তেব রচনা আত্মজীবনী, অন্তত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন :

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। ...কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনেব ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। ...জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্ণে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। ...নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কথার মধ্য দিয়া ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী।"

একই ধরনের কথা শরৎচন্দ্রের কলমে পেয়েছি :

"এইসব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া তো তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে? তাও তো নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু তো শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নূতন করিয়া এসব জোড়া দিয়া রাখে? ...ছেলেবেলার কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া

না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে...তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়েনা। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ত আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।" ('শ্রীকান্ত', প্রথম পর্ব)।

আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে লেখকেরা (বিশেষত যদি ভারতীয় হন) নানাপ্রকার আত্মসংকোচের বশবর্তী, পরবর্তী খ্যাতি এবং জীবনের প্রতিষ্ঠিত ভূমিকার দায় তাঁকে অন্তর্গত-জীবনের পূর্ণ অনাবরণে দ্বিধান্বিত ক'রে তোলে। অপরপক্ষে তাৎক্ষণিক পত্রের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ সেইকালীন ভূমিকার ভিত্তিতে ঝলকিত। সাহিত্যের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন সন্ধানের কৌতূহলী সন্ধানীবৃত্তি যখন সাহিত্যের গবেষণামহলে বিশেষভাবে সক্রিয়, তখন তাঁর পত্রাবলীকে 'মূল সাক্ষ্য' হিসাবে মূল্য দিতেই হয়।

এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পত্রগুলির মাত্রাগত গুরুত্ব সমধিক। কারণ চিঠির মধ্যে তিনি মনের গায়ে চাদর জড়িয়ে ভব্যসভ্য হয়ে কথা বলতেন না। মনে যা উঠল লেখায় তা ফুটল—শরৎচন্দ্রের চিঠিতে তা দেখা যায়। ফলে সেখানে মানুষটি কাছে চলে এসে ধরা দেন।

শবৎচন্দ্র যথার্থ পত্রলেখক। তিনি মুখোমুখি বসে চিঠিতে কথা বলেছেন। কেবল নিজের অখ্যাত জীবনেই নয়, খ্যাত জীবনেও মুখ খুলে কথা বলতে তাঁর দ্বিধা ছিলনা। মধুসূদনকেও সজীব পত্রলেখক বলতে পারি। বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজ সাহিত্য বা অন্যেব সাহিত্য সম্বন্ধে যখন কথা বলেছেন (অবশ্যই ইংরেজিতে), তখন সাহিত্যসত্যেব মূল কথাগুলি যেমন সেখানে আছে, তেমনি তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুরাগ-বিরাগ বেপরোযা মন্তব্যে ঝলসে উঠেছে। কথাগুলো মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনিবার্যভাবে। বিবেকানন্দের চিঠিতে একই গুণ। সোজা কথা মুখেব উপর তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন—যখন বিশ্ববিখ্যাত তখনও।

চিঠিপত্রের জাত নিশ্চয়ই একরকম নয়। লেখকের ব্যক্তিচরিত্র তাঁর পত্রচরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাগভঙ্গির মধ্যে নিজের শিক্ষাদীক্ষা, পারিবারিক সংস্কৃতি, সামাজিক ভূমিকার প্রভাব থাকেই। লেখকের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করে পত্রের প্রকৃতি। সুতরাং কোনো কোনো চিঠির মধ্যে সাহিত্যের তত্ত্বালোচনা দেখা যায়। কিংবা দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও। শেষোক্ত বিষয়সমৃদ্ধ পত্রকে পত্রপ্রবন্ধ বলাই সঙ্গত। তবে দার্শনিক বা তাত্ত্বিক বক্তব্যপূর্ণ পত্রকে পত্রপ্রবন্ধ বলা চলবে না যদি কথাগুলি সুশৃঙ্খল সুগঠিত ব্যাপার না হয়ে লেখকের কাটাকাটা ঝলকভরা উক্তি হয়। সেখানে লেখক যেন কোনো চিন্তাপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনায় বসেছেন। পত্রে যখন লেখক ব্যক্তিমনকে খুলে ধরেন, যেখানে যুক্তিতর্ক দিয়ে মনস্তত্ত্বের ঝাড়পোঁছ নয়, কোনো কিছু প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায় নেই, কেবল রয়েছে কখনো আনন্দের শিহরণ কিংবা মেদুর বিষণ্নতা কিংবা তীব্র আত্মবিদারণ—সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের রক্তচ্ছবিও খাঁটি পত্র হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনেক পত্র অবশ্যই ছদ্মবেশী প্রবন্ধ। কিন্তু তাঁর অগণিত পত্র আছে যেখানে তিনি ধরা দিয়েছেন নিজের সুখদুঃখে, আঘাতে আর্তনাদে, স্বপ্নে কল্পনায়, রসে রহস্যে ভরপুর একটি ব্যক্তিমানুষ রূপে। আমরা ভুলতে পারিনা তাঁর ভানুসিংহের পত্রাবলী কিংবা ছিন্নপত্রাবলীর কথা।

শরৎচন্দ্র অন্য মনের মানুষ। শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাঁর ছিল। কিন্তু প্রাসাদের আচ্ছাদন ছিলনা। যাতায়াতের জন্য নিয়মিত চৌঘুড়ীও নয়। পায়ের তলায় উঁচু নীচু কাদামাটির পথ। আশেপাশে বনবাদাড়, 'জেলে মালা মুচি মেথরের' ঘোরাফেরা। তাদের অনেকের ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে কিংবা দাওয়ায় বসে হুঁকো টেনে গল্প করা, মাঝে মাঝে দু'চার পাত্র দেশি জিনিস চড়িয়ে নেওয়া। তাদেরই মতো ক'রে কথা বলা। তাদেরই বুকের পাঁজরে হাত রেখে নিজের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। এই মানুষ। এই বেড়াভাঙা মানুষ। এই কূলহারা মানুষ। এঁকেই যেন আমরা তাঁর চিঠিতে পেয়ে যাই।

চিঠিতে তাই খাঁটি শরৎচন্দ্রকে পেয়েছি—উত্ত্যক্ত বিরক্ত মুহূর্তে, রঙ্গে রসে উচ্ছল মুহূর্তে, বেদনার্ত ক্ষণেও। আবার তাঁর হালকা কথা সহসা নেমে পড়ে সত্যের গভীরে।

এই আলোচনায় পত্র বলতে শরৎচন্দ্রের পত্রকে যেমন বুঝেছি, তেমনি তাঁকে লেখা অন্যের পত্র এবং এবং অন্যের পত্রে তাঁর উল্লেখও বিচার্য বিষয় করেছি। এও দেখেছি, শরৎচন্দ্রের জীবনীকারেরা বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁর পত্রের বহুল ব্যবহার করেছেন। তবু মনে হয়, এ বিষয়ে আরো নিবিষ্ট আলোচনার প্রয়োজন আছে। পত্রগুলির বক্তব্যকে নানা অংশে ভাগ ক'রে তাদের মধ্য থেকে শরৎচন্দ্রের অন্তর্জীবন, বহির্জীবন এবং সাহিত্যজীবনের ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনা করলে বহুকৌণিক আলোকসম্পাত ঘটতে পারে।

এই 'খাঁটি পত্রলেখকটি' কিন্তু পত্ররচনার ক্ষেত্রে অতীব অলস। নিজের কুঁড়েমির বিষয়ে তাঁর সরস উক্তি :

"আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুঁড়ে। চিবোবার ভয়ে কোনো জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে।" [১]

চিঠি লেখা সম্বন্ধে স্বভাবতই তাঁর কথা : "চিঠি লেখা আমার বাঘ।" [২]

পুনশ্চ : "আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। ...যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায়না—আমি এমনি অগাধ কুঁড়ে।" [৩]

"গুছাইয়া পত্র লিখিবার শক্তি আমার এত অল্প যে হিতৈষী বন্ধুরা বেশ স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দেন যে আমার একান্ত বিশৃঙ্খল ও ছেলেমানুষের মতো এলোমেলো পত্রের সমস্তটুকু পড়িয়া উঠিতে তাঁহাদের ধৈর্য রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে।" [৪]

চিঠিগুলি বিখ্যাত অখ্যাত নানা মানুষকে লেখা। এদের মধ্যে সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় থেকে বৈষয়িক-ব্যবহারিক-ব্যবসায়িক সব বিষয়ই আছে। ফলে বেরিয়ে আসে অংশত সেই শরৎজীবন যার সম্পূর্ণ ছাঁদ এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে উপস্থিত নয়। জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠার শেষ নেই। লোকলোচনে সব পৃষ্ঠা আসেনা। এমনকি যাঁর জীবন তাঁরও কাছে অপঠিত থেকে যায় অনেক পৃষ্ঠা। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীতে এমন অনেক জীবনপৃষ্ঠা মিলেছে যার সবকটিতে পূর্ণ পৃষ্ঠার রেখাঙ্কন নেই। কোথাও দু-চার ছত্র, কোথাও অর্ধ পৃষ্ঠা। লিখতে লিখতে বাক্য কোথাও অসমাপ্ত। সেসব পাঠকের মনকে আঘাত ক'রে বিচিত্র কল্পনার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে। ফলে শরৎচন্দ্রের যে-মূর্তি নির্মিত হয়েছে, তার সৃষ্টিতে বিশ্ব-বিধাতার সঙ্গে পাঠক-বিধাতার কারিগরীও আছে।

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), সাহিত্যসদন, কলকাতা–৭০০ ০১২, ১৩৬৯, পৃ. ২১১। অতঃপর 'শরৎচন্দ্র'।

২. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৯২।

৩. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যাযকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২০৪।

৪. ঐ, পৃ. ২০৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষটির সন্ধানে

শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অংশ ক্ষীণ রেখায় আঁকা। যখন তিনি বিখ্যাত, লোকচক্ষুর সামনে সগৌরবে বর্তমান, তখন আলোকদীপ্ত তাঁর জীবন। কিন্তু যখন বাউণ্ডুলে, উদাসীন, বেপরোয়া—তখন তার সার্বিক আকার ছায়াচ্ছন্ন। জীবনের ঐ অংশের পুরো কথা বলতে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক সংকোচ ছিল, কারণ তার অনেকখানি সামাজিক নীতি ও রুচির পরিপন্থী। স্মৃতিগ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত স্মৃতিকথার উপর নির্ভর ক'রে গড়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠিত শরৎজীবনী গ্রন্থ। সেখানে আমরা পেয়েছি :

জন্ম-বাল্য-কৈশোর চিত্র

জন্মেছিলেন দারিদ্র্যের কণ্টকমুকুট মাথায় পরে—হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, আক্ষরিক অর্থে পর্ণকুটীরে। পরিবার দরিদ্র এবং অনভিজাত। মাতা ভুবনমোহিনী দেবী অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের মানুষ, স্বামী মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের অনটনের সংসারে সর্বংসহা দেবীমূর্তি। শরৎচন্দ্রের আগে জন্মেছেন দিদি অনিলা দেবী, পরে ভাই প্রভাসচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র এবং বোন সুশীলা। কুটীর কলরবে পূর্ণ। কিন্তু অন্ন কোথায়?

গুছনো সাংসারিকতা মতিলালের মধ্যে ছিলনা। ডিহিরিতে স্বল্প সময়ের চাকুরিজীবন ছাড়া অন্য সময়ে তিনি ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়ে। সাহিত্যজীবন তাঁর ছিল—সেখানেও অস্থির। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আরম্ভ আছে, শেষ নেই। এ নিয়ে পরবর্তীকালে পুত্র শরৎচন্দ্রের আক্ষেপ :

"আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এককথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনোটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। ...এখনো স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ ক'রে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি।"[১]

শরৎচন্দ্রের ছাত্রজীবন বারেবারে বিঘ্নিত। দেবানন্দপুরে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা, সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুল, ভাগলপুরে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। দুরন্ত অথচ মেধাবী। ১৮৮৭-তে ছাত্রবৃত্তি পাশের পর ভাগলপুর জেলা স্কুলের সেভেনথ্ ক্লাস অর্থাৎ বর্তমান চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন, ডবল প্রমোশন পেয়ে উঠলেন ফিফথ ক্লাস বা

ষষ্ঠ শ্রেণীতে। ১৮৮৯-তে ফোর্থ ক্লাসে পড়ার সময় ফিরে আসতে হলো হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। ইতিমধ্যে ডিহিরিতে কিছুদিন চাকুরি করার পর সে চাকুরি হারিয়ে মতিলাল আবার সপরিবারে দেবানন্দপুরে। ১৮৯২-তে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ার সময় শরৎচন্দ্রের ছাত্রজীবনে সাময়িক ছেদ পড়ল—কর্মহীন পিতা পুত্রের শিক্ষাভার বহনে অক্ষম।

সাংসারিক অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর। অনন্যোপায় মতিলালকে সপরিবারে পুনরায় শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুরে চলে যেতে হলো।

এধারে শরৎচন্দ্রের পড়াশোনার আগ্রহ যথেষ্ট। কিন্তু কে দেবে তাঁকে বাঞ্ছিত সুযোগ?

ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলের শিক্ষক এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করলেন নিজের স্কুলে। ১৮৯৪ সালে এনট্রানস পরীক্ষা হবে। ফি জুটবে কি ক'রে?

মুশকিল আসান হলেন শরৎচন্দ্রের ছোটমামা বিপ্রদাস। সামান্য চাকুরে তিনি, বৃহৎ পরিবারের দায় বহন করতে হয়, তথাপি হ্যাণ্ডনোট লিখে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষার জন্য টাকা ধার করলেন। ১৮৯৪-তে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ শরৎচন্দ্র।

কলেজে পড়ার স্বপ্ন নিছক স্বপ্নই থেকে যেত যদিনা এবার এগিয়ে আসতেন দূঃসম্পর্কের দিদিমা কুসুমকামিনী দেবী। তাঁরই কথায় স্থির হলো শরৎচন্দ্র তাঁর দুই পুত্র উপেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে পড়াবেন। পরিবর্তে কলেজ-ভর্তির ফি ও মাসিক বেতন তাঁরা দেবেন।

১৮৯৫-তে ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে শ্বশুরালয়ের সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হলো মতিলালের। এবার ভাগলপুরের খঞ্জরপুরে তাঁর বাস, সঙ্গে পুত্রকন্যারা।

শরৎচন্দ্রের ছাত্রজীবনে বিঘ্ন ছাড়া কিছু নেই। এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়ার ফি জুটল না। আগ্রহ হারালেন পড়াশোনায়। কি লাভ হলো অন্যের বই চেয়ে এনে রাতের পর রাত পড়ে?

ঘরছাড়া যৌবন : সাহিত্যচর্চার উন্মেষ

যে-ঘরে মা নেই, পড়াশোনার সুযোগ নেই, সেই ঘরে আটকে থাকেন না শরৎচন্দ্র। ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের তিনি উৎসাহী সভ্য, খেলায়-নাট্যে-সাহিত্যে মশগুল। এইসূত্রে আলাপ বিভূতিভূষণ ভট্টর সঙ্গে। ক্রমে শরৎচন্দ্রের উৎসাহে গড়ে উঠল একটি সাহিত্যচর্চার আসর, যার সদস্য তিনি ছাড়া তাঁর তিন মাতুল সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ ও তাঁর অন্তরালবর্তিনী বিধবা ভগিনী নিরুপমা দেবী। এই গোষ্ঠীর হাতে লেখা একটি সাহিত্যপত্রিকা ছিল—'ছায়া'। সাহিত্যচর্চার রেশ ধরে নিরুপমার প্রতি শরৎচন্দ্রের আকর্ষণের সূত্রপাত। এই সময়ে রচিত গল্প 'অনুপমার প্রেম', 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা', 'হরিচরণ'—এবং 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'শুভদা' ইত্যাদি উপন্যাস।

একটি বৈদ্যুতিক তরুণ এইকালে এসে গেছেন শরৎচন্দ্রের জীবনে—রাজেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়, রাজু। অসমসাহসী, বেপরোয়া, বিচিত্র বিশ্বাস ও মমতাময় হৃদয় নিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের স্বপ্নের রাজকুমার। শরৎচন্দ্র কোনোদিন ভুলতে পারেন নি এই মানুষটিকে। তাঁর সাহিত্যের নানা স্থানে বিধাতার এই আশ্চর্য সৃষ্টির স্থায়ী মুদ্রণ রয়ে গেছে।

অভাবের সংসার। প্রয়োজন পূরণে শরৎচন্দ্র বনেলী রাজ এস্টেটে অল্প কিছুদিনের চাকুরে, তারপর ভাগলপুরে রাজুদের কাঠের গোলায় সহকারী। ১৯০১-এ রাজু নিরুদ্দেশ। তারপরে ভবঘুরে মতিলালের পুত্র শরৎচন্দ্রও। ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে পথে পথে। মজঃফরপুরে থাকাকালীন শুনলেন পিতার মৃত্যুসংবাদ, ভাগলপুরে সামান্যভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন। তারপর ছোট ছোট ভাইবোনদের একরকম ব্যবস্থা ক'রে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে কলকাতায়।

কলকাতা সে যাত্রা ফিরিয়ে দিয়েছিল শরৎচন্দ্রকে। চাকুরিপ্রার্থী শরৎচন্দ্রকে তার প্রযোজন ছিলনা। নেপথ্যে বোধহয় সে প্রস্তুত হচ্ছিল ভবিষ্যতে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দি পেপার বুকের ইংরেজি তর্জমা করার তিরিশ টাকা মাইনের চাকুরি কয়েক মাস করেই শরৎচন্দ্র ছেড়ে দিলেন। সে সম্বন্ধে গভীর বিতৃষ্ণায় বলেছেন : "কি জঘন্য কাজ করি। তার জন্যে পাই মাসে মাত্র ত্রিশটি করে টাকা! এতে ভদ্রতা থাকেনা। ভালো একটা চাকরি পাই যদি তো সাঁওতাল পরগনার জঙ্গলে কেন, সাহারা মরুভূমিতে পর্যন্ত যেতে পারি।" আসল কারণ—ঐ বাড়িতে শরৎচন্দ্র মর্যাদাহীন মানুষ, "বওয়াটে বলে আমার এমন কুখ্যাতি।" [২]

'আমি প্রবাসী : আমি উচ্ছৃঙ্খল'

জানুআরি ১৯০৩। শরৎচন্দ্র ভাগ্যসন্ধানে বর্মা অভিমুখে। যাবার আগে কলকাতায় 'কুন্তলীন' প্রতিযোগিতার জন্য অন্যের নামে 'মন্দির' গল্প লিখলেন। গিরীন্দ্রনাথের অনুরোধে লেখা এই গল্প (যা আসলে তাৎক্ষণিক সৃষ্টি) তাঁকে এনে দিয়েছিল প্রথম সাহিত্যসম্মান। 'কুন্তলীন' গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী হলেন তিনি।

রেঙ্গুনে একাধিক চাকুরির সঙ্গে শরৎচন্দ্র যুক্ত হয়েছেন। বর্মা রেলওয়ে অডিট অফিসে অস্থায়ী কেরানী। পরে স্থায়ী। এই চাকুরি তিনি করেছেন ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত।

ভাগলপুরে থাকাকালেই নেশার ফাঁদে ধরা পড়েছেন, সন্ন্যাসজীবনে তা বলবৎ। রেঙ্গুনে একেবারে উদ্দাম। থাকতেন বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলের মিস্ত্রিপল্লীতে। এসে গিয়েছিল আনুষঙ্গিক দোষও। পতিতা নারীর ইতিহাস সংগ্রহের জন্য দিনের পর দিন ঘুরেছেন পতিতাপল্লীতে। আবার মিস্ত্রিদের সুখদুঃখের সঙ্গী, সালিশী করেছেন, সেইসঙ্গে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা। পল্লীবাসীদের নিয়ে হরিসংকীর্তনও।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের দুই 'বিবাহ'। তার আগে মিস্ত্রিপল্লীর প্রচলিত প্রথায় হয়তো 'আপসে' বিবাহ হয়েছিল। এর উল্লেখ আছে বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা তাঁর চিঠিতে। সে বিবাহ রাত্রিশেষের স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন। তারপর শান্তিদেবীর সঙ্গে 'বিবাহ' —পুত্রসন্তান

লাভ। প্লেগরোগে সপুত্র শান্তিদেবীর মৃত্যু—মৃগতৃষ্ণিকার মতোই অবসিত বিবাহিত জীবন। শরৎচন্দ্র মাটিতে আছড়ে পড়ে কেঁদেছেন।

কয়েক বছর পরে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে পুন'র্বিবাহ'। উভয়ের সম্পর্ক আমৃত্যু বজায় ছিল। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তেইশ বছর জীবিত ছিলেন হিরণ্ময়ী। প্রায় নিরক্ষরা, সন্তানহীনা এই রমণী তাঁর সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছিলেন স্বামীসেবা এবং ধর্মকার্যে।

ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র ছবি আঁকা-গানবাজনা চর্চা করেছেন। আর স্তরে স্তরে জমেছে অভিজ্ঞতার পুঞ্জ। তাকে মার্জিত করেছে তাঁর একাগ্র পড়াশোনা। চিত্রাঙ্কনে প্রসারিত হয়েছে তাঁর শিল্পীজীবনের অন্য একটি দিক।

তবু অসন্তোষ। রেঙ্গুনে আত্মপ্রকাশের সুযোগ কোথায়? কোথায় সেই সাহিত্যতরণী যার নাবিকের আসন তিনি নেবেন?

পরিস্থিতি ক্রমশ অনুকূল। 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে কলকাতায় পরিচয়। ফণীন্দ্রনাথের আগ্রহে তিনি পাঠালেন 'রামের সুমতি' (অন্য অর্থে শরৎচন্দ্রেরও সুমতি—সচেতনভাবে সাহিত্যজগতে প্রবেশের সুমতি)। সময় ১৩১৯। এর আগে ১৩১৪-এ 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' ছদ্মনামে বেরিয়ে গেছে। লেখাটি কি রবীন্দ্রনাথের? —জনে জনে প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমার লেখা নয়, তবে খুব শক্তিশালী কোনো লেখকের লেখা।"[৩] শরৎচন্দ্রের মধ্যে আত্মশক্তির বোধ জাগছিল।

প্রথমে 'ভারতী', 'যমুনা', পরে 'যমুনা', 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গবাণী', 'বেণু', 'ভারতবর্ষ', শেষে মুখ্যত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে দাঁড়ালেন শরৎচন্দ্র।

রেঙ্গুন এদিকে অসহ্য—নানা শারীরিক ব্যাধির প্রকোপ, অর্থের অনটন, চাকুরিক্ষেত্রে ওপরওলার সঙ্গে মনোমালিন্য। অতিষ্ঠ শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালে পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 'বরাবর' একশো কুড়ি টাকার 'সংসার খরচ' পাবার 'লিখিত প্রতিশ্রুতি' সম্বল ক'রে, রেঙ্গুনকে শেষ অভিবাদন জানিয়ে পাড়ি দিলেন কলকাতার দিকে।[৪] ব্রহ্মদেশ থেকে চিরবিদায়।

এবার কেন্দ্র কলকাতা

না, আক্ষরিক অর্থে হাওড়া শহরই তাঁকে আশ্রয় দিল—সেই হাওড়া যা সভ্য ইংরেজের কাছে কুলি টাউনের বেশি কিছু নয়। রেঙ্গুনের মিস্ত্রিপল্লীর একদা বাসিন্দা শরৎচন্দ্র স্বচ্ছন্দে উঠলেন সেখানে। কৃশ চেহারা, মুখে দাড়ি, একমাথা অবিন্যস্ত চুল, কিন্তু চোখে প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর। এই হাওড়া শহরের বাজে-শিবপুরের ভাঙা বাড়িতে বসে রচিত হয়েছিল তাঁর সাহিত্যজীবনের সেরা ফসলগুলি—'স্বামী', 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত' (২য় ও ৩য় পর্ব), 'পথের দাবী', 'গৃহদাহ্', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান' ইত্যাদি।

উচ্চম্মন্য কলিকাতাবাসীর দ্বারা নিন্দিত হাওড়া শহরকে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিভাগুণে নন্দিত করেছেন।

হাওড়া শহরের এক দশকের বাসিন্দা (এপ্রিল ১৯১৬—ফেব্রুআরি ১৯২৬) শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হয়ে গিয়েছিল কলকাতাও। সে শহরের বাসিন্দা তিনি পরে হবেন, অথচ সে শহরে তাঁর সৃষ্টি অল্পই—'শেষ প্রশ্ন', 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব), 'বিপ্রদাস' উপন্যাস—এবং 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' গল্পগ্রন্থের 'অনুরাধা' ও 'সতী' গল্প, এবং 'ছেলেবেলার গল্প'। প্রধানত এইগুলিই তাঁর কলকাতায় থাকাকালীন রচনা।

খ্যাতির চূড়ায়

প্রথম রচনাপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ তাঁর। এক্ষেত্রে তিনি বিরল বিটপী। তাঁর স্বীকারোক্তি : "বাংলাদেশে বোধহয় আমি একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনোদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।"[৫] বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের নিয়মিত ভিড় তাঁর বাড়িতে, পুস্তক-প্রকাশকদেরও। বইয়ের অজস্র বিক্রি। অর্থের ধারাস্রোত, সম্মানেরও। প্রথমে সামতাবেড়, পরে কলকাতায় বাড়ি এবং গাড়ি। জীবনকালে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক। বহু বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট.। তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। কবির সঙ্গে নানা প্রশ্নে মসীযুদ্ধও। সংক্ষেপে বলতে পারি, তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই পালাবদল, চমকপ্রদ উত্থান —এসবই যেন এক উপন্যাস।

রাজনীতির ক্ষুরধার পথে

পরাধীন দেশের মানুষের জীবনে রাজনীতি অত্যাজ্য। সাহিত্যিকেরাও দেশের বাইরের কেউ নন। সুতরাং শরৎচন্দ্র রাজনীতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত এই ঘোষণাসহ :

"আমাদের দেশ হলো পরাধীন দেশ, এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানত স্বাধীনতার আন্দোলন, মুক্তির আন্দোলন! এ আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদেরই তো সর্বাগ্রে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরেই ন্যস্ত।"[৬]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগদান করলেন। দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর স-প্রণাম শ্রদ্ধা। পরে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সস্নেহ শ্রদ্ধা। দেশের বরেণ্য এই প্রবীণ সাহিত্যিক তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ তরুণ দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রকে জলপাত্র এগিয়ে দেবার জন্য কি প্রকার আকুলিবিকুলি করেছেন, তার কাহিনী লিখেছেন রাধারানী দেবী।[৭]

শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন। সুভাষপন্থী তিনি। সুভাষচন্দ্রের বিরোধী গোষ্ঠী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দলের সঙ্গে তাঁরও বিরোধ। সুভাষ ছাড়া রাজনীতি? শিবহীন যজ্ঞ।

চরমপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের যোগ। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ এবং বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীসহ অন্য অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয়। অর্থ, আগ্নেয়াস্ত্রের রসদ দিয়ে সাহায্য, এবং তাঁর নৈতিকসমর্থন বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন।

মৃত্যুসঙ্গমে

শরীর ভেঙেছে। মনও। রচনা ক্ষীণস্রোত। মৃত্যুভাবনার উন্মেষ জীবনের মধ্য পর্ব থেকে। এখন ঘনান্ধকারে ছেয়েছে মন। চোখের সামনে চলে গেলেন মেজ ভাই স্বামী বেদানন্দ (প্রভাসচন্দ্র), দিদি অনিলাদেবীর কন্যা আশা, মামা গিরীন্দ্রনাথ, এমন কি 'পুত্রাধিক' ভেলুও। আর কতদিন এই জীবনপ্রবাসে? ক্লান্তির ভার নামছে নামছে। মন চলো নিজ নিকেতনে। "বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল।"[৮]

১৯৩৭-এর প্রথমদিকে কিছুদিন জ্বর। নিরাময়ের পর দেওঘর বাস। বছরের শেষদিকে পাকযন্ত্রে কঠিন পীড়া। রোগ নির্ণয় হলো—ক্যানসার। মনকে ক্রমশ গুটিয়ে ফেলছেন। উইল করলেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী ঘোষণা ক'রে জীবনস্বত্বে যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দিলেন। হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পরে সম্পত্তির অধিকার বর্তাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের পুত্র/পুত্রদের, তারপরে ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীদের উপর।

প্রথমে ভর্তি হলেন একটি ইউরোপীয় নার্সিংহোমে, তারপর পার্ক নার্সিংহোমে। বিধানচন্দ্র রায় জানালেন অপারেশন একমাত্র পথ।

১৯৩৮-এর ১২ জানুয়ারি অপারেশন হলো। যকৃত একেবারে পচে গেছে। চারদিন পর ১৬ জানুয়ারি সকাল দশটায় মৃত্যু টেনে নিল শরৎচন্দ্রকে।

মৃত্যুকালে বয়স একষট্টি বছর চার মাস।

১৯৩৪-এর ৯ জুলাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেই সভায় আবেগ-আপ্লুত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন :

"ধন্য শরৎচন্দ্র! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কোথা হইতে অবতীর্ণ হইলে?"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু মানুষের মনের কথাকে মাত্র দুটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন।

আমার 'সাজানো বাগান' নয়

এই জীবন। সযত্নে গড়ে তোলা জীবন নয়। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' —এই নাটকীয় আক্ষেপ করার দায় তাঁর ছিলনা। চিঠির মধ্যে নিজ দুর্বলতা আবৃত করার যত্নকৃত প্রয়াস যেমন দেখা যায়নি, তেমনি সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে মুখশ্রীর করুণ এবং কষ্ট-লাঞ্ছিত রেখার উপরে রঙের প্রলেপ চড়ানোর চেষ্টাও তাঁর নেই। আমাকে নিতে হলে

ভালমন্দ সব জড়িয়ে নিতে হবে, আমি তোমাদের মতো পালিশকরা ভদ্রলোক নই —পত্রে এ-ই যেন শরৎচন্দ্রের মনোভাব। এক জাতীয় অহংকারও সেখানে চোখে পড়ে —যদিচ আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই, রবীন্দ্রনাথও নই, কিন্তু ওঁদের অবর্তমানে আলোক দেব আমিই—আমি শরৎচন্দ্র!

লঘুতে এবং গভীরে ভরা শরৎচন্দ্রেব জীবন। সমস্তকে জড়িয়ে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের উচ্ছৃঙ্খলতা। তার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

আত্মঘাতী উচ্ছৃঙ্খলতা

শরৎচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতার বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। মাত্রাহীন মদ্যপান, বহুরকম ধূমপান, পতিতালয়ে বাস, অবাঞ্ছিত নারীসঙ্গ অর্থাৎ পুরো বয়ে-যাওয়া জীবন।

নেশাব সূত্রপাত কৈশোব-যৌবনের মাঝামাঝি সময়ে। তার নানা কারণ থাকা সম্ভব। পড়াশোনাব সুযোগ উপযুক্ত পবিমাণে না পাওযায় পিতার প্রতি অভিমান, বঞ্চনায় দারিদ্র্যে ভবা বাল্যজীবন, অচবিতার্থ আশা-আকাঙ্ক্ষা, কুসঙ্গের আকর্ষণ, শাসনের অভাব ইত্যাদি। নেশার এই বহুমুখিতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের গর্ব ছিল। বলেছেন : "নেশা মানুষ যতরকম ক'বে থাকে, তার কোনোটা বাদ দিইনি।"[৯] পানাসক্তির কথায় প্রথমে আসা যাক।

'...যদি বিমল আমোদ চাওরে, তা'লে ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাওরে...'

ঢুকু ঢুকু ঢুকু? নহে। জীবনের এক পর্বে একেবারে ঢক'ঢক ঢক পান। প্রথম বয়সে লেখা 'দেবদাস' উপন্যাসে হৃদয়ের মাতামাতির কারণ জানিয়ে বলেছেন : "একেবারে বোতল বোতল [মদ] খাইয়া লেখা। [হাতের] লেখাগুলো পর্যন্ত আঁকাবাঁকা।" অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি যখন তাঁর শরীরকে আঘাত ক'বে বিকল ক'রে তুলেছিল, তখন খাদের কিনারে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র : "মাস ছয়েক মদ খাই নাই। আর যদি না খাই তো বোধহয় বেশ সারিয়া যাইব।"[১০]

কালের হিসাবে 'দেবদাস' শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা। তখন তিনি ভাগলপুরে থাকেন। ঐ সময় থেকে তাঁর পানদোষ যথেষ্ট। সন্ন্যাসীবেশে মজঃফরপুরে, পরে রেঙ্গুনে তা ভালোমতো চালিয়েছিলেন। অল্প কিছুদিনের জন্য মজঃফরপুরবাসী শরৎচন্দ্রের নেশাগ্রস্ত চেহারা সম্বন্ধে একটি স্মৃতিকথায় পাওয়া গেছে :

"তখন তিনি নেশায় বেশ পোক্ত,...সুযোগ এবং তেমন দল পেলে নেশা চলত —যাকে বলে 'রমরম'। এবং নেশায় বিভোর হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। একদিন গভীর রাত্রে নেশা ক'রে এসে একটু বে-এক্তিয়ার হন...তখন শিখরবাবু [লেখিকা অনুরূপা দেবীর স্বামী] সতর্ক ক'রে দেন শরৎচন্দ্রকে। ...পরের দিন থেকে আর তাঁকে দেখা গেলনা। লজ্জায় তিনি উধাও।"[১১]

রেঙ্গুনে বাসকালে শরৎচন্দ্রের দোস্তি ছিল বঙ্গচন্দ্র দে নামক জনৈক বঙ্গজ পানাসক্ত মানুষের সঙ্গে।

এই অসংযত মদ্যপানের বলগা শরৎচন্দ্র টেনে ধরেছিলেন রেঙ্গুনে থাকতে। সে কারণ তাঁর মুখে শুনেছেন তাঁর অনুজ বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রী। তার মোদ্দা কথা এই—শরৎচন্দ্রের বিবেকবোধ হঠাৎ দারুণ আঘাতে জেগে উঠেছিল। চোখের সামনে তিনি দেখেছিলেন, স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও মদেব আড্ডায় যোগ দিয়ে হার্টের রোগী জনৈক বর্মী বন্ধু ঐ আসরেই মারা গেলেন। "এরপরও যদি মাতালের বিবেক না আসে তবে আর কিসে আসবে?" [১২]

রেঙ্গুন ছেড়ে হাওড়ার শিবপুরে আসার পরেও শরৎচন্দ্রের মদ্যপানের অভ্যাস কিছু পরিমাণে ছিল। নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন দিলীপকুমার রায়ের কাছে। তা বলার সময়ে রেঙ্গুনে তাঁর বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর উল্লেখ না করে পারেন নি : "অতঃপর মদ আর কখনো খাইনি বলব না, কিন্তু টাল সামলে নিয়েছিলাম একথা বলতে পারি সত্যের অপলাপ না ক'রে।" ('নমঃ শরৎচন্দ্রায়', দিলীপকুমার রায়, শরৎজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, 'দেশ' পত্রিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)। একই কথা শোনা গেছে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় : "...শরৎচন্দ্রের সুরাপানের অভ্যাস ছিল। শুনেছি তিনি অতিরিক্ত মাত্রাতেই ঐ জিনিসটা পান করতেন। এ অভ্যাসটা বর্মা প্রবাসকালে তাঁর বেশি ছিল। সেখান থেকে চলে এসে যখন শিবপুরে থাকেন, তখনও কিছু কিছু ছিল।" [১৩] অসমঞ্জ এও জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র পরে তা ত্যাগ করেছিলেন। এই বক্তব্য কার্যত সমর্থন করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। গঙ্গার ধারে হেমেন্দ্রকুমারের নতুন বাড়িতে সামতাবেড় থেকে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তখন তিনি সামতাবেড়েব বাসিন্দা। সৌজন্য দেখিয়ে হেমেন্দ্রকুমার হুইস্কির পাত্র অফার করলে শরৎচন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করেন—"না, তাও খাবনা।" সামতাবেড়বাসী শরৎচন্দ্র মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন, এ সংবাদ সম্ভবত হেমেন্দ্রকুমারের জানা ছিলনা। শিবপুরবাসী কালেভদ্রে মদ্যপায়ী শরৎচন্দ্রের সংবাদ তিনি রেখেছেন, তার পরের খবর নয়। [১৪]

'ও [আফিম] আমার সঙ্গের সাথী'

আফিম শরৎচন্দ্রের আমৃত্যু সঙ্গী। বিশেষ স্নেহের সঙ্গে নেশাটিকে তিনি লালন করেছেন। "আমি ভয়ানক ওপিয়াম-ইটার।" জীবনের মধ্য পর্বে ছাড়ার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়ে, দ্বিগুণ জোরে আঁকড়ে ধরেছেন। এই ধারণা পর্যন্ত তাঁর হয়েছিল, নিয়মিত অহিফেন সেবন শরীর সুস্থ রাখার অন্যতম উপায়।

"আফিম ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধকরি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না, বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল। এইবার আর একটু ভাল করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়। আফিম কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মতো হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধকরি ভাল। আমি তো মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্তব্য।" [১৫]

"আফিম ভরসা। ইহাতে যদি অচলা ভক্তি রাখিতে পারি, তবে দুর্দিন কাটিবেই কাটিবে।" [১৬]

"বহু আফিম রক্ত-মাংসে জড়ানো। হেরেছি অনেকের কাছে, কিন্তু হার মানিয়েছিলাম আবগারী ব্যাটাদের।"[১৭]

আফিমের এহেন সরস মহিমা-কীর্তন কদাচিৎ দেখা যায়। সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হেমেন্দ্রকুমার রায়কে উৎসাহ দিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "হেমেন্দ্র, যদি আরো ভালো লিখতে চাও, আমার মতো আফিম ধরো।" শরৎচন্দ্রের মতো খেলার মার্বেলের সাইজের আফিমের গুলি খাওয়ার পরিণাম অনুমান ক'রে শিউরে উঠে হেমেন্দ্রকুমার বলেছেন, "মাপ করুন মশাই, ও-রকম একটিমাত্র ডেলা যদি খাই, তাহলে আর ভাল লেখার সময় পাব না, কারণ যমদূতেরা খবর পেয়ে ছুটে আসবে।"[১৮]

আফিম সম্বন্ধে এই বিশেষ মমতার কারণ শরৎচন্দ্র স্বয়ং ব্যাখ্যা কবেছিলেন অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। জীবনের অনেক দুঃখ আফিমের নেশায় তিনি ভুলেছেন। "যখন জগতের কেউ আমায় দেখেনি, তখন ওই আমায় দেখে এসেছে, আমায় আনন্দ দিয়ে এসেছে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও আমার সঙ্গের সাথী।"[১৯] এহেন আফিমকে শরৎচন্দ্র ছাড়বেন কি ক'রে?

শরৎচন্দ্র যখন রাজনীতিতে জড়িত, তখন জেলে যাওযার অনিচ্ছার হেতু জেলে আফিম না মেলা। তা নিয়ে রসিকতা করেছেন সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের সঙ্গে। দিলীপকুমার রায় লিখেছেন :

"একদা নিমন্ত্রণ করেছি সুভাষ, শবৎদা, কিরণশঙ্কর রায়, তুলসী গোস্বামী প্রভৃতিকে। সুভাষ তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছে—কোন সনে ঠিক মনে পড়ছে না। সুভাষকে কৃশকায় মনে হলো, দুর্বল। বললাম : 'সুভাষ, এবার তোমাকে একটু বিশ্রাম নিতেই হবে, নইলে ছাড়ছি না। আমি বলি কি, চলো নৌকাবিহারে—সুন্দরবনের গঙ্গায়। সব বন্দোবস্তের ভার আমার।' কিরণশঙ্কব হেসে বললেন : 'এই-ই তো বন্ধুর কাজ দিলীপবাবু। সুভাষের একটু বিশ্রাম নেওয়াই চাই—আর আপনি জোর ক'রে ওকে টেনে নিয়ে না গেলে—আপনার পিতৃদেবের ভাষায় খেটে-খেটে-খেটে ওর শরীর হবে মেটে।' সুভাষ হেসে বলল : 'তোমার সঙ্গে বিশ্রাম নিতে কি আমার অসাধ দিলীপ? শুধু বিশ্রাম না—নৌকাবিহারে রোজ তোমার গান শোনা—লোভ না হয় কার? কিন্তু হলে হবে কি বলো—কংগ্রেসের কাজে কর্মীর আজ একান্ত অভাব, অথচ কাজ অগুন্তি।'

বলেই হেসে শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে, 'তবে যদি শরৎবাবু বি-পি-সি-সি'র প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হন তবে আমি তাঁর হাতে সব কাজ তুলে দিয়ে দুদিন জিরুতে পারি।'

শরৎদা (তৎক্ষণাৎ) : সুভাষ, আমি দেখতে বোকা বটে, কিন্তু আসলে বোকা নই মোটেই।

সুভাষ (সচকিত বিস্ময়ে) : কি রকম?

শরৎদা : মানে, বি-পি-সি-সি'র প্রেসিডেন্টের গদি আমার মাথায় থাকুক। জেলে যাওয়া আমার পোষাবে না।

সুভাষ (হেসে) : আহা জেলে যেতে হবে—কে বলছে?

শরৎদা : মন, আর কে—যে বলে দুই আর দুইয়ে চার হবেই হবে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সুভাষ (হো হো ক'রে হেসে) : মা ভৈঃ, শরৎবাবু, আপনাকে ওরা কিছু বলবে না।

শরৎদা : আর যদি বলে—তখন? ম্যাও ধরবে কে শুনি?

সুভাষ : সে কি?

শরৎদা : আর সে কি? কী হবে—'শেষের সেদিনে'—আমি বুঝি জানিনা ভেবেছ? ওরা আসবে সদলবলে—হাতে পরাবে বালা—ওদের বন্ধ গাড়িতে টেনে তুলে সরাসর পুলিপোলাও পাঠাবে হরিণবাড়ি—আমি হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকব—আর ঠিক সেই সময়ে তোমরা সদলবলে এসে মালা ছুঁড়ে জেলের দিকে আমাকে তোফা ঠেলে দিয়ে হেঁকে বলবে : 'বন্দেমাতরম'! ব্যস। তারপরে আমার অজ্ঞাতবাস পাঁচটি বৎসর। (একটু থেমে) তার উপর শুনি, সেখানে আফিম দেয়না—না সুভাষ, তোমাদের বি-পি-সি-সি'র খুরে দণ্ডবৎ, ওতে আমি নেই।"[২০]

ধূমপানের বাহার

রকমফের ধূমপানে অভ্যস্ত শরৎচন্দ্র—তামাক, গাঁজা, পঞ্চরং—কি নয়? গড়গড়ার নল সর্বদাই তাঁর ঠোঁটের কোণে ঝুলত। এক সময় পাইপ টানতেন, সিগারেট খেতেন। শেষ বয়সে গড়গড়ার রাজকীয় মেজাজে তিনি আকৃষ্ট। "তামাকের গড়গড়া এবং তার সরঞ্জাম ছিল প্রচুর। গড়গড়া সবসময়ে ঝকঝকে পরিষ্কার থাকত।"[২১] হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তিনি গড়গড়া এবং তামাকের খোঁজ করেছেন। বাড়িতে প্রিয় ভৃত্য ভোলা হাজির থাকত গড়গড়ার মাথায় নতুন কলকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য।

শরৎচন্দ্রের তামাক সেবনের সূত্রপাত অল্প বয়সেই। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগে বা পরে শরৎচন্দ্র এই নেশাটি ধরেছেন। তাঁকে স্বচ্ছন্দে তামাক টানতে দেখে চমকে গেছেন তাঁর সম্পর্কের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'তামাক সেবা মহা অপরাধ' —শিশু বয়স থেকে গড়ে ওঠা সুরেন্দ্রনাথের এই বদ্ধমূল সংস্কারে আঘাত করেছেন শরৎচন্দ্র : "আমার মনে বড় কঠিন ধাক্কা লাগিয়াছিল।" একইসঙ্গে শরৎচন্দ্রের আয়েসী তামাক সেবনের বর্ণনাও দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ :

"তাহার তামাক খাইবার কায়দা দেখিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গুড়গুড়িটি খাটের তলায় ছিল এবং খাটের দড়ির ফাঁকের মধ্য দিয়া নলটি বালিশের পাশে ইচ্ছামতো উঠিতে নামিতে পারিত। ভিতর হইতে দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে নিমেষে ছোট ঘরখানি ধূমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। ...নেশাটা চিরদিনই অবজ্ঞার বিষয়। কিন্তু এক একজন মানুষের জীবনে তাহা কতখানি স্থান জুড়িয়া বসে এবং দৈনন্দিন সুখদুঃখের সহিত জড়িত হইয়া যায়, ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয় ; আবার হাসিও পায়।" ('শরৎচন্দ্র', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্লোল', কার্ত্তিক ১৩৩২)।

গঞ্জিকাসেবনের সূত্রপাত শরৎচন্দ্রের যৌবনের সূচনায়। তখনো তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় বেঁচে। তাঁর সামনে গঞ্জিকাপ্রসাদে রক্তচক্ষু শরৎচন্দ্র যে কেলেংকারী করেছিলেন, তা নিজেই বহু পরে একাধিকবার দিলীপকুমার রায়কে বলেছেন :

"আমি তখন গাঁজাখোরদের সঙ্গে গাঁজা খাই। বাবা জানতেন না। একদিন গাঁজা খেয়ে বেটক্কর হয়ে, বাবা [আমাকে জল দিতে] বলতেই মাটির কলসী থেকে তাঁর গেলাসে জল ঢেলে দিয়েই, কলসীটি রাখলাম তাঁর চাপাটির উপরে। বাবা আমার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে আমার চোখ লাল দেখে একটিও কথা না বলে উঠে চলে গেলেন না খেয়ে। এরপরে আর গাঁজা খাইনি।" ('নমঃ শরৎচন্দ্রায়', দিলীপকুমার রায়, শবৎজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, 'দেশ' পত্রিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)।

কিন্তু সবসেরা নেশা পঞ্চরং—নেশার রাজা। ঐ নেশা করার পরে সজ্ঞান জগতে ফিরে তিনি 'অম্লানবদনে' বলেছিলেন : "নেশার চরম করেছি। আমি পঞ্চরং করেছি, গ্র্যাপ শট খেয়েছি, আর কি চাও?" ধরে নিতে পারি প্রশ্নকর্তা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের স্পষ্টবাদিতায় বিস্ময়ে বিমঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র অতঃপর বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছিলেন পঞ্চরং বস্তুটি কি, চূড়ান্ত নেশাখোর মানুষ কিভাবে ঐ নেশায় ভোম হয়ে থাকে :

"একটি হুঁকায় পাঁচমুখো একটা কলকী চড়ানো। হুঁকার খোলে জলের বদলে মদ ভরা, আর কলকীর পাঁচ মুখে তামাক গাঁজা চরস গুলি সিদ্ধি সাজা। এই সবগুলিতে একত্র আগুন লাগাইয়া মদের মধ্য দিয়ে টানিতে হয়। ইহার নাম পঞ্চরং। আঙুরের থোলো যেমন উপরে মোটা হইয়া ক্রমে সরু হইয়া আসে, এও একটি কলকী তাহার উলটা আকারের, উপরে সরু আর নীচেব দিকে ক্রমে মোটা হইয়া হুঁকার মাথায় বসিবার উপযুক্ত। সেই কলকীটির সর্বাঙ্গে হাজার ছিদ্র ; প্রত্যেক ছিদ্রে গুলি ও চরসের ছিটা দিয়া সেই ধূমপান করিতে হয়। চীনা চণ্ডু নেশার রাজা, তাহাতে এত নেশা হয় যে না শুইয়া ধোঁয়া টানিলেই ধড়াম করিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। শরৎ grape shots শব্দটিকে উচ্চারণ করিত গ্র্যাপ শট।" ('শরৎ-স্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৪৫)।

নেশার সর্বোচ্চ সীমা আমি স্পর্শ করেছি—এই জাঁক করবার ন্যায্য অধিকার শরৎচন্দ্রের ছিল।

'বওয়াটে বলে আমার...কুখ্যাতি'

কথাটা শরৎচন্দ্রেরই। নানা নেশায় পরিপক্কতা অর্জনের সঙ্গে পতিতালয়ে বাস করার অভ্যাস তিনি করেছেন। তাঁর জীবনের সেই উচ্ছৃঙ্খল পর্বের সূচনা রেঙ্গুনে যাবার আগেই। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে মুখে বলেছিলেন, তাঁর জনৈক বন্ধুর অনুরোধ না ফেলতে পেরে হাওড়ার পতিতাপল্লীতে গিয়েছিলেন। সেখানে রাতের মজলিশ জমে উঠেছিল মদ্যপান এবং নর্তকীর ঘুঙুরের শব্দে।[২২] রেঙ্গুনের যে-পরিবেশে তিনি বাস

করতেন তা ভদ্র বাঙালি পরিবারের বাসের উপযুক্ত ছিলনা। মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকের রুচি ঐ পরিবেশে ঢুকে কিভাবে আহত হয়, তার পরিচয় শরৎচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন 'পথের দাবী'তে—অপূর্ব যখন ভারতীর সঙ্গে প্রথম কুলিলাইনে গিয়েছিল। অবাধ মদ্যপান, একান্ত অনাব্রু জীবন, মর্জিমাফিক সঙ্গী বা সঙ্গিনী বদল—এসবের ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। তা করার কালে শিল্পীসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর ছিল। কিন্তু ঐ পরিবেশের মধ্যে সকলের একজন হয়ে তিনিও যে বাস করতেন—এও সত্য!

সাফাই গাওয়ার অধিকার নিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, পতিতা 'নারীর ইতিহাস' সংগ্রহের জন্য (পরে যা রেঙ্গুনে অগ্নিদগ্ধ হয়) দিনের পর দিন তিনি পতিতালয়ে ঘুরেছেন। অনুমান করতে পারি, এই বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড তিনি শুরু করেছিলেন রেঙ্গুনে। তখন সমাজতত্ত্ব বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা ক'রে তিনি পতিতা নারীর গৃহত্যাগের দলিল প্রস্তুতিতে লেগে পড়েছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—পতিতার সেবা করায়। রেঙ্গুনে বসন্ত রোগগ্রস্ত একটি পতিতার সেবা করার ঘটনা তিনি বলেছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে।[২৩] আবার হাওড়ার পতিতালয়ের বাড়িউলি বুড়ি মাসীকে কলেরার হাত থেকে বাঁচানোর কথা জানিয়েছিলেন রাধারানী দেবীকে।[২৪] ১৯১২ সালের অক্টোবরে বর্মা থেকে কলকাতায় এক মাসের ছুটিতে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন। তাঁর দেওয়া ঠিকানা ধরে তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে খুঁজে বার করেছিলেন হাওড়ার পতিতালয়ের একটি ঘর থেকে। শরৎচন্দ্র সেখানে 'চরিত্রহীন' লেখায় ব্যস্ত ছিলেন।[২৫]

এসব তথ্য অনিবার্যভাবে আমাদের একটা প্রশ্নের সম্মুখীন ক'রে দিয়েছে—পতিতাগমন কি শরচন্দ্রের স্বভাব? অথবা নিপীড়িতা নারীর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতির সঙ্গে মিশেছিল বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা—শুধু এইটুকুই? ৯ কার্ত্তিক ১৩৪৩-এ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে শরৎচন্দ্র বিগত যৌবনের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : "সেদিন ছিলুম আমরা যৌবনের কোঠায়, যৌবনের নানা আনন্দ ও অনাচার নিয়ে।"[২৬] মৃত্যুর অল্প আগে লেখা এই চিঠিটিকে আমরা চরম আত্মউম্মোচন মনে করতে পারি। দিনের পর দিন যে যুবক পতিতালয়ে গেছেন, কোনো পতিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে শারীরিকতায় পৌঁছয় নি, তা নিশ্চয় ক'রে কে বলবে? ভূপেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে কি শরৎচন্দ্রের সেই আত্মস্বীকৃতি নেই?

নিজের 'বিখ্যাত' জীবনে প্রিয় মানুষের অথবা মানুষদের কাছে শরৎচন্দ্র নিজের বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন, পতিতালয় সম্বন্ধীয় নানা গল্প তার মধ্যে ছিল। এবং ছিল এই অস্বীকার—পতিতাগমন তাঁর স্বভাব নয়। রাধারানী দেবী এবং হরিদাস শাস্ত্রী সেকথা আমাদের জানিয়েছেন।[২৭] ভূপেন্দ্রনাথকে ঐ চিঠি লেখার সতেরো বছর আগে ৭ ভাদ্র ১৩২৬-এ লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "আমার **এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, শুধু ছোট কাজ কখনো করিনি। যখন মরব—ফরসা খাতা রেখে যাব, যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না।**"[২৮] শরৎচন্দ্র পরিষ্কার ক'রে বলেন নি 'ছোট

কাজ' ব্যাপারটা কি! সারা জীবনে বিচিত্র নেশা এবং সন্দেহজনক স্থানে নিয়মিত গমনের পরেও কি করে তাঁর জীবনের 'খাতা' 'ফরসা' থাকে, তাও আমাদের বোধগম্য নয়। সম্ভবত এই স্ববিরোধিতা শরৎচন্দ্রের নিজের কাছে অস্পষ্ট ছিলনা। তাই মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে ঐ ধোঁয়াটে ভাষার জাল সরিয়ে 'যৌবনের নানা আনন্দ ও অনাচার'-এর কথা মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। নিজের বিষয়ে এতখানি স্পষ্টবাদী শরৎচন্দ্রকে এর আগে কখনো পাওয়া যায়নি।

রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের জীবনে ব্যর্থ প্রণয়ের একটি ঘটনা ঘটে। তার বিবরণ দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনবাসী বন্ধু ওখানকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রকে 'সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক'-এর বেশি ভাবতে পারেন নি। কলকাতার ভদ্রবংশের জনৈক বিধবা সুন্দরী তরুণী গায়ত্রী তার সমবয়সী বিমাতার অত্যাচারে ঘর ছেড়ে প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে তার মেসোমশায়ের বাড়িতে যাত্রা করে। কিন্তু ঐ দুশ্চরিত্র প্রতিবেশী যুবকটি কামনা চরিতার্থ করার জন্য গায়ত্রীকে লক্ষ্ণৌর পরিবর্তে রেঙ্গুনে নিয়ে আসে এবং "রেঙ্গুন শহরে বাঙালি সমাজের নেতা জননায়ক কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের" বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আত্মসম্ভ্রম বিসর্জনে নারাজ গায়ত্রী অনন্যোপায় হয়ে কুঞ্জবাবুর স্ত্রীর কাছে প্রকৃত ঘটনা বলার পরে, গিরীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় শরৎচন্দ্র নিজের বাসস্থান বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলে তাদের জন্য বাড়ি ঠিক ক'রে দেন। ইতিমধ্যে দুশ্চরিত্র যুবকটি গিরীন্দ্রনাথ প্রমুখেব দ্বারা বিতাড়িত হয় এবং কলকাতার একটি যুবকের সঙ্গে শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর রক্ষক হিসাবে একই বাড়িতে থাকতে আরম্ভ কবেন। একটি বিপন্ন নারীর রক্ষক হিসাবে শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ভূমিকাকে আদৌ ভালো চোখে দেখেন নি গিরীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র ধরে নিয়েছিলেন বিমাতার অত্যাচারে ঘরছাড়া গায়ত্রীর পক্ষে অতঃপর সর্বনাশের শেষ ধাপে দ্রুত পৌঁছে যাওয়া খুবই সম্ভব। অন্তত পতিতাদের মুখে শোনা নানা অভিজ্ঞতা তাঁকে তাই শিখিয়েছে। সুতরাং গায়ত্রীর 'প্রকৃত মনোভাব' জানার জন্য তাকে 'দিনকতক স্টাডি' করতে তিনি ইচ্ছুক। শরৎচন্দ্রের এই উদ্দেশ্য শুনে গিরীন্দ্রনাথ শিউরে উঠেছিলেন। সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ তিনি —গায়ত্রীর ব্যাপারে অধিক জড়িত হলে তাঁর নিজের নৈতিক সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের 'সমাজ বা লোকলজ্জার ভয় আদৌ ছিলনা।' তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্তির ফল কি দাঁড়াবে, তা গিরীন্দ্রনাথেব যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ দাঁড়িয়েছিল। "কেন পাগল শরৎচন্দ্রকে গায়ত্রীদের বাড়িতে শুইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম! মনে ভীষণ অনুতাপ হইল।"

গিরীন্দ্রনাথের অনুতাপের আরো কারণ আছে। শরৎচন্দ্রের গায়ত্রী-স্টাডি ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন্ বাঁক নিচ্ছে তাও তিনি দেখেছেন। ধর্মপ্রাণ আত্মীয়স্বজনহীন গায়ত্রীর রূপ-গুণে মুগ্ধ শরৎচন্দ্র নানাভাবে গায়ত্রীর মন আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ছিল : "গায়ত্রীর বৈধব্য তাহাকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রহ্মচারিণীর ব্রতাধিকার বাহিরের দিকে দিলেও অন্তরের দিকে খুব সম্ভব দিতে পারেনি। কেননা নিতান্ত তরুণ বয়সে সে স্বামীহারা। স্বামীর সঙ্গে তার হৃদয়ের পরিচয় হবার কোনোদিনই সুযোগ ঘটেনি। এ

অবস্থায় শাস্ত্র তাকে যে জায়গাতেই দাঁড় করাবার চেষ্টা করুক না কেন, হৃদয়ের দিক দিয়ে সে আজও কুমারী। বিধবা বিবাহ তো অসঙ্গত নয়। কেউ যদি গায়ত্রীকে ধর্মানুযায়ী পত্নী বলে গ্রহণ করতে চায়, তাতে আমি কোনো দোষ দেখিনা।" শরৎচন্দ্র স্বয়ং স্বনির্বাচিত পাত্র।

শরৎচন্দ্রের ঐকালীন মনস্তত্ব গিরীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন। বালবিধবা গায়ত্রীর জীবন স্বামীসঙ্গের অভাবে ব্যর্থ—এটা ধরে নেওয়ায় শরৎচন্দ্রের "ছন্নছাড়া জীবনটা ব্যর্থতার মধ্যেও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল।" কল্পনার তার-ঝঙ্কার তিনি ক্রমাগতই চড়াতে শুরু করলেন। তার ফল—গায়ত্রীর চোখে তিনি "লালসালিপ্ত কামনার জীবন্ত চিত্র।" শরৎচন্দ্রের নৈতিক চরিত্র গিরীন্দ্রনাথের কাছে সন্দেহযুক্ত ছিল। যিনি "অবলা-অত্যাচারিতা ও পতিতা স্ত্রীলোকদিগের...বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য বহুদিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন", তাঁকে সহজে বিশ্বাস করতে পারেন নি গিরীন্দ্রনাথ। উল্টোদিকে গায়ত্রীকে একান্ত ধর্মপ্রাণ নারী হিসাবে তিনি দেখেছেন। শরৎচন্দ্রের হাত থেকে গায়ত্রীকে রক্ষা করাই তাঁর মাথাব্যথার কারণ দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত গিরীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় গায়ত্রী লক্ষ্ণৌতে তার মেসোমশায়ের কাছে ফিরে যায়।[২৯]

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'আত্মচরিত', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮।
২. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৫৮।
৩. ঐ, পৃ. ১১৪।
৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', রাধারানী দেবী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০ ০০৯, অক্টোবর ১৯৭৬, 'পরিশিষ্ট' অংশে সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র দ্রষ্টব্য। অতঃপব 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প'।
৫. 'আত্মচরিত', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮।
৬. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১৬৯।
৭. 'শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র', রাধারানী দেবী, 'জয়শ্রী', আশ্বিন ১৩৮২ (আকর : 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ১৫ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৩০৪। অতঃপর 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র')।
৮. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪১২।
৯. 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৭৪।
১০. বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪।
১১. 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, (আকর : 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১)।
১২. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৭৪।

১৩. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে', অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৭০০ ০০৭, ১৮৮০ শকাব্দ, পৃ. ৪৩। অতঃপর 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে'।

১৪. 'যাঁদের দেখেছি', হেমেন্দ্রকুমার রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ. ১৯২। অতঃপর 'যাঁদের দেখেছি'।

১৫. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৩১।

১৬. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র, ঐ, পৃ. ২৯১।

১৭. ঐ।

১৮. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৮৪।

১৯. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে', পৃ. ৭৯।

২০. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), দিলীপকুমার রায়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৭, ১৮৮৪ শকাব্দ, পৃ. ৯৫-৯৬। অতঃপর 'স্মৃতিচারণ'।

২১. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১০৯।

২২. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শিল্পীসংস্থা প্রকাশনী বিভাগ, কলকাতা—৭০০ ০০৫, ফাল্গুন ১৩৭২, পৃ. ৮৯। অতঃপর 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা'।

২৩. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৮৬-৮৭।

২৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৪৫।

২৫. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৮৭। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে (পৃ. ১৮৪) লিখেছেন, "প্রতিদিনই [যমুনা কার্যালয়ের] আসর ভাঙবার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাড়ি ফিরতুম আমি। তখন তিনি বাস করতেন বড়বাজারের এক কুবিখ্যাত পল্লীতে। সেই সময়ে পথে চলতে চলতে তিনি নিজের জীবনের বিচিত্র কথা আমার কাছে বলে যেতেন একান্ত অসঙ্কোচে।...একদিন বললেন, 'হেমেন্দ্র, এমন নেশা নেই যা করিনি, এমন কুস্থান যেখানে যাইনি। আজ এই ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, এত করেও তো আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। আমার মনের ভিতরকার মানুষটি চিরদিনই নির্মুক্তি হয়ে আছে'।" বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব সাহিত্যে তো আছে, 'তোরা নীর না ছুঁইবি, সিনান করিবি।'

২৬. ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৭৪।

২৭. রাধারানী দেবী এবং হরিদাস শাস্ত্রী একই বিশ্বাসের ঘোষণায় অটল থাকতে চেয়েছেন —শরৎচন্দ্র নেশার চূড়ান্ত ক'রেও, অস্থানে-কুস্থানে গেলেও, পতিতাদের সঙ্গে দেহসম্বন্ধে কোনোদিন লিপ্ত হননি। এঁদের দুজনেরই ভরসা ছিল শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি। রাধারানী লিখেছেন : শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, তিনি 'ক্রেতা হয়ে পতিতা পল্লীতে আনাগোনা করেন নি।' রাধারানীর ব্যাখ্যা, পতিতাদের সঙ্গে দেহ-সম্পর্ক থাকলে পতিতাদের সম্পর্কে 'আন্তরিক করুণায়' কথা বলতে পারতেন না, 'ওদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্য সকলের মতো ছিলনা সম্ভবত।' ('শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৪৫-৪৬)। রাধারানী দেবী প্রথমে যতটা জোরের সঙ্গে তাঁর 'বিশ্বাস'-এর কথা বলেছিলেন, দু'লাইন পরেই তা 'হলেও-হতে পারে' গোছের ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। সন্দেহের কাঁটা তাঁর মনে খচখচ ক'রে বিঁধেছে। সুতরাং লিখেছেন, শরৎচন্দ্র 'সম্ভবত' পতিতালয়ের খদ্দের ছিলেন না। হরিদাস শাস্ত্রী অবশ্য সন্দেহের গোড়া প্রথম থেকেই

মেরে দিয়েছেন। শ্রোতাদের মুখে কার্যত হাত চাপা দিয়ে তিনি লিখেছেন : "এমন লোক থাকা অসম্ভব নয় যিনি মনে করিবেন আমি গল্প লিখিতেছি। তাঁহাদের বলিতে চাই যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে—তা তাঁর প্রশংসারই হউক, নিন্দারই হউক—আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতাম না।" ('শবৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯)। এ বিষয়ে আরও আলোচনা আছে সপ্তম অধ্যায়ের 'অভিজ্ঞতাব বিশেষ চেহারা : পতিতা জীবন' নামক উপ-অধ্যায়ে।

২৮. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২২১।

২৯. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', গিরীন্দ্রনাথ সরকার, ৫৭এ সতীশ মুখার্জী বোড, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ৮৬-১৫৯। অতঃপর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র'।

তৃতীয় অধ্যায়

নিঃশব্দ প্রেম : দারুণ দহন

শব্দহীন শিশিরপাতের মতো সেই প্রেম শরৎচন্দ্রের জীবনে এসেছিল—মাত্র একবারই। সে প্রেমে একাধারে স্নিগ্ধ সৌরভ এবং দহন জ্বালা। দহনের পরিমাণই বেশি। সাংসারিক সমস্ত সাফল্যের পরে জীবনের একেবারে শেষে পৌঁছে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেছে—"কি হলো!" [১] শূন্য হৃদয়ের বেদনাভার তখন অসহ্য বোধ হয়েছে। সেই রক্তাক্ত হৃদয়ের ছবি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতিশীল একজন-দু'জনকে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন। বলেছেন তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যজীবনে বারেবারে বাঁক ফেরার কী কারণ, চেষ্টা করেছেন সে নারীকে হৃদয়ে গোপনচারিণী ক'রে রাখতে। মৌখিক আলাপে বা চিঠিতে সেই তাঁর প্রসঙ্গ এলে তার উপর আবরণ টেনে দিয়েছেন।

আমরা অবশ্য জেনেছি কে এই অনামী অঙ্গনা যাঁর বিষয়ে শরৎচন্দ্র একথা না বলে পারেন নি যে,

"ভালবাসা নিষ্ফল হলো, কিন্তু [আমার] সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।" [২]

"তিনিই ছিলেন আমার লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলোমেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াত না।" [৩]

শরৎচন্দ্রের জীবনদেবী এসেছিলেন সাহিত্যের পথ বেয়ে।

নিরুপমা শরৎচন্দ্রের কাছে অর্ধেক মানবী এবং অর্ধেক কল্পনা। সে ছবি শরৎচন্দ্র বুকের মধ্যে আজীবন বহন করেছেন। তার বর্ণনা পাওয়া গেছে রাধারানী দেবীর লেখায়। সেই 'স্নিগ্ধ কোমল পবিত্র দেবীমূর্তি' "শরৎদার থেকেই আমার মনে সঞ্চারিত।" [৪] কিন্তু দেবীরও একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। রাধারানী তা সংগ্রহ করেছিলেন :

"[নিরুপমার] কথাবার্তা বেশ কোমল ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। মুখে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির আভা; তার সঙ্গে ছিল নরম বিষণ্ণতা। এইটি আমার নিজের দেখা নিরুপমা দেবী।" [৫]

শরৎচন্দ্র নাটক এবং সাহিত্যের সূত্রে নিরুপমাকে জেনেছেন। স্বয়ং নিরুপমাই তা বলেছেন :

"বড় দাদাদের অভিনয়ের পাঠ লিখিয়া দেওয়াও তখন আমার একটা কাজ ছিল।

তাঁহারা 'আদমপুর ক্লাবের' সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের থিয়েটার হইত। শরৎদাদার তাহাতে যোগ ছিল। দাদারা এবং ভগিনীপতিটি সমগ্র 'বৌঠাকুরাণীর হাট'টিই আমার দ্বারা নাটকাকারে লিখাইয়া লইয়াছিলেন। গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেব', 'পূর্ণচন্দ্র' প্রভৃতির বহু পাঠই আমাকে লিখিয়া দিতে হইত।" ('পুরাতন কথার আলোচনা', নিরুপমা দেবী, 'জয়শ্রী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)।

"আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোট্‌দা [বিভূতিভূষণ ভট্ট] তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে [শরৎচন্দ্র] দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐসব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। ...তিনি নাকি ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে 'বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখিতে পারিবে'।" ('আমাদের শরৎদাদা', নিরুপমা দেবী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

ব্যাপারটা শরৎচন্দ্রের কাছে অতীব বিস্ময়ের ঠেকেছিল। যে-সময়ে নারীদের মধ্যে লেখাপড়ার চল বিশেষ ছিল না, সেইকালের নারী নিরুপমা অজস্র কবিতা যেমন লিখছেন, তেমনি নাটক কপি ক'রে দিচ্ছেন ছেলেদের অভিনয়ের জন্য! এই নারী অবশ্যই অসামান্যা। শরৎচন্দ্রের কল্পনা তরতর গতিতে এগিয়েছে। ইতিমধ্যে ভট্টবাড়িতে শরৎচন্দ্র স্থান ক'রে নিয়েছেন। রচিত হচ্ছে 'অভিমান', 'কাকবাসা', 'বোঝা', 'কোরেল', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ' ইত্যাদি গল্প। সে-সবের বিশেষ লক্ষ্য নিরুপমা। "ক্রমে আমরা শরৎদাদার আরো কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। 'বাসা' (যার নাম সুরেন্দ্রভাই 'কাকবাসা' দিয়াছেন), 'বাগান' (ইহাতে 'বোঝা', 'কোরেল গ্রাম', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল।), 'চন্দ্রনাথ', 'শিশু', 'পাষাণ' (এই গল্পটিকে আর দেখিলাম না। একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে ; পরে শুনিয়াছি যে অভিমানের মতো সেখানিতেও একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজি পুস্তকের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত।) এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নামধারণ করিয়াছিল।" ('আমাদের শরৎদাদা', নিরুপমা দেবী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র-নিরুপমার সম্পর্ক দু-পাক্ষিক অথবা তা শরৎচন্দ্রেরই একতরফা—তা নিয়ে বিতর্ক। নিরুপমার কাছে শরৎচন্দ্রের আত্মনিবেদন ছিল এবং ছিল নিরুপমার সম্মানার্থে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে একেবারে সরিয়ে রাখা। এমন-কি তাঁর সাহিত্যজীবন নিরুপমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নিঃশব্দে আত্মবলিদান দিয়েছে। এই খতিয়ান পাওয়া গেছে রাধারানী দেবীর কলমে। শরৎ-জীবনের শেষ কয়েক বছরে তাঁর প্রচুর স্নেহ পাওয়ার সূত্রে রাধারানী জেনেছিলেন, শরৎচন্দ্র দুবার নিরুদ্দেশ হয়েছেন নিরুপমার চিঠি পেয়ে। প্রথমবার ভাগলপুর থেকে। সেবারে একটি চিরকুট এসেছিল শরৎচন্দ্রের কাছে—"আপনি এদেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যান। আর এখানে আসিবেন না। আমাকে এভাবে নষ্ট করিবেন না।" শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি, এই চিরকুট

পাওয়ার "তিন ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে গেছলুম।" দ্বিতীয় চিঠি শরৎচন্দ্রের কাছে ডাকে এসেছিল। তখন তিনি কলকাতায়, নাটক ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। এক ফাঁকে চিঠি লিখেছিলেন নিরুপমাকে। "নির্দোষ নির্মল সে চিঠি। কিন্তু সেটা অন্য লোকদের হাতে পড়েছিল। আর চিঠি লেখাটাই তো মৌলিক অপরাধ। ভালমন্দের প্রশ্নই ওঠেনা। ফলে ডাকযোগে নির্বাসনদণ্ড এসে গেল।" —শরৎচন্দ্র বলেছেন রাধারানীকে। কি ছিল নিরুপমার চিঠিতে? "এখানে যোগাযোগ আর কখনো রাখবেন না। আপনি অনেক দূরে চলে যান। আমাকে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।" পরের অংশ শরৎচন্দ্র সজল চোখে বলেছেন—"এক লাফে সাগরপার। ...দু-তিন দিনের মধ্যেই বিলিবন্দেজ ক'রে ফেললুম। দেরি কবিনি।"

রেঙ্গুনপ্রবাসী শরৎচন্দ্র কেন দীর্ঘদিন সাহিত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি, তার একটা ব্যাখ্যা রাধারানী এখানে দিয়েছেন। ঐ পর্বে শরৎচন্দ্র প্রচুর বই পড়েছেন (আস্ত লাইব্রেরি কিনেছেন পর্যন্ত), কিছু গানবাজনার চর্চা করেছেন, ছবি এঁকেছেন। কিন্তু নিরুপমার প্রতি তীব্র অভিমানে বন্ধ করেছেন সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যই নিরুপমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। আঘাত যখন ওখান থেকে এল, শরৎচন্দ্রের সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ল সাহিত্যের উপরে। বিচিত্র মনস্তত্ত্ব! সারা জীবন ধরে শরৎচন্দ্র বারবার নিজেকে আঘাত করেছেন—নিরুপমাকে না পাওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণায়। প্রেমের এমন বেদনার্ত রূপ কদাচিৎ দেখা গেছে। শরৎচন্দ্রের এই আত্মহনন কিংবা আত্মধিক্কার প্রবৃত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। রাধারানীকে তিনি বলেছিলেন :

"যে-জীবন তাঁর রুচিবিগর্হিত ছিল, যে-পথ তিনি ঘৃণা করতেন, সেই পথেই তিনি নিজের জীবন টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত যেদিকে তিনি হাঁটলেন, সে দিকটি যে ভুল দিক, এটি যখন তাঁর চৈতন্যে এল, তখন ক্ষতিবোধে এতই আহত হয়ে থাকলেন নিজের সর্বনাশের দিকে তাকিয়ে—যার ফলে সারাজীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি।" [৬]

না, শরৎচন্দ্র-নিরুপমার মধ্যে কোনো ভালবাসাবাসি ছিলনা—সবটাই শরৎচন্দ্রের অহেতুক কল্পনা—এই মত প্রকাশ করেছেন নিরুপমার বাল্যসখী এবং সেকালের বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী। নিরুপমার মৃত্যুর পর একটি পত্রিকায় নিরুপমা-শরৎচন্দ্রের প্রেমসম্পর্কের বিষয়ে কিছু লেখা হয়। তাতে ঘোর অসন্তুষ্ট অনুরূপা মৃত শরৎচন্দ্রকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তীব্র কটু বচন বর্ষণ করেছেন। অনুরূপা লিখেছেন :

"...প্রচারকর্তারা নির্বাধে ও উৎসাহ সহকারে রটনা ক'রে বলেছেন এই যে—নিরুপমা দেবীর মন্ত্রগুরু সত্যদ্রষ্টা ঋষি শরৎচন্দ্র। এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে নিঃসন্দেহ। তবে এর ভিতরে 'সত্যদ্রষ্টার' নিজেরও বেশ একটা পরিকল্পনা যে ছিল, সেকথা আমি তো জানিই, অনেকেরই জানা আছে। তিনি [শরৎচন্দ্র] সুবিধামতো অনেকের কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার জন্যই হোক, কিম্বা শুধু কল্পনাবিলাসের আকাশকুসুম চয়নের জন্যই হোক, বা আনন্দলাভের জন্যই হোক, অনেকরকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা ক'রে বেড়িয়েছেন, যা নিয়ে অন্য কোনো সমাজ

হ'লে ডিফারমেসন চার্জ নিয়ে মামলা আনাও চলতে পারত। আমাদের উচ্চ হিন্দু সমাজে ধৃষ্টব্যক্তিকে যথাসাধ্য পরিহার ক'রেই চলতে উপদেশ দেওয়া হয়। ...ভদ্রসমাজের নামজাদা ঘরের সম্মানিতা মহিলাদের সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিত, আজকের দিনের বহু সম্মানিত, সেদিনকার ছন্নছাড়া, ভবঘুরে লোকটির সে শিক্ষা ছিলনা, সে [সম্বন্ধে] আমি, আমার স্বামী এবং এখনো বর্তমান দু' একজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে বুড়ী বলে উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয়না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বালবিধবার শরৎচন্দ্রের মতো চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা চলত। ...শুধু এইটুকু আজ বলতে চাই, সেই তপস্বিনী যশস্বিনী ও মনস্বিনী [নিরুপমা] তার নিজের শক্তিতেই যথেষ্ট শক্তিমত্তা দেখিয়ে গেছে, তার জন্য কারু দাগা বুলাবার প্রয়োজন হয়নি, হাতে খড়ি দেবার দরকারও কিছুমাত্র ছিলনা, যিনি এসব বাজে কথা রটনা করবার হীন কল্পনাবিলাস ক'রে গেছেন, তিনি যে কত অসত্যদ্রষ্টা তার প্রমাণ এইখানেই!" ('নিরুপমা দেবী', অনুরূপা দেবী, 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা, পৌষ ১৩৫৭)।

'বহু সম্মানিত' শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর এক যুগ পরে এই যে চমৎকার প্রীতিসম্ভাষণ লাভ করলেন তাঁর সমকালীন লেখিকা অনুরূপা দেবীর কলম থেকে, তার কারণ কি নিছক সত্যপ্রতিষ্ঠা, নাকি আরো কিছু আছে? এক্ষেত্রে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, 'যমুনা' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩১৯ সংখ্যায় অনিলা দেবী ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের বহু ছিদ্র নির্দেশ ক'রে সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"শ্রীমতী অনুরূপার 'পোষ্যপুত্রে'র গোড়াও পড়ি নাই, শেষও পড়ি নাই, শুধু মধ্যের গুটিকয়েক অধ্যায়মাত্র পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি,...ইঁহার...ভাষা যে অতি মধুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ...এত মধুর যে মুখ মারিয়া দেয় যে, আর গিলিতে পারা যায়না। তা ভাষা যাহাই হোক, প্রায়ই উপমাগুলিই যে না জানিয়া লেখা তাহা পড়িলেই চোখে ঠেকে। আর একটা জিনিস তার চেয়েও বেশি ঠেকে—সেটা অসহ্য জ্যাঠামো। ...দৃষ্টান্তের মতো দুই-একটা উল্লেখ করিব মাত্র। একস্থানে বলিতেছেন, 'বিজনপথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পায়ের নীচে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে পথিক যেমন আড়ষ্ট কাঠ হইয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি।' তাই বটে! একটা ন্যাকড়া কিংবা দড়ির টুকরা দেখিলে লাফাইয়া কে কার ঘাড়ে পড়িবে ঠিক থাকেনা, আড়ষ্ট হইয়াই দাঁড়ায়! তাও আবার যে-সে সর্প নয়—একেবারে দংশনোদ্যত সর্প! ইনি যে লেখেন নাই, রান্নাঘরে হঠাৎ জ্বলন্ত আগুনের টুকরা পায়ের নীচে মাড়াইয়া ধরিয়া রাঁধুনী যেমন অবাক হইয়া হাঁ হইয়া দাঁড়ায়—ইহাই পরম ভাগ্য। ...বইখানি শুনিয়াছি ৫/৬শ পাতার; আমি মাত্র ২৫/৩০ খানি পাতা পড়িয়াছি; ...বইখানি জ্ঞানগর্ভ। বেদ, কোরান, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, এথিক্স, মেটাফিজিক্স, রামপ্রসাদী, তন্ত্র, মন্ত্র, মারণ, উচাটন, বশীকরণ—সমস্তই আছে। এছাড়া সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি—কালিদাস, শেকস্‌পীয়র, টেনিসন—যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন একাধারে সমস্তই। ...আমার ছোট নাতিটিকে একখানি কিনিয়া দিব মনে করিতেছি।"

বহু বছর পরে ১৩৫৭ সালে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় অনুরূপা দেবীর তিক্ত রচনার

পিছনে কি শরৎচন্দ্রের ঐ রচনার বিরুদ্ধে শোধ তোলার মনোভাব ছিল?

অনুরূপার এই লেখার বিরুদ্ধে যুক্তিযোগে প্রতিবাদ করেছিলেন রাধারানী দেবী। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে লেখা প্রবন্ধে, তিনি নিরুপমার লেখা 'আমাদের শরৎদাদা' ('ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪) রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করেছিলেন। রাধারানী জানিয়েছেন, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর রচিত 'নিরুপমা দেবীর শ্রাদ্ধে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ' প্রবন্ধ প্রকাশের পরে "নিরুপমা লিখিত শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যে মাননীয়া অনুরূপা দেবী আর নিজের ভ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন নি।" [৭]

নিরুপমার প্রশংসায় শরৎচন্দ্র মুখর ছিলেন। তাঁর কাছে নিরুপমা প্রতিভাময়ী লেখিকা। তাঁর সাহিত্যশিক্ষক হওয়ার জন্য শরৎচন্দ্র গর্বিত, নিরুপমার অতি কঠোর বৈধব্য জীবনচর্যায় তাঁর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ—এ সকলই আছে। এবং সামাজিক সংস্কারের ঘানিতে পড়ে একটি সম্ভাবনাময় জীবন পূর্ণব্যক্ত হওয়ার সুযোগ হারানোয় তাঁর আর্ত হাহাকার! নিরুপমাকে লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য শরৎচন্দ্রের প্রয়াস অব্যাহত থেকেছে। তাঁর সেই সাহিত্যবিচার অবশ্যই অনুরাগের রঙে রাঙা :

"তিনি [নিরুপমা] সত্যিই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নামও আছে। অনেক সময়ে এবং বেশির ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই আমার মনে হয়।" [৮]

"নিরুপমা দেবীর কোনো লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার যদি দিতে পারেন, তাহলে খুব ভাল হয়। ...আমার অবর্তমানে...আমার বোধহয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে[ন]।" [৯]

"শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া ক'রে দেন, সে তো নিশ্চয় ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশি।" [১০]

"নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই লেখে ভাল।" [১১]

শরৎচন্দ্র চিঠির পর চিঠিতে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের কাছে নিরুপমাকে 'বড় লেখিকা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তা করার সময় ঢালাও ঔদার্যে নিজেকে নিরুপমার নীচে পর্যন্ত স্থান দিয়েছেন। এমন-কি 'যমুনা' সম্পাদকের সম্মতি ছাড়াই ঐ পত্রিকাকে লেখা দিয়ে সাহায্যের জন্য নিরুপমাকে 'পরওয়ানা জারি' করেছেন, যেহেতু "সে আমার হুকুম কোনো কারণেই অমান্য করতে পারেনা।" [১২] নিরুপমা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এতখানি আগ্রহের বিষয়ে পাছে ফণীন্দ্রনাথ কোনো প্রশ্ন তোলেন, সেজন্য অগ্রিম সাফাইও তিনি গেয়ে রেখেছেন : "সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে।" [১৩]

'শিক্ষক' শরৎচন্দ্রের যথার্থই আত্মশ্লাঘা ছিল 'ছাত্রী' নিরুপমার জন্য। তাঁর শিক্ষকতা সম্বন্ধে নিজেই জানিয়েছেন : আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ঐ ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত। তখন নিরুপমা প্রমুখের লেখা পড়ে কেটে কুটে দিয়েছেন, ভালমন্দ মত

প্রকাশ করেছেন এবং পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।[১৪] ষোল বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর মানসিক যন্ত্রণায় 'কাঠ' নিরুপমাকে সময়োচিত বাক্যে সান্ত্বনাদানের সঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর চিত্তকে 'সাহিত্যে নিযুক্ত' ক'রে দিয়েছিলেন। ঐ অবলম্বন ছিল বলেই 'আজ সে মানুষ হইয়াছে।' সুদূর রেঙ্গুনে বাস ক'রে তিনি ক্রমান্বয়ে আনন্দ অনুভব করেছেন 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বিধিলিপি'র লেখিকা নিরুপমার জন্য। "মনে মনে কত যে আশীর্বাদ করি, কত গৌরব অনুভব করি, সে আমিই জানি। সে [নিরুপমা] যাহা লেখে, একটুখানি অংশ আমি মনে মনে আদায় করিয়া নদীর ধারে জেটির উপর বসিয়া পরিপাক করি এবং কামনা করি যেন বাঁচিয়া থাকিয়া বিশেষ একটু ভাল জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।" নিরুপমার লেখার উত্তম অংশ শরৎচন্দ্র গুরুদক্ষিণাবাবদ কেবল 'আদায়' করেন নি, নিরুপমা-ভ্রাতা বিভূতিভূষণকে অনুরোধ করেছেন, 'বুড়ি'র রচনার 'কাটাকুটি করা রাফ্ কপি' পড়ার জন্য যেন 'চুপিচুপি' পাঠানো হয়। এ আগ্রহ অন্য কোনো সাহিত্যশিষ্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ছিলনা।[১৫]

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় সুমহৎ ত্যাগ স্বীকারও করেছিলেন নিরুপমার মুখ চেয়ে। তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চার ফসল 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি পড়ে নিরুপমা তাঁর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' গল্পটি লেখেন। এ বিষয়ে নিরুপমার মন্তব্য স্মর্তব্য। নিরুপমা লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র যে আমাদের প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা গুরু তাহাতে তো সন্দেহই নাই। ...একটা কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গল্পটি ['অন্নপূর্ণার মন্দির'] লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদাদার আভাসও যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে ইহা খুবই সত্য। যেমন কবিতা লিখিতে গেলেই অসাধারণ প্রতিভাশালী ভিন্ন সাধারণ লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেনা, তেমনি এই গল্পটিতে শরৎদাদার লেখার প্রভাবও হয়তো আমার মধ্যে ফুটিয়া কার্য করাইয়াছিল।" ('পুরাতন কথার আলোচনা', নিরুপমা দেবী, 'জয়শ্রী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০)।

এই প্রভাব লক্ষ্য ক'রে শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল 'শুভদা' অপ্রকাশিত অবস্থায় ফেলে রাখেন। পরে তাঁর ভাগিনেয় (দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ করেন। কারণ "আমার ও বই বেরোলে একজন অত্যন্ত হেয় হয়ে পড়বেন।" রামকৃষ্ণ সেই আদেশ অমান্য ক'রে অন্য বইপোড়া ছাই শরৎচন্দ্রকে দেখিয়ে মূল পাণ্ডুলিপি শরৎচন্দ্রেরই বইয়ের আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। শরৎ-গবেষক গোপালচন্দ্র রায়ের মতে, এ ঘটনা "নিরুপমা দেবীর উপর শরৎচন্দ্রের দুর্বলতা এবং তাঁর জন্য শরৎচন্দ্রের...বড় ত্যাগের" স্পষ্ট প্রমাণ।[১৬] অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি পড়ার ব্যাপারে। তাঁকে না দেখাতে বদ্ধপরিকর শরৎচন্দ্র কি বেদনার সঙ্গে 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপির পোড়া ছাই তাঁকে দেখিয়েছেন, তা জানা গেছে অবিনাশচন্দ্রের লেখায় :

"সামান্য দু'চারটে কথার পর যখন 'শুভদা'র কথা তুললুম, তখন উনি খুব বিমর্ষভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললুম, কি হয়েছে? আপনাকে অত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? [তিনি] তেমনিভাবে

বললেন : অবিনাশ, সব শেষ হয়ে গেছে! তিনি এমনিভাবে কথাগুলি বললেন যেন আমি তাঁর কোনো রুগ্ন পুত্রকে দেখতে গেছি, আর তিনি আমাকে তার মৃত্যুসংবাদটা শোনালেন। তারপর পাশের ঘর থেকে একটা বিস্কুটের টিনে খানিক পোড়া কাগজ এনে আমার সামনে রাখলেন। ...বললুম, একটা কথার পরিষ্কার উত্তর দিন তো, এই বইয়ের ব্যাপারটা কি? এটা তো একটা উপন্যাস ছিল? বললেন : হ্যাঁ, উপন্যাসই তো। কিন্তু আর এ নিয়ে কিছু জানতে চেও না—যা শেষ ক'রে দিয়েছি তা শেষ হয়ে গেছে বলেই জেনো।" [১৭]

'শুভদা' অবশ্য শেষ হয়নি। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লুকিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপি শরৎচন্দ্র খুঁজে পান। কিন্তু স্বহস্তে তাকে আগুনে ফেলেন নি।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথমদিকে এবং তারপরে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কলম নিরুপমামুখী ছিল। শরৎচন্দ্রের মুখে রাধারানী দেবী সেকথা শুনেছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বালবিধবা চরিত্রাঙ্কন হোক—নিরুপমা তা চাননি। শরৎচন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন : "আমি এমন বালবিধবা কোনোদিন আঁকব না, যা তোমার মনে বা সম্মানে আঘাত দিতে পারে।" [১৮]

শিল্পীসত্তার এই বন্দীদশা রাধাবানীর পছন্দের ছিলনা। তাঁর বক্তব্যে তা স্পষ্ট : "ভাবলে অবাক লাগে, এমন উত্তাল প্রাণশক্তিপূর্ণ এক শিল্পী তাঁর লেখনীকে চিরদিন সংবৃত ক'রে রাখলেন, একটি নারীর অভিমতের সম্মানে। ছটফটে, বেপরোয়া, নেশাখোর মানুষটি মেতে রইলেন এক আশ্চর্য কোমল গোপন উপলব্ধির নেশায়—একটি গণ্ডীবদ্ধ মনের কাছে নতচক্ষু আত্মসমর্পিত হয়ে ফাঁসি দিয়ে রাখলেন নিজের শিল্পীসত্তার।" অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের স্বগতকথন থেকে তিনি জেনেছেন, শিল্পের মাধ্যমে নিরুপমার কাছে শরৎচন্দ্র পৌঁছে যেতেন। "তাঁর সাহিত্য পড়ে নিরুপমার বিস্ময় হয়ে ওঠে দীপ্ত, আনন্দ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। কঠোর পর্দার আড়ালে থেকে পরস্পরের শিল্প বিনিময় ও শিল্প পরিচিতি, হৃদয়ানুভবে পৌঁছেছিল। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন তাঁর রচনা নিরুপমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে।" এটুকুই শরৎচন্দ্রের কাছে যথেষ্ট ছিল। [১৯]

শরৎচন্দ্র বিশেষ কষ্টবোধ করেছেন নিরুপমার রচনাস্রোতের মন্দগতিতে। অনুযোগ ক'রে তাঁকে লিখেছিলেন :

"সব লেখাই কোনো লোকের সমান ভালো হয়না। ...ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যে খাতিরটুকু বজায় থাকে, তাকে সম্ভ্রম বলেনা, দম্ভ বলে।" [২০]

সেইসঙ্গে উৎসাহদানও করেছেন : "আমি মনে করচি এখন থেকে তোমাকে এমনি ক'রে বাধ্য ক'রে প্রতিমাসেই কিছু না কিছু লিখিয়ে নেব।" [২১] সতর্ক ক'রে বলেছেন, সাবধান না হলে "ধম্মকম্মর চাপে সাহিত্যচর্চার টিকিটুকুও তোমাতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" [২২] আনুষ্ঠানিকতার পাষাণবেদীতে লুণ্ঠিত নিরুপমা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস : "বার ব্রত জপ তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা কিছু মধু ছিল, সব বয়সের সঙ্গে শুকিয়ে গেল...আতিশয্যের জন্যই।" [২৩]

ঐ 'মধু'টুকুই তৃষ্ণাকাতর শরৎচন্দ্রের একান্ত কামনার ধন।

শরৎচন্দ্রের হৃদয়গত এই রক্তক্ষরণের ইতিহাস ছায়া ফেলেছে তাঁর সাহিত্যেও। বারবার তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কেন বিধবার বিবাহ দেননি। যে সমাজ তাঁর এবং নিরুপমার সুস্থ সম্পর্ক মেনে নেবেনা, কিভাবে সেই সমাজেরই একজন হয়ে তিনি রমা-রমেশ, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, হেমনলিনী-গুণীন্দ্রর বিয়ে দেবেন?

"অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।" [২৪]

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। বিধবাদের জীবনের ব্যর্থতার কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ তিনি নিজের কথা বলে ফেললেন কেন? সেই 'কেন'-র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজ সাহিত্যচরিত্র সম্বন্ধে জীবনমন্থন করা কিছু উক্তিকে যোগ করা যায় :

"কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ ক'রে যে-অভিজ্ঞতা আহরণ করেচি,...আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতসারেও।" [২৫]

"আমার সাহিত্যে তোমরা যা পেয়েছ, তা যদি আমি নিজের জীবনে না পেতুম...এ সাহিত্য সম্ভব হত কি?" [২৬]

স্মৃতি ভেসে আসে চিরদিন মনে মনে। "এক একটা কথা মানুষে কোনোকালেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারেনা—অথচ ভোলা ছাড়া আর [উপায়] কি?" [২৭] একথা বললেও শরৎচন্দ্র কখনোই ভুলতে পারেন নি নিরুপমাকে। চোখের জলে তাঁকে লিখতে হয়েছে, ভগবান কেন তাঁকে এত ভালবাসতে শেখালেন? ভালবাসার একটিমাত্র পাত্র নিরুপমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলে কি বিশ্বরাজ্যে লোকের অভাব হতো? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর শরৎচন্দ্রের কাছে ছিলনা। বেদনার রক্তে ডোবানো কলম দিয়ে তিনি প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন :

"[আমার ভবঘুরে বাউণ্ডুলে জীবনের] সমস্তটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া? আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই—এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে?" [২৮]

আপন অভিজ্ঞতায় শরৎচন্দ্র জেনেছিলেন পুরুষের মন মেয়েরা কত সহজে বুঝতে পারে। আর তারা ততটাই কঠিন নিজেদের মন বোঝার ব্যাপারে। এই "আত্ম-অস্বীকৃতির মতো আত্মহত্যা আর নেই। ...সত্যিকারের ভালবাসা সব মানুষের জীবনে আসেনা। এ দুর্লভের আবির্ভাব যাদের জীবনে ঘটে, তারা যদি একে ঠিক চিনতে পারে, তবে এর সার্থকতা।" [২৯] অস্বীকার ছিল নিরুপমার তরফে। নিবিড় বেদনায় শরৎচন্দ্র পুনশ্চ বলেছিলেন : "যে ষোল-সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য?" [৩০] সে কারণ এই—নারী বলে বিধবার অন্য কোনো সত্তা নেই—সে শুধু এক মৃত মানুষের স্ত্রী। অন্তত নিরুপমা তাই বুঝেছিলেন।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা যে প্রেমতত্ত্ব পেয়েছি, তার মূলে রয়েছে এই গভীর সত্য—বড় প্রেম মানুষকে কেবল কাছে টানেনা, দূরেও ঠেলে দেয়।

"সংসার এমন ভালবাসাও আছে...যে সমস্ত জীবন যাকে ভালবেসেছে তার কাছ থেকে বহু যোজন দূরে বহু তফাতেই থাকতে চেয়েছে। তাব ভালাবাসাই তাকে এই দূরে থাকার প্রবৃত্তি দিয়েছে।" [৩১]

খাঁটি ভালবাসা দেওয়া-নেওয়ার হিসাব নেয়না : "অকৃত্রিম ভালবাসা, পাত্রের দোষ-গুণ নিরপেক্ষ হয়। সে তার প্রিয় ব্যক্তির সমস্ত কিছুই সুন্দর দেখে, আশ্চর্য দেখে, মহৎ এবং মাধুর্যময় দেখে। এই দেখার দৃষ্টি এক আশ্চর্য দৃষ্টি।" [৩২]

"গভীর ভালবাসায় সকলের চেয়ে প্রয়োজন মনের বলিষ্ঠতার। মিলনে এবং বিচ্ছেদে উভয়েই কঠিন সংযম এবং দৃঢ় বলিষ্ঠতার প্রয়োজন। বেছে নিতে হয় প্রেমে, কাকে তুলে নিতে হবে মিলন, কাকে নিতে হবে বিচ্ছেদ। এরই মধ্যে প্রেমের আসল পরীক্ষা। আত্মদানেই শুধু প্রেমের সার্থকতা নয়..., আত্মসংবরণেও।" [৩৩]

প্রথম জীবনেই এই 'স্বর্গীয় আশীর্বাদে'র দীপ্ত শূল বুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের পথচলা —মিলন নয়, চির বিচ্ছেদের রক্তটীকা তাঁর নিয়তি।

এখানে প্রশ্ন উঠবেই—নিরুপমা শরৎচন্দ্রের মনোভাব কতখানি জানতেন? হ্যাঁ, তিনি জানতেন। তার প্রমাণ ইতিমধ্যে দিয়েছি। তাঁর সংস্রব ত্যাগ করার জন্য শবৎচন্দ্রকে তিনি দুবার চিঠি দিয়েছিলেন। তার ফলে শরৎচন্দ্র দুবার নিরুদ্দেশ হন। নিরুপমাকে লেখা শবৎচন্দ্রের একটি চিঠিব কথাও আমরা জেনেছি। রেঙ্গুন থেকে লেখা সেই চিঠিতে শরৎচন্দ্রের 'হৃদয়দৌর্বল্য' এবং নিরুপমাকে 'বিবাহের প্রস্তাব' ছিল। নিরুপমাব ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ঐ চিঠির কথা জেনে বলেছিলেন : "শরৎদা এখনো বুড়িকে ভুলতে পারেনি।" কলকাতায় শরৎচন্দ্রের শিল্পীবন্ধু সতীশচন্দ্র সিংহ নাকি ঐ চিঠির কথা স্বয়ং শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছেন। [৩৪]

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নিরুপমার দুর্বলতা ছিল—এই অনুমান রাধারানী দেবীর। শরৎ-প্রয়াণের পর নিরুপমা লিখিত 'আমাদের শরৎদাদা' ('ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪) রচনায় তিনি নিরুপমার শরৎ-অনুরাগের পরিচয় পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের গাওয়া গানের পংক্তি যেভাবে নিরুপমা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, তাও রাধারানীর কাছে বিস্ময়কর। রাধারানী লিখেছেন :

"এই স্মৃতিচারণায় লেখিকা [নিরুপমা] সব কথাই যদিও বহুবচনে বলে চলেছেন, তবু একটি লক্ষণীয় আছে। ঘটনাটি তিনি প্রায় চল্লিশ বছর আগের তাঁর স্মৃতি থেকে তুলে আনছেন। একদা বাতাসে ভেসে আসা গানের পংক্তির কথাগুলি, তাঁর বর্ণিত 'দলে'র কারুর স্মৃতিতে এমন স্থির হয়ে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। এতে অনুমান করা ভুল না হতে পারে, সেই কড়া অবরোধে বন্দিনী তরুণীটির শিল্পীহৃদয়ে ওই উদাসী তরুণটির বাঁশীর সুর, গানের কলি, সাহিত্যশিল্পের অন্তস্পর্শিতা গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল। তিনি চল্লিশ বছরেও সেই ভেসে আসা গানের কলিটি ভুলে যাননি।" [৩৫]

রাধারানীর এই বক্তব্যের সঙ্গে আরো একটু যোগ করা যায়। 'আমাদের শরৎদাদা' প্রবন্ধে নিরুপমা অজ্ঞাতে তাঁর শরৎ-অনুরাগের অন্যতর পরিচয়ও দিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে আবেগময় স্মৃতির রসাবেশ। সেখানে শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর নানা ঋণের উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্র তাঁর কবিতার সমালোচনা করেছেন, তাঁকে গদ্যরচনার প্রেরণা দিয়েছেন এবং তাঁর সমালোচনাশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছেন। এইসব কথার সঙ্গে নিরুপমা শরৎচন্দ্রের অন্তর্লীন কবিসত্তার পরিচয়ও উপস্থিত করেছেন। রাধারানী দেবীর কথা স্মরণ ক'রে বলতে পারি, এক্ষেত্রে নিরুপমা চল্লিশ বছর পূর্বে পড়া শরৎচন্দ্রের লুপ্ত রচনা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন একটি পংক্তিসহ। নিরুপমা লিখেছেন :

"শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই, কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইনমাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—'ফুলবনে লেগেছে আগুন।' সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথা'র বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।" ('আমাদের শরৎদাদা', নিরুপমা দেবী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্রের লেখার বিষয়ে মন্তব্য ক'রে নিরুপমা তাঁকে চিঠি দিতেন। রাধারানী বলেছেন, "নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে তাঁর রচনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বর্মাতে।" মন্তব্য করার এই অনুরোধ এসেছিল শরৎচন্দ্রেরই কাছ থেকে, স্বয়ং নিরুপমাই তা লিখেছেন : "এখান [বহরমপুর] হইতে [বর্মায়] ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।" (ঐ)। নিরুপমা সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

ঐ প্রবন্ধে শরৎ-অনুরাগিনী নিরুপমা তাঁর 'স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধদিনে' তাঁদের 'পূর্ণমাত্রায় অবরোধ প্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মতো প্রবিষ্ট' শরৎচন্দ্রের কথা লিখেছেন। শরৎচন্দ্র ঐ শ্রাদ্ধবাসরে ভীমরুলের 'মোক্ষম' কামড়ে রক্তাক্ত নিরুপমার শুশ্রূষার জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। "শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি, একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।" শ্রাদ্ধাদি কর্ম শেষে বাড়ি ফেরার সময় শরৎচন্দ্র একটি পুঁটলি নিরুপমা-ভ্রাতা বিভূতিভূষণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাতে ছিল নিরুপমার পরিধেয় "একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গয়না—শ্রাদ্ধের পূর্বে যাহা বাড়িতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধহয় সে সময় আবার সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। ...[নিরুপমার ঐ কাজে] ...তিনিও [শরৎচন্দ্র] ...কাঁদিতেছেন —এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল।" (ঐ)।

যাঁর জন্য শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান যুবক বাউণ্ডুলে হয়ে গেলেন, তাঁর বিষয়ে নিরুপমার হৃদয়ে সহানুভূতি, করুণা এবং প্রেমের সুকোমল অনুভূতি যে ছিল, তার অল্পস্বল্প পরিচয় এখানে পেয়েছি। নিরুপমা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যে নীরবতা পালন করেছেন সারা জীবন। দুর্বলতার চিহ্ন যাতে না দেখা যায়, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তবু জীবনপ্রান্তে একবারের জন্য তাঁর সেই স্বনির্মিত অবরোধ ধসে গিয়েছিল। তার সাক্ষী রাধারানী দেবী। রাধারানী তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেব, 'বালিকা' কন্যা নবনীতা এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ বৃন্দাবনে গিয়ে নিরুপমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন :

"চোখে মুখে তাঁর তীব্র বিস্ময় আর আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করলেন ; ব্যাকুলভাবে দুহাতে জড়িয়ে আমাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন। আমরা সকলেই খুব অপ্রতিভ হতভম্ব হয়ে পড়লুম। কল্পনায় ছিলনা, তিনি আমাদের দেখে এতটা বিচলিত হবেন। কিন্তু কেন? কিছুই তখন কারুর আন্দাজে এলনা। অল্প কিছুক্ষণ আমায় বুকে চেপে ধরে দরদর ধারে চোখের জল ফেলার পরে—অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন—তোমরা দুজনে এসেচ? তোমরা আমাকে দেখে যেতে কলকাতা থেকে আমার কাছে এসেচ? ...তোমরা আমার কত আদরের জিনিস। তোমরা শরৎদার রাধু-নরেন। তোমাদেরকে শরৎদা কত ভালবাসতেন! ...শরৎচন্দ্রের লোকন্তরের নয় বছর পরে বৃন্দাবনে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। তখন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশোক উত্তপ্ত নয়, আগুননেভা ছাইয়ের মৃদু উষ্ণতায় পরিণত, কালের নিয়মে। হতচকিত আমার মনে হয়েছিল—ওঁর কি তাহলে আমাদের আকস্মিক দেখে—বিদ্যুৎচমকের তীব্রতায় শরৎদার কথা মনে পড়ে গেল? মনে হলো কি, আমরা শরৎদারই লোক, তাঁর কাছ থেকেই আসছি?—সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলদেহে আত্মসংবরণে অক্ষম হয়ে পড়েছেন? ...কী মর্মন্তুদ বেদনায় তিনি নিঃশব্দে সংগোপনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় ক'রে চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে সারা জীবন ধরে!"[৩৬]

এক্ষেত্রে রাধারানী দেবীর সঙ্গে নরেন্দ্র দেবের স্মৃতিকথার কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। নরেন্দ্র দেব লিখেছেন, নিরুপমা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "শরৎদার যে বাউণ্ডুলে দশা হয়েছিল সে শুধু আমারই জন্য।"[৩৭] এই মুক্তকণ্ঠ স্বীকারোক্তি রাধারানী দেবীর লেখায় পাইনি। নিরুপমার কাছে অল্পক্ষণ তাঁরা ছিলেন। আত্মসংবরণের পর 'লজ্জিত' নিরুপমা "শরৎদার সম্পর্কে কিন্তু আর একটিও শব্দ উচ্চাবণ করেন নি।" একই সাক্ষাৎকার, অথচ একজনের লেখায় নিরুপমার স্বীকারোক্তি পাই, অন্যের লেখায় তা অনুপস্থিত।

নিরুপমার যন্ত্রণা ভাষা পেয়েছে শরৎচন্দ্রের লেখায় : "জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায়না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।"[৩৮] বাহ্য সম্মানের শিখরদেশে অবস্থান করেও শরৎচন্দ্রের শূন্য অন্তর হা-হা স্বরে কেঁদে ফিরেছে —সে নাই সে নাই। এই অন্তর্যাতনাই তাঁর ব্যক্তিজীবনের চরম ট্র্যাজেডি। শরৎচন্দ্র এমনও

বলতে চেয়েছেন, নিরুপমার প্রতি তাঁর প্রেম আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি পায়নি বলে তিনি জীবনের অনেক কথাই লিখতে পারেন নি, এবং সে দায় নিরুপমার কম নয়।[৩১] এখানে প্রশ্ন—বাঞ্ছিত মিলন ঘটলে শরৎচন্দ্র ঠিক কী লিখতেন, এবং কতখানি লিখতেন? অমন ঘটলে তিনি কি ছন্নছাড়া জীবন যাপন করতেন, যার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের সম্পদ? এবং তিনি কি বৈধব্যের ব্যর্থতার যন্ত্রণাকাতরতা আনতে পারতেন—যার শ্রেষ্ঠ কথাকার তিনি?

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে' পৃ. ৪১।
২. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৮৯। হরিদাস শাস্ত্রীকে মৌখিকভাবে শরৎচন্দ্র একথা বলেছিলেন।
৩. রাধারানী দেবীকে পত্র, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৯৩।
৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ ও শিল্প', পৃ. ৭০।
৫. ঐ, পৃ. ৭৮।
৬. ঐ, পৃ. ৫৭, ৫৩; ১৮৩।
৭. ঐ, পৃ. ৬৩।
৮. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১১০।
৯. ঐ, পৃ. ১১৪।
১০. ঐ, পৃ. ১০৪।
১১. ঐ, পৃ. ১০৮।
১২. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৭৪।
১৩. ঐ, পৃ. ১০৮।
১৪. সুবোধ রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৬১।
১৫. বিভূতিভূষণ ভট্টকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১-৪।
১৬. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৭৭।
১৭. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৭৮-৮১।
১৮. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৯-১০।
১৯. ঐ, পৃ. ৯৬, ৯৩।
২০. নিরুপমা দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৯৭-৯৮।
২১. ঐ, পৃ. ১৯৭।
২২. ঐ, পৃ. ১৯৭।
২৩. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২১৮।
২৪. ঐ, পৃ. ২০৩।
২৫. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯৬।
২৬. ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৯৫।
২৭. ঐ, পৃ. ৩৮৮।
২৮. বিভূতিভূষণ ভট্টকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২।
২৯. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৯২।
৩০. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২০৬।

৩১. রাধারানী দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পরিশিষ্ট, পৃ. ৯৪।
৩২. ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৯৩।
৩৩. ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৯৪।
৩৪. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৬৬।
৩৫. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৩৬৬।
৩৬. ঐ, পৃ. ৭৬-৭৮।
৩৭. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।
৩৮. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২২৫।

চতুর্থ অধ্যায়

দাম্পত্য জীবনের নানা পর্ব

বাউণ্ডুলে জীবনেও পায়ে ছেঁড়া শিকল লেগে থাকে, আবার নতুন শিকলও জড়িয়ে যায়। গার্হস্থ্য জীবনের কামনা শরৎচন্দ্রের ছিলই। নচেৎ তাঁর একাধিক 'বিবাহ' কেন? তাঁর সন্তান ছিল—সন্তান কামনাও ছিল। তাই তাঁর সন্তানহীন শূন্য জীবনে রচিত গল্পের মধ্যে পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করার ব্যাপারটি অত বেশি ক'রে দেখা গেছে।

শরৎচন্দ্র সমাজভাঙা মানুষ। নিয়মকানুন মেনে চলা তাঁর ধাতে ছিলনা। মোট ক'টি বিবাহ তিনি করেছিলেন এবং তা প্রথামাফিক হয়েছিল কিনা—এসব বিষয়ে তিনি কদাচিৎ মুখ খুলেছেন ঘনিষ্ঠ মানুষের কাছে। সেই অন্তরঙ্গ আলাপ থেকে তাঁর বিবাহ-রহস্য অল্পস্বল্প জানা গেছে। রাধারানী দেবীকে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বর্মার বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলের মিস্ত্রিপল্লীর বাঙালিদের "বেশির ভাগ লোকই আনুষ্ঠানিকতাশূন্য মিলনে মিলিত হয়ে বিবাহিত দম্পতির মর্যাদায় তাঁদের পরিচিতমণ্ডলের মধ্যে বাস করতেন। শরৎদা ঠাট্টার সুরে একে শৈববিবাহ বলতেন। বলতেন—গান্ধর্ববিবাহ রোম্যান্টিক প্রেম-নির্ভর। শৈববিবাহ জীবনের বাস্তব প্রয়োজন-নির্ভর।" [১] বর্মার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং শরৎচন্দ্রের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার একই কথা বলেছেন : "এই পল্লীর বাঙালি মিস্ত্রিরা...সকলেরই বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলেও এখানে আপসের মধ্যে বিবাহাদির আদানপ্রদান করিয়া সপরিবারে বাস করে। চট্টগ্রামপ্রবাসী বাঙালি ব্রাহ্মণগণ এই সকল বিবাহে পৌরোহিত্য করিত।" [২] শরৎচন্দ্রের বিবাহ এই গোত্রেরই যদিচ সে বিবাহে কেউ পৌরোহিত্য করেছেন—এমন উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

নানা সূত্র থেকে শরৎচন্দ্রের তিনটি 'বিবাহের' সংবাদ আমরা জেনেছি। এক্ষেত্রে 'বাস্তব প্রয়োজন' নামক সূত্রটি চোখের উপর থাকলেও শরৎচন্দ্রের তীব্র ভালবাসার রূপও স্বীকার্য। শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গে আবৃত ভাষায় লিখেছেন : "ভালবাসিবার প্রচণ্ড ক্ষুধা—যাহা যৌবনে মানুষের মনকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে,...[তাহা] শরৎচন্দ্রের জীবনেও একদিন উদ্দাম হইয়া আসিয়াছিল...।" ('ভেলু', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। এই উদ্দাম ভালবাসার পরিচয় পাওয়া গেছে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে।

২২ ফেব্রুআরি ১৯০৮-এ বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির কিছু অংশ জুড়ে আছে তাঁর দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী। বিবাহপ্রসঙ্গ সেখানে অনুল্লিখিত। বক্র ব্যঙ্গের ভাষায় শরৎচন্দ্র তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন :

"রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (?) বাঁধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমানভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। ...এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাক খত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই...বিরহজ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ...আমি গৃহ, গৃহিণী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠারো মাসের মধ্যে এমনি পূরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্তত আঠারো বৎসর লাগিবে।" [৩]

ঘটনাটির অল্পবিস্তর সমর্থন পাওয়া গেছে বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারের 'শরৎস্মৃতি' নামক 'খাতা' থেকে। শরৎচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে ২২.০২.১৯৩০-এ বলেছিলেন :

"বর্মার কথা। একটি বাঙালি মেয়ে এক বস্তিতে একজন রুগ্ন, কৃশ, কদাকার পুরুষকে লইয়া থাকিত। সে নানাভাবে [আমাকে] প্রণয় নিবেদন করিল। তাহার সঙ্গলিপ্সা [আমার] অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েকদিন একত্রে কাটাইবার পর সে অন্তর্ধান হইল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া [আমি] পাগলের মতো ঘুরিতে লাগিলাম। বাড়িউলি একদিন সহানুভূতিতে বলিয়া ফেলিল, কাহার জন্য এমনভাবে শরীরপাত করিতেছ? সে কেমন তোমাকে ঠকাইয়া তাহার বন্ধুর জন্য টাকা রোজগার করিতেছিল। এখন তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তোমার উপর তাহার কখনো কিছুমাত্র দরদ ছিলনা।" [৪]

এর সঙ্গে সামান্য একটু যোগ করব। রাধারানী শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছিলেন, বোটাটং-পোজানডং-এর মিস্ত্রিপল্লীতে "একটি নিয়ম ছিল। অসবর্ণ নারী-পুরুষে মিলিত জীবন যাপন করলে বিবাহিত দম্পতির পরিপূর্ণ মর্যাদা পেতেন না।" [৫] 'রজককন্যার' সঙ্গে বসবাসকারী 'ব্রাহ্মণসন্তান' শরৎচন্দ্রের ভাগ্যেও কি তাই ঘটেছিল?

শান্তিদেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'বিবাহ' রেঙ্গুনে। সে বিষয়ে গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "...স্বজাতীয় কোনো দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বইচ্ছায় বিবাহ করিয়া [শরৎচন্দ্র] সুখী হইয়াছিলেন।" [৬] শরৎচন্দ্র যে সুখী হয়েছিলেন, তার উল্লেখ গিরীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া গেলেও ঐ বিবাহ 'স্বইচ্ছায়' তিনি করেছিলেন কিনা, সে সন্দেহ থেকে যায়। নরেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রের মুখে ঐ কাহিনী শোনেন। 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে তা লেখার সময় উক্ত বিবাহে শরৎচন্দ্রের অনিচ্ছার কথাও বলেছেন :

"পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় এই সময় শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় ব্রহ্মদেশে একটি স্বজাতীয় কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল।" [৭]

ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে ছিলনা। নরেন্দ্র দেব খোলাখুলি লিখেছেন : "অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই নিতে হয়েছিল সেই মেয়েটির ভার।" [৮]

এই বিবাহ যে 'আপসে বিবাহ' রাধারানী তা সরাসরি জানিয়েছেন। একটু ঘুরিয়ে একই কথা বলেছেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার। রাধারানী লিখেছেন :

"বিবাহের আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাপারের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে কোনোদিন কখনো শুনিনি। হলে তিনি নিশ্চয়ই সে কাহিনীর উল্লেখ করতেন। কণ্ঠীবদল ফুলের মালা বদল যতটুকুই যাই হোক না কেন, তার উল্লেখ না ক'রে নিঃশব্দ থাকতেন না।" [৯]

গিরীন্দ্রনাথ বলেছেন, শরৎচন্দ্র বিবাহ করেছেন, একথা অন্যের মুখে তাঁর শুধু 'শুনাই ছিল'। এও লিখেছেন, রেঙ্গুনের বাঙালি সমাজের কারো কারো ঘোর সন্দেহ ছিল, "শরৎবাবু আবার বিয়ে করলেন কবে?" [১০]

অনিচ্ছায় কৃত হলেও শান্তিদেবী ঘরণী হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের সুখের ভরা পূর্ণ হয়েছিল। [১১] সন্তানসুখও তিনি পেয়েছিলেন। নরেন্দ্র দেব লিখেছেন, কিভাবে সেই স্বপ্নভুবন থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়েছিলেন শরৎচন্দ্র : "রেঙ্গুনে আবার দারুণ প্লেগের মহামারী দেখা দিলে—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল।" [১২] প্লেগ রোগাক্রান্ত জনৈক দরিদ্রা প্রতিবেশিনীকে সেবা করতে গিয়ে শান্তিদেবী ঐ রোগে পড়েন। [১৩] শরৎচন্দ্র তখন সামান্য চাকুরি করেন, মাসের শেষে শূন্য পকেট, স্ত্রীর অন্তিম অসুখে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারেন নি। [১৪] এমন-কি শবদেহ শ্মশানে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার শ্মশানবন্ধু পর্যন্ত জোটেনি। শেষ পর্যন্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার "একখানি কুরঙ্গী, কুলিদের মানুষে টানা ঠেলাগাড়ি ভাড়া" ক'রে শবদেহ তাতে তুলে নিয়ে শ্মশানে গেলেন। [১৫] সে সময়ে শরৎচন্দ্রের মর্মঘাতী যন্ত্রণার সাক্ষী গিরীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র শান্তিদেবীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বলেছেন :

"শান্তি, প্রাণের শান্তি! আমার যে আর কেউ নেই, বুক যে একেবারে শূন্য ক'রে চলে গেছ! শান্তিহীন জগতে থেকে লাভ কি? এ যে অসহ্য জ্বালা! হা ভগবান, তুমি না মঙ্গলময়—তবে তোমার এ রাজত্বে এত অবিচার কেন? শান্তিকে হারাতে হয় কেন? কোন্ পাপে বুকে এ শেল বিদ্ধ করলে?" [১৬]

কেবল শান্তিদেবী নয়, তাঁদের শিশুপুত্রও একই কালরোগে মারা যায়। পুত্রহারা পিতার দীর্ঘশ্বাস বহু বৎসর পরেও শরৎচন্দ্রের পাঁজর কাঁপিয়েছে। কবিদম্পতি তমাললতা বসু এবং গিরিজাকুমার বসুর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শরৎচন্দ্র তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার সময়, নিজের মৃত পুত্রের উল্লেখ করেছিলেন :

"তোমরা তো ভাগ্যবান পিতামাতা, আঠারো বছর ধরে পুত্রসুখ উপভোগ ক'রে—তারপরে তাকে হারাবার যন্ত্রণা অনুভব করছ—আমি তো পুত্রসুখ উপলব্ধি করতে না করতেই পুত্রশোক কাকে বলে টের পেয়ে গেলুম। ছেলেকে পেতে না পেতেই ছ' মাসের মধ্যেই আচমকা মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে গাছ-সমেত ফুলটা উপড়ে নিয়ে চলে গেল। তখন আমি কল্পনায় ওর কচি মুখে 'বাবা' ডাক প্রথম যেদিন শুনব—সেদিন কেমন লাগবে ভেবে আনন্দে অধীর হচ্ছিলুম। তোমরা তো জীবনের কাছে অনেকখানিই পেয়েছ। ছেলেকে শৈশব থেকে বাল্যে—বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে হাতে ক'রে নেড়ে চেড়ে এসেছ।" [১৭]

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে নরেন্দ্র দেব রচিত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি' মৃত শরৎচন্দ্রের বিবাহ ও সন্তানঘটিত কেচ্ছার সুখ রসিয়ে উপভোগ করেছিল :

"শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অনুজ প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সততা-সার্টিফিকেট সম্বলিত যে জীবনী বাংলার ব্রাউনিং নরেন্দ্র দেব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শরৎচন্দ্রের দুই বিবাহের উল্লেখ দেখিতেছি। অথচ শরৎচন্দ্রের মাতুল ও আজন্ম সহচর সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে 'আজন্ম ব্রহ্মচারী' বলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম বিবাহের একটি সন্তানও হইয়াছিল। কাহাকে বিশ্বাস করিব? মামাকে, না ভাইকে?" ('সংবাদ-সাহিত্য', 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৪৫)।

শরৎচন্দ্রের পুত্রসন্তান সম্পর্কিত তথ্য নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পর, কৌতূহলী গোপালচন্দ্র রায় ঐ সংবাদের উৎস সম্পর্কে নরেন্দ্র দেবকে প্রশ্ন করেছিলেন। "উত্তরে নরেনবাবু বলেছিলেন [গোপালচন্দ্র লিখেছেন]—শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনী এবং তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি [নরেন্দ্র দেব] গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।" [১৮] গোপালচন্দ্রের 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট এই সংবাদ রাধারানী দেবীকে হতবাক্ করেছে। তিনি না লিখে পারেন নি যে, "এখানে আমার বিস্ময় ঠেকেছে। এই তথ্যটি তো শরৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্র দেব ও আমার একত্রেই শোনা। ...গোপালবাবুর বোধহয় ভুল হয়ে থাকবে—আমার স্বামী যে-তথ্য শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন, তা গিরীন সরকারের কাছে তিনি পেয়েছেন বলবেন কেন?" শরৎচন্দ্রের বিয়ে নিয়ে সাহিত্যিককুলে রীতিমতো ঝগড়াঝাটিও হয়েছে। [১৯]

শরৎচন্দ্রের 'স্ত্রী' হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত হিরণ্ময়ী দেবী। হিরণ্ময়ী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। হিরণ্ময়ীর অসুস্থতার সংবাদে তাঁর উদ্বেগ চিঠিপত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মৃত্যুর আগে লেখা ইচ্ছাপত্রে (Will) শরৎচন্দ্র তাঁকে 'My Wife Sm. Hironmoyee Devi' বলে উল্লেখ ক'রে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জীবনস্বত্বে তাঁকে দান করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনকালেই কয়েকটি বইয়ের স্বত্ব হিরণ্ময়ী দেবীকে দান করেন এবং প্রকাশকের কাছ থেকে হিরণ্ময়ী নিয়মিত রয়্যালটি বাবদ অর্থ পেতেন। [২০]

এসব তথ্য থেকে মনে হতে পারে, পূর্বোক্ত দুই 'স্ত্রী'র সঙ্গে হিরণ্ময়ীকে একাসনে বসানো সম্ভব নয় ; শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁর রীতিমতো 'বিবাহ' হয়েছিল। এইখানে বেধেছে তর্ক। একপক্ষে আছেন রাধারানী দেবী, যাঁর কাছে শরৎচন্দ্র তাঁর রহস্যাবৃত জীবনের অনেক কথা খুলে বলেছেন ; শেষ জীবনে মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ শরৎচন্দ্রের সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন রাধারানী ও তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেব। অন্যপক্ষে আছেন শরৎ-গবেষক গোপালচন্দ্র রায় যিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত না হলেও বহু তথ্য আবিষ্কার ক'রে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে দেব-দম্পতি ও গোপালচন্দ্রের পরস্পর বিরোধী মতের রূপ দেখা যেতে পারে।

নানা যুক্তি সাজিয়ে গোপালচন্দ্র একথা প্রমাণে সচেষ্ট—হিরণ্ময়ী সত্যই শরৎচন্দ্রের 'বিবাহিতা পত্নী'। তিনি বলেছেন, হিরণ্ময়ীর পিতা কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের

সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেন। তখন হিরণ্ময়ীর বয়স চোদ্দ বছর। বিয়ের পর প্রথমে রেঙ্গুন থেকে, পরে হাওড়ার বাজে-শিবপুর থেকে, মাসে দশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর দরিদ্র শ্বশুর মহাশয়ের আর্থিক দায়ভার খানিকটা বহন করেছেন। কৃষ্ণদাস শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাড়িতেও এসেছেন। এ সংবাদ গোপালচন্দ্র শুনেছেন শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুর্লভ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাছাড়া পুস্তক প্রকাশক সংস্থা গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সনস্-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গোপালচন্দ্র জেনেছেন, "শরৎচন্দ্রের নির্দেশক্রমে শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের প্রতিবেশী ভূতনাথ মিত্র একবার হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা তখন বেঁচে ছিলেন।"[২১] সুতরাং এসব তথ্য প্রমাণ করে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর শ্বশুরালয়ের, অন্তত শ্বশুর মহাশয়ের যোগাযোগ ছিল।

গোপালচন্দ্রের সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র—তিনি স্বয়ং হিরণ্ময়ী দেবীর মুখে তাঁর বিবাহের সংবাদ শুনেছেন। অন্য আত্মীয়দের সাক্ষ্যও তিনি উপস্থিত করেছেন। যেমন শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী এবং তাঁর মেজ জা সুকুমারী দেবীর এই বিবাহ বিষয়ে হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে শোনা কথাগুলি। সেইসঙ্গে শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাপত্রে (Will) হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রীর পরিচয়ে উল্লেখ করাও তো প্রমাণ হিসাবে তাঁর হাতে ছিল। তবু গোপালচন্দ্রের গবেষক মন শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত হতে পারেনি। সে সন্দেহ গোপন না ক'রে তিনি লিখেছেন : "দূর দেশে রেঙ্গুনে যেখানে শরৎচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় একা ছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাও ঐ অবস্থাতেই মাত্র বিদেশে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন, সেখানে হিন্দু-বিবাহের সকল প্রকার সামাজিক প্রথা ও লোকাচারগুলি যথাযথ পালন করা হয়তো সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে, হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা নিজে উপস্থিত থেকে যখন শরৎচন্দ্রকে কন্যাদান করেছেন, তখন অন্তত নামমাত্র ও একটা কিছু বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিলই।"[২২] এখানে শরৎচন্দ্রের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে গোপালচন্দ্রের সযত্ন প্রয়াস লক্ষণীয়।

গোপালচন্দ্র এক্ষেত্রে দুজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের হিরণ্ময়ী সম্পর্কিত মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে হিরণ্ময়ীকে শরৎচন্দ্রের 'সঙ্গিনী' বলেছেন। আর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে হিরণ্ময়ী শরৎচন্দ্রের 'জীবনসঙ্গিনী'। গোপালচন্দ্র মনে করেছেন, হিরণ্ময়ীকে শরৎচন্দ্রের 'পত্নী' না বলে 'সঙ্গিনী' বা 'জীবনসঙ্গিনী' বলার কোনো কারণ নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দেখাতে পারেন নি। এক্ষেত্রে "ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবুর ন্যায় হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গিনী না বলে স্ত্রী বলাই ঠিক হবে মনে করি।"[২৩]

গোপালচন্দ্রের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছেন রাধারানী দেবী। তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেন নি।"[২৪] এই বিস্ফোরক বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নানা তথ্য উপস্থিত করেছেন। প্রয়োজনে গোপালচন্দ্র রায়ের মত খণ্ডন করেছেন। রাধারানী জানিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুমহল সকলেই

জানতেন হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী হিরণ্ময়ীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিয়ে হয়নি। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে হিরণ্ময়ী 'বড়বৌ' নামে উল্লিখিত। কিন্তু কোনো চিঠিতে শরৎচন্দ্র তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথা লেখেন নি। রাধারানী আরো বলেছেন : "হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক কিংবা আইনগত বিবাহ যে কোনোদিন হয়নি এটি আমি জেনেছি আরো এই সূত্রে—দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রকাশক হরিদাসবাবু ও ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেনকে বোঝাতে দেখেছি—একটি ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশনে সহি ক'রে কাগজটি হরিদাসবাবুর কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য। এই প্রয়োজনে অনুনয় বিনয় করতে দেখেছি এঁদেরকে, নিরুত্তর নির্বিকার শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছোট ভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলতেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁরা একদিন রাত্রে নিরালায় একটি সই করিয়ে সেই কাগজখানি তাঁদের কাস্টডিতে তুলে রেখে দিতে চান। তাহলে ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের পরে কেউ কোনো আপত্তি তুলে হিরণ্ময়ী দেবীকে অসুবিধায় ফেলতে পারবেন না।"[২৫] এই সাধু ইচ্ছা সফল হয়নি শরৎচন্দ্রের অনমনীয় মনোভাবের জন্য। "শক্ত গলায় [শরৎচন্দ্র] বলেছেন—বড় বৌকে কেউ যদি কোনো ঘা দিতে আসে —সেটা ব্যুমেরাং হয়ে তাকেই উল্টো আঘাতে ফেলবে। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রেজিস্ট্রি ফেজেস্ট্রি করতে চাইনা। সারা জীবনে যা করলুম না—মরবার আগে সেটার ভণ্ডামি করতে পারব না।"[২৬]

কেন শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব—অনুমানে তার কারণ আলোচনা করেছেন রাধারানী। তাঁর মনে হয়েছে প্রেম, বিবাহ, নরনারীর মিলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের মিলবে না। শরৎচন্দ্রের জীবনে প্রেম নামক বস্তুর আধার ছিলেন নিরুপমা দেবী। সেই আসনে অন্য কাউকে বসাতে শরৎচন্দ্র রাজি ছিলেন না। উল্টোদিকে হিরণ্ময়ী শরৎচন্দ্রের 'নিঃসঙ্গ একক জীবনে একজন সঙ্গিনী বা শুশ্রূষাকারিণী।' 'ব্যবহারিক জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে' শরৎচন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর স্বামীর মতোই হিরণ্ময়ীর সঙ্গে আচরণ করেছেন। কিন্তু বিবাহের লোকাচার মানার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

হিরণ্ময়ী-শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের বিন্যাস আলোচনা করার সঙ্গে গোপালচন্দ্র রায়ের মতের প্রতিবাদ করেছেন রাধারানী। অবশ্যই শরৎ-গবেষক হিসাবে গোপালচন্দ্রের কৃতিত্বকে তিনি কোনোভাবে খাটো করে দেখেন নি।[২৭]

কেন নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত ভাষায় হিরণ্ময়ী সম্পর্কে 'জীবনসঙ্গিনী' বা 'সঙ্গিনী' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, এবং শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়নি, একথা স্পষ্ট ভাষায় লেখার পক্ষে কোন্ বাধা ছিল, তাও রাধারানী জানিয়েছেন। নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশকালে হিরণ্ময়ী দেবী জীবিত। ফলে তাঁদের সত্যকথন শরৎচন্দ্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি করত। একইসঙ্গে তা হিরণ্ময়ীর সামাজিক "অবস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট হানিকর হতে পারত।" তাছাড়া শরৎচন্দ্রের আত্মীয়দের সামাজিক সংস্থিতিও ঘা খেত। শরৎচন্দ্রের ভাই প্রকাশচন্দ্র এবং মামা সুরেন্দ্রনাথ কার্যত অনুনয় ক'রে নরেন্দ্র দেবকে বলেছিলেন :

"উনি যে কখনো কাউকে বিবাহ করেন নি, উনি ব্যাচেলার, এতো আপনারা ভালোই জানেন। লিখিতভাবে ওঁকে বিবাহিত বলে প্রচার করা মিথ্যাচার, অথচ উনি বিবাহিত নন একথা আমরা কোনোমতেই বলতে পারব না। কেন যে পারব না, বুঝতে পারছেন। ...কারণ আমাকে তো ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে।"[২৮] প্রসঙ্গটি আলোচনার সময় রাধারানী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, ঘটনাস্থল শরৎচন্দ্রের বালিগঞ্জের বাড়ির দোতলার পড়ার ঘর।

শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ীর বিবাহ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর "কথা গোপালবাবু এ প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসেবে এনেছেন, সেই অনিলা দেবী যে কোনোদিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্নগ্রহণ করতেন না, সেকথা গোপালবাবু নিশ্চয়ই জানেন না।"[২৯] এইখানে রাধারানীর রচনায় ফাঁক থেকে গেছে। তিনি যেন হিরণ্ময়ীর স্পৃষ্ট অন্ন অনিলাদেবী গ্রহণ করতেন না—এই তথ্যের দ্বারা অনিলা দেবী কর্তৃক শরৎচন্দ্রের বিবাহকে অগ্রাহ্য করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে বিবাহ হলেও স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ না করার একাধিক কারণ থাকতে পারে!

হিরণ্ময়ী দেবী স্বয়ং অনিলাদেবীকে রেঙ্গুনে তাঁর 'বিয়ের' কথা বললেও (অনিলাদেবীর কাছে গোপালচন্দ্র তা শুনেছেন) রাধারানী তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চাননি। "তিনি [হিরণ্ময়ী] সাধারণ অর্থেই ওটিকে গ্রহণ করেছেন—শরৎচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী হওয়াই তাঁর 'বিয়ে' হওয়া।"[৩০]

রেঙ্গুনে নয়, "হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে তাঁর আহারাদি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, রান্না করা, সংসারের পরিচর্যার জন্য ১৯১২ খ্রীঃ-তে কলকাতা থেকে বর্মায় নিয়ে যান। যখন তাঁকে নিয়ে যান, তিনি [হিরণ্ময়ী] একান্ত নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন।"[৩১]

রাধারানীর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো তথ্য মিলেছে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়েব কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন : "হিরণ্ময়ী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া মেদিনীপুরের গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে শরৎচন্দ্র যখন বর্মা হইতে চাকুরিতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত পরিচিত হন। বর্মায় তাঁহার গৃহস্থালী চালানোর জন্য সেবাযত্নপরায়ণ একটি নারীর অভাব থাকায় তিনি অসহায়া হিরণ্ময়ী দেবীকে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সঙ্গে লইয়া যান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রমথবাবুই [শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য] আমার বাবাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বাবার কাছে কোনোদিনই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, বরং হিরণ্ময়ী দেবীর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা শরৎচন্দ্রের অবর্তমানে কি করা সমুচিত হইবে, তাহা বাবার সহিত পরামর্শ করিতেন। ...হিরণ্ময়ী দেবীর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বর্মা গমনে তাঁহার পিতার কোনোই ভূমিকা ছিলনা। এ তথ্য প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের মুখে আমার পিতা জানিয়াছিলেন, ইহাই আমি তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। হিরণ্ময়ী পিতৃগৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন।"[৩২]

গোপালচন্দ্র লিখিত একটি তথ্য আংশিক স্বীকার করেছেন রাধারানী। শরৎচন্দ্র তাঁর

দরিদ্র শ্বশুর মহাশয়ের জন্য সত্যই প্রতি মাসে মনিঅর্ডার পাঠাতেন। তবে গোপালচন্দ্র অনুযায়ী মাসে দশ টাকা নয়, মাসে পাঁচ টাকা মাত্র। কিন্তু রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র কখনো তা পাঠান নি, বাজে-শিবপুরে থাকার সময় তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রকাশক গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সনস-র পক্ষে তা যেত। এইখানে গোপালচন্দ্রের বিপরীত বক্তব্য রাধারানী লিখেছেন। গোপালচন্দ্র বলেছেন অনেক সময় অনিলা দেবীর ছোট দেওর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের তরফে মনিঅর্ডার করেছেন।[৩৩] অন্যদিকে রাধারানী তাঁর পক্ষে সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উপস্থিত করেছেন। সরোজকুমার লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী হিরণ্ময়ী দেবীর পিতাকে মেদিনীপুরের গ্রামে আমাদের প্রকাশক সংস্থা হইতে আমরা কয়েকটি টাকা মাসিক সাহায্য পাঠাইতাম শরৎচন্দ্রের হিসাব হইতে। রেঙ্গুনে তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিলনা, অনেক দেনাপত্র করিতে হইত শুনিয়াছি। রেঙ্গুন হইতে তিনি মেদিনীপুরে টাকা পাঠাইতেন কিনা শুনি নাই।"[৩৪]

গোপালচন্দ্রেব সবচেয়ে জোরালো যুক্তি—ইচ্ছাপত্রে শরৎচন্দ্র কর্তৃক হিরণ্ময়ীকে My Wife বলে স্বীকৃতি দান—সে প্রসঙ্গে রাধারানীর পক্ষে গেছে সরোজকুমারের লেখা :

"শরৎচন্দ্রের দুশ্চিন্তা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আইনানুগ উত্তরাধিকারীবা হিরণ্ময়ী দেবীকে হয়তো বা নিরাশ্রয় করিলে করিতেও পারেন। নিজের অবর্তমানে হিরণ্ময়ী দেবী যাহাতে কাহারও দ্বারস্থ বা করুণাপ্রার্থী না হন, এজন্য শরৎচন্দ্র যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন বলিয়া আমি জানি, তাহার মধ্যে আমার পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং এটর্নি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রই প্রধান ছিলেন। স্বর্গীয় জলধর সেন এবং কবি নরেন্দ্র দেবকেও আমি এ সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ করিতে দেখিয়াছি। ...শরৎচন্দ্রের বৈষয়িক আইন উপদেষ্টা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র...বলিয়াছিলেন, জীবনস্বত্বে উত্তরাধিকারিণী হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রকে পাওয়ার অব এটর্নি দিবেন, ফলে সম্পত্তি ও টাকার কর্তৃত্ব প্রকাশচন্দ্রের হাতে পৌছিবে, তিনি তখন হিরণ্ময়ীর অধিকার অনধিকার লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন না। ইঁহারা উভয়ে কেহই সম্পত্তি নষ্ট করিতে বা দান বিক্রয় করিতে পারিবেন না। হিরণ্ময়ী দেবী যথাযথভাবে টাকা পাইতেছেন কিনা সেদিকে প্রকাশক ও এটর্নি উভয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। শরৎচন্দ্রের উইলের 'ওয়াইফ' শব্দটি লইয়া এখন তর্কবিতর্ক শুনিতেছি। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ঐ শব্দটি উইলে বসাইয়াছিলেন এবং বসাইতেই হইবে বলিয়াছিলেন। ঐ শব্দটি না বসাইলে, যদি কেহ আদালতে এই উইলের প্রতিবাদ করেন, ঐ উইল আদালতে বাতিল হইতে পারে, ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। কারণ, তখন শরৎবাবুর আত্মীয়রা হিরণ্ময়ী যে বিবাহিতা নহেন, সকলেই তাহা জানিতেন।"[৩৫]

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের একান্ত অনাবরণ রূপ তুলে ধরার কোন প্রয়োজন রাধারানী অনুভব করেছেন, তা জানাতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তাঁর বিশ্বাস শরৎচন্দ্রের পালিশকরা মূর্তি উপস্থিত করার চেষ্টা অর্থহীন। মানুষ হিসাবে শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন, জীবনে যে-আচরণ তিনি পালন করেছেন এবং যে-আচরণ তিনি পালন করতে অনিচ্ছুক, তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরা সঙ্গত। এই ধারণার সঙ্গে আপসহীন রাধারানী গোপালচন্দ্র রায়ের নাম ক'রে তাঁর ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন : "শরৎচন্দ্রকে বিবাহিত বলা

সহজ [যে কাজ গোপালচন্দ্র করেছেন], তাতে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অবিবাহিত বললে অনেক গোলমালের সম্ভাবনা ; অনেক শুভার্থীর রাগ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের মনে মনে শরৎচন্দ্রের একটি মানসমূর্তি নিজেদের কালানুযায়ী আমরা গড়ে নিতে চাই। 'সামাজিক' শরৎচন্দ্রের মূর্তিতে যাতে আঘাত লাগে এমন তথ্য সত্য হলেও আমরা শুনতে চাইনা। শুনতে পেলে বিরক্ত হই, মনে মনেও মানতে চাইনা। ...শেষজীবন তিনি অপরিণীতা একজনের সাহচর্যে কাটিয়ে গেলেন, এটা মনে করতেই অনেকের ঘৃণাবোধ হবে ; তাই হয়তো কল্যাণীয় গোপালচন্দ্র ওদিকটায় যেতে চাননি। তাঁর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রকে সমাজে শ্রদ্ধেয় ক'রে রাখা। ...হিরণ্ময়ী দেবী ও শান্তি দেবী কাউকেই বিবাহিতা পত্নী বলে বইতে লেখা নরেন্দ্র দেব ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কেন যে সম্ভব হয়নি, গোপালবাবুকে আমার স্বামী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। কেন যে তবুও একটি ভ্রান্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এত পবিশ্রম করেছেন, আমরা তা অনুমান করতে পারি। বর্তমানকালের সংস্কারের সীমায়িত পরিসরের মধ্যে থেকে তিনি এর দ্বারা সমকালীন পাঠকসমাজের মনেব তৃপ্তি ও স্বস্তি বিধানের চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।" [৩৬]

সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ নিয়ে লেখকদের টানাহেঁচড়াকে পছন্দ করেন নি। উভয় লেখকের লক্ষ্যবস্তু একজনই —তিনি হিরণ্ময়ী দেবী। ভীতু, নিরীহ প্রকৃতির সেই নারী সারাজীবন শরৎচন্দ্রকে স্বামী হিসাবে জেনেছেন, সেবাযত্নে তাঁকে ভরিয়ে রেখেছেন। কোনো বৈষয়িক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি তাঁকে ছুঁতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। সত্যরক্ষার জন্য কলম খোলার পরেও সরোজকুমার বলেছেন, স্পর্শকাতর বিষয়টি এঁড়িয়ে গেলেই ভালো হতো, যেমন এড়িয়ে গেছেন নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : "একপক্ষে মনে হয় শ্রদ্ধেয়া রাধারানী দেবী এ প্রসঙ্গ হয়তো উত্থাপন না করিলেই ভালো করিতেন। অবশ্য অন্যপক্ষে গোপালবাবু তাঁহার অযথা অবাস্তব কথা না প্রচার করিয়া তিনিও ব্রজেনবাবুদের ন্যায় যত্নে এ প্রসঙ্গটি এড়াইয়া গেলেই ভাল করিতেন।" [৩৭]

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে হিরণ্ময়ী-প্রসঙ্গ ইতস্তত এসেছে। তদনুযায়ী, তিনি পতিভক্তিপরায়ণা, প্রায় নিরক্ষরা, যথেষ্ট ধর্মপ্রবণ মহিলা। শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান মানুষের 'সহধর্মিণী' হওয়ার উপযুক্ত তিনি নন। তবু তাঁর সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট স্নেহকাতরতা ছিল। কলকাতা থেকে তাকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন শরৎচন্দ্র ব্যগ্র, তেমনি তাঁর অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন। একটি চিঠিতে লিখেছেন : "এঁকে তো এবার পাঠানই চাই। আমারও চলেনা—তাঁর তো প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবামাত্র, ফার্স্ট অ্যাভেলেবল্ টিকিট রিজার্ভ করিবার ব্যবস্থা করিবে।" [৩৮] অন্য চিঠি সরাসরি হিরণ্ময়ীকে লেখা : "ভাবনা আমার তোমার জন্য, পাছে অসাবধানে অসুখ-বিসুখ করে। কারণ, তোমার অসুখ করেছে যেদিন কানে শুনতে পাবো, সেইদিনই দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবো।" [৩৯] এই দুই চিঠির রচনাকালের মধ্যে বাইশ বছরের ব্যবধান, কিন্তু হিরণ্ময়ীর প্রতি শরৎচন্দ্র একইরকম স্নেহশীল।

চিঠিতে হিরণ্ময়ীর রূপচিত্র দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। সেখানে হিরণ্ময়ীর দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের চোখে হিরণ্ময়ী—এই দুই বস্তু একত্র পাওয়া গেছে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "আজ কাল আবার আরো বিপদ—[কাজের] লোকের অসুখ, আমাকে নিজেই বাজারে যেতে হয়। না গেলে 'যিনি' আছেন, তিনি বলেন 'খেতে পাবেনা'। ইনি তো দিনরাত পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু [আমার] কাজে আসেনা। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে ব'লে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকারও করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হলোনা। 'বরং' লিখতে জিজ্ঞেস করেন, অনুস্বারের ঐ টানটা ফোঁটার ভেতর দিয়ে দেব, না বাহিরে দিয়ে দেব? অর্থাৎ 'ং' হবে না '০\' হবে?"[৪০]

একটি সহজ সাংসারিক ছবি—সেখানে একদিকে গৃহকর্মনিমগ্না স্ত্রী, অন্যদিকে সাহিত্যসৃষ্টি-কাতর গৃহকর্তার মুখ ঝুলিয়ে থলে হাতে বাজারহাট করার বাধ্যতা। স্ত্রীর আবার বিশেষরকম ঈশ্বরভক্তি—সংসারকর্মের বাইরে পুজোব্রত পালন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান।

বলা বাহুল্য গৃহিণী হিরণ্ময়ী কোনোদিক দিয়েই সচিব, সখী এবং ললিতকলায় পারদর্শিনী ছিলেন না। কৌতুকের আববণে শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের এইক্ষেত্রে শূন্যতার রূপ একটি চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক এবং ঔপন্যাসিক জলধর সেনের 'অভাগীর স্বর্গ' উপন্যাস পড়ে (যে-উপন্যাসে অভাগীর 'সতীত্বের তেজ' পাঠক ক্রমান্বয়ে দেখেছে—কাশীর নানা স্তরের মানুষ অভাগীর সতীত্ব নষ্টের চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ) হিরণ্ময়ী চোখের জলে ভেসে অনুযোগ করেছেন—কেন শরৎচন্দ্র ঐ ধরনের উপন্যাস লিখতে পারেন না! শরৎচন্দ্রকে উদগত দীর্ঘশ্বাস চাপা দিতে হয়েছিল। একজন সাহিত্যিক তাঁর গৃহিণীর কাছে কেবল গৃহের আরাম নয়, 'মনের আরাম'ও চান।

হিরণ্ময়ীর পতিভক্তি পতির পাদোদক পান-কে অবশ্যকৃত্য করেছিল। শরৎচন্দ্র এই ভক্তির আতিশয্যে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছেন। তাঁর মতো শিকল-ছেঁড়া মানুষের পায়ে হিরণ্ময়ী যেভাবে শিকল বাঁধতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর অস্বস্তি ও বিরক্তির শেষ ছিলনা। তেমন একটি ঘটনা ঘটেছিল নরেন্দ্র দেব এবং রাধারানী দেবীর উপস্থিতিতে। উত্যক্ত শরৎচন্দ্রের তিক্ত মনের ছবি পাই রাধারানীর বর্ণনায় :

"রবিবারের সকাল। তখন বেলা বারোটা প্রায় বাজে। বালিগঞ্জে দোতালায় পড়ার ঘরে শরৎদা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দরজার সামনে বউদি এসে দাঁড়ালেন। চওড়া লালপাড় তসরের শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, শাদা শাঁখা আর এক গোছা ঝকঝকে সোনার চুড়ি। হাতের পাতায় ছোট্ট একটি পাথরের বাটি কিংবা কাঁসার বাটি, জলভরা। একটু লজ্জা-লজ্জা অপ্রস্তুত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। শরৎদা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ও-ও-ও-ও—এইবারে 'পা-দোক' নেবে বুঝি তুমি? এরা রয়েছে বলে লজ্জা হচ্চে? ...লজ্জার কী আছে? তুমি কত ভক্তিমতী আদর্শ হিন্দুনারী—একটু দেখেশুনে নিক না রাধু। ওরা তো সব একেলে বিবি-মেয়ে! তোমার ভক্তির ফিচেলি বুদ্ধিটা ওকে একটু চুপি-চুপি শিখিয়ে দিও বরং। দরকার পড়লে কাজে লাগতেও পারে। নাও, নিয়ে এস তোমার জল। তা বেলা বারোটা বাজতে চলল—এত বেলায় তোমার

পুজো আহ্নিক সারা হলো? তুমি রোগে ভুগবে না তো কে আর ভুগবে? কই? আনো না তোমার বাটি! —অপ্রতিভ মুখে হিরণ্ময়ী দেবী এগিয়ে এসে নীচু হয়ে জলের ছোট্ট বাটিটা শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে ধরলেন—শরৎদা চটির ভেতর থেকে একটি পা বার ক'রে বাটির জলে বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে পা-টি আবার চটিতে ভরে রাখলেন। বউদি শরৎদাকে প্রণাম করে বাটি হাতে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"শরৎদা হাসতে হাসতে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ তির্যক কণ্ঠে বললেন—ওটি পতিভক্তি মোটেই নয়—গরু বেঁধে রাখার খুঁটি। পাদোদক পান ক'রে তারপরে উনি দৈনন্দিন জলগ্রহণ করেন। এই ওঁর দীর্ঘকালের ব্রত। যতক্ষণ না সতী পতির চরণামৃত পান করেন, ততক্ষণ তিনি শক্তি পান না সারাদিন সংসার ঠেঙাবার। ভূদেব মুখুজ্জের বই চোখেও দেখেনি তোমার বউদি, পড়া দূরে থাক—অথচ সেই বইয়ের পাতা ফুঁড়েই মানুষটা বেরিয়ে এসেচে—তোমরা মিলিয়ে দেখে নিতে পারো।

"—বলো কেন যন্ত্রণাভোগের কথা—বর্মায় যখন ছিলুম, ওর উৎপাতে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হতো। ...দু-চার দিন যে বাড়ির একঘেঁয়েমি কাটাতে কোথাও ডুব মেরে থাকব —তার উপায় ছিলনা। ...ওর পতিভক্তি নিয়ে সেখানে সব্বাই হাসি-মস্করা করত। ওর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। দু-একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও নেশা ক'রে পড়ে থাকার উপায় ছিলনা। চটকা ভাঙলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে—একটা মানুষ উপোস ক'রে ঘরের মেঝেয় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ...সদর দরজার কড়া নাড়লেই দরজা খুলে যাবে —সামনে থাকবে বোকা-বোকা ভীতু চোখে একটা উপোসী শুকনো মুখ। ...রাগারাগি বকাঝকা অনেক করেচি।...কোনো ফল হয়নি। কৈফিয়তও চায়না—রাগও করেনা—শুধু ভাবনাভয়ে-ভরা ভীতু চোখে তাকিয়ে থাকে। ...এমনি ক'রে ওই নির্বোধ মুখ্যু মানুষটি চালাক মানুষটাকে জব্দ ক'রে ছেড়েচে। যতোটা বোকা দেখায় ওকে, আসলে তা কিন্তু নয়।" [৪১]

শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কদের খাওয়াবার জন্য জেদাজেদি করার কাজে পটিয়সী। তাতে খাদ্যের মশলায় প্রেমের ভিত মজবুত হয়েছে। উপন্যাসে নয়, বাস্তব জীবনে সেই একই কাজ যখন হিরণ্ময়ী করতে চেয়েছেন, সোনার হাতে সোনার কাঁকন পরে অবশ্যই নয়—তাতে শরৎচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি ক'রে উঠেছেন। চিঠিতে তা লিখেছেন যথেষ্ট বিরক্তি মিশিয়ে:

"এত কম খাই যে অম্বল পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁষে না, পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর ক'রে ছাই-পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠছে। ...আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি ক'রে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না, রোগা হয়ে গেল —ঘর সংসার রান্নাবান্না কিসের জন্যে—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাব—ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু বিবাগী হবে তো শিগ্‌গির হও—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে কাঁটা ক'রে তুললে। ...আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেখানে বোধহয় এমন ক'রে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করেনা। আর তা যদি করে তো আমি যেন বরঞ্চ নরকে যাই।" [৪২]

নরনারীর যৌথ জীবনে সেতু রচনা করে সন্তান। শরৎচন্দ্রের বহু ঐশ্বর্যে ভরা

জীবনের একাংশে শূন্যতার হাহাকার। তাঁর আর সন্তান হয়নি। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর বঞ্চিত কাতর মনের রূপ : "আমি ছেলেপিলে বড ভালবাসি। আমাকে [তোমার] এর পরের একটি [ছেলে] দিও তো, আমি নিজের ধরনে মানুষ করব। দেবে?"[৪৩]

আমাদের শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে, হিরণ্ময়ীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয় বৈষ্ণব মতের কণ্ঠিবদল ক'রে, কিংবা শৈব-বিবাহ মতে। সম্ভবত তা শৈব-বিবাহই, যার প্রকৃতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মত বর্তমান অধ্যায়ের গোড়াতে উপস্থিত করেছি। শৈব-বিবাহ এখনকার ভাষায় 'একত্র বাস'। জনৈক 'রজক কন্যা', কিংবা শান্তি, কিংবা হিরণ্ময়ীর সঙ্গে একত্র বসবাসকেই তিনি বিবাহেব মর্যাদা দিয়েছেন। সমাজ ঐ বিবাহকে স্বীকার কবত কিনা সন্দেহ। এই কারণেই কি সভাসমিতিতে তাঁকে 'চিরকুমার' উল্লেখ করলে তিনি নিশ্চুপ হয়ে থাকতেন?[৪৪] শৈব-বিবাহকে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক-রূপ দিয়েছেন তাঁব একটিমাত্র উপন্যাসে—'শেষ প্রশ্নে' কমল-শিবনাথের মধ্যে 'শৈব-বিবাহ' ঘটিয়েছেন। কমলের মুখে শুনেছি : "বিয়ের মতো কি একটা হয়েছিল। যারা দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়—ফাঁকি। ওঁকে [শিবনাথকে] জিজ্ঞাসা করতে বললেন, বিবাহ হলো শৈব মতে। আমি বললাম সেই ভালো।"

শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন শৈব-বিবাহিত নরনাবীর সম্পর্কের ভিত্তি আনুষ্ঠানিকতায় নয়, পারস্পরিক ভালবাসায়। ব্যক্তিজীবনে এহেন বিবাহের ফলভোগ শরৎচন্দ্র করেছেন, প্রথম ক্ষেত্রে মন্দ ফল, শেষ দুটি ক্ষেত্রে ভাল ফল। নাবীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্রের মতো মানুষের পক্ষে বন্ধনকে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব ছিলনা। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা সংস্কারের শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি, যদিও তার পেষণের রূপও ফুটিয়েছেন। সতীত্বকে তিনি পূজার আসনে বসিয়াছেন (যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্নদাদিদির প্রশস্তি)। আবার পত্নীর সতীত্বের দড়ি গলায় বাঁধা স্বামীর দমবন্ধ চেহারাও এঁকেছেন (যেমন 'সতী' গল্পে)। দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে অন্তত শরৎচন্দ্র কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিরেট আকারে উপস্থিত করতে চাননি। এইটুকু বলতে পারি, শরৎ-সাহিত্যের শিক্ষা—সামাজিকতার মূল্য আছে, কিন্তু মানবিকতা আরো মূল্যবান।

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৭৪।
২. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' পৃ. ৯৬।
৩. বিভুতিভূষণ ভট্টকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩।
৪. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৮২।
৫. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৭৪।
৬. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৫৯।

৭. 'শরৎচন্দ্র', নরেন্দ্র দেব (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫)।
৮. ঐ, পৃ. ৯৭।
৯. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৭৪।
১০. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৭৯।
১১. শরৎচন্দ্রের সুখী জীবনের ছবি পাওয়া গেছে গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখায় : "যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে বড় কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহা স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৬০)। পরেও একই কথা গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী। নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া তিনি সুখেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন।" (ঐ, পৃ. ১৭৬)।
১২. 'শরৎচন্দ্র', নরেন্দ্র দেব (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭)।
১৩. গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, "তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণটিও অত্যন্ত দুঃখের। কোনো প্লেগ রোগগ্রস্তা দরিদ্র প্রতিবেশিনীর সেবা করিতে গিয়া তিনি নিজে বিপন্ন হইয়াছিলেন।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৮৮)। এক্ষেত্রে বলব, প্লেগরূপী মৃত্যুকে সাক্ষাৎ জেনেও তার সম্মুখীন হওয়ার মতো প্রবল মানসিক শক্তিসম্পন্ন এবং সেবাপরায়ণা একটি নারীকে শরৎচন্দ্র ঘরণীরূপে পেয়েছিলেন।
১৪. রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের করুণ আর্থিক অবস্থা! বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলে প্লেগ হচ্ছে জেনেও স্বল্প মাইনের চাকুরে শরৎচন্দ্র স্ত্রী শান্তিদেবীকে নিয়ে রেঙ্গুনের ভদ্রপল্লীতে বাড়ি ভাড়া করতে পারেন নি। গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে তিনি বলেছেন : "কি করব ভাই, সামান্য মাহিনা পাই, অত টাকা বাড়ি ভাড়া দেব কি ক'রে?" শান্তিদেবী প্লেগ রোগাক্রান্ত হলে অর্থাভাবে তার উপযুক্ত চিকিৎসাও শরৎচন্দ্র করাতে পারেন নি : "এখনো ডাক্তার দেখাতে পারিনি, মাস কাবার, হাতে টাকাকড়ি কিছুই নেই।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৭৬-১৭৭)।
১৫. প্লেগ রোগাক্রান্ত রোগীর সেবা এবং মৃতের সৎকারের জন্য মূলত গিরীন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে রেঙ্গুন শহরে 'রেঙ্গুন সেবক ও সৎকার সমিতি' স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতির স্বেচ্ছাসেবকেরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান এবং "স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের আদর্শে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিজেদের জীবন সর্বতোভাবে বিপন্ন করিয়া অনেক কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ রোগীর সেবা ও সৎকার" করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত শান্তিদেবীর মৃত্যুর পর কোনো স্বেচ্ছাসেবককে পাওয়া যায়নি। শরৎচন্দ্রের তখন উন্মত্তের মতো চেহারা, 'মাথার চুল এলোমেলো, চরণদ্বয় নগ্ন, কণ্ঠস্বর রুক্ষ।' গিরীন্দ্রনাথও, সেই গভীর রাত্রে কিভাবে শবদাহ হবে, সেই চিন্তায় দিশাহারা, "শরৎচন্দ্রের বাসা হইতে শ্মশানঘাট প্রায় সাত মাইল দূরে। ...অগত্যা একখানি কুরঙ্গী, কুলিদের মানুষটানা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করিয়া দুইজনে অতি কষ্টে ধরাধরি করিয়া তাহাতে শবদেহ তুলিয়া শ্মশানে লইয়া গেলাম।" (ঐ, পৃ. ১৬১–১৬২, ১৭৯–১৮২)।
প্রসঙ্গত শান্তিদেবীর নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণার বর্ণনা দিয়েছেন গিরীন্দ্রনাথ : "ডাক্তার সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখিলাম, রোগিণী একখানি কাঠের তক্তপোষের উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ছটফট করিতেছেন। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হইতেছে। একটি বৃদ্ধা মুড়িওয়ালী তাঁহার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে। প্লেগরোগ যে কী ভীষণ ব্যাধি, তা প্রত্যক্ষ না করিয়া শুধু গল্প শুনিয়া

হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৭৭–১৭৮)।

১৬. ঐ, পৃ. ১৮৫।

১৭. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৬১।

১৮. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৯৭।

১৯. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৫৯–১৬০।
রাধারানী এ-বিষয়ে অতিরিক্ত সংবাদ শুনিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে কবি তমাললতা বসু, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'দীপালি' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র বিষয়ক রচনায় শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথা লিখেছিলেন। তমাললতাব অকালমৃত পুত্রের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁকে সান্ত্বনা দিতে নিজের মৃত পুত্রেব উল্লেখ ক'রে পুত্রহারা পিতার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা বলেন। এই সংবাদ ছাপতে সাহস করেন নি 'দীপালি'-সম্পাদক বসন্তকুমার। বরং তিনি তমাললতার লেখায় শরৎচন্দ্রের জবানীতে "এই যে আমার মোটেই ছেলেপুলে হয়নি" কথাগুলি বসিয়েছিলেন। বসন্তকুমারের ভয় ছিল যে, "সকলেই জানে তিনি [শরৎচন্দ্র] অপুত্রক ছিলেন। ঐ বকম তথ্য এই শোকের মধ্যে আমার কাগজে ছেপে আমি কাগজের বদনাম কিনতে পারিনা।" বলা বাহুল্য তমাললতার স্বামী কবি গিরিজাকুমার তাতে বিষম চটে গিযে ঘোব তর্ক বাধিয়েছিলেন বসন্তকুমারের সঙ্গে এবং সেই তর্কেব জের প্রায় হাতাহাতি পর্যন্ত গডিয়েছিল। "বসন্তকুমারের কণ্ঠস্বর বৈধতগ্রাম-ঘেষা, গিরিজাকুমারের পঞ্চম-ঘেঁষা। ...বসন্তবাবু তাঁর কাগজে সদ্য পরলোকগত শরৎচন্দ্রের পুত্রশোকের খবব ছেপে বিস্ময় সৃষ্টিব দায়ে পডতে চাননা। 'দীপালি' আজগুবি খবর ছাপে, বটে যেতে পারে। লেগে যাবে বাদ-প্রতিবাদেব 'কিউ'। শরৎদা যখন জীবিত নেই, তাঁর মুখেব কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবে কে? গিরিজাবাবু বলেছিলেন—তুমি ঐ অংশটি কেটে বাদ দিতে পারো। নতুন কথা নিজের ইচ্ছে মতো জুড়ে দিতে পারো না। বসন্তবাবু বলেছিলেন—আলবৎ পারি। আমাব সে 'রাইট আছে।" রাধারানী জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে বসন্তকুমার-গিরিজাকুমারের প্রায় হাতাহাতি ঘটে যাবার ঘটনাটি নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ রচনার 'বীজ'। "এই ঘটনার পরেই কথা উঠল—শরৎচন্দ্রের যে একটি ছেলে হয়েছিল, এটি সাধারণ্যে প্রকাশ হওয়া উচিত।" (ঐ, পৃ. ৭১–৭৪)।

২০. হিরণ্ময়ীর জন্য শরৎচন্দ্র নিজ জীবনকালেই অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। একাজে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন পুস্তক প্রকাশক সংস্থা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-সংবাদ জানিয়েছেন। সরোজকুমার লিখেছেন : "বাবার পরামর্শে, শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবনকালেই হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁহার নিজের লেখা কিছু পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হিরণ্ময়ী দেবীর নামে পৃথক হিসাবে থাকিত এবং পৃথক করিয়া পাঠানো হইত শরৎচন্দ্রের জীবনকালেই।" (সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত পত্র, 'পরিশিষ্ট', 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প')।

২১. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১০৩।

২২. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১০৪। গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রায় একই সংবাদ জানিয়েছেন : "[শান্তিদেবীর মৃত্যুর] দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ির সন্নিকটে ৩৬নং গলিতে

বাড়ি ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৮৮–১৮৯)।

২৩. ঐ, পৃ. ১০৪।

২৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৬৭।

২৫. ঐ, পৃ. ১৬৩।

২৬. ঐ, পৃ. ১৬৫।

২৭. গোপালচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যথেষ্ট মতপার্থক্য পোষণ করেও তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণা-কর্মের প্রশংসা করতে রাধারানী দ্বিধা করেন নি। তিনি লিখেছেন : "শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায়ের অনলস প্রচেষ্টার ফলে শরৎচন্দ্র বিষয়ে বাঙালি পাঠকের অনেক তথ্য জানা হয়েছে। এজন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন।" ('শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৫৮।)

২৮. ঐ, পৃ. ১৬০।

২৯. ঐ, পৃ. ১৫৭।

৩০. ঐ, পৃ. ১৫৮।

৩১. ঐ, পৃ. ১৬৪।

৩২. সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা পত্র, 'পরিশিষ্ট', ঐ।

৩৩. এই তথ্যটি ছাড়াও গোপালচন্দ্র লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীব মেজ দেওরের ছেলে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সেজ দেওরের ছেলে ব্রজদুলর্ভ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁরা উভয়েই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাকে শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাড়িতে দেখেছেন।" ('শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩)।

৩৪. সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত পত্র, 'পরিশিষ্ট', 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প'।

৩৫. ঐ।

৩৬. ঐ, পৃ. ১৫৮–১৬০।

৩৭. সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত পত্র, 'পরিশিষ্ট', ঐ।

শুধু সরোজকুমার নয়, সমকালীন আরো তিন বিখ্যাত বাঙালির বক্তব্য গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে রাধারানী যুক্ত করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধারানী দেবী-প্রদত্ত তথ্যকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করেছেন : "আমি সে যুগে নানাভাবে নানা জনের নিকট শুনিয়াছি যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করেন নাই। এ বিষয়ে রাধারানী দেবী যাহা লিখিয়াছেন—তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। রাধারানী দেবী সত্যই লিখিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে ধর্মপত্নীর পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে রাধারানী দেবী শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে মনগড়া কোনো অপবাদ দিবার প্রয়াস করেন নাই। মানুষকে সত্য কথা উচ্চারণের সুযোগ না দেওয়া কোনো দেশেই সভ্যতার প্রগতির লক্ষণ নহে। ইহাতে শরৎচন্দ্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—এই ধ্বনি তুলিয়া কয়েকজন তথাকথিত সাহিত্যিক যে আলোড়ন তুলিয়াছেন —শরৎচন্দ্রের জীবনের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বা তাহার দাবি আছে আমি ইহার পূর্বে শুনি নাই। স্মৃতিনির্ভর রচনায় যদি কোনটি সামাজিকভাবে ভাল দেখাইবে, কোনটি মন্দ দেখাইবে এই বিবেচনার ফলে সত্য গোপন করিতে হয়, তবে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা হয়না। রাধারানী দেবী ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন —ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর 'অখ্যাতি' গোপন করেন

নাই—ইহার জন্য ঐতিহাসিক মাত্রই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন।"

রাধারানীর বক্তব্যের যাথার্থ্যে কোনো সন্দেহ ছিলনা ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও। দীর্ঘদিন বালিগঞ্জ অঞ্চলে রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের প্রতিবেশী থাকার সূত্রে তিনি দেখেছেন কিভাবে তাঁরা শরৎচন্দ্রের স্নেহ ও প্রীতি পেয়েছেন। সুতরাং "তাঁহাদের উক্তির আধার যে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের মুখের কথা, সে সম্বন্ধে আমাব কোনো সন্দেহ নাই।" একইসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে ভদ্র সামাজিক বেশ পরিয়ে উপস্থিত করতে যারা আগ্রহী, তাঁদের সম্বন্ধে সুনীতিকুমার বলেছেন :

"সময় ও সুবিধা পাইলেই, শরতের অনুরাগী সাহিত্য-ব্যবসায়ী সামাজিক সজ্জন নিজের মন-গড়া শরৎচন্দ্রকে না পাইলে খুশি হইতেন না, বা হয়েন না, তাঁহারা সকলেই চাহেন, তাঁহাদের মতে আদর্শ-চরিত্রের শরৎচন্দ্র তাঁহারা গড়িয়া তুলিবেন। এইজন্য তাঁহারা শবৎচন্দ্রের জীবন-কথার মধ্যে সত্যকার তথ্য এবং তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিবার এক বিকট আকাঙ্ক্ষা লইয়া শরৎ-চরিত্র-চিত্রণে অবতীর্ণ হন, পুনর্গঠন ও অনুমানের সহায়তায় যেটুকু সত্যকার তথ্য তাঁহারা পান সেইটুকুকে আরো পল্লবিত করিয়া তাঁহাদের সমান-ধর্মা সকলের উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলেন। যাঁহার এই কার্য করেন, তাঁহারা সদ্‌ভাব এবং সমুদেশ্য লইয়াই তাহা করেন, কিন্তু যে-বস্তু শরৎচন্দ্রের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল, তাহার কথা ভুলিয়া যান। বর্মায় রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের যৌবনকালের সহধর্মিণী শান্তিদেবী, এবং তৎপবে তাঁহার সমগ্র জীবনের অর্ধাঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবী, ইঁহাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রেব প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ উক্তি এবং প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্রেব আত্মীয় ও সুহৃদবর্গের স্পষ্ট অভিমত উপেক্ষা কবিয়া তাঁহারা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এই বিষয়ে, সরল অকপটভাবে, নিজের চোখে দেখা ও শরৎচন্দ্রের মুখের কথা নিজের কানে শোনা ঘটনা ও কথা, শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবী ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য স্পষ্ট ভাষায় যাহা তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাই আমার মনে হয় সত্য ঘটনা ও সত্য কথা।"

হিরণ্ময়ী দেবীর 'ভার্যাতত্ত্বের শাস্ত্র সম্মত বৈধতা নিয়ে' সুকুমার সেন মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে।' তাঁর মতে, হিন্দু সমাজের সাধারণ নিয়মকানুনের প্রতি আস্থাহীন শরৎচন্দ্র 'ঢাকঢোল বাজিয়ে শালগ্রাম এনে' হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেন নি। তবে 'শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে পরিপূর্ণ পত্নীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং হিরণ্ময়ী তাঁকে পতিদেবতারূপে গণ্য করতেন।' অবশ্যই 'সে বিবাহে শালগ্রামের উপস্থিতির বামনাই কাণ্ড ঘটেনি।'

৩৮. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৮৩।
৩৯. হিরণ্ময়ী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৫০৭।
৪০. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৬৭।
৪১. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৬৬–১৬৭।
৪২. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২১১–২১২।
৪৩. ঐ, পৃ. ২২২।
৪৪. শৈববিবাহের সামাজিক মর্যাদা নেই—একথা শরৎচন্দ্রের বিলক্ষণ জানা ছিল। তার উল্লেখ পাওয়া গেছে গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখায় : " 'শরৎদা, এখানে সভাসমিতিতে তোমায় চিরকুমার ব'লে উল্লেখ করলে তুমি তার জবাব দাওনা কেন?' শরৎদা বলিলেন —'তামাসা দেখি, বেশ মজা লাগে'।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩২৫)।

পঞ্চম অধ্যায়

বিচিত্র জীবনের আরও কয়েকটি দিক

॥ ১ ॥

জীবন—কি বিচিত্র হে!

শরৎচন্দ্রের কাছে মানবজীবন ক্যালাইডোস্কোপেব আকাবে উপস্থিত। সেখানে যেসব বিচিত্র নকশা ফুটেছে—কখনো সেগুলি তা তাঁর স্বনির্মাণ, কখনো বা অন্যের হস্তাবলেপে লাঞ্ছিত। তাদের মধ্যে শবৎচন্দ্রের আনন্দবেদনা, কান্নাহাসির স্বর শুনেছি। লক্ষ্য করেছি, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, বাঁশী বাজানোয় শরৎচন্দ্রের মনোযোগ যেমন ছিল, তেমনি পাখি শিকার, জ্যোতিষ চর্চা, দাবা খেলা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় উৎসাহ কম ছিলনা। সারাজীবন পশুপাখি পুষেছেন, পুত্রস্নেহে পালিত ভেলুর মৃত্যুতে তীব্র যন্ত্রণা পেয়েছেন। উগরে দিয়েছেন চাকুরি করার জন্য মনের পরতে-পরতে জমে থাকা তীব্র আত্মগ্লানি। সরস রসিকতায় কিংবা কঠিন ব্যঙ্গের কলমে পরিচিত মানুষ, এমন-কি নিজের ছবিও এঁকেছেন। আবার সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্তিতে দেখেছি তাঁর আনন্দবিহ্বলতা। এইসব নিয়েই গড়ে উঠেছে শরৎচন্দ্র নামক রূপতাপসের চালচিত্র।

॥ ২ ॥

একদা খেলা রঙের ঘরে

তুলি দিয়ে ছবিও এঁকেছেন শরৎচন্দ্র যখন তিনি রেঙ্গুনে। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করেছেন। তাঁর চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে অন্যের স্মৃতিকথায় উল্লেখও আছে। কিন্তু তাঁর চিত্রসৃষ্টির যে সামান্য নমুনা পাওয়া যায়, তাতে তাঁকে সার্থক শিল্পী হিসাবে গণ্য করা যায়না। এটুকু বলা যায়—তিনি শিল্পবেত্তা। এবং 'ছবি' গল্পটি তাঁরই।

নিজের শিল্পজীবন বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মমত্ব ছিল। সনিশ্বাসে বলেছেন : "এক সময় আমি কেবল ছবি আঁকতুম...বহুদিন একাগ্রমনে ছবি আমি আঁকতুম...বলতে চাইনে একটা অদ্বিতীয় কিছু হতুম...তবে চেষ্টা করলে মানুষে তার ফল পায়, আমার ছবি বন্ধুবান্ধবদের ভালোই লাগত...ভারি যত্নের ছিল সেগুলো আমার...বিশেষ করে মহাশ্বেতার ছবিটি। ...একবার বাড়ি পুড়ে গিয়ে আমার অনেক বই আর সেগুলো গেছে...।" ('সাহিত্যে আত্মহত্যা', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', আষাঢ় ১৩৩৫)।

শরৎচন্দ্র ছবি আঁকা শিখেছিলেন বর্মী চিত্রকর বা-থিনের কাছে, আর চিত্রসম্পর্কিত

প্রচুর বই পড়েছেন অধীত শিক্ষাকে মার্জিত করার জন্য। বিখ্যাত বিদেশী চিত্রকরদের বিভিন্ন ছবির প্রতিরূপ দেখে এই ধারণা তাঁর হয়েছিল, চিত্রকর হিসাবে 'র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়।' [১] নিজের মন্তব্যের পক্ষে তিনি বিশেষজ্ঞদের মতের উল্লেখও করেছেন : "বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার। ...একালের চিত্রকরদের মধ্যে মিলের টার্নারের খুব নাম। দুজনেই বিলাতী চিত্রকর। স্যার জোশুয়া রেনল্ডস ও গেইনসবরোর পর এঁরাই বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।" [২]

শরৎচন্দ্রের দুর্বলতা জমে গিয়েছিল তাঁর শিল্পগুরু বা-থিনের প্রতি এবং তারই ফল 'ছবি' গল্প। [৩] 'ছবি' গল্পে বা-থিনের আঁকা জাতকের গোপার ছবিতে দেবতার পরিবর্তে 'মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা' গড়া হয়েছে। "সে [বা-থিন] হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই [প্রেমিকা] মা-শোয়ে। চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান! আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম!" বা-থিন জানতেন না দেবতাকে প্রিয় ক'রে প্রিয়কে দেবতার আসনে বসিয়েছেন ভারতবর্ষের আধুনিককালের মহাকবি। হয়তো এ সত্য শরৎচন্দ্রের ছবিতেও ফুটেছিল। তাঁর আঁকা 'রাবণ-মন্দোদরী' (অনুমান করতে পারি রাবণের প্রেমিকা মন্দোদরী প্রাধান্য পেয়েছেন) কিংবা 'মহাশ্বেতা' ছবিতে তাঁর চির অপ্রাপণীয়া নারী ছায়া ফেলেছেন। বর্ষায় ঝাপসা হয়ে আসা নদীতীরের 'তরুতলে এলোকেশী সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা' উপস্থিত। [৪] সেখানে তপস্বিনীর কঠিন রূপের আড়ালে শরৎচন্দ্র প্রাণপণে ধরতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের প্রেরণারূপিনী বিশেষ নারীটিকে। সেই নারীর উদ্দেশে ঝরে-পড়া তপ্ত-অশ্রু সাদা ক্যানভাসে ফুটেছিল নদীতীরের বর্ষার ছদ্মবেশে।

শরৎচন্দ্র পোর্ট্রেটও আঁকতেন। রেঙ্গুনে 'নারদ মুনি' নামক পল্লীর বৃদ্ধ ভিখারীকে মডেল ক'রে শরৎচন্দ্র ছবি এঁকেছেন। [৫] কলকাতাতে সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সিংহ তাঁর বাড়িতে ছেলে কোলে মা-র ছবি আঁকার সময়, শরৎচন্দ্র দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সতীশচন্দ্র মডেল সামনে রেখে ছবি আঁকতেন। "শরৎদা আমার পাশে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে আমার ছবি আঁকা দেখতেন। ...আমি যতক্ষণ ছবি আঁকতাম, ততক্ষণ তিনি থাকতেন। ...ঐ সময় আমি একদিন শরৎদাকে বলেছিলাম —শরৎদা, আপনি...এই মেয়েটিকে 'মডেল' ক'রে একটা ছবি আঁকুন না। আমার এই কথায় শরৎদা তখনই পেন্সিল নিয়ে একটা ঐ 'মা ও ছেলের' ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।" [৬] এমন কি সতীশচন্দ্রের পুত্র অজিত সিংহকে হরগৌরীর ছবি আঁকতে দেখে শরৎচন্দ্র পেন্সিলে হরগৌরীর ছবি এঁকেছিলেন।

কেমন ছবি আঁকতেন শরৎচন্দ্র, সে বিষয়ে অন্যের মতামত উল্লেখ করেছেন হেমেন্দ্রকুমার : "তাঁর [শরৎচন্দ্রের] আঁকা যাঁরা দেখেছেন, প্রশংসা করেছেন। সেসব ছবি আমি দেখিনি, শরৎদার রেঙ্গুনের বাড়িতে আগুন লেগে ছবিগুলি নষ্ট হয়ে যায়।" [৭] ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুআরি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্র তাঁর 'মহাশ্বেতা' ছবি আঁকার প্রসঙ্গে বলেছেন : "আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা

(অয়েল পেন্টিং) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।"[৮] মহাশ্বেতার নির্মাণপর্ব সম্বন্ধে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের অফিস সহকর্মী-যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র এবারে একখানা নূতন ছবি আঁকার আয়োজন করিতেছিলেন। ...নূতন চিত্রের পরিকল্পনা নেহাৎ মন্দ হইতেছিল না।"[৯] শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে আঁকা মহাশ্বেতা এবং কলকাতায় আঁকা একটি ছবি সম্বন্ধে দুজনেব মত উল্লেখ করব। প্রথম জন যোগেন্দ্রনাথ সরকার, যিনি নিজেকে শিল্পরসিক বলে দাবী করেন নি।[১০] পরবর্তীকালের 'বিখ্যাত' শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকথা লেখার সময় উক্ত লেখক-শরৎচন্দ্রের প্রাপ্য প্রশংসা চিত্রকর-শরৎচন্দ্রের উপর তিনি আরোপ করেছেন, তাঁর লেখা পড়ে তা মনে হওয়া সম্ভব। যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মতো নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে অ্যানাটমির জ্ঞান, পারসপেকটিভ এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহিনা। মোটের উপর একসঙ্গে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্য চিত্র মিলাইয়া যাহা হয় ঠিক তাই। এই তপস্বিনী মহশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল প্রকৃতির খেয়ালী-সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।"[১১]

অন্যদিকে স্বয়ং শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহ্ শরৎচন্দ্রের আঁকা মা-র কোলে ছেলে ছবির বিষয়ে সতর্কভাবে সংযতভাষায় বলেছেন : "ছবিটা মন্দ হয়নি।"[১২]

চিত্র-সমালোচক হিসাবে শরৎচন্দ্র আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন। বর্মায় যখন চাকুরীজীবনে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন, কলকাতায় আসার জন্য অস্থির, তখন বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন—কোনো একটি পত্রিকায় সাব-এডিটারী যোগাড় ক'রে দেবার জন্য। সাব-এডিটারী করার সঙ্গে "ছবি 'জাজ' করার" কাজটাও তিনি করতে পারবেন —তার জন্য আলাদা ক'রে চিত্রসমালোচক রাখার প্রয়োজন নেই।[১৩] পরবর্তীকালে, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহের ছবির বিষয়ে তাঁকে মতামত জানাতে শুনেছি : "আমি [অর্থাৎ সতীশচন্দ্র সিংহ] তুলি রাখলে তিনি প্রায়ই বলতেন—ঐ জায়গাটা ঐ রকম করলে কেন? আবার কখনো বলতেন—এইখানটায় এই রকমের একটা টান দিলে বোধহয় ভালো হতো।"[১৪] সতীশচন্দ্র-পুত্র অজিত সিংহের ছবির বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেছেন : "তোমার ছবি আঁকাটা ঠিক হচ্ছেনা।"[১৫] শিল্প-সমঝদার হিসাবে শরৎচন্দ্রের তারিফ করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্রকুমারের তিনতলা বাড়ির প্রতিটা ঘরে টাঙানো ছবি 'বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি'তে পরীক্ষা ক'রে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "তোমার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেদিন আমার কাছে অভিযোগ ক'রে এলেন, 'হেমেনের ঘরে ঘরে টাঙানো অশ্লীল নগ্ন মূর্তির ছবি। চোখ তুলে তাকানো যায়না।' কিন্তু আমি তো বাড়িতে এসে একখানা অশ্লীল ছবিও তো দেখতে পাচ্ছি না। এসব তো উঁচুদরের আর্ট, এ দেখে যার মনে অপবিত্র ভাব জাগে, তারই মন শ্লীল নয়।" কৃতজ্ঞ হেমেন্দ্রকুমারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া : "শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পী।"[১৬]

শিল্প-সমালোচকের কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবে তা স্পষ্ট।

বিশ শতকের প্রথম দশকে নব্য বঙ্গীয় শিল্প-আন্দোলন (নামান্তরে ভারত শিল্প-আন্দোলন) ইউরোপীয় বস্তুধর্মী শিল্পের অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতা করেছিল এবং নির্ভর করেছিল ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার উপর। এই আন্দোলনের প্রধান প্রেরণাপুরুষ কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ঈ বি হ্যাভেল (স্বয়ং শিল্পী এবং শিল্পবিষয়ে লেখক)। সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, আনন্দ কুমারস্বামী এবং শ্রীঅরবিন্দ, যাঁদের শক্তিশালী লেখনী আন্দোলনের তত্ত্বভূমিকা নির্মাণ করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অবিসংবাদিতভাবে এই আন্দোলনের শিল্পগুরু যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল প্রতিভাবান একটি শিল্পীগোষ্ঠী—খ্যাতনামা নন্দলাল বসু তাঁদের অন্যতম। অবনীন্দ্রনাথ কেবল এই ভাবধর্মী শিল্প সৃষ্টি করেন নি, এর সমর্থনে লেখনী চালনাও করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন না। বরং তাঁকে বিদ্রূপ মন্তব্য করতে দেখা গেছে। সম্ভবত তাঁর কোনো রচনা বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের নেতিবাচক মন্তব্যের কথা শরৎচন্দ্র জেনেছিলেন।[১৭] তারপর, 'মনে কোরো না পুরনো কথার শোধ তুলছি' বলেও নিজেকে তিনি সামলাতে পারেন নি :

"এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের উপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনোদিন করিনি। 'আর্ট পেন্টিং' আমি নিজেও করি। 'অয়েল পেন্টিং' আমি নিজেও বুঝি। ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়িনি।" (২৫ জুলাই, ১৯১৩)।[১৮]

শরৎচন্দ্রকে সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন মাসিক 'গৃহস্থ' পত্রিকার শিল্প-সমালোচক। ১৩২০ বৈশাখ সংখ্যায় ঐ পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে লেখা হয়েছিল :

"গত ফাল্গুন মাসের কলিকাতার ধর্ম সমবায় কোম্পানী নির্মিত হিন্দুস্থান বীমা সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে। ...শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আদর্শ রাধিকা' কল্পনাটি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে গৃহীত। শিল্পীর রচনাও আদৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহাব 'প্রথম দর্শন' চিত্রে রমণীর পাশ-বালিশের মতো পা-গুলি অতি কদাকাব হইয়াছে। যে-কোনো দর্শকের মনে বীভৎস রসের সঞ্চার হইবে।"[১৯]

এই লেখা পড়ে উৎসাহিত শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : "[অবনীন্দ্রনাথকে] আক্রমণ করিতেই হইবে।" অবশ্য "একটু পোলাইট ধরনের।" অথচ ঐ সময়ে, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে, রেঙ্গুন-প্রবাসে তিনি অবনীন্দ্রনাথের একটিও মূল ছবি দেখেন নি ("আমি ওঁর ' ওরিজিন্যাল পেন্টিং' দেখিনি")। তা সত্ত্বেও চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে তিনি যে-কোনো মুহূর্তে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারেন, এ অহংকার ছিলই : "এমন বলা বলিতাম যে, তিনি [অবনীন্দ্রনাথ] বুঝিতেন এ কোনো চিত্র-ব্যবসায়ীর লেখা—যার তার নয়।" (৯ অগস্ট, ১৯১৩)।[২০]

শরৎচন্দ্রকে উসকে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সাতটি ছবি সম্পর্কে সরস বিদ্রূপে অবনীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩২০ শ্রাবণের 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'শ্রীনগদ-ক্রেতা' ছদ্মনামে লেখা তাঁর ঐ 'কানাকড়ি' প্রবন্ধে ছিল :

"ছবিখানির উপরে লেখা 'ভারতবর্ষ', ছবির নীচে লেখা 'বিশ্বাস', 'আশা' ও 'বদান্যতা', চিত্রকর জ্যাটকা! এ নিশ্চয় আমাদের ও পাড়ার প্যাটকা ছেলেটার কাজ, নাম ভাঁড়িয়েছে। যা হোক ছেলেটা এঁকেছে ভাল, ঠিক ইতালিয়ান পেন্টিং, কিন্তু ছেলেটা ভাব ফোটাতে পারেনি। ক্রশ নিয়ে 'বিশ্বাস' এটা বোঝা গেল—ঠিক আমাদের মেয়ে ইস্কুলের বড় মেম। কিন্তু 'আশা' আর 'বদান্যতা' এ দুটোর কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া গেল না তো! ...ছবিটাব গুণপনা পড়ে একটা ভুল ধারণা আমার থাকিয়াই যাইত, যদিনা আমার এম. এ. [পাশ] বন্ধু আসিয়া আমায় পরিষ্কার বুঝাইয়া দিতেন যে এটি সত্যই একটি বিলাতী ছবি। নারদের বাহন যেমন ঢেঁকি তেমনি ক্রিশ্চানদের মতে বিশ্বাসের বাহন ক্রশ-কাষ্ঠ, আশার বাহন নঙ্গর এবং বদান্যতার বাহন মদের পেয়ালা।"

শরৎচন্দ্র নিজেও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা ঐ ছবিগুলি দেখে অবনীন্দ্রনাথের মতোই হতাশ হয়েছিলেন। প্রমথনাথকে বেশ ঠাট্টাই করেছেন : "তোমাদের [মুদ্রিত] গল্পের ছবিগুলি আরো চমৎকার! পাঁজিতে জামাইষষ্ঠীর পুরনো ব্লক তোলা ছবির মতো। রাগ কোরো না ভাই, সত্যি কথা একা বন্ধুর কাছেই বলা যায়।"[২১] নিজের গল্পকে সচিত্র আকারে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় দেখতে তাঁর ঘোরতর আপত্তিও ছিল : "ছবি দেবে কি হে? দোহাই প্রমথ আমার গল্পেব ভেতরে ছবি দিও না—ওরে বাপরে। ...আমি তাহলে লজ্জায় বাঁচব না। ...আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে।" (৯ অগস্ট, ১৯১৩)।[২২]

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা ছবির মান সম্পর্কে 'বন্ধু' শরৎচন্দ্রের সমালোচনাকে প্রমথনাথ কোন গুরুত্ব দিয়েছেন, তা আমরা জানিনা। অপরপক্ষে তিনি রাগে জ্বলে গিয়েছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ্য সমালোচনায়। অবনীন্দ্র-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মনোভাব ইতিমধ্যে তাঁর জানা থাকায় শরৎচন্দ্রকে তিনি দলে টানতে চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ ক'রে লেখা প্রমথনাথের চিঠিতে 'প্রবাসী'-সম্পাদককে 'বুড়া রামানন্দ' বলে তিক্ত সম্বোধন ছিল। সেইসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে গালাগালির ফোয়ারাও ছুটিয়েছিলেন প্রমথনাথ :

"অবনীবাবু 'ভারতবর্ষের' ছবির উপর খুব একচোট গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন—রসিকতারও অভাব নেই। অবনীবাবুর 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' জ্ঞান ভাই দুর্ভাগ্যবশত 'অ্যাপ্রিসিয়েট' করতে পারিনা। তিনি শিব গড়িতে কি যেন একটা গড়েন—আর প্রবাসীর দল তাঁর ঢাক বাজায়। তাঁর 'আর্টের' যমুনায় একটা 'ক্রিটিসিজম্' করতে পারো? তাঁর পুষ্পরাধা প্রভৃতির। সত্য, প্রথম সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' ও 'মেঘদূতের' ছবিটা খারাপ হয়েছিল। কিন্তু লোকটা যেন তাঁর অপর স্কুলের আর্টকে নিন্দা করবার সংকল্প ক'রেই কলম ধরেছিল—নইলে কভারটা আর 'ফেথ', 'হোপ অ্যাণ্ড চ্যারিটি'র ছবিটাও নিন্দা করে! 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'টা তাঁর প্রতিযোগীর আঁকা। ...আমরা কিন্তু তার 'নবল্ রিভেঞ্জ' নিয়েছি—তাঁর ফটো ছেপেছি ও তাঁর ছাই (সি আই ই) ল্যাজ পাওয়ায় দীর্ঘ জীবন কামনা করেছি। [অবীন্দ্রনাথের লেখা] 'কানাকড়ি' পড়ে [প্রতিবাদ করা] যদি তোমার যুক্তিযুক্ত মনে হয়, একবার অনিলাকে দিয়ে তাঁর ছাই ঝেড়ে দেবে? তুমিই একা পারো।" (১৯ জুলাই, ১৯১৩)।[২৩ক]

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বিরূপ শরৎচন্দ্র, অতঃপর 'বন্ধুর' ক্রোধকে নিজের কোলে টেনে নিতে দেরী করেন নি, বলেছিলেন 'আক্রমণ করিতেই হইবে।' (৯ অগস্ট, ১৯১৩)।[২৩খ] সেই উত্তাপ তাঁকে এই সত্য ভুলিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের পথানুসারী।

ছবির জগতে শরৎচন্দ্রের হঠাৎ প্রবেশ। শারীরিক অসুস্থতার ফলে যখন পড়া এবং লেখার একটানা পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, তখন তুলে নিয়েছিলেন শিল্পীর তুলিকা। কয়েক বছরের খেয়ালী বিচরণ হঠাৎ আবার শেষ হয়ে গিয়েছিল দারুণ মানসিক আঘাতে—আগুনের লকলকে শিখা গ্রাস করেছিল তাঁর সমস্ত ছবি। শুধু বেঁচে গিয়েছিল আঁকার সরঞ্জাম—রঙ ও তুলির পাত্র।[২৪] সেই তুলির ডগা আর কখনো সাদা ক্যানভাসে রঙের আঁচড় কাটেনি। শিল্পীর ভাঙা-মনের হাহাকারের উত্তাপ শুকিয়ে ফেলেছিল তুলি দিয়ে ঝরে-পড়া রঙের রসনির্যাসকে।

এইখানে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উল্টো ভূমিকায়। শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের সৃষ্টি ছবি। তাঁর 'ভবঘুরে' জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তা আকস্মিকভাবে ভেসে এসেছে তাঁর জীবনে, আবাব চলেও গেছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এবং পরিণত মনের সৃষ্টি তাঁর ছবি। দীর্ঘকাল লেখার জগতে বিচরণের পর মহাপ্রতিভা ক্লান্ত বোধ ক'রে হাতে তুলে নিয়েছিলেন রঙতুলির পাত্র। তারপর সৃষ্টি করেছেন চিত্রজগতের কিছু সম্পদ।

শরৎচন্দ্রের ভাগ্যলিখন অন্যরকম। অকস্মাৎ গৃহদাহ তাঁর মনে যে প্রবল আঘাত হেনেছিল, তাকে আমরা সাহিত্যবিধাতার বিধান মনে করতে পারি। ঈশান কোণের মেঘের বুক চিরে নেমে পড়া বজ্রের মতোই তা অপ্রতিরোধ্য। বিপর্যস্ত 'চিত্রকর' শরৎচন্দ্র তখন পুরনো সাহিত্য-পৃথিবীতে ফিরে গিয়েছিলেন এই কথা মনে রেখে :

> সব 'ছবি' লুপ্ত হয় বারংবার লিখিবার তরে '
> নূতন কালের বর্ণে।

॥ ৩ ॥

'যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী'

কথাটি বলেছিলেন নিরুপমা-ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট। তিনি ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সের সাহিত্যসাধনার অন্যতম সঙ্গী। সেই সূত্রে দেখেছেন শরৎ-প্রতিভার নানামুখী বিকিরণ—অভিনয় মঞ্চে, সঙ্গীত পরিবেশনে, বাঁশি বাজানোয়। সেই পরিচয় ভাগলপুর এবং রেঙ্গুনের বাইরে কার্যত ছড়ায় নি। পরবর্তী খ্যাতির জীবনে শরৎচন্দ্র ঐসব পরিচয়কে আবৃত রেখেছেন। বিভূতিভূষণ ছাড়া শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী, গিরীন্দ্রনাথ সরকার, যোগেন্দ্রনাথ সরকার স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন শরৎ-জীবনের অনতিপরিচিত সেইসব কথা।

শরৎচন্দ্র কেবল অভিনেতা নন, তিনি অভিনয়-পরিচালক এবং প্রযোজকও।

অভিনয়ের জগতে তাঁর প্রথম উদ্ভাস কেবল অভিনেতা হিসাবে। কলেজে প্রবেশের পর রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত 'থিয়েটারের দলে' তিনি যোগ দিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী ঐ থিয়েটার দলের প্রথম প্রযোজনা। শরৎচন্দ্র তাতে স্ত্রীভূমিকায় আবির্ভূত। এরপর গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে তিনি জনা হয়েছেন। লক্ষণীয় যে-দুটি নাটকে শরৎচন্দ্রের অভিনয়-সংবাদ পাওয়া গেছে, দুটিতেই তিনি স্ত্রীভূমিকা নিয়েছেন। পরবর্তীকালে নিপীড়িতা নারীর পক্ষে তিনি কলম তুলে নেবেন—এ যেন তারই পূর্বসংকেত।

কেমন ছিল শরৎচন্দ্রের অভিনয় ক্ষমতা? সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, মৃণালিনী নাটকে "শরৎ স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গানে এবং একটিঙে . সকলকে বিস্মিত করে।" ('শরৎচন্দ্র', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'কল্লোল', চৈত্র ১৩৩২)। বিভূতিভূষণের কাছে অভিনেতা শরৎচন্দ্রের কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়, এমন কি এই বিশেষ ভূমিকায় সেকালের 'প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী'-কে পর্যন্ত তিনি শরৎচন্দ্রের সমকক্ষ ধরেন নি : " 'জনার' পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর (তিনকড়ি কি?) অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। অন্তত শরৎচন্দ্রের অভিনয়ে যে গম্ভীর সংযত তেজস্বিতা ও শোকপ্রকাশের ভঙ্গি দেখিয়াছিলাম, কলিকাতার প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা পাই নাই বলিয়াই স্মরণ হয়।" ('আমার শরৎদা', বিভূতিভূষণ ভট্ট, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

ভাগলপুরের খঞ্জরপুর অঞ্চলের বালক ও যুবকদের নিয়ে শরৎচন্দ্র ছোটখাট নাট্যদল তৈরী করেছেন। তিনিই সে দলের 'প্রযোজক এবং শিক্ষক'। বিভূতিভূষণ সানন্দে জানিয়েছেন অভিনয়-অন্তে সাজপোশাকপরা অভিনেতাদের ছবি পর্যন্ত তোলা হয়েছিল। মহড়া হতো অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে বিচিত্র এবং ভীতিপ্রদ স্থানে :

"নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান —কোনো স্থানই বাদ যাইত না। Shakespeare-এর *Midsummer Nights Dream*-এর গ্রাম্য অভিনয় চেষ্টার সমস্ত হাস্য ও করুণ রসটা আমরা প্রত্যক্ষভাবেই তখন অনুভব করিয়াছিলাম। তখন অবশ্য আমাদের Shakespeare পড়িবার বয়স নয়, কিন্তু বিশ্বকবি যাহা হয়তো কল্পনা করিয়াছিলেন, আমাদের বেপরোয়া শরৎচন্দ্রের উৎসাহে তাহা বর্তমানকালে স্থূলেই ঘটিয়াছিল।" ('আমার শরৎদা', বিভূতিভূষণ ভট্ট, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

শেকস্পীয়রের মতোই শরৎচন্দ্র অভিনেতা থেকে লেখক—এই ইঙ্গিত কি বিভূতিভূষণ দিতে চেয়েছেন?

অভিনয়ের প্রতি শরৎচন্দ্রের আকর্ষণ পরে তাঁর সাহিত্যে সঞ্চারিত। 'রামের সুমতির' নাট্যগুণ লক্ষ্য ক'রে মুগ্ধ হন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি সোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন : "একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ড্রামা হে প্রমথ! লোকটিকে দেখতে ইচ্ছা হয়।" [২০ক] প্রসঙ্গ শেষ করব অভিনয়-জীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নিজের কথা দিয়ে। চাপা অহংকারে বলেছেন : "অভিনয়টা...সত্যিই বুঝি।

শখের থিয়েটার অনেক করেছি। ফিমেল পার্টও বাদ যায়নি।"[২০খ]

রঙ মাখা মুখে অভিনেতার পোশাক গায়ে চড়িয়ে মঞ্চে অভিনয়যোগে একদা গান পরিবেশন করেছেন শরৎচন্দ্র। তা ভিন্ন প্রকাশ্য সঙ্গীতসভায় গায়ক হিসাবে ভাগলপুরে তাঁকে পাওয়া যায়না। একমাত্র বন্ধুদের সামনে তিনি স্বচ্ছন্দে গান গেয়েছেন। আসর জমে উঠত সাধারণের অগম্য স্থানে—অমাবস্যার গভীর রাত্রে কবরখানায়। বিভূতিভূষণ লিখেছেন ঐ ভয়াবহ পরিবেশে "শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ামসহ্ গান চলিতেছে এবং আমরা ২/৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছি।" ('আমার শরৎদা', বিভূতিভূষণ ভট্ট, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

গানের সঙ্গে পাল্লা দিত বাঁশি বাজানো। নির্জন রাতে "ঘোষেদের পোড়ো বাড়ির দোতলার ছাতে বসিয়া [শরৎচন্দ্র] প্রায়ই বাঁশি বাজাইত।" সেকথা জানিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এসরাজ বাজিয়ে শরৎচন্দ্রের গান গাওয়ার সাক্ষীও তিনি : "শরৎ ধীরে ধীরে একখানি এসরাজ বাজাইয়া গাহিতে লাগিল : মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী ইত্যাদি। নিমেষে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুকের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।" ('শরৎচন্দ্র', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'কল্লোল', অগ্রহায়ণ ১৩৩২)।

গানবাজনার প্রতি শরৎচন্দ্রের আকর্ষণের শুরু সম্ভবত প্রবেশিকা পরীক্ষার পর। একদিকে বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের আড্ডায় এসবের তুমুল চর্চা, অন্যদিকে আর্থিক কারণে পড়াশোনার সঙ্গে শিথিল সম্বন্ধ—সব মিলিয়ে শরৎপ্রতিভা তখন গতিশীল সঙ্গীতের জগতে। "এই বয়সে তাহার গানবাজনার প্রতি টানটা কিছু অসাধারণ বলিয়া মনে পড়ে। ...শরৎ [রাজেন্দ্রনাথের] আড্ডায় মিশিয়া গান করিতে ও হারমোনিয়াম বাজাইতে বেশ শিখিয়াছিল।" তাঁর এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ সহ কয়েকজন "সস্তা বাঁশের বাঁশি খরিদ করিয়া 'যমুনা পুলিনে বসে' ইত্যাদি বাজাইতে শিখিয়াছিলাম।" সুরেন্দ্রনাথ এও শুনেছেন, সঙ্গীতের প্রবল টানে "ভাগলপুর আসিবার পূর্বে সে নাকি দিন কতেকের জন্য যাত্রার দলে ভর্তি হইয়াছিল।" (ঐ)।[২০গ]

তরুণ শরৎচন্দ্রের গান ও বাঁশি বাজানো অন্তঃপুরবাসিনী এক নারীকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছিল এতই বেশি যে, বহু বছর পরে শরৎচন্দ্রের কথা লিখতে গিয়ে স্মৃতির মালা থেকে একটি একটি ক'রে রত্ন তুলে এনেছিলেন সেই নারী—নিরুপমা। এক শিল্পীর মন আরেক শিল্পীর উপযুক্ত মূল্যায়নে কোনো ভুল সেদিন করেনি :

"সেই উদাসী কবিস্বভাব-বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মসজেদ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি সাজাহানের আমলের), তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোনো গভীর রাত্রে সেই মসজেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গন-চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেদজা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন 'এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড'! আমাদের সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত সুউচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত ছিল ; তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে তাহাকে পার্বত্য অধিত্যকার মতোই দেখাইত। সেই বাটীর অধিকারী আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতি-সমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে

ক্রমোচ্চভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতি-সমাধি হইতে বায়ু পথে ভাসিয়া আসিয়া গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল—'আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি, অমনি মুদিলি আঁখি।' ইহাদের পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরো গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি ; কিন্তু বাঁশি কখনো সেসব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রচিত আরো একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল : '*গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি বৃন্দাবন*'।" ('আমাদের শরৎদাদা', নিরুপমা দেবী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

প্রকাশ্য সভায় সঙ্গীত পবিবেশনে শরৎচন্দ্রে স্বভাবে সংকোচ ছিল। রেঙ্গুনেও তাব ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায়নি। ঐকালে তিনি নিরুপমার প্রেমে ব্যর্থ, সাহিত্যের সঙ্গে বস্তুত সম্পর্করহিত, সমাজদর্শন-ইতিহাস ইত্যাদির একনিষ্ঠ পাঠক। একান্তে আপন মনে গান কবেন।[২৬]

রেঙ্গুনে বাংলা গানের শ্রোতাব সংখ্যা নয়, কিন্তু ভালো গায়কের নিতান্ত অভাব। শরৎচন্দ্রের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর অল্পদিনে তাঁকে এমন খ্যাতি এনে দিয়েছিল যে, সঙ্গীতে 'সিদ্ধকণ্ঠ' শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ চর্বণার সময় গিরীন্দ্রনাথ সরকাব উচ্ছ্বসিত। রেঙ্গুনে নবীনচন্দ্র সেনেব বাড়িতে শরৎচন্দ্রের গান শুনে ('আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা। বাকি কিছু নাই। ...শেষে অজানা সময় নিকটে আসিলে যেন তোমারি চরণ পাই॥') মুগ্ধ নবীনচন্দ্র তাঁকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। তাতে আবেগআপ্লুত গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীতে যেরূপ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার গানের মধ্যেও সেইরূপ অসাধারণ মাধুর্য ছিল। গানে প্রাণ দিয়া ভাব ফুটাইয়া তুলিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয়। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, শরৎচন্দ্রের একটিমাত্র গানে কবিবর [নবীনচন্দ্র সেন.] এত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এরূপভাবে সম্মানিত করিবেন। আমার বিশ্বাস, শরৎচন্দ্রের মুখে এই গানটি যিনি শুনিয়াছেন তিনি তাঁহাকে কখনো ভুলিতে পারিবেন না।"[২৭]

অথচ রেঙ্গুনের সেরা গায়কের মুকুট মাথায় পরার কিন্তু কোনো বাসনাই শরৎচন্দ্রের ছিলনা। এ ব্যাপারে আশ্চর্য উদাসীন তিনি। রেঙ্গুনে নবীনচন্দ্র সেনের সংবর্ধনা সভায় তিনি গান গেয়েছেন পর্দার আড়াল থেকে। সে গান শেষ হওয়ামাত্র "গায়ক শরৎচন্দ্রকে দেখিবার এক অদম্য কৌতূহল জনতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ব্রহ্মপ্রবাসে কে এই অজ্ঞাত সুধাকণ্ঠ গায়ক আজ কবি-সংবর্ধনা করিয়া প্রবাসী বাঙালির মুখরক্ষা করিলেন।"[২৮] এমন কি স্বয়ং নবীনচন্দ্র পর্যন্ত গায়কের সঙ্গে আলাপে উৎসুক—যদিও গান শেষ হওয়ামাত্র গায়ক পর্দার অন্তরাল থেকে অন্তর্হিত। নবীনচন্দ্রের আগ্রহের কথা জেনে শরৎচন্দ্রের দুই বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার এবং গিরীন্দ্রনাথ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন শরৎচন্দ্রকে কবির সম্মুখে হাজির করতে। এ ব্যাপারে যোগেন্দ্রনাথ নিজের ব্যর্থতার কথা গোপন করেন নি : "বহুবার অনুরোধ করিয়াও [শরৎচন্দ্রকে] নবীনচন্দ্রের সদনে লইয়া যাইতে সক্ষম হই নাই।"[২৯] গিরীন্দ্রনাথ অবশ্য লিখেছেন : "আমি একদিন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া শরৎচন্দ্রকে তাঁহার [নবীনচন্দ্রের] বাটীতে লইয়া গেলাম।

উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া সম্মুখে ড্রয়িংরুমে কবিবরের সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতা রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ মিঃ যতীশরঞ্জন দাশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শরৎচন্দ্র হঠাৎ এরূপ জোরে দৌড় দিলেন যে, তাঁহার পায়ের একপাটি জুতা খুলিয়া পড়িয়া গেল। কাঠের সিঁড়িতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় কেহ পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, শরৎচন্দ্র একপাটি জুতা পরিয়া ছুটিয়া পলাইতেছেন।" [৩০] শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে 'বিশেষ লজ্জিত' গিরীন্দ্রনাথ বোধহয় সে সময়ে ধরণী দ্বিধা হও ভেবেছেন। পরে অবশ্য তিনি শরৎচন্দ্রকে নবীনচন্দ্রের কাছে ধরে আনতে পেরেছিলেন—সেকথা আগেই বলেছি।

রেঙ্গুনের বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে শরৎচন্দ্রের মুখে জ্ঞানদাসের পদকীর্তন শুনে ভাবাবিষ্ট যোগেন্দ্রনাথ সরকার তদ্‌গতচিত্তে বলেছেন : "শরৎচন্দ্র যে কি গাহিলেন বলিতে পারিনা। দেখিলাম তাঁহার চোখদুটি ছলছল করিতেছে—রুগ্ন শীর্ণ কণ্ঠ যেন সঙ্গীতের ভারে ফাটিয়া পড়িতেছে। কি সে প্রাণের বেদনা! কি সে মর্মের ক্রন্দন! সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আসিয়া সকলের মর্মে প্রবেশ করিতেছে। গান বলিতে যদি কিছু থাকে, যাহার ভিতরে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সে এই গান, সে এই প্রাণ জুড়ানো সঙ্গীত। সেইদিন হইতে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম।" এই মানুষটি কেন গান গাইতে বসে মাঝপথে হারমোনিয়াম ছেড়ে উঠে পড়েন, যোগেন্দ্রনাথ তার কারণ বুঝে উঠতে পারেন নি। গায়ক শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি রীতিমতো হতাশগ্রস্ত। "গায়ক বলিয়া [শরৎচন্দ্রের] যা কিছু খ্যাতি ছিল, সেটাও তাঁর নিজের দোষেই অবশেষে মাটি হইতে চলিল।" এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের ঐ কাজের মুখরক্ষা গোঁছের ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন : "শরৎবাবু কোনোদিনই স্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী ছিলেন না। অধিকক্ষণ গান গাহিতে হইলে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন ; তাই কতকটা বাধ্য হইয়া, কতটা বা অধ্যয়নের জন্য এইসব মজলিশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। [৩১]

রেঙ্গুন থেকে কলকাতা—গায়ক শরৎচন্দ্রকে পাওয়া গেছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিকথায়। এখানেও তিনি লাজুক গায়ক। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন : "আমি তখন পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পুরাতন বাড়িতে। মা এসে বললেন, 'তোর পড়বার ঘরে কে একটি ভদ্রলোক চমৎকার গান গাইছেন।' বিস্মিত হয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখি, গালিচার উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আপনমনে গান গাইছেন শরৎচন্দ্রই। কণ্ঠস্বরে ওস্তাদির ছাপ না থাকলেও বড় মিষ্ট গলা। গাইতেও পারেন ভালো। কিন্তু আমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গান থেমে গেল। বহু অনুরোধেও আর তিনি গাইলেন না। এরপরেও প্রায় তিনি আমার ঘরে এসে বসতেন,...মাঝে মাঝে আড়াল থেকে তাঁর গান শুনেছি আরো কয়েকবার। কিন্তু আমার সাড়া বা দেখা পেলেই তাঁর গান হতো বন্ধ।" [৩২]

নিজের গায়কভূমিকা পরে শরৎচন্দ্রের রসিকতার বিষয়। তা করেছেন এমন একজনের কাছে যিনি স্বয়ং গায়ক হলেও শরৎ-জীবনের এই পর্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন কিনা সন্দেহ। দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী' পড়ে শরৎচন্দ্র নিজ তৃপ্তির উল্লেখ করার পর ঠাট্টা ক'রে বলেছেন : "দু-একটা ত্রুটিও আছে। [তোমার বইয়ে]

ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হলাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধরে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিও, ভুলো না।" [৩৩]

ভারতবিখ্যাত গায়ককে নিয়েও তামাশা করতে শরৎচন্দ্রের বাধেনি। দিলীপকুমার লিখেছেন :

"১৯২৪ কি ২৫ সালে একবাব শিবপুরে গিয়ে শরৎদাকে ধরলাম—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেয়ালী আবদুল করিম আমাদের থিয়েটার রোডে গান গাইবেন। আসতেই হবে আপনাকে। শুনবেন কী অপূর্ব গান।

শরৎদা : অপূর্ব? হবে। কিন্তু হিন্দি যে।

আমি : বা রে! ওস্তাদে কি বাংলা গাইবে!

শরৎদা : তাই তো মণ্টু!...যেতে পারি...কেবল যদি একটু ভরসা দাও।

আমি : ভরসা? কী?

শবৎদা : তিনি থামেন তো?

আমরা হেসেই কুটিকুটি। শরৎদা আমাদের হাসি থামলে বললেন : তোমবা হাসলে, কিন্তু আমি কেঁদেছিলাম জানো কি?

আমি (হেসে) : কেঁদেছিলেন?

শরৎদা : কান্নার বাড়া হে। বলি শোনো। একবার গিয়েছি তোমার ঐ আবদুল করিমের মতনই এক ওস্তাদের গান শুনতে। সে তো আর থামেনা—কেবলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তানের চরকিবাজি ক'রে সমে ফিরে এসে হোঁচট খেয়ে বলে : 'সৈঁয়া! তু কাঁহা গৈঁয়া?... আরে মেরী সৈঁয়া! তু কাঁহা গৈঁয়া রে?'...শেষে আমি আর থাকতে পারলাম না, ফরশির নল মুখ থেকে ফেলে দিয়ে গর্জে উঠলাম : 'আরে সৈঁয়া তোর কাশী মিত্তিরের ঘাটে গৈঁয়া। তারপরে কী হলো বল্ না'?" [৩৪]

দিলীপকুমারের মুখে শরৎচন্দ্রের এই গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথ 'এক গাল' হেসে বলেছিলেন, "শরৎ মোক্ষম রসবাণ হেনেছে হে, যাকে বলে ক্লাসিক'।" [৩৫]

॥ ৪ ॥
'চাকুরির মুখে ছাই'

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যখণ্ডের দ্বারী বলেছিল, 'চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে পারিনা ভাই, বিষকৃমি সম হয়ে আছি।' প্রায় দুশো বছর পরে কেরানী শরৎচন্দ্রের একই মনোভাব। তাঁর নানা সময়ের চিঠি থেকে রেঙ্গুনে চাকুরি নামক অর্থনিগড়ের সাক্ষাৎ চিত্র পেয়ে গেছি :

"অপমান সহ্য ক'রে যে চাকরি করে সে করে, আমি তো কিছুতেই পারব না। ...এতদিন চাকরি কচ্চি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দশায় কখনো পড়িনি।" [৩৬]

"এ শালার অফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম।"[৩৭]

"আত্মমর্যাদাবোধ এবং চাকরি একত্রে দুইটা প্রায় অসম্ভব।"[৩৮]

চাকুরিজীবনে শরৎচন্দ্র গ্লানিতে জ্বলেছেন। অন্নচিন্তা মানুষের পায়ে দাসত্বের বেড়ি পরিয়ে দেয়। তাব ভুক্তভোগী শরৎচন্দ্র স্বয়ং। তাঁর শতাধিক বৎসর আগে কবি ভারতচন্দ্রকে রাজকবির স্বর্ণশৃঙ্খল পবে, অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখতে গিয়ে, তাতে জুড়ে দিতে হয়েছিল রাজা ও রাজকবির প্রশস্তি। শরৎচন্দ্রের সৌভাগ্য অন্নদাতা প্রভুর মর্যাদা খ্যাপনে তাঁকে লেখনী নিয়োগ করতে হয়নি।

১৯১৩-র ৩১ মে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠির অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে আছে, চাকুরিস্থলে কোন অসম্মানেব বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাঁকে দিনযাপন করতে হয়! চিঠির মধ্যে সমস্ত যন্ত্রণা ঢেলে দিয়ে তিনি যেন বন্ধুর কাছে সান্ত্বনা চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র নামক মুক্ত বিহঙ্গের তীরবিদ্ধ ছবি এর চেয়ে স্পষ্টভাবে কোথাও পাওয়া যায়নি :

"আমাদের বড় সাহেব 'নিউমার্চ'। 'গোরা'তে ববিবাবু বলিয়াছেন, 'আমি মাধব চাটুজ্যে নীলকরের গোমস্তা।' এর বেশি আর বলাব আবশ্যক নাই। নিউমার্চ ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরানীকে 'রিডিউস' করিয়াছেন। অপরাধ, একজনের চিঠি 'ডেসপ্যাচ' করতে ৩ দিন দেরি হয়—আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরানো চিঠি বার হয়, এই রকম। এঁর দৌরাত্ম্যে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল চ্যাণ্টার সাহেব, ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল শ্রীনিবাস আইয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল সুন্দরম, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ম্যাসেট, ১ মাসের মধ্যে 'মেডিকেল সার্টিফিকেট' দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে, আমাদের 'পি-ডব্লিউ-ডি' লোকেদের নিজেদের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের অফিস আওয়ার 'স্ট্রিক্টলি উইথ হার্ডেস্ট লেবার ফ্রম ১০.৩০ টু ৬.৩০।' নিয়ম এই যে, যদি কারু কোনোদিন কোনো তরফ থেকে 'রিমাইণ্ডার' আসে—৬ মাসের জন্য ১০ [টাকা] হিসাবে (জরিমানা) 'রিডাকসন্'। এই তো সুখের চাকরি। তার উপর সেদিন 'লোকাল গভর্নমেন্টকে এই বলে [নিউমার্চ] মুভ করেছেন যে, অফিসের কেরানী ঘুষ দিয়ে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে পালায়, তাতে অফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সেইজন্য অফিসের চিঠি না গেলে সিভিল সার্জন কাউকে যেন মেডিকেল সার্টিফিকেট না দেন। আমাদের এখন মেডিকেল সার্টিফিকেট দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিলেও [নিউমার্চ] বলে, ওর 'সার্ভিস বুকে' নোট ক'রে রাখ, মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট। বর্মা বলেই এত জুলুম চলে যাচ্ছে।

"দিন ৩/৪ পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা 'রিমাইণ্ডার' আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারিনা—এটি আমার 'সাব অডিটর' ভৌমিকবাবু ও পেরিয়া স্বামীর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। 'একস্প্লেনেশন' দিলাম আমারই 'ওভারসাইট'। ইত্যবসরে 'রেজিগ্নেশন' লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০ টাকা গেছেই।

...কি জানি নিউমার্চ দয়া ক'রে কোনো কথাই বললেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনা, আমার আর 'রেজিগনেশন' দেওয়া হলো না। কিন্তু শরীর আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

"...এও বুঝতে পাচ্ছি, এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায়, শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখিনে—তাহলে আমাকে অন্তত ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে 'অ্যাপ্লিকেশন' পর্যন্ত 'ফরওয়ার্ড' করেনা। ঢের পাজি লোক দেখেছি, কিন্তু এমনটি শোনাও যায়না।" [৩৯]

শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ চিঠি থেকে এটা পরিষ্কার, নিউমার্চের কড়া শাসনে একজামিনার পাবলিক ওয়র্কস অ্যাকাউন্টেন্ট অফিসের উচ্চ এবং নিম্নপদস্থ কর্মীবৃন্দ ত্রাহি মধুসূদন জপ করেছেন। অন্য সূত্র উদ্ধার করে বলতে পারি নিউমার্চ আসার আগে এই অফিসের শাসন অনেক শিথিল ছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন অফিসেব টিফিনের সময় মশগুল হয়ে সাধারণ সাহিত্য বা নিজের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই সেই আলোচনা টিফিনের নির্ধারিত সময় অতিক্রম ক'রে অধিকার ক'রে নিত অফিসের কাজেব সময়। কর্তৃপক্ষ তা ক্ষমাব চোখে দেখতেন। [৪০] এক্ষেত্রে নিউমার্চের আগমন কর্মীবৃন্দের ঢিলেঢালা কর্মজীবনে যথেষ্ট উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল।

চাকুরিজীবনের এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও শরৎচন্দ্র পুনরায় চাকুরির বৃত্তে জড়িয়ে পড়তে চেয়েছেন। তবে তা বর্মায় নয়, বাংলাদেশে। এখানে উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার কথা এসে যায়—মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে, তবু মুখে চিবোয় কাঁটাগাছ। শরৎচন্দ্র বিশেষ খুশি হয়েছিলেন বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য কলকাতায় তাঁর চাকুরির চেষ্টা করায়: "কলকাতায় আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশি হলাম।" [৪১] সকাতরে বলেছেন: "কোথাও একটা ৪০/৫০ টাকার চাকরি যোগাড় ক'রে দিতে পারো তো যাই।" [৪২] "যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি রিজাইন দিয়ে চলে যাই।" [৪৩] না, চাকুরিপ্রীতি নয়, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নিরাপত্তা, উপযুক্ত পরিবেশ, সহৃদয় (সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী) রসিকগোষ্ঠী, রচনা প্রকাশবাহন যোগ্য পত্রিকা—রেঙ্গুনে এসব ছিলনা। তখনো পর্যন্ত সাহিত্য লিখে গ্রাসাচ্ছাদন করা যায়—এই প্রত্যয় তাঁর আসেনি ["সাহিত্যচর্চা করে পেট ভরে না ভাই" [৪৪]]। তাই আর্থিক কারণে চাকুরি চেয়েছেন এবং সে চাকুরি কোনো পত্রিকার সাব্-এডিটারী হলে ভালোই। প্রমথনাথকে আশ্বস্ত ক'রে তিনি বলেছেন, পাঠক পত্রিকা পড়ে 'ছি-ছি' করবে, এমন 'কাগজ কোনো মাসেই হতে' দেবেন না। নিজ কর্মগুণের তালিকা একইসঙ্গে তিনি পেশ করেছেন—একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা যেমন তিনি লিখবেন, তেমনি ছবি 'জাজ' করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনাও করবেন। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এসব কাজ তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। এবং "এ চাকরি আমার খুব ভালো লাগবে।" [৪৫]

'কলকাতায় আসার মূলে শরৎচন্দ্রের ক্রমাগত শরীরিক অসুস্থতাও ছিল। [৪৬] গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন: "অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুষাঘুষি করিয়া তিনি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।" [৪৭] এই শারীরিক বলপ্রয়োগের ব্যাপারটি যোগেন্দ্রনাথ

সরকারের লেখাতেও দেখেছি।[৪৮] গোপালচন্দ্র রায় ঐ কারণটির পক্ষে একাধিক সূত্র উদ্ধার করেছেন।[৪৯ক] শরৎচন্দ্র স্বয়ং একটি চিঠিতে লিখেছেন : "বর্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরানী—হঠাৎ বড়সাহেবের সঙ্গে মারামারি ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই [সাহিত্য] ব্যবসা আরম্ভ করেছি।"[৪৯খ]

ব্যাপারটি বিস্ময়জনক মনে হয়। কাজে নিছক ইস্তফা দেওয়া নয়—একেবারে ঘুষোঘুষি ক'রে ইস্তফা? কারণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ সরকার। বর্মাবাসের শেষ পর্বে শরৎচন্দ্র লেখক হিসাবে বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে অর্থাগমেরও শুরু। এতদিন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে তীব্র লড়াই ক'রে এসেছেন—সেই তাঁর ওষ্ঠে নতুন জীবনের স্বাদ যেন এনে দিল তাঁর রচনা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি তখন কার্যত সম্পর্ক চুকিয়ে অফিস বাদে অন্য সময় লেখায় নিমগ্ন, অন্তর্গহনে তৈরী হচ্ছে স্বাধীন লেখকসত্তা। কোনো ধরা বাঁধার মধ্যে থাকতে এখন একান্ত অনিচ্ছুক। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ও তখন তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন বর্মা ত্যাগে।[৫০] এইসব কারণে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া : "আমার আর এখানকার চাকরি একদিনও ভালো লাগছে না।"[৫১] সেই অনিচ্ছা নামক বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করেছে কোনো একদিনের ঘটনা যা হয়তো আপাততুচ্ছ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বেপরোয়া সত্তা ঐ সুযোগে পায়ে জড়ানো চাকুরি-শিকল ছিঁড়ে ফেলে তরণী ভাসিয়েছে কলকাতার উদ্দেশে। আর নতুন চাকুরি নয়, সাহিত্যবিধাতার আদেশ শিরোধার্য ক'রে সর্বদ্বিধা-মুক্ত শরৎচন্দ্র তখন পুরোপুরি সাহিত্যিক হওয়ার বাসনায় অধীর।

॥ ৫ ॥

আড্ডাজীবী বাঙালি

বাঙালির জীবনভরা আড্ডা এবং আড্ডা। বাংলা সাহিত্যের নানা জায়গায় আড্ডার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নয়নচাঁদের গুলির আড্ডা, পরশুরামের হাবসীবাগান লেনের মেসবাড়ির আড্ডা কিংবা রায়বাহাদুর বংশলোচনের বৈঠকখানা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ৭২নং বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়িতে ঘনাদার সঙ্গে শিবু-শিশির-গৌরের আড্ডা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পটলডাঙার চাটুজ্যেদের রোয়াকে সপার্ষদ টেনিদার আড্ডা ইত্যাদি। রক থেকে ড্রয়িংরুম—সর্বত্রই বাঙালির আড্ডা। শরৎচন্দ্র এক সেরা আড্ডাধারী বাঙালি। আড্ডায় আবার কখনো কখনো একজন কুলপতি থাকেন, তিনি মুগ্ধ করে রাখেন গল্পকথায়। শরৎচন্দ্র তেমনই একজন।

তিনটি স্মৃতিকথা থেকে শরৎচন্দ্রের ঐ পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। প্রথম স্মৃতি মোহিতলাল মজুমদারের : "গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম—শুধু গল্প নয়—গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গিতেও।...শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরনের—তাহাতে ভাবের সংক্রমণতা আরো অব্যর্থ।"[৫২]

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছেন : "হয়তো অনেকেই জানেন না যে, শরৎচন্দ্র খুব

ভালো গল্প বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তাঁর লেখার থেকে গল্প বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর।"[৫৩]

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিকথা এইবকম : "তিনি [শরৎচন্দ্র] কোনোরকম কৃত্রিম ভঙ্গি বা গাম্ভীর্যের ধার ধারতেন না, গল্পের পর গল্প বলবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন, আর কত রকম গল্পই যে তিনি জানতেন!...পয়লা নম্বরের আড্ডাধারী মানুষ, কোনো কোনোদিন দশ-বারো ঘণ্টা ধরে অশ্রান্তভাবে গল্প ক'রে গিয়েছেন, বাড়ি ফিরেছি আমরা রাত দুটো কি তিনটের সময়ে।"[৫৪]

শরৎচন্দ্রের কাছে সভাসমিতি রীতিমতো ভয়ের বস্তু। অথচ আড্ডায় তিনিই অক্লান্ত। ঘণ্টার পব ঘণ্টা জমিয়ে রাখতেন শ্রোতাদের, অফুরন্ত স্টক। আড্ডার ব্যাপারে কোনো আপসরফা শরৎচন্দ্রের স্বভাবে ছিলনা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব পরিষ্কার—আড্ডায় ঢোকার আগে হাতের ঘড়ি খুলে বাইবে রেখে আসতে হবে। ঘড়ি ধরে আড্ডা জমেনা। সময় মেপে চলে কেজো লোক। ওটা আড্ডাজীবী মানুষের লক্ষণ নয়। শরৎচন্দ্র নিজে তা-ই করতেন। তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকায় সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি নিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর পুরনো বন্ধু চারুচন্দ্রের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। একদিন রাত্রে অপূর্বকুমার চন্দের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ। বিকালে গেছেন সুরেশচন্দ্র ঘটকের বাড়িতে গল্প করতে। সে গল্প এমনই জমে উঠেছে যে শরৎচন্দ্রের, এমন-কি সুরেশবাবুদেরও, সময়ের খেয়াল নেই। রাত ক্রমে গভীর। "ওদিকে অপূর্বকুমার চন্দেব বাড়ি হইতে বারবার আমাদের [চারুচন্দ্রের] বাড়িতে জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছেন—শরৎচন্দ্র ফিরিয়াছেন কিনা? শুনিলাম রাত যখন প্রায় এগারোটা, তখন সে [শরৎচন্দ্র] মিঃ চন্দের বাড়িতে আসে। তাও মিঃ চন্দ নিজে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন তাঁর বাড়িতে, তবে। নইলে সে কখন উঠিত কে জানে! এত গল্পপ্রিয় সে ছিল—এবং গল্পের নেশায় তার স্নান-খাওয়ার সময় বহিয়া যায়, একথা তাকে বলিলে সে বলিত, 'আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে লোকে যদি খুশি হয় তো আমি কেন তাদের এটুকু আনন্দ জোগাতে কৃপণতা করব?' সে রাত্রে [অপূর্বকুমার চন্দের বাড়ি থেকে] প্রায় আড়াইটার সময়ে সে বাড়ি ফিরিয়াছিল।" চারুচন্দ্রের বাড়িতে একই ঘরে শরৎচন্দ্র এবং চারুচন্দ্র থাকতেন। রাত্রির মধ্য যাম অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও চলত শরৎচন্দ্রের অনর্গল গল্প। পরে আপসোস ক'রে চারুচন্দ্র লিখেছেন : "অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তি উহাদের একটিও ধারণা করিয়া রাখিতে পারে নাই।" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৮)।

মনস্বী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত স্মরণ করেছেন আড্ডায় মশগুল শরৎচন্দ্রকে : "আমার বাটীর মধ্যে একটি পুকুর ছিল। তাহার বাঁধানো ঘাটের উপর দুই রোয়াকে বসিয়া আমাদের মজলিস বসিত।...ঘাটের মজলিসে তিনি [শরৎচন্দ্র] আসর জমাইয়া বসিতেন, আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত এবং ঘন ঘন হুঁকার কলিকা বদল হইত।"[৫৫]

শরৎচন্দ্রের নিজের চোখে আড্ডার চেহারা দেখে নিতে পারি। তাঁর শেষ বয়সে

অমল হোমকে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন আড্ডার গঙ্গাযাত্রা দেখে : "আড্ডা জিনিসটা উঠে যেতে বসেছে—দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এ যে কতবড় অবনতি, তা যদি কেউ জানত।"[৫৬] সতৃষ্ণচিত্তে অপেক্ষা করেছেন একটি সরস আড্ডার জন্য : "তুমি এলে জমবে ভালো। মুখোমুখি বসে অনেকদিন গল্প করিনি তোমার সঙ্গে।"[৫৭] আবার রোমন্থন করেছেন অতীত আড্ডার যা সততই সুখের। এখানে বলে নেওয়া যায়, একই সঙ্গে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক আড্ডারও উল্লেখ করেছেন :

"মনে পড়ে দ্বিজেন মৈত্রের সেই হাসপাতালের ছাদে গঙ্গার আলো হাওয়ায় তোমাদের সেই আড্ডা—আর শিবপুরে তাঁর ভাই সুরেন মৈত্রের ওখানে, সেও ঐ গঙ্গার ধারে। মনে পড়ে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই ন্যাড়া ছাদে আমাদের যমুনা আপিসের আড্ডা। ফণীর ['যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল] ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে [অমল হোমকে]। তুমি আর প্রভাত [প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়]। কি তার্কিকই না ছিলে তোমরা দুটি বন্ধু। আর কি পাকা! কতই বা তখন বয়স তোমাদের। সমানে তাল ঠুকে গিয়েছ আমাদের সঙ্গে। আর তারপর তোমাদের সেই ভারতীর আড্ডা। তেমনটি আর হবেনা।"[৫৮]

খাঁটি আড্ডা কাকে বলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল শরৎচন্দ্র। আড্ডা আর যাই হোক কারুর এজমালী সম্পত্তি নয়। তুমুল হৈ হৈ, ঘন ঘন চা এবং অবিরাম হুঁকোর কলকে বদল (যা রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন), তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলের অংশ নেওয়া—এই না হলে আড্ডা! কিন্তু যদি তা না হয়, যদি একজনই আড্ডার শিরোমণি হয়ে সর্বক্ষণ কথা চালিযে যান, তাহলে? তাহলে সেটা আড্ডা না হয়ে অন্তরঙ্গ মহলে বাণীবর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে তেমনটি ঘটত বলেই শরৎচন্দ্র মনে করতেন—

"সে আড্ডায় হয়তো তিনিই [রবীন্দ্রনাথ] শুধু কইবেন কথা— অন্যে রবে নিরুত্তর। মনোপলিতে আড্ডা জমেনা—শুধু সলিলোকিতে যেমন জমেনা নাটক।"[৫৯]

আড্ডায় বানিয়ে গল্প বলায় জুড়ি ছিলনা শরৎচন্দ্রের। খুব মজা পেতেন যখন দেখতেন আড্ডার মানুষগুলি তাঁর সাজানো কথাকে সত্যি ধরে নিয়ে কখনো রাগে, কখনো দুঃখে অস্থির, কখনো ভয়ে আতঙ্কিত। শরৎচন্দ্র সেসব মিটিমিটি উপভোগ করতেন। তাতে তাঁর কাছের মানুষেরা আদৌ খুশি ছিলেন না। তেমন একটি ঘটনার কথা লিখেছেন রাধারানী দেবী। একবার নিজের কলকাতার বাড়ির বৈঠকখানায় সমবেত জনকয়েক ভদ্রলোককে শরৎচন্দ্র একটি খুনের ঘটনা শুনিয়েছিলেন—বর্মায় মত্ত অবস্থায় মিস্ত্রিদের ঝগড়া, তারপর কুড়ুল দিয়ে একজনকে খুন করা। খুন হওয়ার পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত শরৎচন্দ্র কাঁটাতারের বেড়া টপকে ছেঁড়া জামাকাপড়ে রক্তাক্ত হাতে পায়ে দৌড়ে পালিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মুখে রক্তহিমকরা খুনের বর্ণনা শুনে শ্রোতারা স্তম্ভিত। "আড়ষ্ট হয়ে শুকনো মুখে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে উঠে দাঁড়ালেন একে একে সকলে। যত ভাল লেখকই হননা, ঐ রকম পরিবেশের মানুষ যিনি, আর ঐ গল্প ভদ্রসমাজে বিস্তৃত

বর্ণনা স্বচ্ছন্দে করতে যাঁর রুচিতে বাধে না, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গ-সাহচর্যের জন্য তাঁদের তখন আগ্রহ উবে যাওয়া আশ্চর্য নয়। পাড়ার দু-একজন ভদ্রলোকও এটা-ওটা ছুতো ক'রে উঠে পড়লেন। গল্পটি রোমহর্ষক হলেও বিস্ফোরকও ছিল। সভ্য ভব্য গৃহস্থের পক্ষে একটি খুনে ডাকাতের [সঙ্গীর] সাহচর্যটা খুব স্বস্তিজনক নয়।" বলা বাহুল্য উক্ত ভদ্রলোকদের প্রতিক্রিয়া শরৎচন্দ্র অট্টহাস্যে উপভোগ করেছেন। কয়েকদিন পরে জানা গিয়েছিল খুনের সময় আদৌ শরৎচন্দ্র হাজির ছিলেন না। অন্যের মুখে শোনা ঘটনাকে নিজের মুখে চালিয়েছেন। নিজেকে খুনেব মিথ্যা সাক্ষী ক'রে তোলার এই শবৎচন্দ্রীয় প্রয়াস রাধারানী ভালোভাবে নেননি। তাঁর "চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" [৬০]

শরৎচন্দ্রের আরেক অনুগামী দিলীপকুমার রায়ও দুঃখ পেয়েছেন শরৎচন্দ্রের বানিয়ে গল্প বলার ফল দেখে। দিলীপকুমার লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের...অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো।...এ ভঙ্গি হলো ফরাসী—প্রকৃতিতে : এর নাম 'ব্লেগ' : অর্থাৎ কিনা নিপুণ ভঙ্গিতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করিনা। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনেনা, তারা স্বতই ওঠে চটে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এই জন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমার বাজত—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুশি হতেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।" ('প্রণাম', দিলীপকুমার রায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৩৪)।

॥ ৬ ॥

'আমার ছেলে...আমার ভেলু'

শরৎচন্দ্রের অস্তিত্বের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর কুকুর ভেলু বা ভেলি। শরৎচন্দ্রের পত্রে এবং বিভিন্ন স্মৃতিকথায় ভেলুর উল্লেখ দেখেছি। এও জেনেছি ভেলুর রূপে-গুণে শরৎচন্দ্র যত মুগ্ধ ছিলেন, তাঁর আত্মীয়-পরিজন অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তত আতঙ্কিত। অভ্যাগতদের ভেলু কেবল দাঁত খিঁচোত না, দাঁত বেঁধাতও।

ভেলুর পোশাকী নাম বংশীবদন। রেঙ্গুনে মাত্র আট আনা পয়সায় তাকে কেনার পরের দিন শরৎচন্দ্র দু'শ টাকার মনিঅর্ডার পেয়েছিলেন।[৬১] আর্থিক অনটনগ্রস্ত শরৎচন্দ্রের কাছে ভেলু সেদিন থেকে সৌভাগ্যের চিহ্ন এবং পুত্রস্নেহে পালিত। ভেলুর অস্তিত্বের সঙ্গে তিনি নিজের অস্তিত্ব জড়িয়ে নিয়েছিলেন :

"সে [ভেলু] যে কতখানি, তা আমি ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারিনে।...ভেলি আমার নেই...একথা মনে আনতে ভয় করে।...বহুদিন থেকে সে আমার নিঃসঙ্গের সাথী —প্রবাসের বন্ধু।" ('ভেলি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। যে দুঃখ অন্য মানুষের কাছে চিরদিন গোপন ক'রে রাখতে হয়, শরৎচন্দ্র তাও হালকা করেছেন ভেলুর কাছে। "জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, তার অনেক সময় ভেলু আমার লঘু ক'রে দিয়েছে।" (ঐ)। শরৎচন্দ্রের কোন্ দুঃখ ভেলু লাঘব করেছে, তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণী শান্তি দেবী প্লেগ

রোগে পরলোক গমনের পর শরৎচন্দ্রের মর্মান্তিক যন্ত্রণা বুঝেছিল ভেলু। মানুষ এবং পশুর অনুভূতি সেদিন একসূত্রে গাঁথা—"বারাণ্ডার এক পার্শ্বে শরৎচন্দ্রের প্রিয় কুকুর 'ভেলো' সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া মাথা গুঁজিয়া অসাড়ের মতো শুইয়াছিল, অন্ধকারে ইহার চোখ দুটি নক্ষত্রের মতো জ্বলিতেছিল। এতক্ষণে এই জন্তুটিকে শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন। ভেলো শরৎচন্দ্রকে দেখিয়া অস্বাভাবিক ক্রন্দন করিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এই জন্তুটিও কি তাঁহার এই সর্বনাশে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে? কোন ইন্দ্রিয় দিয়া এই অবোধ জীব তাঁহার অন্তরের ভাষা বুঝিতে পারিল?" ৬২ শরৎচন্দ্র এমনও ভেবেছেন ভেলুর সঙ্গগুণে তাঁর অনুধাবনশক্তি পর্যন্ত বেড়ে গেছে : "ভেলির কাছ থেকে অনেক পেয়েছি...অনেক শিখেছি! তাকে জানতে বুঝতে যে কষ্ট স্বীকার করেছি—তাতে আমার মনের অন্যকে বোঝার শক্তিটা খুলে গেছে, বেড়ে গেছে...।" ('ভেলি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। দেখা যাচ্ছে, স্নেহ নিম্নগামী হয়ই।

স্নেহান্ধ পিতা যেমন পুত্রের বজ্জাতিকে স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের চোখে দেখেন, ভেলু যখন অকারণে অপরকে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দিত, শরৎচন্দ্র তেমনি একই মনোভাব দেখিয়েছেন। দেখেছো, কী মিষ্টিটা দুষ্টুটা। অপরে কিন্তু তা ভাবতে রাজি ছিলেন না। এঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও আছেন : "শরৎ ছাড়া আর কাহাকেও তাহার গুণে মুগ্ধ হইতে বড় দেখি নাই। ঐ কুকুরটি ছিল বাড়ির লোকের, পাড়ার লোকের এবং শরতের বন্ধু-বান্ধবদের দুই চক্ষের বিষ।" (ঐ)। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, মেজাজ তিরিক্ষে হলে ভেলু তার মনিবকেও রেয়াত করত না—

"তার [ভেলুর] সবচেয়ে বড় শখ ছিল, যে-কোনো মানুষকে আদর ক'রে কামড়ে দেওয়া। তার এই বিপদজনক সখের জন্য শরৎচন্দ্রের নামে আদালতে নালিশ হয়েছে, তবু ভেলুর বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলনা। একদিন সে তার মনিবেরই করতল কামড়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিয়েছিল। পরদিন ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে শরৎচন্দ্র এসে বললেন, 'আহা, আমাকে কামড়ে দিয়ে ভেলুর যে কি দুঃখ আর লজ্জা হয়েছিল, তার চোখ-মুখ দেখলেই তোমরা বেশ বুঝতে পারতে!' এই ভেলু ঘরে ঢুকলেই সুধীর সরকার ['মৌচাক' পত্রিকার সম্পাদক এবং পুস্তক প্রকাশক] হন্তদন্ত হয়ে প্রাণপণে একটি লাফ মেরে একেবারে টেবিলের উপরে আরোহণ করতেন এবং সেই সারমেয়নন্দনকে সেখান থেকে অপসারিত না করা পর্যন্ত তিনি আর ভূমিষ্ঠ হবার নাম মুখেও আনতেন না।" ৬৩

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখা আদায়ের জন্য সম্পাদক জলধর সেন প্রায়ই তাঁর শিবপুরের বাড়িতে হাজির হয়ে ভেলুর সগর্জন সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। তিনি মনে করেছিলেন লেখা না দিয়ে সম্পাদককে ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রের পক্ষে ভেলুর এই স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে জলধর সেন ভেলুর শ্রাদ্ধ করতে দেরি করেন নি :

"শরৎচন্দ্রের একটি কুকুর ছিল—তিনি বিলাতী নহেন, খাঁটি দেশী।...কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার, আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র। যে-কেউ শরৎচন্দ্রের

শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনিই জানেন যে, অভ্যাগতকে কি বিপুল গর্জনে ভেলু অভ্যর্থনা করত, শরৎ-দর্শন-প্রার্থীবৃন্দ ভেলুর এই সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থে দশ হাত পিছিয়ে পড়তেন।" [৬৪]

'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ভেলুর সঙ্গে তাঁর 'শুভদৃষ্টি'র রোমাঞ্চকর বিবরণ দিয়েছেন :

"দরজার কড়া নাড়তেই তিনি [শরৎচন্দ্র] একখানি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হাতে ক'রে এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি প্রণাম করতে যাচ্ছি অমনি একটি কুকুর ঘেউ শব্দ ক'রে আমার দিকে ছুটে এলো। আমি পাঁচ হাত দূরে সরে গেলুম। আমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে কিছু সাহস সংগ্রহ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, কুকুরটা কামড়াবে না তো? তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, কামড়েছে কি? মনে মনে বললুম, কামড়ালেই বা আপনি করবেন কি?" ('শরৎ-প্রসঙ্গ', অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'বাতায়ন', 'শরৎস্মৃতি সংখ্যা', ২৮ জানুআরি, ১৯৩৮)।

নিরুপমা-ভ্রাতা এবং ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ সাহিত্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টের অভিজ্ঞতাও অবিনাশচন্দ্রের থেকে পৃথক কিছু ছিলনা :

"আমি এবং আমার একটি পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত উভয়ে যখন দুয়ার ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন একটা বিশ্রী কালো কুকুর আমাদের যে অভ্যর্থনা করিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনো মনে হয় যে Agoraphobia-গ্রস্ত মানুষের উপযুক্ত দারোয়ানই তিনি দ্বারে স্থাপন করিয়াছিলেন। Hydrophobia-র ভয় দেখাইয়া তিনি বোধহয় নিজের জন্য একটু বিশ্রামের অবসর করিয়া লইতে পরিয়াছিলেন।" ('আমার শরৎদা', বিভূতিভূষণ ভট্ট', 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

ভেলুর রকমসকম রীতিমতো রাজকীয়। তিনি চাকরদের সেবা গ্রহণ করতেন না। মনিব শরৎচন্দ্রকেই সে ভার নিতে হয়েছিল। ভেলুর জন্য একটি ছোট তক্তপোষ ছিল। তাতে কার্পেট পাতা থাকত এবং তাকিয়াও ছিল। শীতকালে হতো গরম বিছানার ব্যবস্থা। [৬৫] ভেলুর আদরযত্নের আতিশয্যের উল্লেখ হেমেন্দ্রকুমার করেছেন : "ভেলুর জন্যে হোটেল থেকে আসত ঘিয়ে ভাজা মটন চপ ও কাটলেট প্রভৃতি। প্রেমাঙ্কুর [আতর্থী] একদিন শরৎচন্দ্রের অসাক্ষাতে অভিযোগ করলেন, 'শরৎবাবুর ব্যবহারটা দেখ একবার! একটা লেড়ি কুকুরের জন্যে আসছে ভালো ভালো খাবার, আর আমরা এতগুলো ভদ্রলোক যে এখানে উপস্থিত আছি, সেটা ওঁর খেয়ালেই আসেনা'।" [৬৬]

শরৎচন্দ্র আক্ষরিক অর্থে বিগলিত ছিলেন 'আমার ছেলে...ভেলু'র প্রতি। সেকথা স্মরণ ক'রে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "[ভেলু] বহুমূল্য কার্পেট খণ্ড খণ্ড করিলে তখন তাহার দাম হইত, 'ও কিছু না।' নূতন বই-এর পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িলে ভেলির সাহিত্য-বৈরাগ্যের কথা মনে করিয়া রাজা শুদ্ধোধনের মতো শরতের চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিত। তাহার চরণ-চুম্বনে ফাউন্টেন পেনের নিবটি লাঙ্গলের ফলার আকার ধারণ করিলে শরৎ খুশি হইয়া দেখিতেন, তাহলে ওর গায়ে সত্যিই একটু গত্তি লেগেছে। ভেলির

কুৎসিত লেজটির নিন্দা করিলে শরতের সংসার-বৈরাগ্য ঘটিত—লেজের জন্য ওকি দায়ী?" ('ভেলি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

ভেলুকে "শুদ্ধ-সাত্ত্বিক ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী দেখিতে বড় সাধ ছিল" শরৎচন্দ্রের। সেই ভেলুর বৃদ্ধ বয়সের অসংযমী আচরণের জন্য তিনি বড় লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। ভেলুব দোষস্খালনের জন্য তাঁর চেষ্টার কমতি ছিলনা। ভেলুর শেষ বয়সের সঙ্গিনী টেপি। "টেপির গায়ে বোধহয় বিলাতী কুকুরের রক্ত ছিল। তাহার ক্ষিপ্রতা, চাঞ্চল্য এবং স্ফূর্তির কাছে ভেলিকে আশি বছরের বৃদ্ধ দেখাইত। মনে হইত জীবনের সাধ-আহ্লাদ শেষ করিয়া সে পরব্রহ্মের চিন্তায় নিযুক্ত!...অবশেষে কেমন করিয়া নবীনতার মোহ ভেলিকেও ধরিল!...দেখিলাম বৃদ্ধের আর অবসর নাই ; সেও টেপির পিছনে পিছনে—উপরে যায় নীচে আসে, বাহিরের ঘরের জানালায় বসিয়া পথের লোককে অকারণে ধমক দিয়া চমকাইয়া দেয়।...সে বছর বড়দিনের ছুটিতে গিয়া দেখি, সেই দুরন্ত শীতে টেপি সন্তান প্রসব করিয়াছে। তাহার লজ্জা, নির্লজ্জ বৃদ্ধের [ভেলুর] একটুও নাই! বেতালা লোকে বলে, এই বুড়োর বাচ্চা হলো, আশ্চর্য!

"কথা-সাহিত্যকুশল শরৎচন্দ্র বলেন, না না ওব নয়—মুখে অপ্রস্তুতের হাসি!

"নয় তো কি মশাই, ওই কান ওই রং ; বলেন কি আপনি? ভারি আশ্চর্য তো?

"শরতের মনে মনে রাগ হয়—বোধহয় উভয়ের উপরেই!—বলেন, ঠিক জানি মশাই ঠিক জানি—ওই ওদের বাড়ির কুকুরের।" (ঐ)।

ভেলুর মৃত্যু শরৎচন্দ্রের জীবনের সমস্ত রং মুছে দিয়েছিল। সেই গভীর মর্মযাতনার কথা তিনি চিঠিতে লিখে গেছেন। যিনি 'সুপারস্টিশানে' বিশ্বাস করেন না বলে মনে করেন, সেই তাঁকেও অসুস্থ ভেলু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রাস্তার ধারে 'একটা মৃতপ্রায় বাছুর', 'একটা জবাইকরা মোরগ', 'একপাল শকুনি আর একটা মৃত কুকুর' দেখে আতঙ্কিত হতে হয়েছিল। তাহলে কি ভেলু আর নেই? এর কয়েকদিন পরে ভেলুর মৃত্যু। তারপর শরৎচন্দ্র যে-চিঠি লিখেছিলেন, সেখানে নিবিড় বেদনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল চরম আত্মব্যঙ্গ। সাহিত্যের সামগ্রী সেই অংশ :

"ভেলু বেঁচে নেই।...সাত দিন সাত রাত খাইনি ঘুমুইনি—তবু পরের বৃহস্পতিবার ভোর ছটার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

"বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেলনা ; কিন্তু রাগের উপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থামল।

"আমার ২৪ ঘন্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে, তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগল —তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা। তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিলনা। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি।

"...ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু-বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করাতে, অর্থাৎ

পাগলা কুকুর কামড়ানোর পবে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চলবে। ২৮টা ইঞ্জেকশান-এর আজ ১০টা ইঞ্জেকশান হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচাতেই হবে—কারণ, ইওর লাইফ ইজ ট্যু ভালুএবল!" [৬৭]

॥ ৭ ॥

চা-পান, জ্যোতিষ, দাবা খেলা, শিকার, হোমিওপ্যাথি, বিয়ের ঘটকালী

নানা বিষযে শরৎচন্দ্রেব আকর্ষণেব অল্পস্বল্প পরিচয দেব। ধরা যাক চা-পানের কথা। চা-স্পৃহায় সদা চঞ্চল শরৎচন্দ্র দিনে আট-দশবার চা খেতেন। বন্ধুমহলে 'রীতিমতো চা-খোর' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। [৬৮] তাই নয়, উৎসাহের সঙ্গে অন্যদের চা-ধরাতেও চেষ্টা করতেন। বর্মায় থাকাকালে বোটাটং-পোজানডং পল্লীর কোনো কোনো মানুষকে চায়ের লোভ দেখিযে তাঁর ছবি আঁকার ঘরে বসিয়ে রেখেছেন, এমন উল্লেখ পেয়েছি। [৬৯] বর্মায় এই নেশাটির খুব চল ছিল। "এখানে এক-একটা চায়ের দোকান দু-তিন হাজার টাকা দামেও বিক্রি হয়। এ দ্বাবা স্পষ্ট অনুমান করতে পারেন, এদেশে চা-এর প্রচলন কিরূপ।" [৭০]

লেখক-খ্যাতির পরোয়া না ক'রে শরৎচন্দ্র যত্রতত্র চা-সেবন করতে বসে যেতেন—ইউরোপীয হোটেল বা সাধাবণ চা-এর দোকানের মধ্যে কোনো বাছবিচার ছিলনা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চা-এর দোকান প্যারাডাইসে তাঁকে চা-সেবন কবতে দেখা গেছে। [৭১] আবার দেখা যায়, নিজের মোটরগাড়ির ড্রাইভারকে খরচে ইউরোপীয়ান হোটেলে একই টেবিলে বসিয়ে শরৎচন্দ্র চা খাওয়াচ্ছেন, নিজেও খাচ্ছেন। কাছাকাছি বাঙালি হোটেলে কম পয়সায় চা পাওয়া গেলেও মানবিক বোধসম্পন্ন এই মানুষটির পক্ষে চা-তৃষ্ণাকাতর ড্রাইভারকে সেখানে পাঠাবার প্রবৃত্তি ছিলনা। [৭২]

রেঙ্গুনে থাকার সময় চা-এর ব্যবসাও শরৎচন্দ্র করেছেন। ১৯১২-র মার্চে রেঙ্গুন থেকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি, 'দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য' একশো টাকা মাইনের চাকরির সঙ্গে একটা 'ছোট চায়ের দোকানও' তাঁকে চালাতে হয়। [৭৩] চা-তত্ত্ব সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র মহাজ্ঞানী। বন্ধুদের সবিস্তারে চা-প্রস্তুত প্রণালী বুঝিয়েছেন। ব্যবসায় বিষয়েও জ্ঞানদান করেছেন—এক টিন দুধে কত চিনি মেশাতে হবে, তাতে কত পেয়ালা চা হবে ; সকালবেলা দুধের টিন কিনে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা তিনি হিসাব বুঝে পয়সা গুণে নেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। [৭৪] এত জ্ঞানের চোটে চা-এর দোকান নির্ঘাত শূন্য মার্গে প্রস্থান করেছিল, যদিও সেই পরিণতির কথা শরৎচন্দ্রের কোনো চিঠিতে পাওয়া যায়নি।

জ্যোতিষের সত্যতায় শরৎচন্দ্রের কতখানি আস্থা ছিল বলা শক্ত, তবে জ্যোতিষগণনায় আগ্রহী। ১৯২০ সালে তিনি নিজের পরিচয় গোপন ক'রে কোষ্ঠীবিচার করতে গিয়েছিলেন :

"এখানে [কাশীতে] ভৃগুসংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন—তিনি তো

আমার কোষ্ঠী গুণে নিজেও হাঁ ক'রে রয়ে গেলেন, আমিও হাঁ ক'রে রয়ে গেলুম। আমার অতীত জীবন (যা আজও কেউ জানেনা) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন যে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল! আবার ভবিষ্যৎ জীবন আরো বিভীষণ। তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন, এ কোনো মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোনো ব্যক্তির [জন্ম] কুণ্ডলী!...[জ্যোতিষী] লোকটার ভারি পশার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়েই পড়লেন—পারিশ্রমিক তো নিলেনই না—বারম্বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—ইনি কে এবং কোথায় আছেন! ধর্মস্থানে বৃহস্পতির এত বড় পবিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি!...আয়ু কিন্তু ৪৮-এ কিম্বা বড় জোর ৫৬। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে মৃত্যু আর বললেন না—উচ্চারণ করতেই পারলেন না। বলতে লাগলেন—এঁর যদি ৪৮-এ মোক্ষ না হয় তো তারপরে সংসার ত্যাগ করে ৫৬-তে দেহত্যাগ করবেন!!!" [৭৫]

পরের ঘটনা ১৯৩১-এ কলকাতার একটি ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার (যিনি একইসঙ্গে জ্যোতিষচর্চা করেন) শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে তাঁর 'রাশিচক্র' এবং 'হাতের রেখার একটা ছাপ' নিয়ে তৎক্ষণাৎ গণনায় লেগে পড়লেন। ফলাফল গিয়েছিল 'ধার্মিক শরৎচন্দ্রের' অনুকূলে :

"[জ্যোতিষী-ক্যাশিয়ার] বললেন, এক বছরের মধ্যে আপনি অন্য পথ নেবেন। জিজ্ঞেস করলাম, অন্য পথ মানে? বললেন, স্পিরিচুয়াল। আমি জবাব দিলাম—কুষ্ঠির ফল ও-রকম আছে, সেকথা আমাকে কাশীর ভৃগুবালারাও বলেছিল, কিন্তু আমি নিজে কানাকড়ি বিশ্বেস করিনে। কারণ আধ্যাত্মিকতার 'আ' আমার মধ্যে নেই। বললেন, এক বছর পরে যদি আবার দেখা হয় তখন এর উত্তর দেব। আমি বললাম, এক বছর পরেও ঠিক এই কথাই আমার মুখ থেকে শুনবেন। তিনি শুধু ঘাড় নাড়লেন। তাঁর বিশ্বাস কুষ্ঠীর ফলাফল গুণতে জানলে মিথ্যে হয়না।" [৭৬]

দাবা খেলায় মত্ত শরৎচন্দ্রের ছবি দেখেছি অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়। সামতাবেড়ের বাড়িতে বসে উৎসাহে দাবার চাল দিয়ে 'কিস্তি' মাত করেছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু লেখক-শরৎচন্দ্রের ভক্ত অসমঞ্জ দাবাড়ু-শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একেবারেই অনাগ্রহী। সুতরাং শরৎচন্দ্র দাবা খেলতে লাগলেন, আর গম্ভীর বদনে অসমঞ্জ রূপনারায়ণের রূপদর্শন করতে লাগলেন। "ইচ্ছা করেই [দাবা] শিখিনি, [অসমঞ্জ লিখেছেন] কারণ যে-খেলাতে, খেলোয়াড়-বাপকে এসে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে—'আপনার ছেলেকে সাপে কামড়েছে, শিগ্‌গির যান', এবং বাপ বোড়ের চাল দিতে দিতে অন্যমনস্কভাবে বলছেন —'কাদের সাপ?'...ও-খেলায় আমার মোটেই উৎসাহ নেই।" [৭৭]

অসমঞ্জ বোধহয় খেয়াল করেন নি, সাহিত্যের কথাচিত্রে দাবার অবিস্মরণীয় রূপ শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসেই আছে। কাশীবাসী বৃদ্ধ-দাবাড়ু কৈলাসচন্দ্রের ছবি গভীর মমতায় শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। কাশী ছেড়ে চলে যাবার সময় সরযুর ছেলে বিশ্বেশ্বরের হাতে কৈলাসচন্দ্র তাঁর দাবার ছকের লাল মন্ত্রী তুলে দিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে অসুস্থ কৈলাসচন্দ্রের চোখের সামনে মৃত্যুর ঘন কুয়াশা নেমে এসেছিল, "এ বিশ্বের দাবাখেলায়

কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট তাহাই যেন কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে।...বৃদ্ধের চক্ষু [তখন] কপালে উঠিয়াছে, শুধু ওষ্ঠাধর তখনো যেন কাঁপিয়া কহিতেছে, বিশ্বেশ্বর! মন্ত্রী-হারা হয়ে আর কতক্ষণ খেলা যায়, দে ভাই, দে।"

মনুষ্যজীবনে স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্ব না থাকলে জীবন রসহীন হয়ে যায়। দ্বন্দ্ব জীবনের বিস্তারের লক্ষণ। স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্বের অনেক দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনে আছে। যৌবনে তিনি বন্দুক হাতে বন্ধুদের সঙ্গে শিকারে গিয়েছেন—অথচ তিনি আবার রীতিমতো পশুপ্রেমিক। আমরা জেনেছি "শিকারের বাই এক সময়ে শরৎচন্দ্রের প্রায় ব্যায়রামের মতো ছিল ; আজো, তাঁর বন্দুকের উপর প্রীতি দেখিলে হাসি পায়।...ছোরা-ছুরি, দা-ভোজালে, এইসব বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রের একটি মিউজিয়েম করিতে পারিলে বোধকরি তাঁর মনস্কামনা পুরে।" ('ভেলি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। সামতাবেড়ে থাকার সময় চোরডাকাতের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তাঁর বন্দুক ছিল। বন্দুক দিয়ে বিশাল গোখরো সাপকে কিভাবে শরৎচন্দ্র মেরেছেন, তার বিবরণ নিজেই দিয়েছেন অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে : "শরৎচন্দ্র বন্দুকে টোটা পুরে, [প্রতিবেশীর ঘরের] সেই ফাটলের মুখে, বন্দুকের নলটা রেখে, দিলেন ঘোড়া টিপে—দুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে তাজা রক্ত ফাটলের মুখে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন বাইরের যত লোক সব ভিড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকল।...সেই মরা সাপকে তখন খুঁচিয়ে টেনে বার করা হলো—ইয়া প্রকাণ্ড এক গোখরো।" [১৮] পাখি-শিকারী শরৎচন্দ্রের ছবিও পাওয়া গেছে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। "সেদিন কয়েকজন মিলিয়া গঙ্গার চরে পাখি-শিকার করিতে যাওয়া হয়। তার কিছুদিন পূর্বে শরৎ একটি ডক গন (Duck gun) কিনিয়াছিলেন, সেটি তাঁর হাতে। মাথার উপর দিয়া একজোড়া চকা-চকী উড়িয়া যাইতেছিল। শরতের অব্যর্থ সন্ধানে তাহাদের একটি মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে মরিল।" ('ভেলি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

শরৎচন্দ্র শিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেন—তার দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। প্রথমটি লিখেছেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টি গোপালচন্দ্র রায়। সুরেন্দ্রনাথের মতে গঙ্গায় পাখি-শিকারের পর "বাড়ি ফিরিয়া অনুরূপ একটি দুর্ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। হাঁসটির মৃত্যুর মর্মভেদী দৃশ্য যেন আমরা সঙ্গে করিয়া বহিয়া আনিলাম, এমনি অপরাধের কথা গভীর সন্তাপের সহিত আমরা সেদিন যেন অনুভব করি। শরতের শিকারি হাত দুইখানি সেদিন হইতেই বোধকরি এই কর্মে বীতরাগ হইয়া গেছে ; জীবহত্যার জন্য আর কিছুতেই তাহা উদ্যত হইতে চায়না।" ('ভেলি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

পাখি-শিকারে গিয়ে একবার প্রায় মানুষ-শিকার ক'রে ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্র এবং সেটাই তাঁর শিকার ছেড়ে দেবার মূল কারণ—এই দাবী গোপালচন্দ্র রায়ের। দিদি অনিলাদেবীর কয়েকজন ভাসুরপুত্রকে নিয়ে রূপনারায়ণের বুকে নৌকায় ভেসেছিলেন শরৎচন্দ্র। হাতে বন্দুক ছিল, আকাশে পাখিও। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি সেদিন অনিলাদেবীর সেজ দেওরের বড় ছেলে ব্রজদুর্লভের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছিল। হতচকিত শরৎচন্দ্র

বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন : "আজ তোকেও [ব্রজদুর্লভকে] মেরেছিলাম, আর আমিও মরতাম। তোকে মেরে, মরা দেহ নিয়ে গিয়ে তোর মা-কে তো আব দিতে পারতাম না। তাই তোর মৃত্যুর পরে আমাকেও এই বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করতে হতো। পাখি শিকার আমার এই পর্যন্তই শেষ। জীবনে আর এ নাম মুখে আনব না।" [১১ক]

হোমিওপ্যাথি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাসের জগতের অন্তর্গত। রীতিমতো চিকিৎসকের ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তার সূত্রপাত বর্মা থেকে। বোটাটিং-পোজানডং পল্লীতে শরৎচন্দ্রের দরিদ্র প্রতিবেশীরা অর্থাভাবে অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসা করাতে পারত না। শরৎচন্দ্র তাই বই পড়ে হোমিওপ্যাথি শিখে দাতব্য চিকিৎসা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। তেমন একটি ঘটনার বিবরণ শোনা গেছে শরৎচন্দ্রের মুখে : "আমি রেঙ্গুনে এক সময়ে যেখানটায় থাকতুম, সেটা তোমাদের মতে ভদ্র পল্লী না। একদিন একটা স্ত্রীলোক এসে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরলে। সে বলতে লাগল, দা-ঠাকুর তুমি না গেলে আমার মিনসে কিছুতেই বাঁচবে না—তুমি তাকে দেখে একটু ওষুধ দেবে চলো। ব্যাপারটা সব শুনে আমি গেলুম। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল, আমি সবটুকুই প্রয়োগ করলুম, কিন্তু লোকটা শেষ পর্যন্ত বাঁচল না।" [১১খ]

কলকাতায় আসার পরেও তিনি হোমিও-চিকিৎসা ছেড়ে দেননি। নিজ পরিবার, বন্ধুগোষ্ঠী, সামতাবেড় গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা তখন তাঁর রোগী। শরৎচন্দ্রকে চিকিৎসকেব ভূমিকায় পেয়েছি তাঁরই লেখা কয়েকটি চিঠির সূত্রে। যেমন, ২৪/১১/১৯-এ লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছেন, দিদি অনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়ির গ্রামের গরীব মানুষদের ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসার জন্য তিনি 'ওষুধের বাক্স নিয়ে' গেছেন। ১২ শ্রাবণ ১৩৩৩-এ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছেন, "এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্বাঙ্গে টিনচার আইওডিন মাখিয়ে *আরনিকা* খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ-সেকের বন্দোবস্ত ক'রে ফিরেছি।" এমন কি নিজের চিকিৎসার জন্যও তাঁকে হোমিওপ্যাথি খেতে দেখা গেছে : "অর্শের রক্ত আমার যখন কিছুতেই থামছিল না, তখন সুরেনের প্রেসক্রিপশন বায়োকেমিক For Phos 6x এবং Cal. flour 6x দিনে ৫/৬ বার খেতে দিন তিনেকের জন্যে রক্ত বন্ধ হয়েছিল। প্রায় ৬ মাস পরে আবার দিন ৪/৫ পূর্বে রক্তপড়া শুরু হয়েছে, আবার সেই ওষুধই খাচ্ছি।" [১১গ]

হোমিও-চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে শরৎচন্দ্রের গভীর আগ্রহের উল্লেখ করেছেন তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "শরৎ হোমিওপ্যাথি পড়িতে আরম্ভ করে ও অনেক টাকার বই কিনিয়া গভীরভাবে অধ্যয়ন করে।" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৪৫)। রাধারানী দেবী দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়তে দেখেছেন। মাঝে মাঝে এও তাঁকে বলতে শুনেছেন, "রাত্রিবেলায় নাকি তাঁর চিকিৎসার বই পড়ার সময়। তখন গোলমাল কানে আসেনা, মন একাগ্র হয়।" রোগের লক্ষণ এবং উপসর্গের নাম লেখা ছোট একটি ডায়েরী শরৎচন্দ্রের ছিল। তাছাড়া "ছোট ছোট কাগজের স্লিপেও রোগের লক্ষণ, রোগীর নাম

ও বিভিন্ন ওষুধের নাম লেখা দেখেছি।" রাধারানীকে হোমিও-চিকিৎসায় আগ্রহী ক'রে তোলায় শরৎচন্দ্র উৎসুক ছিলেন। রাধারানীর প্রবল জ্বরের সময় শরৎচন্দ্র নিজে মহেশ ভট্টাচার্যের দোকানে গিয়ে "একটি ছোট ওষুধের বাক্স কিনে এনে আমার ঘরে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে একখানি গৃহচিকিৎসা বই। বইখানি হারিয়ে গেছে, ওষুধের বাক্সটি এখনো আমার কাছে রয়েছে। হারানো গৃহচিকিৎসা বইখানির পিছনের পাতায় তাঁর হাতে লেখা অনেকগুলি ওষুধের নাম ও চিকিৎসার নির্দেশ ভায়োলেট রঙের কালিতে লেখা ছিল। তাতে লিখে দিয়েছিলেন—ভোরে দাঁত মাজার পূর্বে পরিষ্কার জলে কুলকুচি ক'রে ওষুধ খাবে—তার বেশ কিছুক্ষণ পরে দাঁত মাজবে। টুথপেস্টে বা টুথ-পাউডারে দাঁত মেজে ওষুধ খাবেনা।" [৮০] রাধারানী অবশ্য কবুল করেন নি শরৎচন্দ্রের হোমিও-চিকিৎসা তাঁর ধাতে সয়েছিল কিনা।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ও হোমিওপ্যাথির প্রতি শরৎচন্দ্রের এই প্রবল শ্রদ্ধার সাক্ষী। শরৎচন্দ্রকে তিনি বলতে শুনেছেন : "হোমিওপ্যাথি হলো আসল শাস্ত্র, অ্যালোপ্যাথিতে রোগ সারে না কি?" অসমঞ্জ অবশ্য সামতাবেড়ে তাঁর স্বল্পকালীন স্থিতিকালে হোমি-চিকিৎসকের ভূমিকায় শরৎচন্দ্রকে দেখেন নি, বরং এই চিকিৎসা পদ্ধতির পক্ষে জনৈক চিকিৎসকের বক্তব্য শরৎচন্দ্রকে শুনতে দেখেছেন। [৮১]

পরাধীন দেশে রাজনীতির বাইরে যাওয়া সম্ভবপর নয় কোনো মানুষের পক্ষে। দরিদ্রের প্রাণদাতা হোমিওপ্যাথি, আবিষ্কারক জার্মান হ্যানিম্যান। সেই চিকিৎসা শোষণরিক্ত ভারতবাসীর পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য, কারণ তা ব্যয়বহুল নয়। ইংরেজ সরকার যেখানে মুখের অন্ন টেনে নিচ্ছে ভারতবাসীর; সেখানে করবে খরচসাপেক্ষ অ্যালোপ্যাথির ব্যবস্থা! শরৎচন্দ্র তা জানতেন। তাঁর হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ও তার প্রয়োগের কারণও এখানে মেলে। [৮২]

উপন্যাসে প্রেমিক-প্রেমিকার বিচ্ছেদ দেখিয়ে শরৎচন্দ্র যতই পাঠকের চোখের জল ঝরান, বাস্তব জীবনে বিয়ে-শাদির জন্য 'ঘটকালী' করা তাঁর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় এক্ষেত্রে তাঁর শাগরেদ। "দুটি ভাল ছেলে-মেয়েকে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে দিতে পারলে শরৎচন্দ্রও আনন্দ পেতেন, আমিও পেতাম।" [৮৩] ঘটক-শরৎচন্দ্রের সাফল্য নিতান্ত কম নয়। দুর্গা নাম্নী একটি বালবিধবার বিয়ে দিয়ে স্বামীসহ ঐ মেয়েটিকে নিজের সামতাবেড়ের বাড়িতে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর বালবিধবা রাধারানী দেবীর বিবাহের পিছনে শরৎচন্দ্রের শুভইচ্ছা ও উদ্যোগ কী পরিমাণে ছিল, তা স্বয়ং রাধারানী মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

"আমাদের বিবাহেও শরৎদার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ওঁর কাছে সাহস আর উৎসাহ না পেলে আমি কোনোদিনই হয়তো মনস্থির করতে পারতুম না। আমাদের বিয়েতে অনেকটাই তাই শরৎদার কৃতিত্ব ছিল বলতে পারি।...আমাদের বিয়ে শরৎদার মনে পরম তৃপ্তি দিয়েছিল আমি জানি।...যেন তাঁর নিজের মেয়ের জীবনের নিরুপায় নিষ্ফলতা দূর ক'রে তাকে তিনি সাফল্যে উত্তীর্ণ করেছেন, এমনিই একটি বিজয়ীসুলভ ভাব তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত।" [৮৪]

বালবিধবার বিবাহের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র এতখানি আগ্রহী কেন, মনস্বিনী রাধারানী তার কারণসন্ধান করেছেন। যে-তিনি ব্যক্তিজীবনে বালবিধবা নিরুপমা দেবীকে বিবাহ করতে পারেন নি, কিংবা নিরুপমা দেবীর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর সাহিত্যে কখনো বালবিধবার বিবাহ দিতে পারেন নি, অথচ বালবিধবার অচরিতার্থ, অসম্পূর্ণ এবং নানাভাবে নিপীড়িত জীবন যাঁকে নানাভাবে দেখতে হয়েছে, সেই তিনি হয়তো ব্যক্তিজীবনে কয়েকটি বালবিধবার বিবাহ দিয়ে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

ঘটক শরৎচন্দ্রকে একবার অন্তত পশ্চাদ্‌অপসরণ করতে হয়েছিল। বিবাহে অনিচ্ছুক এক পাত্রের 'ভীষ্ম'-প্রতিজ্ঞাকে তিনি টলাতে পারেন নি। পাত্রটি তাঁর একান্ত স্নেহভাজন—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উমাপ্রসাদকে বিবাহে রাজি করাতে শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' থেকে কোটেশন পর্যন্ত চিঠির মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন :

"অপূর্বর দাদা রাগ ক'রে এসে বললেন, মা, যা করবার ক'রে ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলো, নইলে আমার তো প্রাণ যায়। রাঙা মাকাল ফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না।

"অনেকদিনের কথা। এর নিহিতার্থ তুমি বুঝবে বলে ভরসা করিনে। বোঝাবার ভার পড়েছে আমার উপর। তাঁদের [পাত্রীপক্ষদের] কথা দিয়েছি এ চিঠির জবাব পেলেই বিজুকে গিয়ে বোঝাবো। অতএব শীঘ্র উত্তর দেবে।"

এই চিঠি লেখার ফল—শূন্য। উমাপ্রসাদ ফিরতি চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে লিখলেন :

"আপনার যে-কোনো অনুরোধ হোক না কেন, রাখতে না পারলে মনে সত্যই ব্যথা পাই। তাই একান্ত আশা করি সে-ব্যথা দেবার অবকাশ যেন না কখনো আপনি নিজের হাতে টেনে আনেন।

"বোঝাবার ভার আপনি নিয়েছেন। নিতান্ত প্রয়োজন যদি মনেই করেন তো বোঝাবার চেষ্টা কববেন। আমি শান্ত হয়ে শুনব, কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা আমি করতে পারব না।"

পরাজিত শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঘটকের স্বেচ্ছাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লিখেছেন :

"এসব জিনিস আমার কাছে রুচিকর নয় এইটুকুই বলতে পারি।" [৮৫ক]

॥ ৮ ॥

ব্যঙ্গে শাণিত, রঙ্গে কোমল

শরৎচন্দ্রকে দুভাবেই আমরা পেয়েছি—কখনো তীব্র ব্যঙ্গ কখনো স্নিগ্ধ কৌতুক। নিজেই সেকথা বলেছেন : "আমি বিদ্রূপ করিলে কিরূপ করি তা জানই।" [৮৫খ] তখন তিনি খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ফুঁসে উঠতেন। আবার আত্মব্যঙ্গও কম ছিলনা।

বয়োজ্যেষ্ঠ জলধর সেন তাঁর বিচিত্র আচরণ, বধিরতা ইত্যাদির কারণে শরৎচন্দ্রের কৌতুকের লক্ষ্য হয়েছেন। এককালে জলধর সেন সাহিত্যের নামী মানুষ ছিলেন—প্রচুর সজল উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে তিনি 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিকপত্রের সম্পাদক। সমাজে প্রতিপত্তিশালী। মানুষটি স্বার্থ বুঝতেন, আবার ভোলাভালা ধরনেরও ছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিতেন এবং স্বচ্ছন্দে অঘটন ঘটাতেন। অঘটনঘটনপটিয়সী তাঁর সৃষ্টি-নমুনার নিদর্শন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সহাস্য বাহ্‌বা ছিল। জলধর সেনের 'অভাগী' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের স্বঘরের বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ সৃষ্টি করেছিল। হিরণ্ময়ী দেবী 'অভাগী' পড়ে ফোঁস্‌-ফোঁস ক'রে কেঁদে স্বামীর কাছে অনুযোগ করে বলেছেন—

"কি যে ছাইপাঁশ তুমি লেখো—এমন একখানিও যদি লিখতে পারতে!"

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সবিনয়ে পরাজয় স্বীকার ক'রে বললেন, না তেমনটি তিনি পারেন না। পারবেন কি ক'রে যখন জানলেন অভাগীর প্রচণ্ড 'সতীত্বের তেজে'র কথা। কাশীর দারোগা, কনস্টেবল, বাড়িওলা, পাণ্ডা, সন্ন্যাসী সবাই একে একে ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে হার মেনেছে। পুরো হারলে গৃহিণীর কাছে মান থাকেনা। শরৎচন্দ্র বললেন :

"কেউ যে কিছু করতে পারবে না সে আমিও জানতাম, তবু তর্কে হারবার ভয়ে বললাম, বই তো এখনো শেষ হয়নি, এরই মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হয়োনা। কাশীর বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং বাকি। তিনি চেষ্টা করলে ঠেকানো শক্ত। তখনকার মতো মান থাকল বটে, কিন্তু পড়া সাঙ্গ হবার পরে যে তা আর থাকবে না এও জানতাম। থাকেও নি।" [৮৬]

কখনো কখনো ব্যঙ্গ রঙ্গ একত্রে। অলৌকিকতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সবিশেষ সন্দিহান। পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সম্পর্কে যেটুকু খবর তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে তাঁর মনে হয়েছিল ওখানে ওসব বিষয়ের ভালোই চর্চা চলে। সুতরাং ঠাট্টা ক'রে স্নেহভাজন দিলীপকুমার রায়কে পণ্ডিচেরী থেকে 'বিভূতি' শিখে আসার জন্য বলেছেন :

"বারীন [বারীন্দ্রকুমার ঘোষ] শুনেছি যে-কোনো গাছের পাতা নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে-কোনো ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুজ্যে বলে এটা সে [বারীন] কর্তার [শ্রীঅরবিন্দ] কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিনকতক তার 'আন্দামানের বাঁশী'র খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং এ-বই এতদিন যে পড়োনি, এই ব'লে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হ'লেই 'বিভূতি'টা হস্তগত ক'রে নিতে পারবে।...অনিলবরণ শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি ক'রে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকেনা বটে, কিন্তু ৫/৭ ঘণ্টা চিনির মতো দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা করো। ...অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালমানুষ—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ ক'রে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাবতে হবেনা—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে।" [৮৭]

"অনিলবরণের চিনি করতে পারার খবরটা নিশ্চয় দিও। পারলে জাভা চিনি তো অত্যন্ত সহজেই বয়কট করা যেতে পারবে। সে তো দেশেরই একটা মহৎ কাজ।" [৮৮]

দিলীপকুমার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অরবিন্দ আশ্রমে যোগ দেন। অমন একটা প্রতিভাবান গুণী ছেলের নিভৃত ধর্মচর্চাকে শরৎচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি। ঠাট্টাতামাশার সঙ্গে সস্নেহ সতর্কবাণীও ছিল :

"তোমার নামে তো ওয়ারেন্ট ছিলনা সাধু হতে গেলে? ব্যস, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চ'লে আসবে।...আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে [পণ্ডিচেরী] বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী...দের পিঠের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। এ বাঙালির পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চ'লে এসো। কবে আসচো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইস্টিসানে যাবো।...সন্ন্যাসী হওয়া ভাবি খারাপ মন্টু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই।" ৮৯

সত্যকার রসিক মানুষের মতো শরৎচন্দ্র আত্মব্যঙ্গ করতেনই। সেইসঙ্গে থাকত আত্মদংশনও। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারের মালিক ম্যাডান সাহেব শরৎচন্দ্রের কোনো বই চলচ্চিত্রায়নের জন্য বেশ কিছু টাকা অগ্রিম হিসাবে এবং বাকি ভবিষ্যতে দেবার জন্য চুক্তি কবেছিলেন। এই ঔদার্যে 'চোখে জল' নিয়ে শরৎচন্দ্র ভেবেছেন 'অন্যের মর্জি ও খোশ-খেয়ালের উপর' তিনি এখন নির্ভবশীল :

"একটা জরুবী শর্ত তিনি বোধকবি তাড়াতাড়িব জন্যেই ক'রে নিতে ভুলে গেছেন। গ্রন্থকারকে [চুক্তিব] এই পনেরো বৎসরে একবার সকালে ও একবার বিকালে গিয়ে কুর্নিশ ক'বে আসতে হবে।...শুধু একখানা বইয়ের জন্য ও টাকা ঢের বেশি। সুতরাং [চুক্তির] মধ্যে এই 'ক্লজটুকু' ঢুকিয়ে নিলে দেখতে শুনতে সব দিকেই বেশটি হবে।" ৯০

এই আত্মদংশনের তীব্রতার পরিমাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাধারানী দেবীর নিম্নের মন্তব্যকে পটভূমিতে রাখলে :

"সেই অদ্ভুত খেয়ালী, জেদী মানুষটিকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার সাধ্য কারো ছিলনা। প্রকাশক আর সম্পাদক সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁব মন জুগিয়ে চলতেন। 'ভারতবর্ষে' ধাবাবাহিক লেখা অসমাপ্ত পড়ে আছে—অথচ 'বিচিত্রা'য় 'বসুমতী'তে নতুন উপন্যাস ধরেছেন। অভিযোগ করলে জবাব দেন—আমার কলম 'কল' নয়। কলের মতন দম দিলেই তর্‌তব ক'রে চলতে পারেনা। যখন যেটা কলমে আসে—সেটা লিখি—যেটা আসতে চায়না—জোর ক'রে লিখিনে। লিখতে পারিনে। একটা অলিখিত নিয়ম ছিল তাঁর —তাঁরই মর্জির উপর নির্ভর ক'রে চলতে হবে সম্পাদককে আর প্রকাশককে—না যদি পোষায়, কারবার তুলে দিতে পারেন—তাতে আপত্তি নেই।" ৯১

এহেন উঁচু-মাথা শরৎচন্দ্রকেও মাথা নামাতে হয়েছিল ম্যাডান সাহেবের টাকার থলির কাছে। সে যন্ত্রণা শরৎচন্দ্র ভুলতে পারেন নি।

ব্যঙ্গ-বিচ্ছিন্ন কৌতুকের প্রবণতা শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট ছিল। পাড়াগাঁয়ে বাস করতে গেলে যে বর্ষাকালে চতুষ্পদ হওয়া প্রয়োজন তা রীতিমতো জেনেছেন :

"আচ্ছা জায়গাতেই [সামতাবেড়] এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায় খুর গজায়—তাতেই দিব্যি খট্‌খট্ ক'রে হেঁটে চলে—পিছলকে ভয় করেনা। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরো দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়।" ৯২

প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ-শিষ্য মতিলাল রায় ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতেন, কিন্তু মেজাজটাকে নিরামিষ করতে পারেন নি। 'সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী'র প্রতি শরৎচন্দ্রের নিবেদন :

"ভগবৎস্থানে প্রার্থনা করি, আপনার চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী নিদারুণ ক্রোধ যেন অন্তত তেইশ ঘণ্টায় দাঁড়ায়।...হে ঈশ্বর, তুমি মতিবাবুর মেজাজটা একটু মোলায়েম ক'রে দাও।" ১৩

শরৎচন্দ্রের সৎপরামর্শে মতিলালের মেজাজ কিছু ঠাণ্ডা হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে অন্য একটি চিঠিতে দেখা গেছে মতিলাল রায় অথবা প্রবর্তক সংঘের একটা অনুরোধ না রাখায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। দুঃখে বা ছদ্মদুঃখে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "প্রবর্তক সংঘ এ বছর আমাকে অক্ষয় তৃতীয়ায় আর ডাকলে না। তারা অনুরোধ করেছিল ['শেষ প্রশ্ন'] বইয়ের মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ স্পষ্ট দেখা গেল পেরে উঠিনি।" ১৪

শরীর মন্দিরম্...ব্যাধি মন্দিরম

সাহিত্যসাধনা শরৎচন্দ্রের ধর্মসাধনা। শরীর সুস্থ থাকা তার জন্য আবশ্যিক। জীবনের নানা ঘটে ও ঘাটে জলপানের জন্য, অনেক সময়েই বিষাক্ত জল, শরৎচন্দ্রেব শরীর প্রায়ই প্রতিবাদ করত, এমন কি বিদ্রোহও। এসব নিয়ে শরৎচন্দ্র কাঁদবেন না হাসবেন?—কেঁদেছেন অবশ্যই, আবার হেসেছেনও। সে হাসির কিছু নমুনা হাজির করা যাক।

রসিকতার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না। নিজেকে নিয়ে যেমন, স্ত্রী হিরণ্ময়ীকে নিয়েও কৌতুক তাঁর। একটি কসের দাঁত দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যন্ত্রণার সময়ে দাঁতটিকে একটু নড়িয়ে বেশ 'আরাম' পেতেন। হিরণ্ময়ীর পরামর্শে একদিন 'ঘণ্টাখানেক' 'খুব ক'রে' নড়িয়ে ভেতরের 'বদ রক্ত' বের ক'রে দেবার চেষ্টায় লেগে পড়লেন। ফল হাতে হাতে।

"[পরদিন] সকালবেলা উঠে দেখি আর হাঁ করতে পারি নে। তারপরে সে কি যন্ত্রণা!! সে দিনরাত যে কি ক'রে গেল তা শুধু ভগবানই জানেন।

"পরদিন 'ডেন্টিস্ট'-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, উপড়ে ফেলে দিতে হবে। উনিও [হিরণ্ময়ী] সঙ্গে গিয়েছিলেন, বললেন, ওরে বাপ্‌রে! একটি দাঁত তুললে সবকটি দু-দিনে ঝুর ঝুর ক'রে পড়ে যাবে এবং বেশ একটু 'সায়েন্টিফিক' ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে, দাঁতে দাঁতে ঠেকে আছে—অসময়ে তুললেই আর রক্ষে থাকবে না। সাত পাঁচ ভেবে চলে আসা গেল, তারপর জ্বর।...আর সহ্য হলো না, তার পরদিন তুলে এলাম।" ১৫

হিরণ্ময়ী দেবীর 'সায়েন্টিফিক নির্বুদ্ধিতা'র বিবরণ দিয়েই এ কাহিনী শেষ করেন নি শরৎচন্দ্র, যোগ করেছিলেন 'হাতুড়ে' ডেন্টিস্ট-এর অকর্মণ্যতার কথাও—

"সে যা 'ডেন্টিস্ট'! প্রথমে সে নড়া দাঁতের পাশে একটা ভাল দাঁত ধরে প্রায়

আধ-ওপড়ানো-গোছ ক'রে তুলেছিল। যত বলি ওটা না, ওটা না, সায়েব থামো থামো —সে ততই ব'লে সবুর করো আর একটু টানি। তখন তার সাঁড়াশি হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে তবে দাঁতটা রক্ষা করি। তারপর নড়া দাঁত ওপড়ানো হলো। ওপড়ানো তো হলো —কিন্তু রক্ত থামেনা। 'ডেন্টিস্ট' বললেন—বাবু, তোমার দাঁত বড় খারাপ।...তুই শালা তুলতে জানিস নে—রক্তপড়ার দোষ হলো আমার দাঁতের!" [১৬]

কানে কাঠি দিয়ে কান চুলকানোর মতো আরামদায়ক ব্যাপার উপভোগ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের বিপত্তি ঘটে—সাময়িক বধিরতা। এই বধিরতা তাঁর পক্ষে যতই ক্ষতিকর হোক, মজবুতরকম বধির 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেনের পক্ষে সুবিধার কারণ হয়েছিল। তাহলে আমিই বা কেন এই বধিরতা নিয়ে জলধরদাদার সঙ্গে সম্পাদকপদের প্রতিযোগিতায় নামতে পারব না—সকৌতুকে তিনি পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছেন :

"১৫/২০ দিন পূর্বে কানে কাঠি দিয়ে আর শুনতে পাইনে।...এমন সুন্দর হয়েছে যে পিছনে কামান দাগলেও চমকাইনে। আমার সম্পূর্ণ আশা হয় যে, শ্রীযুক্ত জলধরদাদাকে এবার আপনি [হরিদাস চট্টোপাধ্যায়] বিদায় দিয়ে আমাকে ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুক্ত করলে আপনাদের ট্র্যাডিশনের কোনো প্রকার অমর্যাদা হবেনা।... [বধিরতার] বিষয়ে আমার যোগ্যতা যেন বিস্মৃত হবেন না।" [১৭ক]

জলধরদাদা শরৎচন্দ্রের আরো একটি কৌতুকের লক্ষ্য : "এবার দার্জিলিং থেকে আসার পরে তাঁর কানের এতটা উন্নতি হয়েছে যে, বলশালী লোকেও [তাঁর সঙ্গে] দু-চারটে কথার পরে হাঁপিয়ে ওঠে।" [১৭খ]

ইঞ্জেকশনে শরীরে ব্যথা হয়, বিশেষত অস্থানে ইঞ্জেকশন ফোটালে কী বিপত্তি ঘটে তা রসিয়ে লিখেছেন শরৎচন্দ্র :

"কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন ইঞ্জেকশন দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে ভর দিয়ে মানুষ বেশ সুস্থ হয়ে বসে ঠিক সেই জায়গায়। উঃ কি এর ব্যথা! নুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি।" [১৮]

'শ্রীঅর্শ' শরৎচন্দ্রের লেখায় সন্ত্রাস্ত। 'শ্রীঅর্শের ভয়ংকর রক্তপাতে' কাবু হয়ে টোটকা ওষুধের আশ্রয় নিয়েছেন। তাতে যখন কাজ হয়নি তখন খুব রেগে ইংরেজি শব্দবাণ ছুঁড়েছেন : "অ্যাবসলিউটলি ফেলড্। ফেলড্ ইগনোমিনিয়াসলি!" ফেল করার ফল? "রক্তধারা বোধকরি নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়।" [১৯]

শ্রীঅর্শ শরৎচন্দ্রের সরস প্রশ্রয় পেয়েছিল। আহা, ও থাকনা, তোমরা ডাক্তাররা ওকে তাড়াতে চাইলে বেচারী যায় কোথায় বলো দেখি, ইত্যাদি। "এতদিন আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে যে ওকে আশ্রয়হীন করাও কঠিন। কিন্তু কুমুদ (ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়) ওর পরম শত্রু। সে বলে, ওকে তাড়াতেই হবে। একথা ওকে [শ্রীঅর্শকে] আর জানতেই দিইনে। জানলে ভয়ে ও এমনি সংকুচিত হয়ে উঠবে যে, প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত ক'রে

তুলবে। একেই তো ওকে খুশি করতে দিনে ঘণ্টা কয়েক আমার কাটে, এর ওপর ও যদি অভিমান করে, তাহলে বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা কি হবে!" ('ব্যাধি ও মুক্তি', অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৮)।

শেষ অসুখের সময় ইঞ্জেকশনের ফোঁড়াফুঁড়ি এবং নানা পরীক্ষার যাতনায় অস্থির শরৎচন্দ্র সবিস্তারে বলেছেন তাঁর দুরবস্থার কথা। তার মধ্যেও হাসি ঢুকে পড়েছে। সেই 'চিকিৎসা-সঙ্কট' কালে পরশুরামের নন্দবাবুর মতো শরৎচন্দ্রকেও নানা দিক থেকে টানাটানি।

"নানা মতামতের ঘাতপ্রতিঘাতে আমার অবস্থা শোকাবহ। এইমাত্র টেলিফোনে খবর এলো আজ রাতে আর একজন ডাক্তার আসবেন, নতুন ধরনে পেচ্ছাপ একজামিন হবে। তারপরে বোধকরি আমার চোখের জলের পরীক্ষা হবে। কাল দুপুরে একটা Emetine injection হয়ে গেছে, আজ দ্বিতীয় প্রস্থ Calcium injection হবে। ইতিপূর্বে দুই দফায় বারোটা কুইনিন ফোঁড়া হয়ে গেছে। সর্বদেহে আর স্থান নেই, এইবার বোধহয়, তারা চোখে ফুঁড়বে। এরপর শুভার্থীরা আছেন, কেউ বলছেন, ঐ যমদূত ব্যাটাদেব দূর ক'রে দিয়ে কোবরেজ ডাকুন, সে বাঁচাবে। কেউ বলছেন, ওরা কিছুই জানেনা—তার বদলে ভবানীপুরের সাহা ডাক্তারকে ডেকে পাঠান, তিনি ছোট্ট দুটি globules দেবেন, তাতেই সাতদিনে সমস্ত আরাম হবে। পরশু বসুমতীর সতীশ মুখুজ্জে এসেছিলেন, তিনি বললেন, দাদা, আসলে আপনার হয়েছে ন্যাবা। আমি এক গাছা মালা এনে দেব, গলায় পরবেন। রোগ যেমন যেমন ভালো হবে, মালা লম্বা হতে হতে পা পর্যন্ত গিয়ে আপনি ছিঁড়ে পড়ে যাবে। স্থান পরিবর্তন তো অনেকে উপদেশ দিচ্ছেন।...অথচ ভারি শীতকাতুরে লোক আমি, দেওঘরের কনকনে বাতাস মনে পড়লে যাবার উৎসাহ নেবে zero ডিগ্রিতে এসে দাঁড়ায়।...৬১ বছর বয়সটা তো উপেক্ষা করবার নয়, তাকে সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় মেনে নেওয়াই এখন বুদ্ধির কাজ। 'শেষের সেদিন মন, করো রে স্মরণ' ইত্যাদি —চোখ বুজে ভক্তি ভরে আবৃত্তি ক'রে চুপ ক'রে থাকাই ভালো। তাতে অন্তত এই শীর্ণ দেহটা দিন কয়েকের বিশ্রাম পাবে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে মনে মনে জপ করব, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্য সাথী ৯৯° জ্বর! তোমাকে বিচলিত করার বৃথা চেষ্টা আর আমি করব না, কিন্তু তুমি দয়া ক'রে একটু চটপট তোমার কাজটা সেরে ফেলো।" [১০০]

পরশুরামের 'চিকিৎসা-সঙ্কটে'র মিলনান্ত পরিণতি ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র কিন্তু 'নন্দরানী'র আলিঙ্গনের পরিবর্তে শ্যামসমান মৃত্যুর বাহুডোরে বাঁধা পড়েছিলেন।

•

নিজেকে 'বৃদ্ধ' ভাবতে এবং বলতে শরৎচন্দ্র বড়ই ভালবাসতেন। জীবনের মধ্য পর্ব থেকেই তাঁর এই 'বৃদ্ধ'-বিলাসিতা। ১৯১৯-এর শেষার্ধে লেখা চিঠি এবং তারপরেও লেখা চিঠি থেকে আমরা তা পাচ্ছি। এমন কি "একদিন রবীন্দ্রনাথের সামনেই তিনি বৃদ্ধত্বের উপরে এমনি অশোভন দাবি করতে কুণ্ঠিত হননি। ফলে কবির চোখে ফুটে উঠেছিল কৌতুকযুক্ত বিস্ময়।" [১০১ক]

রবীন্দ্রনাথ কেন, কাছে-পিঠের অনেক মানুষের কাছে শরৎচন্দ্র নিজের বৃদ্ধত্ব

জাহির করেছেন। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের থেকে তিনি মাত্র চার বছরের বড় হলেও এমন ভাব করতেন যে, "তিনি যেন আশি বছরের বুড়ো, আর আমি [অসমঞ্জ] যেন ২৫/২৬ বছরের যুবক।" অসমঞ্জের অনুযোগ : "সাধারণের কাছে তাঁর বুড়ো হবার আগ্রহটা, তাঁর অনেক লেখা, বক্তৃতা ও চিঠির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ষাট বছর বয়সে তিনি তাঁর নিজের মনে আশি বছরের বুড়ো হয়ে থাকতে চাইতেন।" [১০১ক] সেইসঙ্গে ছিল নিজেকে কুরূপ প্রতিপন্ন করার মজা। তাঁর ধারণা রেল স্টেশনে তাঁকে যে-কোনো অচেনা লোক অনায়াসে চিনে ফেলবে। কেননা তাঁকে দেখলেই মনে হয় "একজন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বৃদ্ধ মুসলমান।" [১০২] শরৎচন্দ্রের একসময়ে নুর দাড়িও ছিল।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রথম পরিচয়ের ছবিটা দেখে নিতে পারি। 'যমুনা' পত্রিকার কার্যালয়ে হেমেন্দ্রকুমারের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি মানুষ। "নিতান্ত সাধারণ চেহারা। নাতিদীর্ঘ কৃশ দেহ, কালো রং, মাথার চুল এলোমেলো, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, আধময়লা জামা-কাপড়, পায়ে চটি, সঙ্গে একটা লেড়ি কুকুরের বাচ্চা।" ভদ্রলোক জানালেন তিনি 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে দেখা করতে চান। হেমেন্দ্রকুমার গম্ভীর মুখে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে কাজ করতে লাগলেন, ভদ্রলোকের সঙ্গেও লেড়ি কুকুরের খেলা চলতে লাগল। খানিক পরে ফণীন্দ্রনাথ ঘরে প্রবেশ ক'রে শশব্যস্ত হয়ে, "একি, শরৎবাবু যে! ওখানে বেঞ্চের উপরে বসে আছেন কেন?" শরৎচন্দ্র মুখ টিপে হেসে হেমেন্দ্রকুমারকে দেখালেন। অপ্রস্তুত হেমেন্দ্রকুমাব তখন : "কেমন ক'রে চিনব? [চেহারা দেখে] আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী।" [১০৩]

দিলীপকুমার রায়ের অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। গুরুদাস লাইব্রেরিতে সেই 'শুভদৃষ্টি' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "অতি গদ্যময় পরিবেশ...চারিদিকে বই, মাঝখানে ব'সে একটি মানুষ—শ্যামবর্ণ, ছাগলদাড়ি, একহারা—কেবল কী*তীক্ষ্ণ চোখ দুটি, আর কী টিকোলো নাক? সে-সময়ে সত্যিই তাঁর চেহারার মধ্যে সে-জৌলুস একদম ছিলনা—যা পরে ফুটেছিল কলকাতার জলহাওয়ায়।" [১০৪]

একথা ঠিক শরৎচন্দ্র প্রচলিত অর্থে সুদর্শন নন, কিন্তু এমন-কিছু তাঁর চেহারায় ছিল যা শিল্পীর তুলি বা লেখকের কলম নাড়াতে পারে। এখানে দুজনের স্বীকৃতি উপস্থিত করছি, যাঁরা কোনোমতেই শরৎচন্দ্রের রচনায় মুগ্ধ ছিলেন না। প্রথম জন বুদ্ধদেব বসু। ভারতীয় পি.ই.এন. (পোয়েটস ইসেইস্ট নভেলিস্ট) ক্লাবের কলকাতা শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে একটি ভোজসভা আয়োজিত হয়েছিল ধর্মতলা-চৌরঙ্গীর মোড়ে হোটেল ম্যাজেস্টিকে। সেদিন ঐ সভায় শবৎচন্দ্র প্রধান অতিথি। বুদ্ধদেবও আমন্ত্রিত। একটু দেরি ক'রে এলেন শরৎচন্দ্র। তিনি "শুভ্র খদ্দর পরেছেন, তাঁর চুল ধূসরায়মান ও ঈষৎ বিস্রস্ত, মুখের ছাঁদ কৃশ ও দৃষ্টি উজ্জ্বল—যে-আমি যৌবনপ্রাপ্তির পরে তাঁর লেখা আর ভালবাস্‌তে পারিনি, আর সেই কারণে তাঁর কাছেও ঘেঁষিনি কখনো, সেই আমারও তাঁকে দেখে সম্ভ্রম হলো।" [১০৫]

দ্বিতীয় জন অন্নদাশংকর, যিনি শরৎচন্দ্রের লেখার চেহারার বদলে লেখকের চেহারার উপর প্রশস্তি ঢেলে দিয়েছেন। অন্নদাশংকর ট্রেনের কামরায় শরৎচন্দ্রকে দেখেছিলেন : "ভাস্কর্যের মডেল হিসাবে তাঁর [শরৎচন্দ্রের] মুখের কাট অমূল্য। ভালে

প্রতিভার অভ্রান্ত ব্যঞ্জনা। নাসায় আভিজাত্যের নিশান। নয়নে সকরুণ মমতা। মুখের কোনো অংশে কী একটা দুর্বলতার আভাস ছিল, বোধহয় ঠোঁটে। হাবভাব খুবই এলোমেলো,...চুল আলুথালু। কিন্তু বেমানান নয়। বেশভূষা ফিটফাট।...চেহারা শুধু আর্টিস্টের চেহারা নয়, আর্টের বিষয়বস্তু।"[১০৬]

রঙ্গব্যঙ্গের প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যায় নিজ কাব্যবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্রের রসিকতা। কবিতা তিনি বোঝেন এ দাবি কখনো করেন নি।[১০৭] অথচ রাধারানী দেবীর 'লীলাকমল' বইটি যখন তাঁর কাছে এল এবং মতামত জানাবার তাগিদাও, তখন "দুপুর রাত্রে আরাম-কেদারা ছেড়ে অকস্মাৎ উঠে বসেছি এবং কাগজ কলম খুঁজে বার ক'রে নিয়ে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেচি ওপরে যাবার আগে এ চিঠি শেষ করবই।" আমরা কি এরপরে উক্ত কাব্যগ্রন্থ সূত্রে কিছু গভীর কথা পাব? নহে নহে—

"বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকি [এমন কি রাধারানীর পানেও]। নিজে না পারি দু' ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে। একবার বহু চেষ্টায় 'হায়'-এর সঙ্গে 'জলাশয়' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, ও হয়নি।"

না, 'লীলাকমল' কাব্য সম্বন্ধে সত্যই বলার মতো কিছু কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন :

"প্রথম যেদিন তোমার বই এল, বইয়ের মোড়ক খুলতেই মনে হয়েছিল যেন কোনো এক শিক্ষিত, ভদ্র, বড়লোকের ঘরে নিমন্ত্রণে এসেছি। ভিতরে ভোজের ব্যবস্থাটি যে খাসা ও পরিপাটি হবে, একথা মন যেন আপনি আন্দাজ ক'রে নিলে। তাই বটে। যেমন ভাষা তেমনি বাঁধুনি, তেমনি প্রকাশভঙ্গি। নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয়না। তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মতো বেঁধে—সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা, এত বর্ণচ্ছটা, শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য—কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিত্যতা নেই।"[১০৮]

॥ ৯ ॥

আমি ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্র মানবস্বভাব বিচিত্রতরভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যিক হিসাবে যিনি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রভূত সম্মান-শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁর মনের মধ্যেও পোশাকী পণ্ডিতসমাজ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার লোভ ছিল।

বাংলা সাহিত্যের দুই প্রতিভাধর পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র (রবীন্দ্রনাথ অবশ্য যে-কোনো সাহিত্যমানে উত্তুঙ্গ প্রতিভা)—দুজনের কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়পর্ব শেষ হয়নি, শরৎচন্দ্রের হয়েছিল। তবে আর্থিক অনটনে আর এগোতে পারেন নি। সৃষ্টিগরিমায় দুজনে এমন এক অবস্থানে ছিলেন যেখান

থেকে ডিগ্রি ইত্যাদিকে তুচ্ছ করা যায়। তবু দেখা গেছে দুজনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সম্বন্ধে সম্ভ্রমের মনোভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পগুলিতে বেশ খাতিরের সঙ্গে চরিত্রগুলির বিলেতি ডিগ্রির উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্র সামাজিক ভূমিকায় পারিবারিক আভিজাত্যে নিম্নস্তরে থাকতেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সম্বন্ধে ঈষৎ ঈর্ষাযুক্ত মনোভাব দেখা যায়। এইসব পণ্ডিতরা যখন তাঁর সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনা করতেন তখন তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অত্যন্ত তিক্ত। আর যখন অনুরক্ত অধ্যাপক বা পণ্ডিতদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছেন তখন নিজের পুলক গোপন রাখতে পারেন নি। অধ্যাপকী পাণ্ডিত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ইত্যাদি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের মনে এক ধরনের হীনতাবোধ ছিল : "আধুনিক কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালিগালাজ করে, [তখন] সভয়ে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য, কত সামান্য।" [১০৯] শরৎচন্দ্রের মনোভাব সম্বন্ধে কালিদাস রায়ের সাক্ষ্য এইপ্রকার :

"শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উপাধি ছিলনা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের recognition-কে স্পৃহনীয় মনে করতেন। একদিন বলেছিলাম, 'আপনার ডি.লিট. পাওয়া উচিত।' তাতে তিনি বলেছিলেন, 'বোধহয় সাহিত্যসেবার জন্য উপাধি দেওয়ার কোনো প্রথাই নেই। সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে এরা recognize করে।...National University যখন হবে তখন তা দেশের মনীষীদের গৌরব দান করবে। আমি আর তখন থাকব না—তোমরা পাবে'।" [১১০]

রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চাসনে ছিলেন তাতে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডিগ্রি পাওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয় (সে ডিগ্রি আবার অকসফোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁর ভারতীয় আবাসে এসে অর্পণ করেন ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ)। শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. পেয়েছিলেন। ডিগ্রিদানের প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে তিনি লিখেছেন : "শুনলাম কাগজে খবর বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মহা বড়লোকদের সঙ্গে তোমাদের ঢাকা ইউনিভারসিটি আমাকে ডি.লিট. উপাধি দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি আমাকে জানাতে পারো? দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যে সহসা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠবেন এমন কখনো ভাবিনি।" [১১১]

ডিগ্রি নেওয়ার জন্য উৎসাহের সঙ্গে তিনি গাউনও তৈরি করিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র যতবড় লেখকই হোন, সারা দেশ তাঁর লেখা নিয়ে যতই মাতোয়ারা হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডিগ্রিপ্রাপ্তি কিছু লোকের মনে অসূয়া সৃষ্টি না ক'রে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পরে উপাচার্য, ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার শরৎচন্দ্রের ডিগ্রিপ্রাপ্তির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

"বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ড: সুশীলকুমার দে ও শিক্ষক মোহিতলাল মজুমদার কলিকাতায় 'শনিবারের চিঠি'র দলের (অর্থাৎ সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির) বিশেষ বন্ধু ও তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে ডিগ্রি দেওয়া পছন্দ করেন না। শুনিয়াছি তাঁহাদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি.লিট. দেওয়ার উপযুক্ত মনে করে নাই; সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐরূপ ডিগ্রি দিলে তাহার মান খাটো হইবে।" [১১২]

রমেশচন্দ্র সুকৌশলে কার্যোদ্ধার করেছিলেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

এ.এফ. রহমানকে তাঁর দলে টেনে। এজন্য তাঁকে মুসলমান কবি মহম্মদ ইকবালের নামও হিন্দু সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রস্তাব করতে হয়েছিল ডি.লিট. দেওয়ার জন্য। এই ঘটনা বলাই বাহুল্য 'শনিবারের চিঠি' পছন্দ করেনি। ডিগ্রিপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে এই পত্রিকায় ('সংবাদসাহিত্য', 'শনিবারের চিঠি', আষাঢ় ১৩৪৪) লেখা হয়েছিল :

"আমাদের ডক্টর শরৎচন্দ্রের দিন বড় খারাপ যাইতেছে। অথবা, এমনও হইতে পারে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি তাঁহার সহিতেছে না। শরীর ভালো নয়, আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' তাহার প্রমাণ পাইলাম, লেখাও শীর্ণ হইয়া আসিতেছে।"

এই ছদ্ম দুঃখপ্রকাশ নীচতা ও নিষ্ঠুরতার সহাবস্থান।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে—মোহিতলাল মজুমদার সত্যই কি শরৎচন্দ্রের সাম্মানিক ডিগ্রিপ্রাপ্তির বিরোধী ছিলেন? 'শরৎ-পরিচয়' প্রবন্ধে মোহিতলাল লিখেছেন, ঐবারে ঢাকায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আসন্নপ্রকাশ একটি বই শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছেন, সাহিত্যপ্রসঙ্গ বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছিল।

"শরৎচন্দ্রকে শেষ দেখি ঢাকায়, ১৩৪৩ সালে।...আমাকে তিনি ভুলিয়া যান নাই—না ভুলিবার কারণও ছিল। তাই তাঁহার আহ্বানের অপেক্ষা না রাখিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় অতিথি—তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দান ব্যাপার শেষ হইয়াছে, শরীর অসুস্থ বলিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন—ঢাকা ত্যাগ করিবার তারিখ একটু পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে একটু একা পাওয়া অসম্ভব, ভিড় কিছুতেই কমে না। যেদিন কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক তাহার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কথাবার্তার কোনো অবকাশই পাইলাম না—কেবল দেখিলাম নানা জন যাইতেছে ও আসিতেছে, সামাজিকতার দাবি মিটাইতে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।...আমার বড় ইচ্ছা ছিল, প্রকাশিতপ্রায় আমার একখানি বই প্রথম তাঁহার হাতেই উপহার দিই,...জিজ্ঞাসা করিলাম, পরদিন কোন্ সময়ে আসিলে অসুবিধা হইবে না। তিনি অতিশয় আগ্রহ করিয়া আমাকে যে-কোনো সময় আসিতে বলিলেন—যাত্রা-কালের পূর্বে হইলেই চলিবে। পরদিন বেলা ৮টা সাড়ে ৮টার সময়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরখানি জনবিরল ; চারুবাবু সকল দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—সকলেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। আমি বইখানি হাতে দিয়া বসিতেই আলাপ শুরু হইল।"[১১৩]

মোহিতলালের মতো প্রবল আত্মসম্মানী মানুষের পক্ষে শরৎচন্দ্রের ডিগ্রিপ্রাপ্তির বিরোধিতা করার পরে, ডিগ্রিপ্রদান অনুষ্ঠানের অনতিবিলম্বে, শরৎ-সমীপে উপস্থিত হওয়া কি সম্ভব? শরৎচন্দ্রকে ডিগ্রিপ্রদানের অন্যতম বিরোধী ছিলেন মোহিতলাল—রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই 'শোনা কথা' কি তথ্যনির্ভর?

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. চিত্ররসিক শরৎচন্দ্র র‍্যাফেলকে চিত্রকর হিসাবে এমন কিছু উঁচু দরের মনে করেন নি। অন্তরঙ্গ আলাপে যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে এ-বিষয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা র‍্যাফেল-ভক্তদের চটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট: "তোমরা তো র‍্যাফেলের ম্যাডোনা দেখেছ? বাজারে ও-ব্যক্তির খুব নাম হলেও বড় বড় সমালোচকদের কাছে ও থার্ড ক্লাস পেন্টার বলে গণ্য হয়ে আসচে। তিসিয়ানের কাছে ও দাঁড়াতেই পারেনা।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', যোগেন্দ্রনাথ সরকার, মিত্রালয়, কলকাতা-৭০০ ০১২, চৈত্র ১৩৬৫, পৃ. ১০। অতঃপর 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র')। তিসিয়ান অনেক বিবসনা নারী-চিত্র এঁকেছেন, সেজন্যই কি ব্রহ্মপ্রবাস পর্বে জীবনরসিক শরৎচন্দ্রের তিসিয়ান-প্রীতি।

২. ঐ।
শরৎচন্দ্রকে রিয়ালিস্টিক ছবির পক্ষপাতী দেখা গেছে। যোগেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছেন: "ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং-এর চেয়ে হিউম্যান পেন্টিং ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেন্টিং আঁকা যায়না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে তো ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা-তা রং দিয়ে আঁচড় পাড়লেই ছবি হলোনা।" (ঐ)।

৩. শরৎচন্দ্রের শিল্পগুরু বা-থিন কিনা, এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া গেছে। সতীশচন্দ্র দাসের লেখা 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থ উদ্ধার করেছেন গোপালচন্দ্র রায়: "তিনি বর্মাতে বা-থিনের কাছেই চিত্রবিদ্যা শিখিয়া নিজ হাতে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন।" ('শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১)।
আবার যোগেন্দ্রনাথ সরকারের ভাষায় শরৎচন্দ্র স্বশিক্ষিত চিত্রশিল্পী: "ঘরের ভিতরটায় ঢুকিতেই চোখে পড়িল, একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ—কোথাও কোথাও রঙের পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝিতে বাকি রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ শিক্ষার গুরু কে, শরৎদা?' 'এ গুরু আমি নিজে' —বলিয়া বাম হাতের তর্জনী দিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া একটুখানি হাসিলেন।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯)।

৪. ঐ, পৃ. ১৩।

৫. ভিখারীর নাম নারদমুনি কেন হলো—যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সহাস্যে বলেছেন, "এই যেমন ক'রে আমার নাম শরৎ চাটুজ্যে, তোমার নাম যোগীন সরকার হয়েছে, ঠিক এমনি ক'রেই। তাই যদি বা না হলো তো অমন পাকা চুল, দাড়ি, গলায় অমন কাঠের মালা, মুখে হরিনাম, এতেও কি এ বেচারীকে নারদমুনি বলা ভুল হয়!" (ঐ, পৃ. ১১–১২)। শরৎচন্দ্রের কথার ভঙ্গিতে মনে হওয়া সম্ভব, নারদমুনি নামটা তাঁরই দেওয়া।

৬. 'শরৎচন্দ্র', (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৯১।

৭. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৮৮।

৮. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র', (৩য় খণ্ড), পৃ. ৮৭।

৯. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৩।

১০. আমি শিল্পবেত্তা—এই ডমফা যোগেন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বাজান নি। সবিনয়ে জানিয়েছেন, "ছবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যটি কিরূপ করিলে সুন্দর মানাইবে, কোন্ রঙে

ইহার এফেক্ট কিরূপ বাড়িবে, সেই সম্বন্ধে অনেক কথাই [শরৎচন্দ্র] বলিলেন। মোটের উপর আমি তার এক বর্ণও বুঝিলাম না। কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া গেলাম।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯)। যোগেন্দ্রনাথের বিনয় বচনে আস্থা রাখার কোনো কারণ দেখিনা। কেননা চিত্রশিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ তাঁর ছিল বলেই 'উইগুসর ম্যাগাজিনে' "স্যার জন এভারেস্ট মিলে-র [লেখা] বিখ্যাত নিসর্গ-শিল্পী টার্নারের চিত্র-পরিচয়" তিনি পড়েছেন। (ঐ, পৃ. ১০)। 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ির চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে-বর্ণনা তিনি করেছেন তা যেন শিল্পীর কলমে আঁকা ছবি : "বাড়িটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও একলার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষুদ্র গৃহটির সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের প্রান্তসীমায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি পজুন ডাঙের খাড়িটি বেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া উত্তব-পশ্চিম অভিমুখে জনপদের ভিতর প্রবেশ কবিয়াছে। মাঠটিব দৃশ্য কি সুন্দর তখন। যেদিকে তাকাও যেন সোনা গলানো।" (ঐ, পৃ. ৮)। 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থটির প্রকাশক, যোগেন্দ্রনাথের চারুশিল্পের বিষয়ে আকর্ষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "যোগেনবাবুর কলাপ্রীতিই তাঁকে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গজন ক'রে তুলেছিল।" শুধু ছবি নয়, সাহিত্য-সঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর ভালবাসাব কারণে তিনি শরৎচন্দ্রের ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

১১. ঐ, পৃ. ১৩।

১২. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৯১।

১৩. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৬৮।

১৪. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৯১।

১৫. ঐ।

১৬. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৩।

১৭. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৬৯।

১৮. ঐ, পৃ. ৬০।

১৯. ঐ, পৃ. ৬৯।

২০. ঐ, পৃ. ৬৬।

২১. ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬।

২২. ঐ, পৃ. ৬৬।

২৩ক. শরৎচন্দ্রকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের চিঠি, ঐ, 'নিবেদন', পৃষ্ঠা 'র'।

২৩খ. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে শরৎচন্দ্রের চিঠি, ঐ, পৃ. ৬৬।

২৪. ১৯১২-এর ২২ মার্চ প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন—"বছর তিনেক আগে যখন 'হার্ট ডিজিজ'-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া 'অয়েল পেন্টিং' শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি 'অয়েল পেন্টিং' সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।" (ঐ, পৃ. ৯)।

২৫ক. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ২।

২৫খ. অমল হোমকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৯১।

২৫গ. সঙ্গীতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ যে শরৎচন্দ্রকে বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি, তা জানিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী : "গানবাজনাও [স্কুলে পড়ার সময়] এই বয়সেই

শরৎচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল ; গ্রামের ভিতরে গানবাজনার নিয়মিত চর্চার সুযোগ ছিলনা বলিয়া একবার তিনি বাটী হইতে পলায়ন করিয়া এক যাত্রার দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা হয়।" ('দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র', দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪।

২৬. শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনবাসের প্রথম পর্বের ছবি এঁকেছেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার। একটি সর্বরিক্ত মানুষ সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে কিভাবে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন, তার পরিচয় দিতে গিয়ে গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রেঙ্গুনের উদীয়মান উকিল এবং শরৎচন্দ্রের আত্মীয় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ হলে তাঁর সেবার ভার নিয়েছিলেন গিরীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। "শরৎচন্দ্র দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন...তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যূষে আপন মনে কত কি আবৃত্তি করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। ঐ আবৃত্তি ও গানের অধিকাংশই ছিল কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে।" গিরীন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবে লিখেছেন, ঐকালে শরৎচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব, অর্থবল ইত্যাদি কিছুই ছিলনা। "সম্বল ছিল মাত্র ভাবপ্রবণ দরদী হৃদয়খানি ও সুমধুর কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর প্রথম আকৃষ্ট করে আমাকে।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ২-৩)।

২৭. ঐ, পৃ. ১১-১৪।

২৮. নবীনচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র কি গান গেয়েছিলেন, তাতে নিয়ে পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া গেছে। গিরীন্দ্রনাথ যে-গানটি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, তার কিয়দংশ এইরকম : "ব্রহ্মভূমি সুশোভিত বঙ্গ রতনে আজি হে। এস কবিবর এস হে/ধন্য করো ব্রহ্মদেশ হে।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৬)। গানের ভাষা শুনে বোঝা যায় এ গান নবীনচন্দ্রের সংবর্ধনা উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত। অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "একবার রেঙ্গুনবাসী বাঙালিরা মিলিয়া স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রকে এই শহরে অভ্যর্থনা করেন। সেই অভ্যর্থনা সভায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ২)।

২৯. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ২।

৩০. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৭-৮।

৩১. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩-৫।

৩২. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৮৮। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতসত্তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও এখানে দিয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার। অবশ্য শরৎচন্দ্রের সেই রূপের পুরোটাই তিনি নিজের চোখে দেখেন নি, অন্যের মুখে শুনেছিলেনও : "তিনি সঙ্গীতচর্চাও করেছিলেন অল্পবিস্তর। বাঁশী বাজাতে পারতেন, আর পারতেন তবলা বাজাতে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মুখে জানতে পারি, যৌবনেই শরৎচন্দ্র গায়করূপেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রেঙ্গুনে অজ্ঞাতবাস করবার সময়েও গান তিনি ত্যাগ করেন নি। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একবার রেঙ্গুনে বেড়াতে যান। তাঁর সংবর্ধনা সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে খুশি হয়ে কবি তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'রেঙ্গুন-রত্ন'।" (ঐ)

৩৩. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩১৯।

৩৪. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ৯৪।

৩৫. ঐ।

৩৬. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪২।
৩৭. ঐ, পৃ. ৪৬।
৩৮. কুমুদিনীকান্ত করকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২০১।
৩৯. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪১-৪২।
৪০. এ-বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "টিফিনের ছুটি মাত্র অর্ধ ঘণ্টা। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের অফিসের উপরওয়ালারা কোনোকালেই তেমন কড়া ছিলেন না বলিয়া আমরাও অনায়াসে এই সনাতন নীতিটি লঙ্ঘন করিয়া চলিতাম।...চায়ের দোকানে বসিত আমাদের সাহিত্যের বৈঠক। শরৎবাবু শুকদেব ঋষির মতন সদুপদেশপূর্ণ অনেক কথাই বলিয়া যাইতেন, আর আমি কেবল কান পাতিয়া তাহা শুনিয়া যাইতাম।...[শরৎবাবুর লেখার] বেশির ভাগ পড়া এবং আলোচনা হয় এই চায়ের দোকানে। কোনো কোনোদিন টিফিনের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া এতই বিলম্ব হইত যে অফিসে ঢুকিতে লজ্জা হইত। আমাদের সিংহলবাসী পক্ককেশ বৃদ্ধ সুপারিন্টেনডেণ্ট সাহেব একটুখানি হাসিয়া বলিয়া উঠিতেন, 'ও আই সি বোথ অফ ইউ হ্যাভ রিটার্নড় অ্যাট লেট!' এই মন্তব্যের আঘাতে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতাম।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৭১-৭২)।
৪১. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৫১।
৪২. ঐ, পৃ. ৪৬।
৪৩. ঐ, পৃ. ৪২।
৪৪. ঐ, পৃ. ৫১।
৪৫. ঐ, পৃ. ৩৮। সম্পাদনাকার্যে শরৎচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ফুটে বেরিয়েছে আরো একটি চিঠিতে—২৪ মে ১৯১৩-এ প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা সেই চিঠি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা সম্বন্ধে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের অল্প পূর্বে ভাবী সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পরলোকগমন করেন। পত্রিকার পক্ষে চরম বিপদের এই দিনে শরৎচন্দ্র ঐ পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত প্রমথনাথকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন—কলকাতায় থাকলে পত্রিকার জন্য তিনি কি কি করতে পারতেন তা জানিয়ে : "কোনো নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটাই 'এডিট' করিয়া দু-এক মাস চালাইয়া দিতে পারিতাম। আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারিনা, তাছাড়া সব রকমই পারি, এবং যেটা সম্পাদকের প্রধান কাজ, 'সমালোচনা' (অপর কাগজের লেখার উপর) সেটাও আমার বেশ আসে!" (ঐ, পৃ. ৩৯)। শরৎচন্দ্র অবশ্য সে যাত্রায় প্রমথনাথকে খোলসা ক'রে বলেন নি, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার দপ্তরে চাকুরিপ্রার্থী হয়ে তিনি ঐ কথা লিখেছেন কিনা। তবে ইঙ্গিত যে ছিল, এটা মনে করা যেতে পারে।
৪৬. শরৎচন্দ্র পা-ফোলা এবং ডিসপেপসিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে তিনি নিজেই চিঠিতে লিখেছেন : "এ শুনি বর্মা দেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোনোদিন এও ছাড়ে না।...ভয় হয়, হয়তো বা চির জীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব। এই সম্ভাবনা মনে করিতেও যেন পারিনা। যাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া, আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং ডিসপেপসিয়াও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হইবার কথাও বটে। কারণ, খাও দাও, স্নান করো, লেখাপড়া করো, কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। অথচ গোদ নয়—কি যে ডাক্তারেরা

তাহাও বলিতে পারেনা—কতদিনে সারিবে কিংবা সারিবে কিনা এ খবরও তাঁরা দিতে পারেন না।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪)।

এই করুণ শারীরিক অবস্থায় শরৎচন্দ্র যে বর্মা ছাড়ার কথা ভেবেছেন, তা হরিদাসকে লেখা তাঁর আরেকটি চিঠিতে দেখা যায় : "আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করিনা।" (ঐ, পৃ. ১৪৬)। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বর্মা ছাড়তে ব্যাকুল হয়েছিলেন বলেই শরৎচন্দ্রের পক্ষে ঐকথা লেখা সম্ভব হয়েছিল।

৪৭. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩২০।

৪৮. যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "[অফিসের] সেকশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থেকে শুরু কবিয়া বড় সুপারিটেণ্ডেণ্ট মেজর বার্নার্ড, এমনকি শেষটায় সেকশনের ইনচার্জ অফিসার পর্যন্ত চ্যাটার্জির প্রতি বিরক্ত হইয়া গেলেন। চ্যাটার্জিও ক্রমশ এমন বেপরোয়া হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে, ব্যাপারটা একদিন চরমে উঠিল। দুই পক্ষে লাগিল ঠোকাঠুকি। বাকযুদ্ধে জয়ী হইলেও শরৎচন্দ্র মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১০৩)।

৪৯ক. শারীরিক অসুস্থতা এবং উপরওলার সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে শরৎচন্দ্র চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন—এই দুই কারণের পক্ষে গোপালচন্দ্র রায় একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। যেমন, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস 'শরৎপ্রতিভা' গ্রন্থে লিখেছেন : "১৯১৬ ইংরাজি ফেব্রুআবি মাসে শরৎদার শরীর ভাঙিয়া পড়ে। এবার তিনি আব অপেক্ষা না করিয়া এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে কাজে ইস্তফা দিয়া বাঙ্গালার শরৎচন্দ্র বাঙ্গালায় ফিরিয়া চলিলেন।" "হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলাম শরৎদার সঙ্গে অফিসের সুপারিটেণ্ডেণ্ট সাহেবের কি গোলমাল হইয়া গিয়াছে। শরৎদার কিছুদিন হইতে কাজকর্মের উপর মন বসিতে ছিলনা। অফিসের কাজকর্ম দ্বারা তিনি ধরা পড়িলেন। উপরস্থ কর্মচারীর হাতে এমন-কি তাঁর ডিপার্টমেন্টের সুপারিটেণ্ডেণ্ট কাগজপত্র তালাস করিয়া দেখিয়া শরৎদাকে দুচারটা কথাও বলিয়াছিলেন।...উভয়ের মধ্যে বচসা চলিতে চলিতে মারামারিও হইয়াছিল।"

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার শরৎচন্দ্রকে নিজে এ-বিষয়ে বলতে শুনেছিলেন : "একদিন অফিসে পৌঁছিতে সামান্য বিলম্ব হইলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সুপারিটেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে কয়েকটি কঠিন কথা শুনাইয়া দেয়। হয়তো তাহার মন্তব্য কিছু রূঢ় হইয়া থাকিবে, সুতরাং শরৎচন্দ্রও তাহাকে অনুরূপ মন্তব্যে অভিনন্দিত করেন। শেষে কথা ছাড়িয়া উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং তাঁহার ও সুপারিটেণ্ডেণ্টের বক্ষদেশ রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠে।" ('শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-১৫০)।

কেন শরৎচন্দ্র চাকুরি ছেড়েছিলেন—তার পক্ষে ঐ সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

৪৯খ. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২২১।

৫০. হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক শরৎচন্দ্রকে বর্মা ত্যাগে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন হরিদাসপুত্র সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের ভূমিকার কথাও বলেছেন—"প্রমথবাবুরই সহায়তায় আমার পিতার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল শরৎচন্দ্রকে বর্মা মুলুক হইতে এদেশে স্থায়ীভাবে ফিরাইয়া আনা। প্রমথবাবুই বাবাকে পরামর্শ দিয়া শরৎচন্দ্রের জাহাজভাড়া এবং দেনা শোধের ব্যবস্থা করান।...শরৎচন্দ্রকে বরাবর ১২০ টাকা হিসাবে সংসার খরচ দিবার পাকাপাকি লিখিত প্রতিশ্রুতি পাঠাইবার পরে—শরৎচন্দ্র বর্মামুলুকের চাকুরি ছাড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।" ('শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৫১. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১০০।
৫২. 'শরৎ-পরিচয়', মোহিতলাল মজুমদার, 'সাহিত্য-বিতান', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ১০৩।
৫৩. প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দৈনিক বসুমতী শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬০ (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫)।
৫৪. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৮৪।
৫৫. 'শরৎস্মৃতি', বমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১৭৩ (আকর : 'শবৎপ্রসঙ্গে', অমরেন্দ্রকুমাব ঘোষ সম্পাদিত, ভাব ও লেখা প্রকাশিত, কলকাতা-৭০০ ০১২, জুন ১৯৭৫)। শবৎচন্দ্রের এই আসর জমিয়ে মজলিশী গল্প করার প্রবণতাকে তাঁর সাহিত্যের মূল লক্ষণ বলে নির্দেশ ক'রে অন্নদাশংকর তাঁকে সাহিত্যের কথকঠাকুর বলেছেন ('শবৎচন্দ্র : বিনুর অ্যাডভেঞ্চার')। তাতে অতিশয় বুদ্ধিমান লোকের ব্যাজস্তুতি করাব ক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র অবশ্যই 'কথকঠাকুর'—তাঁর বিষয় কিন্তু মনুষ্যজীবন, যে-জীবনের ঐশ্বর্য অসামান্য চিত্তকর্ষী কাহিনীর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে চিরায়ত রূপ ধরেছিল।
৫৬. অমল হোমকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৭৭।
৫৭. ঐ।
৫৮. ঐ।
৫৯. ঐ।
৬০. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১২-১৪।
৬১. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ২২০।
৬২. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৮১।
৬৩. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯০।
৬৪. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ২১৯।
৬৫. ঐ, পৃ. ২২৪।
৬৬. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯০।
৬৭. সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৫১।
৬৮. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৭।
৬৯. দুটি দরিদ্র মানুষের পরমানন্দে চা-পানের ছবি এঁকেছেন যোগেন্দ্রনাথ। প্রথমজন নারদমুনি নামক ভিখারী। "শরৎবাবু...কহিলেন, 'দ্যাখ নারদ,...রোজ সকালবেলা আমার এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্য আসতে পারো? চা-টাও খেতে পারবে, আর আমার এই ছবি আঁকাও দেখতে পারবে।' চায়ের উল্লেখে বৃদ্ধ মনে মনে একবার পরম উপাদেয় বস্তুটির স্বাদ উপভোগ করিল, পরে মুখেও চপচপ করিয়া বার দুয়েক শব্দ করিল। শরৎবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া গেলেন। পরে এক পেয়ালা চা লইয়া আসিয়া বৃদ্ধের সামনে নামাইয়া রাখিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন, 'বড়ই কষ্ট হয়েছে, নাও চা খাও'।" দ্বিতীয় মানুষটি সাধু নামক শরৎচন্দ্রের জনৈক প্রতিবেশী। গুরুর নাম জপ না ক'রে মুসলমানের দোকানের চা-রুটি খাওয়ায় তার আপাত আপত্তি অল্পেই উড়ে গেছে, কেননা চা-রুটি বড়ই লোভনীয় এবং সেটি সাধুর সামনে ধরেছেন 'বামুন' শরৎচন্দ্র। অতএব 'গুরুর নাম জপ' সরিয়ে রেখে "বেশ নিবিষ্ট চিত্তে চা ও রুটি" সাধু সেবন করেছে। ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১২, ৩২-৩৩)।

৭০. 'শরৎ-প্রতিভা', সতীশচন্দ্র দাস (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ১১)।
৭১. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', ভূমিকা—পৃ. ৮।
৭২. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে', পৃ. ২।
৭৩. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৮।
৭৪. ঐ, পৃ. ১১।
৭৫. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, ঐ, পৃ. ১৭২।
৭৬. দিলীপকুমার রায়কে পত্র, ঐ, পৃ. ৩৪৩।
৭৭. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে', পৃ. ৮৮-৮৯।
৭৮. ঐ, পৃ. ১৭।
৭৯ক. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।
৭৯খ. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৮৮।
৭৯গ. 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২২৩, ৪০৮, ৪৯৭।
৮০. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১০৫।
৮১. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে', পৃ. ৩।
৮২. ঐ।
৮৩. ঐ, পৃ. ২২।
৮৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ২৫-২৬।
৮৫ক. 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪১৮-৪১৯।
৮৫খ. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৬১।
৮৬. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯০-৩৯১।
৮৭. দিলীপকুমাব রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩২৮-৩২৯।
৮৮. ঐ, পৃ. ৩৪৫।
৮৯. ঐ, পৃ. ৩২৮-৩২৯।
৯০. নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩১৩।
৯১. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১০০।
৯২. মণীন্দ্রনাথ রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৩৪।
৯৩. মতিলাল রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৬৬-৪৬৭।
৯৪. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৩৫।
৯৫. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৭০।
৯৬. ঐ।
৯৭ক. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৭৬।
৯৭খ. ঐ, পৃ. ১৬৯।
৯৮. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪২০।
৯৯. মণীন্দ্রনাথ রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৪১।
১০০. সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৯৫।
১০১ক. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৮৬।
১০১খ. 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে', পৃ. ৬-৭।
১০২. সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৩৬।
১০৩. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৮৩।

১০৪. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ৪।

১০৫. 'আমার যৌবন', বুদ্ধদেব বসু, এম সি সরকার এণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ১০৮।

১০৬. 'শরৎচন্দ্র : বিনুর অ্যাডভেঞ্চার', অন্নদাশংকর রায়, (আকর : 'ইশারা' গ্রন্থ)।

১০৭. রাধারানী দেবীকে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছিলেন : "জানোই তো ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনা।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০)।

১০৮. ঐ, পৃ. ৩৯১।

১০৯. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৫৪।

১১০. 'শরৎপ্রসঙ্গ', কালিদাস রায়, পৃ. ১৮১–৮২। (আকর : 'শরৎপ্রসঙ্গ', অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত)।

কালিদাস রায় ঐ প্রবন্ধে অধিকন্তু লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের উপাধি প্রাপ্তির পরে 'রসচক্র' সাহিত্যসংস্থা বনহুগলীতে শিল্পী অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর বাগানবাড়িতে শরৎ-সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে। সেখানে সম্মাননা ভাষণে বলা হয়েছিল : "গঙ্গাতীরের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে বুড়ীগঙ্গাতীরের বিদ্বৎসমাজ ডি.লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। একদিন বঙ্গের রবিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মান দান করিয়া নিজের সম্মানই রক্ষা করিয়াছিল—আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র—আমরা রবির প্রখর আলোকে বিলুপ্ত—সে সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করি নাই। শরৎচন্দ্রের এই সম্মানেই নক্ষত্ররা আজ সম্মানিত।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্যাদা দান করিয়া নিজের মর্যাদাই বহুগুণে বৃদ্ধি করিল। শরৎচন্দ্রেব গৌরবদ্যুতি নতুন করিয়া কি বাড়িবে জানিনা। শরৎচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত হইয়া উপাধিই গৌরবান্বিত হইল বলিয়া মনে করি।" সম্মাননা ভাষণে শরৎচন্দ্রের প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহেলার ব্যাপারে তির্যক খোঁচা দেওয়া হয়েছে।

১১১. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৫১।

১১২. 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৩০৫-৩০৬ (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra')।

১১৩. 'শরৎপরিচয়', মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ৯৯-১০০ (আকর : 'সাহিত্য-বিতান')।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবনের ধর্ম—ধর্মের জীবন

॥ ১ ॥

জীবনের ধর্ম যিনি পালন করেছেন, ধর্মের জীবন তাঁরই। শরৎচন্দ্রের ঐ প্রথম পরিচয় আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। এবার দ্বিতীয় পরিচয়। নিজেকে তিনি নাস্তিক বলতে ভালবাসতেন। "এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চলল—কেবল আমিই হলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। হেরিডিটি আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে।" [১] অথচ তাঁর মনের গভীরে ছিল প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস—একেবারে লুটিয়ে পড়া প্রণাম। 'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।'

নিজ ধর্মবোধের সশব্দ প্রচার শরৎচন্দ্র পছন্দ করতেন না। একেবারে ঘনিষ্ঠ মানুষদের কেবল বলেছেন সেসব কথা। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিষয়েও তাঁর আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়না। যে-বস্তু একান্ত আপনার, তাকে লোকলোচনের আড়ালে পালন করতে তিনি আগ্রহী। তাই নাস্তিকতার আবরণে ঢেকে রেখেছেন গহন অস্তিত্বের জগৎ।

॥ ২ ॥

'আমি সংসারের বাইরে'

আত্মস্মৃতি এবং পরস্মৃতিতে শরৎচন্দ্র বোহেমিয়ান, পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো উদাসীন মানুষ। জীবনের প্রতি অসীম তৃষ্ণা, ওষ্ঠে ভোগপাত্র, কণ্ঠপথে তরল অনল—এ সকল থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বভাববৈরাগী। জীবনের প্রথম পর্বে ঘরের থেকে পথের টানই তাঁর বেশি। গতি অনির্দেশ্য।

এই বিষয়বৈরাগ্যের কারণ—তাঁর 'শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত', অর্থের অভাবে শিক্ষা অসমাপ্ত, অনটনের মাংসহীন করোটির কাছে মাথা নামিয়ে পিতা মতিলাল পর্যন্ত বসতভিটা বিক্রি করেছেন। সুতরাং শরৎচন্দ্রের ঘর কোথায়?

রক্তের মধ্যেও শরৎচন্দ্র শুনেছেন ঘরছাড়া বাঁশির সুর। বৈরাগী-স্বভাব পিতারই সন্তান তিনি : "পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব...ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত...গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম।" [২]

বন্ধু রাজেন মজুমদারের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হওয়াও হয়তো শরৎচন্দ্রের মনে ঘরের শিকড়কে সমূলে টান দিয়েছিল।

সন্ন্যাসজীবন ত্যাগের পরেও নিজের মধ্যে বৈরাগীর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব ক'রে চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

"আমি সন্ন্যাসী—আমার নামের ওপর, টাকার ওপর আত্মসম্মানের চেয়ে বেশি লোভ নেই।" [৩]

কখনো কখনো নিজেকে সন্ন্যাসী ভেবেছেন—"আমি উদাসীনও বটে, গৃহীও বটে।" [৪] সন্ন্যাসী হওয়া প্রায় অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন শরৎচন্দ্র : "আমি চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি।" [৫] বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের বৈরাগী জীবন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি।" ব্রাহ্মণত্বের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে সন্ন্যাসীর নির্বিকার চিত্তে 'কত হাড়ি বাগ্‌দির বাড়িতে' তিনি আহার করেছেন। ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫)।

'সন্ন্যাসী' শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম পরিচয়ের সকৌতুক বিবরণ দিয়েছেন নরেন্দ্র দেব :

"একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা [প্রমথনাথ প্রমুখ] ক্লাবে জমায়েত হয়ে খেলা ও গল্প-গুজব করেছিলেন, এমন সময় একটি তরুণ সন্ন্যাসী সেখানে এসে পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় সবিনয়ে লেখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন। ক্লাবের একটি ছেলে দোয়াত-কলম এনে দিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে একখানি পোস্টকার্ড বার ক'রে ঘরের এক কোণে বসে নিবিষ্ট মনে পত্র লিখতে শুরু করলেন। ছেলেরা স্বভাবতই কৌতূহলী। ওবই মধ্যে একজন উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিলে সন্ন্যাসী চমৎকার বাংলা হরফে পত্র লিখছেন। ক্লাবের মধ্যে একটা কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল, সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এই তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় নেবার জন্য। প্রমথনাথ...পুরোবর্তী হয়ে সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শুরু করলেন একেবারে খাঁটি বাংলা ভাষায়। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যেক কথার উত্তর হিন্দিতেই দিচ্ছে দেখে প্রমথবাবু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন—'ছাতুখোরের ভাষা ছাড় না বাবাজী, নিজের জাতভাষা ধরো না, আমরা অনেকক্ষণ জানতে পেরেছি তুমি বাঙালি।' শরৎচন্দ্র এবার হেসে ফেললেন...।" [৬]

শ্রীকান্তের জবানীতে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসজীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। বেশ বোঝা যায়, সন্ন্যাসী হওয়ার মূলে তাঁর বিশেষ ঈশ্বর-ব্যাকুলতা ছিলনা :

"প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা এক সুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোট বড় রুদ্রাক্ষমালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধুনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। দেখিলাম, তাঁহারও

রস-বোধ আছে ; তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একটো। তবে লুকিয়ে আনো না একবার! মিনিট দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম।...চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন।...গম্ভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল।...চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চূড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান।...আমার শুকনো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল —একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।"

॥ ৩ ॥

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রেব অভিমত কি ছিল, তা কৌতূহলের বিষয়। কোনো চিঠিতে বিষযটি তিনি আলোচনা করেন নি, অথবা তাঁর কোনো গল্প-উপন্যাসে তা নেই। কিন্তু অন্যের স্মৃতিতে এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি জেনেছি। রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, এমন উল্লেখ নেই। কিন্তু শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা, তারপর ভারতে তাঁর আগমন এবং বিপুল অভ্যর্থনা, ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু— এসব সংবাদপত্রে শরৎচন্দ্র পড়েছেন ধবে নিতে পারি। রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী-সন্তান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, বিবেকানন্দ-অনুগত স্বামী শর্বানন্দের সঙ্গে নানা ধর্মপ্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি-কর্মপদ্ধতি নিযে শরৎচন্দ্রকে আলোচনা করতেও দেখা গেছে। সে বিবরণ দিয়েছেন রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রেব বন্ধু এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার।

রেঙ্গুনে ১৯০০ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি-রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের উপস্থিতিতে গিরীন্দ্রনাথ ও আরো কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত 'রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের আয়োজন করা হতো। কয়েক বছর পরে সেই উৎসব বৃহৎ আকার নেওয়ায় গিরীন্দ্রনাথ প্রমুখের অনুরোধে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ থেকে রেঙ্গুনে পৌঁছেছিলেন। সেবার বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উৎসব পালিত হয়েছিল। উৎসবের দিন সকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-গিরীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে কয়েক মাইল পথ হেঁটে শরৎচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ফুল 'নাগেশ্বর চাঁপা' সংগ্রহ ক'রে এনেছেন, আবেগমথিত কণ্ঠে গান গেয়েছেন ("তেমনি ক'রে আবার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের বান।/ ...প্রাণভরে সবাই মিলে গাইব 'জয় রামকৃষ্ণ' গান"।।), তারপর 'মহোল্লাসে কোমর' বেঁধে উৎসবে সমাগত ভিখারীদের পরিবেশন ক'রে খাইয়েছেন।[১]

ঐকালে শরৎচন্দ্রের মানসিক অবস্থা ঠিক কি ছিল, গিরীন্দ্রনাথ তা কাছ থেকে দেখেছেন। 'সংসারের দুঃখদারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের কশাঘাতে' বিপর্যস্ত শরৎচন্দ্র তখন সংশয়ী মানুষ, নিজেকে নাস্তিক প্রচারে ব্যস্ত হয়ে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সগর্জনে প্রমাণ করতে

সচেষ্ট, "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার কোনো সংকল্প তাঁহার মনে উদয় হয় নাই বা তাঁহার ভাগ্যে কোনোদিন কোনো আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয় নাই। এক্ষণে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর ও কামকাঞ্চন ত্যাগের জীবন্ত মূর্তি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটায় তত্ত্বকথা শুনিবার আগ্রহ বাড়িয়াছিল।" রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনার দীর্ঘ বিবরণ গিরীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছিল "স্বামীজীর মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা ও উপদেশগুলি তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] তাপিত প্রাণে মৃত-সঞ্জীবনী ঢালিয়া দিল ও এক বিস্ময়কর বৈরাগ্যের ভাব আনিয়া দিয়াছিল।" শরৎচন্দ্র, এমন কি, রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হওয়ার পদ্ধতি বিষয়েও সাগ্রহে প্রশ্ন করেছেন :

"শরৎচন্দ্র—আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী হবার নিয়ম কি?

স্বামীজী—মঠের সন্ন্যাসী হতে গেলে প্রথম তিন বৎসর শিক্ষানবীশ থাকতে হয়, তারপর তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য ব্রত। এই ছয় বৎসর মঠাধ্যক্ষ তোমায় সন্ন্যাসগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করলে তবে সন্ন্যাস দেবেন। মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সংযমী ও আদর্শ ভক্ত হতে হবে।

শরৎচন্দ্র—ঐ ছয় বৎসর কি শিক্ষা করতে হবে?

স্বামীজী—মিশনের মূল মন্ত্র—Renunciation and Service—সংসারাসক্তি ত্যাগ, সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা।

শরৎচন্দ্র—সেবা কাজটি ঘরের মেয়েদের কাছেই ভালো শিক্ষা হয়, হিন্দুর মেয়ে আপন স্বামী-পুত্রের যেভাবে সেবা করে, তার চেয়ে বড় আদর্শ কিছু হতে পারে কি?

স্বামীজী—সতীর পতিসেবার মধ্যেও একটু স্বার্থগন্ধ থাকে, কিন্তু মঠের ছেলেরা বিপন্ন রোগীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে 'পীড়িত নারায়ণ' ভেবে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে।

শরৎচন্দ্র—মঠের বড় বেয়াড়া নিয়ম, ছয় বৎসর এপ্রেনটিস্! ছ' বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়।

স্বামীজী—ডাক্তার হলে অপরের রোগের চিকিৎসা হবে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পারলে ভবরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"[৮]

খাঁটি সন্ন্যাসের অপরিচিত পথে পা বাড়ানো শরৎচন্দ্রের বিধিলিপি ছিলনা, তিনি রয়ে গিয়েছিলেন গৃহাঙ্গনে, যার শ্রেষ্ঠ কথাকাব হবেন। কিন্তু 'নৈষ্ঠিকী ভক্তির জীবন্ত সৌম্য মূর্তি' রামকৃষ্ণানন্দের প্রতি আকৃষ্ট শরৎচন্দ্র 'প্রতিদিন সময় বুঝিয়া তাঁহার [রামকৃষ্ণানন্দের] নিকটে আসিয়া...নির্জনে আত্মকাহিনী জ্ঞাপন' ক'রে 'তত্ত্বকথা' শুনেছেন, প্রাণমাতানো রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত শুনিয়েছেন রামকৃষ্ণানন্দকে, রামকৃষ্ণানন্দের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিকদের উত্থিত নানা কূট প্রশ্নের সমাধান শুনে 'শ্রদ্ধাবিস্ফারিত নয়নে' চেয়ে থেকেছেন, রামকৃষ্ণানন্দের রেঙ্গুন ত্যাগের সময় দেখা গেছে শরৎচন্দ্রের 'চক্ষু জলভারনত'।[৯]

রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে উদার করেছিল। রেঙ্গুনে থাকাকালে তিনি সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন :

"পরমহংসদেবের শিষ্যবর্গ, একবার ভাবো তো দেখি তাঁদের অসামান্য কার্যকলাপের কথা—একবার সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে চিন্তা কবো তো ভায়া [যোগেন্দ্রনাথ সরকার], জগৎময় স্বামী বিবেকানন্দের মহামানবতার কথা। সমস্ত আমেরিকা কি শুধু শুধু এই লোকটির এক চিকাগো বক্তৃতাতেই মেতে উঠেছিল? তা তো নয়। তারা দেখতে পেয়েছিল যে, এই অতি মানুষটি এমন একটি জ্ঞানের জ্যোতি ভারত থেকে সঙ্গে করে এনেছেন, যার আলোকে অচিরেই প্রশান্ত মহাসাগরের এপার, এমন কি আটলাণ্টিকেরও পরপার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।" [১০]

শরৎচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণানন্দের প্রভাব কতদিন ছিল তা বলা কঠিন। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে রেঙ্গুনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' স্থাপনের সূচনাপর্বে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা দ্বিমুখী। বেলুড় মঠ থেকে আগত স্বামী শর্বানন্দ ঐ সেবাশ্রম নির্মাণকাজে প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর আগ্রহে মন্দির তৈরির জন্য অর্থসংগ্রহ শুরু হয়। একটি 'সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান' ক'রে 'সঙ্গীতাভিনয়ের' ব্যবস্থাও তার মধ্যে ছিল। গিরীন্দ্রনাথের "বিশেষ অনুরোধে তাহার [সঙ্গীত-অভিনয অনুষ্ঠানের] দৃশ্যপট পবিকল্পনা, সাজসজ্জা নির্বাচন ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার [শরৎচন্দ্র] লইয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্টেজের ভিতর উপস্থিত ছিলেন।" [১১] শরৎচন্দ্রের এই ভূমিকা সদর্থক।

অন্যদিকে "শরৎচন্দ্রের পেটে কোনো কথা হজম হইত না। তাহা ছাড়া তিনি দুই পক্ষে গণ্ডগোল বাধাইয়া তামাসা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন।" রেঙ্গুনবাসী বাঙালি ধনী ব্যবসায়ী শশিভূষণ নিয়োগী স্বামী শর্বানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর ক্রীত জমিতে কালীমন্দির নির্মাণের পরিবর্তে, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও মন্দির তৈরি ক'রে দিতে শর্বানন্দের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির কথা অবিলম্বে বাইরে প্রকাশ না করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত শরৎচন্দ্রকে গিরীন্দ্রনাথ সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। আপন স্বভাবগুণে (অথবা দোষে?) শরৎচন্দ্র তা সবিস্তারে তাঁর সহকর্মী রামকৃষ্ণ মিশন-বিদ্বেষী প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন। ফল—প্রিয়নাথের কান ভাঙানো কথায় বিভ্রান্ত শশিভূষণ মঠ নির্মাণের যাবতীয় খরচ দানের কথা প্রত্যাহার ক'রে "মাত্র আর দশ হাজার টাকা দিতে রাজি হইলেন।" [১২]

॥ ৪ ॥

'আমার ভাই বেদানন্দ'

শরৎচন্দ্রের মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ঈষৎ অহংকারের সঙ্গে চিঠিতে লিখেছেন, বেদানন্দ তাঁর বংশের অষ্টম সন্ন্যাসী পুরুষ। বেদানন্দ ১৯১৭ সালের কোনো এক সময়ে শরৎচন্দ্রকে কলকাতার 'বলরাম ভবনে' নিয়ে আসেন স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য। স্বামী অখণ্ডানন্দ বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত 'সেবাধর্মের সিদ্ধপুরুষ'। তাঁর সঙ্গে "সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র শরৎবাবু বলিলেন, 'দেখুন, আমি সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে আসিনি। শুনেছি,

আপনি মানুষকে ভালবাসেন, চাষার কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের সেবা করেন, লেখাপড়া শেখান। তাই আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনি যে-ভাব নিয়ে কাজ করছেন, আমি সেই-ভাব নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছি, গল্প লিখেছি।' পরে শরৎবাবু তাঁহার অনেক বই [মুর্শিদাবাদের রামকৃষ্ণ মিশন] সারগাছি আশ্রমে পাঠাইয়া দেন।" নিছক আত্মমুক্তির সন্ন্যাসে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিলনা। প্রথম জীবনে তিনি স্বয়ং অনেক সময় নানাভাবে মানুষের সেবা করেছেন।"[১৩] ভাই বেদানন্দ যখন সন্ন্যাসী হিসাবে একই কাজ করেছিলেন, তখন তা শরৎচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। তার উল্লেখ ক'রে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন :

"[বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ] সেবাশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ শরৎচন্দ্রের নিজের ভাই, তাই বোধহয় সেখানকার সেবাকাজের বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তাঁর কুণ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু ইঙ্গিতে তিনি তা যথেষ্টই করেছিলেন। ঐ বৃন্দাবনে এক ধনী মারবাড়ী একদল 'নিরুৎসুক উদাসীন বুভুক্ষু' বৈষ্ণবীকে কিছু আটা ও কয়েকটি পয়সা দেওয়ার শর্তে অষ্টপ্রহর কীর্তন-চাকুরিতে বহাল করেছিলেন। সে কাণ্ড দেখে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় শরৎচন্দ্র সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। এই জবরদস্তির ধর্মধ্বজীকে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমরা এত খরচ করো, কিন্তু সেবাশ্রমে সাহায্য করো না কেন?' সে ব্যক্তির উত্তরের মধ্যে প্রচলিত ধর্মাচারের সঙ্গে বিবেকানন্দের ধর্মের পার্থক্য উদঘাটিত হয়েছিল। মারবাড়ী উত্তর দেন, 'সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ওষুধ দেয়, যে-সে জাতের মড়া ফেলে, রোগীর সেবা করে—এইসব কি সাধুর কাজ? সাধু শুদ্ধাচারী হবে, সাধন-ভজন করবে, তবেই তো সে সাধু।' শুনে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া : 'মনে মনে বলিলাম, তাই বটে! তা নইলে আর আমাদের এই দশা'!"[১৪]

দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সেরে শরৎচন্দ্র সদলে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। বৃন্দাবনে তখন কলেরা ও ডেঙ্গুর প্রকোপ। আশ্রমের অবস্থাও শোচনীয়। ঠাকুরচাকর অসুস্থ কিংবা নেই। একজন ব্রহ্মচারীও পুরনো ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। ঐ পরিস্থিতিতেও বেদানন্দ সযত্নে শরৎচন্দ্রদের বৃন্দাবনে নানা মন্দির ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী ভাইয়ের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ মমত্ব ছিল। বেদানন্দকে তিনি নানা সময়ে কাছে এনে রেখেছেন। বেদানন্দের মৃত্যু তাঁরই সামতাবেড়ের বাড়িতে। সেই গভীর বেদনা এত অল্পে প্রকাশ করা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব :

"আমার মেজ ভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন,...তিনি দিন কয়েক পূর্বে বর্মা হইতে ফিরিয়ে মঙ্গলবার রাত্রে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরের দিন বেলা একটায় ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে বাহিরে আসিলেন এবং আমার বুকে মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন।"[১৫]

"...বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ির একটা পশুপক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না, তাহার বলিবার আছেই বা কি!...ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এত বড় দুর্বল ছিলাম একথা তো জানিতাম না। এ ব্যথা আমার সহিবে কি করিয়া!"[১৬]

বেদানন্দের মৃত্যু (১০ কার্ত্তিক ১৩৩৩) শরৎচন্দ্রের কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ তিনি, তার প্রভাবে ক্ষেত্রবিশেষে সংকীর্ণলক্ষ্য হয়ে পড়েছেন। কঠোর ভাষায় গিরীন্দ্রনাথকে বলেছেন : "তোমাদের বড় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন! বেদানন্দের অসুখের সময় যখন তাকে আনতে গিয়েছিলাম, কিছুতেই দিতে চাননা।" [১৭] বেদানন্দ যক্ষ্মায় মারা যান। ঐ একই রোগে রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম সংগঠক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দেরও মৃত্যু। সুতরাং এ প্রশ্ন ওঠেই—রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন আর্থিক অবস্থার খোঁজ কি শরৎচন্দ্র নিয়েছিলেন এবং বেদানন্দের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা? সে সকলের উল্লেখ তাঁর চিঠিপত্রে নেই, অন্যের স্মৃতিকথাতেও মেলেনা। এটুকু বলাই যায়, বেদানন্দের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত ভাল ধারণা নষ্ট হয়ে যায়। পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমবাসী দিলীপকুমার রায়কে খোঁচা দিয়ে লিখেছেন : "আশ্রমবাসীরা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তারা কথায় কথায় গালমন্দ ক'রে তেড়ে আসে।" বেদানন্দের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ৪ ফাল্গুন ১৩৩৭-এ লেখা এই চিঠিতে শরৎচন্দ্র বলেছেন 'কোনো আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই,...আমি জানি ও সবই সমান, সবই ভুয়ো।' এ-কথার মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাঁর বিরূপতার ইঙ্গিত আছে বলেই মনে হয়। [১৮]

ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের মনেরও পালাবদল হয়েছে। সমাজসেবা থেকে রাজনীতির অধিক আকর্ষণে ধরা দিয়ে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন ;—হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, এ আই সি সি-র সদস্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তার প্রতিক্রিয়া তাঁর একটি ভাষণেও পড়েছে। ১৯৩২ সালে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সুভাষচন্দ্র সভাপতি। সেখানে শরৎচন্দ্রের এলোমেলো ভাষণ শ্রোতাদের মধ্যে যথেষ্ট বিরক্তির সঞ্চার করেছিল :

"মঠের সন্ন্যাসীদের কাজকর্মের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই, মঠের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনতে পাই—সেগুলোকে মনে ক'রে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হলে অনেক সময় লাগবে, আর তার দরকার নাই। আমার বিশ্বাস উপস্থিত মঠের কাজগুলি ঠিক পরমহংসদেবের ভাবানুযায়ী বা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী কিছু হচ্ছে না।"

এই বক্তব্যের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ ক'রে স্বামী বিজয়ানন্দ বলেছিলেন :

"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শরৎবাবু বিশেষ প্রতিভাবান লেখক হইয়াও এবং তাঁহার অনুজ স্বামী বেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি এই মঠ ও মিশনের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুশৃঙ্খল বিরাট সেবাপ্রতিষ্ঠান বলিতে আজ এক বাক্যে রামকৃষ্ণ মিশনকেই বুঝায়। মিশনের সম্মুখে যে বিরাট আদর্শ আছে, হৃদয়ে যে স্পন্দন আছে, কার্যে যে প্রাণ আছে, আমার বিশ্বাস তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা শরৎবাবুর নাই! আশা করি তাঁহার সমস্ত ভুল ধারণা তিনি শীঘ্রই সংশোধন করিয়া লইবেন।" [১৯]

শরৎচন্দ্র স্বভাবত প্রেমিক এবং রসিক। নরনারীর বহুমাত্রিক সম্পর্ক তাঁর সাহিত্যের

বিষয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাই তাঁর কাছে শেষ কথা। বুভুক্ষু নিপীড়িত মানুষের সেবাকে পরিহার ক'রে নিছক আত্মমুক্তির সাধনাকে তিনি সন্ন্যাসের শ্রেয় আদর্শ মনে করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। বেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান ক'রে সেবাধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 'শ্রীকান্ত'-র বজ্রানন্দ চরিত্রে এই আদর্শ রূপায়িত। 'শেষ প্রশ্ন'-র রাজেনের মধ্যেও তার ছায়াপাত।

বেদানন্দের 'কর্ম ও চেষ্টা'র সাহিত্যিক রূপ লিখিত আছে 'শ্রীকান্ত'-র বজ্রানন্দ চরিত্রে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মতো বজ্রানন্দের আকার, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, যেমন সুকুমার তেমনই সুশ্রী, কৃশ এবং দীর্ঘ, 'চোখ, মুখ, ভ্রূ ও কপালের গঠন নিখুঁত বলিলেই হয়।' একইসঙ্গে তিনি কর্মে প্রদীপ্ত, সদা সঞ্চারমান। সাংসারিক বন্ধন বজ্রানন্দ অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন. বৃহৎ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য। শ্রীকান্তের মনে হয়েছিল তিনি "গেরুয়া সত্ত্বেও যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যেই বেরিয়ে এসেছেন আমার তা বিশ্বাস নয়। তার কারণ, আমিও বার কয়েক সাধু-সঙ্গ করেচি, তাঁদের কেউই আজও ওষুধের বাক্স ঘাড়ে ক'রে বেড়ানোকে ভগবৎলাভের উপায় নির্দেশ ক'রে দেননি।" বজ্রানন্দ তা-ই করেছিলেন, কারণ তাঁর সন্ন্যাসধর্ম এই শিক্ষা তাঁকে দিয়েছে—আত্মমোক্ষ নয়, প্রাণহীন-স্বাস্থ্যহীন-মুমূর্ষু মানুষের সেবা করাই সন্ন্যাসীর ব্রত। এক্ষেত্রে বজ্রানন্দ একক সৈনিক নন, একই পতাকার তলে সমবেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কয়েকজন মানুষের অন্যতম তিনি।

এই দেশের মানুষকে চেনার অভিজ্ঞতা শ্রীকান্তের ছিল। কিন্তু বজ্রানন্দ যে গভীর চোখে দেশকে দেখেছিলেন, সেই সর্বব্যাপী দৃষ্টির কাছে শ্রীকান্তের মাথা নত হয়ে এসেছে :

"দেশের আভ্যন্তরীক অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার দুঃখ, ইহার অভাব আমি নিজেও নিতান্ত কম জানিনা ; কিন্তু এই সন্ন্যাসীটি যেই হোন, তিনি এই বয়সেই আমার চেয়ে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন এবং ঢের বড় হৃদয় দিয়া তাহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে চোখের ঘুম জলে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল এবং বুকের ভেতরটা ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে ব্যথায় যেন মথিত হইয়া যাইতে লাগিল।...এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া দেখাইতে লাগিল।"

নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বিবেকানন্দের নাম না ক'রে তাঁর নব সন্ন্যাসধর্মের ফলিত রূপ বজ্রানন্দের মধ্যে সার্থকভাবে এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। সেকাজ করার সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বামী বেদানন্দ। প্রসঙ্গটি শেষ করার আগে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত শরৎচন্দ্রকে দেখে নেব :

"রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যরা বক্তৃতা করেছেন বেশি ও যথেষ্ট চাঁদা তুলেছেন, সেটা তো স্বোদর পূরণের জন্য নয়।...আজ যে বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যস্রোত বয়ে চলেছে, এ স্রোতের মূলে বক্তৃতা ছিল, কিন্তু এসব বক্তৃতালব্ধ অর্থ থেকে কত বড়

বড় অনুষ্ঠান হয়েছে, তা তো আর কারো অজানা নেই! তাঁরা কখনো কারো লম্বা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোন নি বা বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে লম্বাচওড়া চাঁদাব খাতাও বের করেন নি। লোকে যা দিয়েছে, তাঁদের সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সদনুষ্ঠানের উপবে আস্থাবান হয়ে। এই তো চাই।"[২০]

॥ ৫ ॥

রসের ধর্ম

বেপরোয়া ভাবে নিজের ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকাব করলেও শরৎচন্দ্রের মর্মমূলে প্রোথিত ছিল গভীর ধর্মবোধ। তাঁর কাছের মানুষ রাধারানী দেবীর সাক্ষ্য এ-বিষয়ে মূল্যবান বিবেচিত হবে :

"সেই খামখেয়ালী আত্মভোলা এলোমেলো মানুষটির মধ্যে অতিশয় কোমল এবং অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল একটি অন্তর ছিল, যা সহজে বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশিত হতো না ; বরং শুষ্কতার আবরণে সংগুপ্ত থাকত। যতখানি তিনি গভীব ঈশ্বরবিশ্বাসী, ততখানিই ছিল তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মুখে উপেক্ষা। 'আমি একটা মহা নাস্তিক', একথা তাঁর মুখে বহুবার শুনলেও যাঁরা তাঁকে চিনতেন, তাঁবা জানতেন এই মৌখিক কথার মূল্য কতটুকু ছিল তাঁর জীবনে।" ('শরৎচন্দ্র', রাধারানী দেবী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র নিজেও কি সর্বদা গোপন করতে পেরেছিলেন—তিনি আস্তিক? একাধিক চিঠিতে তাঁর ঐ অনাবরণ হৃদয়রূপ প্রকাশিত। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ লেখার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ থেকে কটু বাক্যের তীর তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলে, শরৎচন্দ্র খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো জ্বলে উঠে বলেছিলেন :

"আমি কিছুদিন পূর্বে আমার দিদির [অনিলা দেবী] নামে 'নারীর মূল্য' বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। আমার দিদি ব্যাপারটা আমাকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠান, আমি সেইটাকে বড় করিয়া লিখি। এজন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন তাহা লিখিয়া জানানো যায়না। কেহ কেহ এমন বলিয়াছিলেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দুধর্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই, ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র।...সেই সময়ে আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন, আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু। অথচ, আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করিনা, যার তার হাতে জল পর্যন্ত খাইনা।"[২১]

অন্য সময়ে লেখা চিঠিতে দেখা যায়—

"ছেলেবেলায় ভগবানকে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধকরি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম, এখন শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।"[২২]

"ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাসটা একটু যেন বেশি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে।"[২৩]

"বহুদিন থেকে আমার বদরিকাশ্রম দেখবার সাধ ছিল, কিন্তু হয়ে উঠল না।"[২৪]

এই ঈশ্বরবিশ্বাস শরৎচন্দ্রের মনে এমনই শক্তিসঞ্চার করেছিল যে, চিরকালের মতো পঙ্গুত্বের সম্ভাবনাকেও তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করেছেন :

"যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মতো ভাঙিয়াও থাকে,...তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহা দুঃখ বোধকরি সহিয়া যাইবে। হয়তো বা তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব।" [২৫]

নিজের ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র কিছু গভীর কথা বলেছেন রাধারানীকে : "ঈশ্বরবিশ্বাস নেই এমন মানুষ দুনিয়ায় নেই জানবে। যারা বিশ্বাস করেনা, কিন্তু বস্তুবাদে বিশ্বাসী—তাদের কাছে ঈশ্বর বস্তু বা বিজ্ঞানরূপেই প্রকাশিত হয়েছেন। আসলে—বিশ্বাসই ঈশ্বর।...এমন কথাও বলতেন শরৎচন্দ্র, নাস্তিকরাই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ, কাছাকাছি, জেনে রেখো।" [২৬] রাধারানীর জানা ছিলনা বহু বছর আগে রেঙ্গুনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে শোনা কথার প্রতিধ্বনি শরৎচন্দ্র এখানে করেছেন। রামকৃষ্ণানন্দ শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন : "যাহারা নাস্তিক তাহারাই বেশি আস্তিক, নাস্তিকরাই সর্বক্ষণ ঈশ্বরকে খুঁজছে! যাদের মন দিবারাত্র ঈশ্বরান্বেষণে ব্যস্ত, তারা কি নাস্তিক হতে পারে?" [২৭]

শরৎচন্দ্রের ঈশ্বর বৃন্দাবনের চির কিশোর-কিশোরী রসময় কৃষ্ণ ও রসময়ী রাধিকা। তিনি ডুবে গিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মে। নিত্য পালনীয় আচরণে কেবল নয়, বৌদ্ধিকভাবেও দেখেছেন বৈষ্ণব ধর্মকে। একটি চিঠিতে লিখেছেন :

"আপনি [হরিদাস চট্টোপাধ্যায়] আমাকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়িতে দিয়াছিলেন —সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই—[রেঙ্গুনে] আসিবার সময় মনেই হয় নাই,...এছাড়া আরো অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি (এমন কি রোজই প্রায় পড়ি) তা বলিতে পারিনা। এগুলিও ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল। ...বইগুলি বরং আমাকে দান করুন।" [২৮]

শরৎচন্দ্র আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব ছিলেন—এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তাঁর গলায় তুলসীর মালা থাকত, উপবীতধারণ ব্রাহ্মণের অবশ্যকৃত্য মনে করতেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে পাওয়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নিত্যপূজার সময়ে ব্যবহার করতেন ঢাকা মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যসভায় প্রাপ্ত কারুকার্যময় শাঁখ। [২৯]

বৈষ্ণবধর্মের প্রাণরস প্রবাহিত কীর্তনের মধ্যে। রেঙ্গুনে কীর্তনে আবিষ্ট শরৎচন্দ্রের কথা বলেছেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার। বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিয়ে কীর্তনের দল তৈরি করেছেন এই পল্লীর 'বামুনদাদা' শরৎচন্দ্র। "বামুনদাদার পরিচালনায় ছুটির দিনে ইহারা খোল করতাল সংযোগে নাম সংকীর্তন করিত।" [৩০] যোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের ঐ বাড়িতে ঢুকে বিস্মিত হয়েছিলেন, স্বল্পপরিসর বারান্দার "রেলিঙের একপাশে তক্তার উপর বসানো একটি তুলসীর চারা, অপর পাশে একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এসব কি শরৎদা?' 'ওহে এটা যে হিঁদুর বাড়ি, একথাটা ভুলে যেয়ো না সরকার'।" [৩১]

বৈষ্ণবতার প্রভাব শরৎচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন। ফেরার

পথে বৃন্দাবনে নামেন। সেবারে শরৎচন্দ্রের সহযাত্রীর (সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনৈক বন্ধু) মুখে কেদারনাথ শুনেছিলেন: "আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতি বড় নাস্তিকও সে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান।" [৩২ক]

সমাজধর্ম বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দোলাচল মন। একদিকে জাতিভেদের পূর্ণ উচ্ছেদ তিনি সমর্থন করেন নি (যেমন 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে), অন্যদিকে জাতির বাঁধনছেঁড়া অনাচারে অভ্যস্ত মানুষ তিনি, নিম্নবর্ণের বৈষ্ণব সমাজের উদার সমাজনীতি ও রীতিতে মুক্তির দিগন্ত দেখেছেন। 'শ্রীকান্ত'-এ আছে সেই আখড়ার জীবন, 'পণ্ডিতমশাই'-এ কণ্ঠিবদল ইত্যাদি। 'একাদশী বৈরাগী' বর্ণহিন্দু সমাজের চাপে ধর্মান্তরিত বৈষ্ণব। একথা ঠিক, সমাজ সংস্কারকদের জাতিভেদ বিরোধী নির্ঘোষে শরৎচন্দ্রের সায় ছিলনা, সমাজসংস্থিতি তাতে বিপন্ন হবে এমন আশঙ্কা পোষণ করেছেন। [৩২খ] অন্যদিকে চতুর্বর্ণাশ্রমী হিন্দুধর্ম যখন কেবল মানুষকে বর্জন কবতে উৎসাহী, ধর্মধ্বজীদের সত্যমিথ্যা অভিযোগের শিকার সামাজিক মানুষেরা, তারা জাতিচ্যুত, তাদেব ধোপা-নাপিত ইত্যাদি বন্ধ—সেই সময়ে নিত্যানন্দের সমাজবোধ হিন্দুসমাজে পঞ্চম বর্ণ সৃষ্টি করেছিল। তাতে ধর্মান্তরিতদের গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদেব চলও ছিল।

শরৎচন্দ্রের এই স্ব-বিরোধী আচরণ রাধারানী দেবীর কাছে 'জীবনেরই একটি নিয়ম' মনে হয়েছিল। "শেষ জীবনে তিনি প্রথম জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাকে বদলে অন্য কথা বলেছেন।" তার মধ্যে আছে 'আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে শ্রদ্ধাশীল' হওয়া। [৩৩] রাধারানী লক্ষ্য করেছেন "বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর [শরৎচন্দ্রের] বেশ আকর্ষণ ছিল। তাঁর স্বাভাবিক মনঃপ্রকৃতির অনুকূল ছিল বৈষ্ণব ধর্মের রসসাধনা। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।" [৩৪] এই ধর্মে নিষ্ণাত কিছু খাঁটি মানুষকে শরৎচন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন পথে-প্রান্তরে চলার সময়। 'শ্রীকান্ত'-র চতুর্থ পর্বে তিনি এঁকেছেন তাদেরই ছবি—গহর গোঁসাই, কমললতা, দ্বারিকাদাস গোঁসাইয়ের মতো চরিত্রের মধ্যে। দ্বারিকাদাসের মুখে শুনেছি 'রসের দীক্ষা'র কথা। বৈষ্ণব ধর্মস্রোতের নিম্নগামিতার মধ্যেও শ্রীকান্তের চোখে পড়েছিল দ্বারিকা গোঁসাইয়ের মতো উজ্জ্বল বৈষ্ণব, যাঁর "কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই [ধর্ম নিয়ে] মাস্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জন ঘরের মধ্যে কাটে।...এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গি এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে যাওয়া শুধু সংকোচ নয়, দুঃখবোধ হয়।"

শরৎচন্দ্রের মন কীর্তনের রসে মজেছিল, সেকথা আগেই বলেছি। শ্রীকান্তের সামনে কমললতা চণ্ডীদাসের পদ গেয়েছে। একটি সংশয়ী মন তখন কীর্তনের ভাবরসের মাধুর্যে অলৌকিক জগতে উত্তরণ করেছে:

"মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের

দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে—মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি, নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি— ।...এই সকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল।...আমারও যেন মনে হইতে লাগিল, অদূরবর্তী ঐ পাথরের মূর্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।"

॥ ৬ ॥

জীবনরহস্যের সন্ধানে

শরৎচন্দ্রের উদাসীন জীবনের কথা আমরা শুনেছি। সেই ঔদাসীন্য গভীরতর জীবনপ্রশ্নে তাঁর মনকে কতখানি আলোড়িত করেছিল? জীবন কী কেবল প্রত্যক্ষদৃষ্ট পটচিত্র? জীবনরহস্য বলে কি কিছু নেই? নিয়তির সঙ্গে জীবনের সম্পর্কই বা কি? কালচেতনা কি কেবল তাৎকালিকতা, নাকি নিরন্তর প্রবাহিত কালস্রোতের অনুভূতি? এসব প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের মতো একজন গভীর মনের মানুষ সম্বন্ধে ওঠে। চিঠিপত্রের মধ্যে কিন্তু সে সকলের যথেষ্ট পরিচয় নেই। শরৎচন্দ্র তাঁর পত্রগুলিকে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রাপকের চরিত্র অনুযায়ী সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার কাজেই ব্যবহার করেছেন। হয়তো হৃদয়ের গভীর কথা বিনিময় করা যায়—এমন অন্তরঙ্গ মানুষ তিনি পাননি। কিংবা পেলেও দীর্ঘ চিঠিতে সেসব কথা লিখে যাওয়ার মতো ধৈর্য তাঁর ছিলনা। অথবা আত্মসংকোচ তাঁর স্বভাবগত। এও সম্ভব, পত্রকে তিনি তথ্যসংবাহক মনে করতেন, দার্শনিক রচনা নয়, পত্র যেন প্রবন্ধ না হয়ে ওঠে—ইত্যাদি তাঁর মত। তিনি রবীন্দ্রনাথ নন। এবং উপন্যাস বা কথাগল্পের বৃহৎ কালপটে মানবজীবনকে স্থাপন ক'রে দর্শন করাবার মতো মানসিক গঠনও তাঁর ছিলনা। তাঁর রচনার বিষয়ও সেইরকম নয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না।

সুতরাং পত্রের মধ্যে অনুরাগে-অভিমানে-ব্যঙ্গে-বিরক্তিতে তাৎক্ষণিক ভাবনায় উদ্‌বেজিত মানুষটিকে পাই। তার মধ্যে একান্ত নির্জন মানুষটির উপস্থিতি কতখানি? তবে মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে জীবনমৃত্যু রহস্যের ঝলক চোখে পড়ে। তার ব্যাপকতর পরিচয় পেতে হলে তাঁর কথাসাহিত্যই সন্ধান করতে হবে। শ্রীকান্তের অনির্দেশ্য উদাসীনতায় ভরা মানুষটির মধ্যেই তার প্রধান আশ্রয়। মহাশ্মশানের গহনরাত্রি শ্রীকান্তের চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল ঘন তমসার রূপ। আলোর খেলা শেষ ক'রে কৃষ্ণ অন্ধকার নিশীথের গভীর গম্ভীর রূপ ধারণ করেন—কৃষ্ণের সঙ্গে কালী মিশে যান। সেই মহারহস্য কোনো প্রশ্নের মীমাংসা করেনা—শুধু জীবনকে দেয় অনন্ত বিস্তার :

"কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য,

যত সীমাহীন—তাহা তো ততই অন্ধকার।...কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানিনা, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখিনা—তাহা ততই অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তাহার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই বাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম। ...এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল তা তো কোনো দিন জানি নাই। তবে হয়তো মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়তো তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।" [৩৫]

শরৎচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গভীর রূপ তাঁর মৃত্যুভাবনায়। তিনি যে নিজেকে বৈরাগী বলেছেন, তা মৃত্যুর জন্য তাঁর প্রশান্ত কামনা থেকে কিছুটা বোঝা যায়। যৌবনকাল থেকেই নানা ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত। তাঁর লেখা চিঠিপত্র অসুখের সংবাদে পূর্ণ। বার্ধক্য না এলেও অসময়ে নিজেকে তিনি বৃদ্ধ বলেছেন। আসলে জীবনের আঘাত ও অভিজ্ঞতা তাঁকে বৃদ্ধ করেছিল। কালের রেখা তাঁর শীর্ণ ভাবকাতর মুখে স্পষ্ট :

"মৃত্যুকে জীবদেহের অনিবার্য পরিণতি বলেই তাকে বরণ ক'রে নিতে হবে। সেজন্য মনকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুকে ভুলে থাকলে মন্দ হয়না—কিন্তু ভোলবার তো উপায় নেই। প্রকৃতি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মনে পড়িয়ে দেয়। আমি ঐ অনিবার্য পরিণতির জন্য মনকে প্রস্তুত করছি।" ('মৃত্যুপথে শরৎচন্দ্র', কালিদাস রায়, 'বাতায়ন' পত্রিকা, শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

মৃত্যুর মাত্র দু' বছর আগে শরৎচন্দ্র ঐকথা বলেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজেকে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন বহু আগে থেকে। ১৯১৩ সালে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চিঠিতে লিখেছেন :

"মৃত্যু একদিন হবেই, এবং তাহা সত্যই আসন্ন, সে চিহ্নও চারিদিকে ফুটে উঠেছে। তবে নিরর্থক চারিদিকে ছুটাছুটি ক'রে লাভ কি!" [৩৬]

এই বছরের অন্য চিঠিতে একই কথা :

"আমার সন্দেহ হচ্ছে আমার আর বেশিদিন নেই। হয়তো বা এই বছরটাই শেষ বছর।" [৩৭]

তেতাল্লিশ বছর বয়সে বলেছেন তাঁদের বংশে আজ পর্যন্ত কেউ চল্লিশে পৌঁছন নি। সেই হিসাবে পিতৃপিতামহদের তিনি হারিয়েছেন। [৩৮]

জীবনের ক্লান্তির ভার ক্রমশ অনুভব ক'রে আটচল্লিশ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

"দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা কেন?...কাল যদি এর ফেরবার ডাক পড়ে, বলি নে পরশু এসো।...অনেকদিন তো বাঁচলাম।...আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি বলেন ৪৯ [বছর] পুরো না হলে কিছুতেই যাওয়া চলবে না—আমি বলি, করোই না বাবা কিছুদিন মাপ।...দাও কিছু ছাড়। আমি শ্রান্ত হয়ে গেছি...।" [৩৯]

"আপনার [কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] চেয়ে একটু দেরি ক'রে আমি সংসারে এসেছিলাম, তাই বলে দেরি ক'রেই যে সংসার থেকে যেতে হবে, বিধাতার এমন কোনো কড়া আইন নেই।" [৪০]

"দেহটা সত্যই ভাঙল। বৈরাগীর জীবন যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল।" [৪১]

"এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না...।" [৪২]

"গিরীনের [গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] মৃত্যুসংবাদ পেলাম। সান্ত্বনা এই যে আমাদেরও খুব বেশিদিন আর নেই, নিষ্কৃতির পথে এসে পৌঁছেছি। [মৃত্যুর] দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে—[দবজা] খোলাব যা দেরি।" [৪৩]

সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তার 'ভয়ংকর-সুন্দর' ছবি আঁকার মতো শিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে সমুদ্রের প্রলয় ঝড় বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় :

"হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হালকা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণের একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানিনা।

"ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন এক রাজপুত্র এক ডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সাতশ রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করিতে করিতে পদভারে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে ; তবে রাক্ষসী সাতশ নয়, শতকোটি ; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধকরি তাদের আসাই ঢের ভালো ছিল।

"এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা তো ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া সুদ্ধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত!...

"হঠাৎ মনে হইল জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙিল, তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখদুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া তো সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি ; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা তো কখনো দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!...

"সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপরে খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমাব চক্ষের সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া দিল।"

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. দিলীপকুমাব বায়কে চিঠি, 'শবৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৪৪।
২. 'আত্মচরিত', শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাতায়ন' পত্রিকা, শবৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮, পৃ. ৩২।
৩ প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শবৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৩।
৪. ঐ, পৃ. ৬২।
৫. দিলীপকুমাব বায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩২৮।
৬. 'শবৎচন্দ্র', নবেন্দ্র দেব (আকব . 'শবৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩)।
৭. 'ব্রহ্মদেশে শবৎচন্দ্র', পৃ. ১৫-২৩।
৮. ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫।
৯. ঐ, পৃ ৯-১১, ৪৬।
১০. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শবৎচন্দ্র', পৃ. ৭৯।
১১. 'ব্রহ্মদেশে শবৎচন্দ্র', পৃ. ২১৪-২১৫।
১২. ঐ, পৃ. ২১৫-২২১। ব্যাপাবটা এখানেই থামেনি। তাঁব তামাশার ফল কি হয়েছিল তা জানতে শরৎচন্দ্র বিলক্ষণ কৌতূহলী ছিলেন। ১৯২২ সালে হাওড়াবাসী শবৎচন্দ্র গিবীন্দ্রনাথেব কাছে প্রসঙ্গটি তোলেন। অনিচ্ছুকভাবে তাঁকে এই সংবাদটি হজম কবতে হয়েছিল—মন্দিরের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, শশিবাবুর প্রদত্ত জমির একপাশে শশিবাবুর নামে ধর্মশালা হয়েছে। (গ্রহীতারা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না)। ইস্ট রেঙ্গুনে স্বামী শ্যামানন্দ বিরাট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হাসপাতাল তৈরি করেছেন। বিস্মিত শরৎচন্দ্রেব প্রশ্ন : *"তোমাদের এই স্বামীজীর কাছে আলাদীনের ল্যাম্প আছে নাকি?"* তার উত্তব গিবীন্দ্রনাথের কাছে প্রস্তুত ছিলই—সৎকাজের জন্য টাকাব অভাব হয়না। তিনি যোগ করেছিলেন : *"তোমাব বন্ধু [বামকৃষ্ণ মিশন-বিদ্বেষী] প্রিয় বাঁড়ুজ্জে মিশনেব কাজেব প্রসারতা দেখে অবাক হয়ে গিযেছে।"* (ঐ, পৃ. ৩২৩-২৪)।
১৩. 'স্বামী অখণ্ডানন্দ', স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন. কলকাতা-৭০০ ০০৩, মহালয়া ১৩৬৭, পৃ. ২২৭।
মজঃফবপুরে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্রেব সেবামূর্তির পবিচয তুলে ধবেছেন সেকালেব বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী : "শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল।—অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার, এমনি সব কঠিন কার্যের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। এইসব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু শীঘ্রই একটা স্থান করিতে পারিয়াছিলেন।" (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫)।

নিরুপমা প্রসঙ্গে স্পর্শকাতর অনুরূপা শরৎ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিরূপ হলেও এখানে শরৎচন্দ্রের সত্যরূপ উপস্থাপন করেছেন।

১৪. 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', (৪র্থ খণ্ড), শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ১৩৮৭, পৃ. ১৬০। অতঃপর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'।

১৫. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪২৫।

১৬. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৮৪। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একই কথা লিখেছেন শরৎচন্দ্র : "বাড়ির একটা পশুপক্ষীর মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারিনা, এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এতবড় থাকে এ যেন আমি জানিতাম না। কে জানিত ভিতরে ভিতরে আমি এতখানি দুর্বল ছিলাম।" (পৃ. ৩০১)।

১৭. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩৩৫। গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ঐ অভিযোগের জবাব দিয়েছেন : "শরৎদা! তুমি নিজের বুদ্ধির মাপকাঠিতে মহারাজকে যতটুকু ভেবে রেখেছে, তিনি ততটুকু ছিলেন না। মহারাজ মঠের সন্তানদের আধ্যাত্মিকজীবন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ভালবাসার ধারা ছিল অন্য রকমের। আত্মীয়স্বজনের কোল ছেড়ে যারা মঠের আশ্রয়ে আসত, মহারাজ তাদের সেবাশুশ্রূষা সমস্ত নিজের তত্ত্বাবধানে করাতেন।" (পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)। শরৎচন্দ্র একথার কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

১৮. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৩৩-৩৩৪। শরৎচন্দ্রকে একই কথা বলতে শুনেছি অন্য সময়ে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথকে বলেছেন : "আমার ধারণা, যেখানে যত আশ্রমধারী আছে, সবাই এক একটি মতলববাজ—ফাঁদ পেতে বসে আছে।" ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩৩৩)।

১৯. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩২৮-৩৩০। শরৎচন্দ্রের ঐ বক্তৃতার আরো কিছু অংশ অন্যত্র পাওয়া গেছে। মূল ভাব একই—রামকৃষ্ণ মিশনের ছিদ্রান্বেষণ—"স্বামীজী আজ শুধু ভারতবর্ষের নহেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...আমার বিশ্বাস, স্বামীজীর আদর্শ যদি আমরা অন্তরের সহিতই লইয়া থাকিতাম, তবে দেশ আরো আগাইয়া যাইত। আমরা তাহা করি নাই বলিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সামান্য দিনের মধ্যে যে-সামান্য ব্যাপার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে ভাঙাইয়া খাইতে হয়। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যরা যে-আধ্যাত্মিক দিকটির উপর সম্পূর্ণ জোর দিতেছেন, তাহার চাইতে বড় জিনিস তিনি দিয়া গিয়াছেন—তাহা দেশকে ভালবাসা, আত্মত্যাগ। আমি নিজে পরকালের জন্য ব্যস্ত নই। দেশের স্বাধীনতার মধ্যেই আমি আমার চরম মুক্তি পাইব। আমার মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমরা মুখেই বলি, তাহা অন্তরে পৌঁছে নাই। তাই আমাদের বাক্যে ও চিন্তায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। স্বামীজী অসত্যকে সকলের চেয়ে ঘৃণ্য বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।" ('বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১)।

২০. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯৭।

২১. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫১।

২২. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৪৫।

২৩. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৯১।

২৪. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪১৭।

২৫. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৪৫।

২৬. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১০৫।

২৭. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৩৫।

২৮. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৩৪।

২৯. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পাওয়ার ব্যাপারটি শরৎচন্দ্র একটি বইয়ের মলাটের ভিতরপৃষ্ঠায় লিখে রেখেছিলেন—

৬ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩১-১৯২৪
রাত্রি ১২টার সময় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন
দাশের নিকট হইতে একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পাইলাম।
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ('শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬)

গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যসভায় উপহার পাওয়া শাঁখ বাজিয়ে শরৎচন্দ্র প্রতিদিন রাধাকৃষ্ণের পূজা করতেন। ঐ শাঁখ পাওয়ার ব্যাপারটি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও পাওয়া যায় : "ঢাকাতে বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে একটি সমিতি ছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যচর্চা। শরৎ প্রথমবারে ঢাকায় গেলে বিশ্বভারতী সম্মিলনী তাহাকে একটি সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত শঙ্খে করিয়া মানপাত্র দিয়াছিল। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত গল্প করিয়া আমরা যখন ঘুমের উমেদারি করিবার জন্য একটু চুপ করিয়াছি, তাহার কয়েক মিনিট পরেই শরৎ মৃদুস্বরে ডাকিল—চারু,...সেই শাঁখটা কোথায় আছে? আমি বলিলাম—এই যে আমার কাছেই বিছানাতেই আছে। শরৎ বলিল—চারু, তুমি নইলে এমন জিনিস আমাকে কেউ দিতে পারত না। এটি আমার ঠাকুরকে দেব। রোজ এতে ক'রে তাঁর পুজো হবে।" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক, ১৩৪৫)।

৩০. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৮-১৯।

৩১. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯।

৩২ক. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৪৫–৪৪৬।

৩২খ. যে-শরৎচন্দ্র আপাতভাবে সমাজসংস্কার সমর্থক, সেই তিনিই সংস্কারের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। রেঙ্গুনে এবং কলকাতায় থাকার সময়ে তাঁর এই মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। সমাজসংসারের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে আগ্রহী যোগেন্দ্রনাথ সরকারের কথা শুনে শিউরে উঠে বলেছেন : "সর্বনাশ। শেকলের জোরেই সমাজ টিকে আছে। এই শেকল ছিঁড়ে গেলে যে, এক মুহূর্তেই সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন আর আমার সমাজ, ওমুকের সমাজ, বলে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। সেটা কি ভালো? এই থাকাটার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য, স্বাতন্ত্র্যই বৈশিষ্ট্য।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯৩)।

একই ধরনের কথা তাঁর মুখে কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীও শুনেছেন : "আমি যখন [সামাজিক] সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিই,...তা আমি মনের সঙ্গেই দিই—আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রেই দিই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমার মনের কোন এক অজ্ঞাত কোণ থেকে যেন Conservativeness মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আমাকে দুর্বল ক'রে ফেলে। এই ধর না জাতিভেদ। আমার বিশ্বাস, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা আমাদের জাতিগঠনের পরিপন্থী। কিন্তু যদি শুনি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে একজন ধোপার মেয়েকে বিয়ে করেছে, অমনি আমার বিবেক যেন বিরোধী হয়ে ওঠে।" ('শরৎচন্দ্র ও সমাজনীতি', কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৮)।

অথচ শরৎচন্দ্র ব্যক্তিজীবনে সমাজভাঙা মানুষ, সমাজের নীতিনিয়ম কোনোদিনই মেনে চলেন নি। এক্ষেত্রে সমাধানসূত্র হিসাবে বলতে পারি, ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিজেকে ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার মানার পক্ষে রায় দিয়েছেন —যদি সেই সামাজিক সংস্কার মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর হয়। যখন তা নয় শরৎচন্দ্র সামাজিক সংস্কার বিরোধী।

৩৩. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১০৪।

৩৪. ঐ।

৩৫. মহাশ্মশানের ভয়ংকব-সুন্দর রূপে মুগ্ধ পাঠক মৃণাল সর্বাধিকারী লিখেছেন : "মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র যে আলেখ্য আমাদের সুমুখে আবরণ উন্মোচন করিয়া ধরেন, তাহার সহিত কোনো চিত্রিত চিত্রের তুলনা হয়না। মহাশ্মশানের রূপবর্ণনা পড়িতে পড়িতে যেন অপূর্ব জ্যোতিতে সেই অন্ধকার নিশীথিনী, সেই ভয়াবহ মহাশ্মশান প্রদীপ্ত হইয়া আমাদের চক্ষুকেও অন্ধকার করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে।" ('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

৩৬. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৫৫।

৩৭. ঐ, পৃ. ৭২।

৩৮. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২১২। শরৎচন্দ্র ঐ চিঠিতে লিখেছিলেন : "শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছন নি। সে হিসেবে তো অন্তত পিতৃপিতামহদের হারিয়েছি।"

৩৯. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৪২। ৯ এপ্রিল ১৯২৪-এ কেদারনাথকে ঐ চিঠি লেখার কয়েক মাস পরে ১৪ অক্টোবর ১৯২৪-এ পুনশ্চ শরৎচন্দ্র কেদারনাথকে লিখেছেন : "আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ, একবার হাসি একবার কান্না—নিতান্তই আমার পুরনো হয়ে গেছে।" (ঐ, পৃ. ২৪৩)।

৪০. ঐ, পৃ. ২৯৪।

৪১. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩১২।

৪২. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫২।

৪৩. সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৯৩।

সপ্তম অধ্যায়

জীবন, প্রত্যক্ষ জীবন—শরৎসাহিত্যের ভিত্তি

॥ ১ ॥

অভিজ্ঞতাভিত্তিক বাস্তবতা আর তত্ত্বভিত্তিক বাস্তবতা

বাংলায় রোমান্স ও সমাজবাস্তবতামিশ্র উপন্যাস-ধারার স্পষ্ট সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়। তুলনায় সমকালের তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'য় সমাজবাস্তবতার অধিক স্বীকৃতি থাকলেও, আক্ষরিক অর্থে প্রখর সমাজচেতনাসম্পন্ন উপন্যাসের জন্ম হয়নি। বাস্তব সাহিত্যের নামে তখন রচিত হচ্ছিল সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস যেখানে ব্যক্তিমনের কিছু কথা স্বাভাবিকভাবে এসেছে। সত্যকার মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে সামাজিক তথ্য আছে, কিন্তু মনস্তত্ত্বের গভীরে সঞ্চরণ করেছে উপন্যাস। তাঁর 'গোরা'য় সমকালীন সমাজ এবং পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভারসাম্য রক্ষিত। আর 'চোখের বালি'তে 'আঁতের কথা' বের ক'রে দেখিয়েছেন তিনি। অবশ্যই গণমানুষের জীবনোত্তাপ অনুভূত হয়নি রবীন্দ্র-উপন্যাসে। সেই নিতান্ত পরিচিত কিন্তু সাহিত্যে অপরিচিত সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের রস-রহস্য-মহত্ত্ব-নীচতা নিয়ে আবির্ভূত হলো শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে।

রিয়ালিজমের তত্ত্ব শরৎচন্দ্র জানতেন। রেঙ্গুনে নানা বিষয়ে তাঁর বহু পাঠের সঙ্গে যুক্ত ছিল সাহিত্যতত্ত্বও। কিন্তু কোনো তত্ত্বের হাত না ধরে তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক জন-মানুষ নেমে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। এক্ষেত্রে কল্লোল-কালিকলম যুগের লেখকদের রচনার সঙ্গে শরৎ-রচনার বিশেষ মাত্রাগত পার্থক্য। রিয়ালিজম্ ও ন্যাচারালিজমের তাত্ত্বিক ব্যাপারটিকে সাহিত্যে প্রয়োগেব ক্ষেত্রে কল্লোল-যুগবন্ধদের অতি উৎসাহ বহুলাংশে কৃত্রিম এবং কিছুটা স্থূল সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। এঁদের মতো ক'রে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিলনা যে, বাস্তবতা তত্ত্বগ্রন্থ থেকে উঠে আসে। বহু অভিজ্ঞতার অক্ষরলেখা জীবনের পৃষ্ঠাগুলি তাঁর সামনেই খোলা ছিল।

অথচ কী-না মন্দ ভাগ্যের শিকার এই লেখক! তাঁর রচনাবিষয়ে ইদানীংকালের চলতি ধারণা—পল্লীগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তিনি কেবল গ্রাম্য দলাদলি, নীচতা, উৎপীড়ন, অবিচার, সামাজিক অত্যাচার ইত্যাদির কথা বলেছেন। বড় জোর অর্থনৈতিক দুর্গতি প্রসঙ্গ ইতস্তত এসেছে। তার বেশি নয়। অথচ স্নেহ, প্রেম, ত্যাগ, স্ত্রী-পুরুষের ব্যক্তিত্ব, উদারতা, বাৎসল্য, সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব, শরৎচন্দ্র কম দেখান নি। সেখানে আছে হিন্দু-ব্রাহ্ম দ্বন্দ্ব, শহুরে মানুষের চিত্র, সামাজিকের মধ্যে অসামাজিক মানুষ, বহুমাত্রিক মানুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত মানুষ। এসেছে বহির্গত-অন্তর্গত মানুষ; বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত আত্মদীর্ণ মানুষ; প্রতারক-প্রতারিত-আত্মসম্মোহিত মানুষ; অপথ-বিপথগামী

লোভার্ত মানুষ। প্রেমে ব্যর্থ শরৎচন্দ্র নৈরাশ্যের ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে ঘুরেছেন আলো-আঁধারির মধ্যে—কোথায় আছে জীবনের সার্থকতা, অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতা?

মানুষের সন্ধানে অগ্রসর শরৎচন্দ্র—চোখে সন্ধানী আলো নিয়ে।

॥ ২ ॥

'আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস'

ঐকথা বলার জোর শরৎচন্দ্রের ছিল। পরতে পরতে জমে-ওঠা অভিজ্ঞতা কল্পনাশ্রিত হয়ে যখনই বাণীরূপ পেয়েছে, তখনই সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাস। শরৎচন্দ্র সেই অর্থে দাবি করতে পারেন, তাঁর জীবনই উপন্যাস। সে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে জীবনের 'গভীর ও বহুবিচিত্র' অভিজ্ঞতা, 'অনেক আশ্চর্য কাহিনী'। সেসব নিয়ে 'আত্মজীবনী' লেখার তাগিদ শরৎচন্দ্রের ছিলনা। কেননা তিনি জানতেন, "জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না। সেই অভিজ্ঞতার ফল, একমাত্র সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি করার কাজে লাগতে পারে।" ('শরৎচন্দ্র', রাধারানী দেবী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন আড্ডাস্থল থেকেও। আড্ডা দেবার সময়ে তিনিই কেবল বাক্‌পতি ছিলেন না, অন্যের কথা শোনার জন্যও উন্মুখ থাকতেন উদগ্র ভঙ্গিতে। তুচ্ছ বিষয় পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। তীব্র তাঁর দৃষ্টিক্ষুধা। 'তরুণ গরুড় সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে।' দিলীপকুমার রায় লিখেছেন : "শরৎদার কৌতূহল এত নিবিড় ছিল যে, তাকে কৌতূহল না বলে তৃষ্ণা নাম দিতাম আমরা অনেকেই : যেন এ ও তা অজস্র তথ্য তাঁর না জানলেই নয়—যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি আহরণ তাঁর কাছে বিলাসের নয়—জীবনীশক্তির প্রত্যক্ষ খোরাক যোগায়। আজ যখন অতীতের ছায়ালোকের দিকে ফিরে তাকাই, তখন প্রায়ই আমার স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে তাঁর স্নেহকোমল অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।...একবার গিরিশ মেসোমশাই বলেছিলেন : 'দেখেছ মণ্টু, কীভাবে উনি দেখেন একদৃষ্টে— মনে হয় যেন আমাদের ভিতর অবধি সার্চলাইট চালাচ্ছেন'।"[১]

একই কথা রাধারানী দেবীরও : "শরৎচন্দ্র খুব ভালো শ্রোতা ছিলেন। অপরের কথা মন দিয়ে শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর।...ঝগড়াঝাঁটি বিরোধ বিসংবাদের খবরে একটুও নিরুৎসাহ নন। বরং বেশ আগ্রহে এগিয়ে প্রশ্ন ক'রে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা শুরু ক'রে দেন। আমরা অস্বস্তি বোধ ক'রে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলে আরো বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রে বলতেন—রোসো না, ব্যাপারটা ভালো ক'রে জেনে নিতে দাও সবটা। যদি বলেছি, অন্যের ব্যাপার জেনে আপনার কী হবে বড়দা? ওসব না শোনাই তো ভালো। অদ্ভুত একরকম চাপা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল ক'রে জবাব দিয়েছেন—আমি গেঁয়ো লোক, ঝগড়াঝাঁটি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে বালক থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম,...বাদবিসংবাদ নিয়েই তো সারা দুনিয়া ঘুরপাক খাচ্চে। পৃথিবীর সব দেশের মীথ্ পড়ে দেখ—গীতা, পুরাণ, কোরান, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল যেখানে যত পুঁথি দেখবে—ঝগড়া, কলহ,

মারামারি বাদবিসংবাদ নেই এমন বই পাবে না।"[২]

দ্রষ্টা এবং শ্রোতার অপূর্ব সমাহার এই মানুষটি বহমান জীবনের প্রতিটি তরঙ্গ, প্রতিটি বাঁকের ছবি অসীম কুশলতায় মনের পটে এঁকে নিতেন। ফলে ঘটত জনজীবনের সঙ্গে সর্বাত্মক একাত্মতা। আত্মপ্রসঙ্গ উল্লেখে স্বভাবকুণ্ঠ শরৎচন্দ্র কখনো কখনো জীবনের ব্যাপ্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা মেলে ধরেছেন—চিঠিতে এবং অন্তরঙ্গ মহলে।

"জীবনে যে ভালবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন যোগাবে?"[৩]

ও-বস্তু যে তাঁর সত্যই ছিল, চিঠিতে একাধিকবার শরৎচন্দ্র লিখেছেন, আবার কথাগুলি তুলে ধরছি :

"কবিকল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ ক'রে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেচি ; এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।"[৪]

নানা সময়ে মৌখিক আলাপেও একই কথা তাঁর। যেমন, দিলীপকুমার রায়কে একবার বলেছিলেন, মাসের পর মাস বছরের পর বছর তিনি "মাতাল, নেশাখোর, বাউণ্ডুলে, বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলে, অস্পৃশ্য, পতিতা, লম্পট...সম্ভবত খুনে বদমায়েশ"-দের সঙ্গে কাটিয়েছেন।[৫]

এ প্রশ্ন ওঠেই যে, ঐ পরিবেশে তাঁর মতো শিল্পীমানুষ কিভাবে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারতেন? রাধারানী দেবী উত্তর দিয়েছেন : অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র আপসহীন শিল্পীস্বভাবের মানুষ। সমাজদ্রোহ তাঁর মজ্জাগত। ফলে সমাজনীতির পরোয়া ক'রে অভিজ্ঞতা সংগ্রহে তিনি হাত লাগান নি। নিয়মভাঙা মানুষ বলেই স্বচ্ছন্দে "শূদ্রের শববহন, মৃতদেহ দাহ করেছেন সমাজের সামনে। সমাজে যারা ঘৃণিত, সেইসব শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মেলামেশা করেছেন। নিন্দিত ব্যক্তিদের বন্ধু হয়ে তাদের নিন্দার সিংহভাগ নিজে গ্রহণ করেছেন নির্ভীক মনে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে কখনো যাত্রার দলে, কখনো সাপুড়েদের দলে, কখনো সন্ন্যাসীদের দলে ভর্তি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শরৎদার মুখে শুনেছি—তিনি বাগ্‌দিপল্লীতে বসন্ত মহামারীতে দিনের পর দিন তাদের দেখাশুনো, মুখে জল দেওয়া, মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন।...বাউরিদের ঘরে একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে অচৈতন্য হয়ে ছয় সাত দিন কাটিয়ে বাসি আমানি পথ্য ক'রে দুর্বলদেহে অতি কষ্টে বাড়ি ফিরেছেন।"[৬]

মানবমনে যেহেতু বহুতল, তাই নানা স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষের বাহ্যিক আচরণে ভিন্নতা দেখা যায়। জীবনে বহু পোড়খাওয়া মানুষ শরৎচন্দ্র তা জানতেন। তাই আবশ্যকমতো অন্যকে সচেতন ক'রে বলেছেন, স্বল্পকালের আলাপে কোনো মানুষকে ভালো বা মন্দ বলে দেগে দেওয়া যায়না। মুখের অনাবৃত সুকোমল অংশ যদি সুন্দর

এবং সত্য হয়, তাহলে একই মুখের বীভৎস ক্ষতচিহ্নযুক্ত আবৃত অংশও কম সত্য নয়। শরৎচন্দ্রের সেসব কথার প্রাসঙ্গিক অংশ এইরকম :

"...সংসারে একটুখানি বাহ্যিক নিষ্ঠা বা সদ্‌ব্যবহার দেখলেই কাউকেই ভালমানুষ বলে ঠাওরানো মস্ত ভুল।...তোমরা [যোগেন্দ্রনাথ সরকার] তো রেঙ্গুন শহর ছাড়া বাইরে আর কোথাও এক পা বাড়াওনি—তাই নানারকম মানুষের সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান খুবই কম। যেতে একবার ইউ.পি, পাঞ্জাব, এমনকি বেহার অঞ্চলে, তো দেখতে পেতে মানুষের ব্যবহার। বাইরের মানুষটি যে ভেতরকার মানুষটির একটি আলাদা ছাঁচ, তা টের পাওয়া যায় ঐ সব দেশেই ; অবিশ্যি ভালো মানুষ খুবই আছে—তা না বললে ডাহা মিথ্যে কথা বলা হয়।"[৭]

বারবার শরৎচন্দ্র বলেছেন—এই বিপুল মানব-অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যের সম্পদ। সেই স্বীকারোক্তির কয়েকটি টুকরো অংশ :

"আমার চরিত্রগুলির ৯০% basis সত্য।...আমি যে চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যে পরিণতি দেখেছি, তাই লিখেছি।"[৮]

"আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫)।

"...আমি নিজের চোখে যা দেখি, আর নিজের মনে যা অনুভব করি, লেখার ভিতর দিয়ে কেবল সেইটুকু প্রকাশ করতে চাই।"[৯]

"আমি [মনোজ বসু] বললাম—আপনি মায়াবী। চরিত্রগুলোকে এমন জীবন্ত ক'রে এঁকেছেন যে মিথ্যা বলে কেউ মানতে চায়না। একটুখানি ভেবে নিয়ে তিনি [শরৎচন্দ্র] বললেন—মিথ্যাও হয়তো তারা নয়। জীবনে কত মানুষ দেখলাম, কত রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। লিখবার সময় সেইসব মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে বসি।" ('শরৎকথা', মনোজ বসু, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

॥ ৩ ॥

তাঁর অভিজ্ঞতায় পতিতা জীবন

শরৎচন্দ্রের প্রবল অনুভূতিবোধ ধাবিত ছিল বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত নারীর প্রতি। প্রতীচ্য মনস্তাত্ত্বিকদের নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে নানা আলোচনাও তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে। রেঙ্গুনে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বিপুল পড়াশোনার ফলিত উদাহরণ সংগ্রহে তিনি নেমে পড়েছেন। 'নারীর ইতিহাস' নামে বহু পরিশ্রমের সেই ফসল রেঙ্গুনের বিধ্বংসী গৃহ-অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। সে কষ্ট দীর্ঘদিন শরৎচন্দ্রের মনে জাগরূক ছিল। গৃহদাহের কিছু পরে ২২.০৩.১৯১২-তে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছেন : "আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের 'ম্যানাসক্রিপ্ট'—'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০/৫০০ লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।"[১০]

অনেক পরে ১৪.০৮.১৯১৯-এ লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিতে ঐ একই কথা, যদিচ সময়ের ব্যবধানে সেখানে তাৎক্ষণিক আর্তনাদ নেই: "আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬/৭ শত কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়।" [১১]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকেও শরৎচন্দ্র বলেছিলেন: "আজকাল Havlock Ellis খুব popular হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সব view আমি support করিনা। আমার নিজের একটা sex সম্বন্ধে লেখা ছিল। সেটা যদি থাকত, তাহলে দেখতে পেতে তোমার Havlock Ellis অতগুলো মোটা মোটা বই লিখে বিশেষ কিছু নূতন কথা বলেন নি।...সেবার যখন [রেঙ্গুনে] আমাদের বাড়িটা পুড়ে গেল,...তখন আমার ঐ manuscript-টা আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কিছুতেই বাঁচতে পারলে না। এগুলো বাঁচাবার জন্যে যে কি চেষ্টাই করেছিলুম!" [১২]

অবিনাশচন্দ্রকে এও বলেছিলেন, তাঁর বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় 'একজন মস্ত বড়ো psychologist.' পিতার অসমাপ্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার দায় পুত্র বহন করেছেন।

ঐ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল প্রথমত রেঙ্গুনের আলগা সমাজবন্ধন, দ্বিতীয়ত সমাজনীতির তোয়াক্কা না-রাখা। স্বেচ্ছা-ব্রাত্য এই মানুষটি স্বচ্ছন্দে পতিতা পল্লীতে গিয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে পারতেন।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনবাসী বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের পতিতা নারীর ইতিহাস সংগ্রহের আকর হিসাবে নির্দেশ করেছেন বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলের মিস্ত্রিপল্লীকে। ঐ পল্লীর বাসিন্দারা বাঙালি, পাঞ্জাবি, বর্মী, চীনা, মাদ্রাজী ও আরো নানা জাতের ও ধর্মের মানুষ। সকলের সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রী না-থাকায় ঐ অঞ্চলের অন্য নারীদের সঙ্গে তাদের 'আপসের মধ্যে বিবাহাদির আদানপ্রদান' চলত। শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন এই পল্লীতে কাটিয়েছেন। এদের একান্ত ঘনিষ্ঠ তিনি। "ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত বলিয়া মিস্ত্রিগৃহিণীরা সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং কেহ দুঃখ কষ্টে পড়িলে, বা চরিত্রহীন মদ্যপ স্বামীর হস্তে নির্যাতিত হইলে, অকপটে তাঁহার কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইতে লজ্জাবোধ করিত না।" এই আপস-বিবাহিত নারীরা ভদ্র হিন্দু সমাজেরই, মুহূর্তের প্রলোভনে পথভ্রষ্ট। শরৎচন্দ্র সে-বিষয়ে গিরীন্দ্রনাথকে বলেছেন: "এইসব নিগৃহীতারা অসহায় অবস্থায় নরপশুদের প্রলোভনে পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।...এমন কত পতিতা এই বর্ম্মা-মুল্লুকে এসে আশ্রয় নিয়েছে।"

"নারী আন্দোলনের [এই] ভাবনায়ক—এইখানে [মিস্ত্রিপল্লীতে] বসিয়াই বিভিন্ন স্তরের বহু নারী-চরিত্রের দুর্বোধ্য রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার বহু চমকপ্রদ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।" [১৩]—গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র কেবল বর্মামুল্লুক নয়, হাওড়া ও কলকাতার পতিতা পল্লীও। ঐসব পাড়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় রেঙ্গুনে যাবার আগেই। রেঙ্গুনবাসী হওয়ার পর ছুটি কাটাতে যখন স্বদেশে আসতেন তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর ঠিকানা হাওড়ার একটি পতিতালয়।

"বর্মা থেকেই আসি আর বেহার থেকেই আসি—আমি এসে দাঁড়ালেই ওদের

পতিতাদের] মধ্যে একটা খুশির সাড়া পড়ে যেত। তক্ষুনি ঘাটে নিয়ে যাওয়ার খাট একখানা এসে পড়ত আমার জন্যে।...শ্মশানে দেহ নিয়ে যাওয়ার খাটিয়া।...এক প্রস্থ বিছানা তার সঙ্গে। সেই খাটের মাপের তোশক চাদর বালিশ। শীতকাল হলে নতুন লেপ বা কম্বল একখানা।...সে কী ব্যতিব্যস্ত আয়োজন।...কালো কষ্টিপাথরের থালায় জুঁইফুলের মতো ভাত সুন্দর চুড়ো ক'রে বেড়ে, সাদা পাথরের বাটি গেলাসে নানা তরকারি আর জল।...আমি ছিলুম বাড়িউলি বুড়ির বাবাঠাকুর। একবার ওকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলুম। সেই থেকে সে আমাকে সত্যি সত্যি 'ঠাকুর' ক'রে তুলেছিল। আর সেই বস্তির ঘরে যত মেয়ে ভাড়াটে ছিল, আমায় তারা ডাকত বাবাঠাকুর। আমায় দেখলে তাদের আহ্লাদের সীমা থাকত না। সবাই মিলে আমায় খাওয়াত। যত্নআত্তি করত। যখনি ওখানে গেছি, নতুন খাটিয়ায় নতুন বিছানায় ধোয়ামোছা একখানা ঘরে শুয়েছি। ওরা কিন্তু আমাকে আন্তরিক ভালবাসত। কোনো দবকার তো ছিলনা আমাকে নিয়ে। আমি যে ওদের ঘেন্না করিনা, এইটুকু বুঝত বলেই বোধহয় সব্বাই ভালবাসত।"

শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা এই বিববণ লেখার সময় রাধারানী সন্তর্পণে বলেছেন, পতিতালয়ে তাঁর বাস, কিন্তু পতিতাগমন তাঁর স্বভাব নয় : "শরৎদা পতিতাপল্লীতে ওদের ক্রেতা হয়ে আনাগোনা করেন নি, একথা কিন্তু অনেকবারই বলেছেন [শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'বিষকন্যা' তাঁর কাছে ত্যাজ্য বস্তু]।...আমি শরৎদার একথা বিশ্বাস করি। পতিতাদের তিনি এমনভাবে দেখতে পেতেন না, যদি তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেহের মোহে জড়িত থাকত। [রাধারানীর এই বক্তব্য অবশ্য তর্কযোগ্য। এ-বিষয়ে 'মানুষটির সন্ধানে' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।] পতিতারাও বোধহয় এই অদ্ভুত প্রকৃতির পুরুষ মানুষটির কাছে এমন মন খুলে তাদের জীবনের সব কথা বলতে পারত না বিশ্বাস করে।" [১৪]

রাধারানীর এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়নি, 'বাবাঠাকুর' হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের কাছে পতিতারা মন খুলে সব কথা বলতে পেরেছিল কিনা, অথবা 'বাবাঠাকুর' হওয়ার আগেই তিনি সেসব জেনে ফেলেছেন।

অর্থের প্রয়োজনে দেহ-ব্যবসায়ী পতিতারাও ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের প্রলোভনকে জয় করতে পারে, তেমন একটি ঘটনা চিরকালের জন্য শরৎচন্দ্রের মনে দাগ কেটে বসে যায়। পরবর্তী বিখ্যাত জীবনে তা তিনি নানা মানুষকে বলেছেন। লিখিতভাবে সে প্রমাণ রয়েছে অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' এবং দিলীপকুমার রায়ের 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে। এই দুই বই মিলিয়ে ঘটনাটি উপস্থিত করছি। প্রথমে অবিনাশচন্দ্রের কথা :

"আমি রেঙ্গুনে যাবার আগে কিছুদিন উপীনের [উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] দাদার বাসায় ভবানীপুরে থাকতুম।...হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের সময় কোথা থেকে আমার ঠিকানা যোগাড় ক'রে, আমার এক পুরনো বিহারী-বন্ধু এসে হাজির। সে হচ্ছে কি একটা স্টেটের ম্যানেজার। হাতে তার বড় একটা গ্লাডস্টোন ব্যাগ। সে এসেছে কেনাকাটা করতে। রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে পরেরদিন কাজ সেরে আবার ফিরে যাবে। পরের বাড়িতে থাকি, তাই [বন্ধুর কথামতো পতিতার ঘরে] রাত কাটানোর ব্যবস্থা শুনে প্রথমটা আমি রাজি

হইনি। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। অগত্যা তার সঙ্গী হলুম। হাওড়ার ঘোলাডাঙায় একটা বাড়িতে গিয়ে ওঠা হলো। মেয়েছেলেটা পাঁচটি টাকাতেই হাসিমুখে রাজি হলো।"[১৫]

অবশিষ্ট অংশ দিলীপকুমারের রচনায়: একাধিক নর্তকী সহযোগে নাচ এবং মদ্যপানের প্রচুর আয়োজনও ছিল। শুকনো রাত কাটানো নয়। ঢক্‌ঢক পান সেরে সকলের শেষে শরৎচন্দ্রও কাত। "সকালবেলা ঘুম ভাঙল [বন্ধু] প্রমোদবাবুর হাহাকারে! চোখ চেয়ে দেখি তিনি বুক চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন—'হায় হায় সব চুরি গেছে গো, সব লোপাট! পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা! কী হবে? এ টাকা আমার নয়—জমিদারের উশুল-করা খাজনা। ভেবেছিলাম দু-তিনশো টাকা এ থেকে খরচ ক'রে ফূর্তি ক'রে ফিরব—কিন্তু এবার—হায় হায় চাকরি তো গেলই, জেল অবধারিত...' ইত্যাদি ইত্যাদি ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না। খোঁজ খোঁজ খোঁজ! কোথায় এ-ঘরের ঘরণী? দেখি পাশের ছোট ঘরে সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে—কোমরে শাড়ির আঁচল কোমরবন্দের মতন দু'তিন পাকে জড়িয়ে। তাকে জাগাতে সে কচলাতে কচলাতে সব শুনল। তারপর প্রমোদবাবুকে বলল: 'আপনার কি মাথা খারাপ বাবু? নৈলে এত টাকা নিয়ে কেউ আসে এসব জায়গায়—যেখানে দু' চারটে টাকার জন্যে মেয়েরা ছাড়ে লজ্জাশরম, গুণ্ডারা ক'রে খুনখারাপি? আমি তো থ হয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাণ্ড দেখে—সবার সামনে পকেট থেকে নোটের পর নোট বার ক'রে ফেলে দিচ্ছেন—একী ব্যাপার! দেখি সবারই চোখ আপনার পকেটের উপরে—কখন আপনি বেসামাল হবেন। ভেবেচিন্তে শেষে আমি করলাম কি—আপনি ঘুমে এলিয়ে পড়তে না পড়তে আপনার পকেট থেকে নোটের গোছাটা উঠিয়ে আমার আঁচলে বেঁধে দু' পাক জড়িয়ে কোমরবন্দ মতন ক'রে ঘুরিয়ে পুঁটুলিটা গুঁজে রাখলাম আমার তলপেটের দিকে—যাতে কেউ টানলেই আমার ঘুম ভেঙে যায়! এই নিন আপনার সে টাকা বাবু—কিন্তু আর কখ্‌খনো করবেন না এমন বোকামি।"[১৬]

॥ ৪ ॥

অভিজ্ঞতা—সাহিত্যে এবং মৌখিক আলাপে

অধিক পরিশীলন ছাড়াই শরৎচন্দ্রের দৃষ্ট বাস্তব অনেক সময় তাঁর সাহিত্যে প্রায় অবিকৃত আকারে উপস্থিত। নারীমুখের মিছিল সেখানে—স্বাভাবিক দেহসুখবঞ্চিতা বালবিধবা, মৃত্যুকামনায় অধীর বৃদ্ধা, স্বামী-পরিত্যক্ত সধবা কিংবা সংসারবহির্বর্তী ভৈরবী। এদের শরৎচন্দ্র খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সাহিত্যে যেমন তাদের রূপায়ণ করেছেন, তেমনি মৌখিকভাবেও সেসব বলেছেন কিছু কিছু মানুষকে। মোহিতলাল মজুমদার ঢাকায় শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছিলেন—ব্রাহ্মণ বালবিধবা নিরুদির দীর্ঘদিনের কল্যাণময়ী সেবারূপের কথা, পরে সহসা তাঁর পদস্খলন, সেজন্য উপকার-বিস্মৃত সমাজের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, গ্রামপ্রান্তে পরিত্যক্ত যন্ত্রণাকাতর নিঃস্ব জীবন এবং শোচনীয় মৃত্যু। শরৎচন্দ্র এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।[১৭] 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম পর্বে এই কাহিনী উপস্থিত করার সময় শরৎচন্দ্র 'নিরুদিদি' নামটি পর্যন্ত বদলান নি।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে মৃণালের শাশুড়ির মৃত্যুকামনার মর্মান্তিক রূপ একান্ত বাস্তব—অন্তত দুজন মানুষকে সেকথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। তাঁর দিদি অনিলাদেবীর অতিবৃদ্ধ দিদিশাশুড়ির একান্ত মৃত্যুকামনার প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্রের সেই অভিজ্ঞতা মোহিতলালের স্মৃতিকথনে :

"সেদিন রাত্রে একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল—আমি [শরৎচন্দ্র] বাহিরের ঘরে শুইতাম, ভিতরে উঠানের দিকে বারবার একটা কিসের শব্দ হইতেছে। দরজা খুলিয়া উঠানে নামিয়া শব্দের নিকটে আসিয়া দেখি—উঠানের মাঝখানে যে ঠাকুরঘর আছে, তাহারই দুয়ারে পৈঠায় সেই বৃদ্ধা পাগলের মতো আপনার মাথা ঠুকিতেছে, আর বলিতেছে, 'তুমি আমাকে নেবে না—এত ক'রে ডাকছি, তবু তোমার দয়া নেই!' স্থানটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে।"[১৮]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে একই কথা বলেছিলেন শরৎচন্দ্র। শুষ্ক জীবনের বিবর্ণ চেহারার থেকেও মৃত্যু আপন।[১৯]

কৌলীন্য গর্বে স্ফীত বংশের কুলকলঙ্ক-কথাকে কাহিনীর কেন্দ্রে স্থাপন ক'রে শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু স্পর্শকাতর বলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সতর্ক ক'রে বলেছিলেন : "লেখো, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিও না। কুলীন ব্রাহ্মণ আমি, আমাকেও লাগবে, ও রকম কোরো না।" উল্টোদিকে শরৎচন্দ্র দৃঢ় ছিলেন এই সিদ্ধান্তে—"এ সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত experiences আছে।"[২০] অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ('বাতায়ন' পত্রিকা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮ এবং 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' গ্রন্থ) এবং হরিহর শেঠ ('বসুমতী', মাঘ ১৩৪৪) শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা ঐ কাহিনী লিখেছেন।

অবিনাশচন্দ্র শুনেছেন—কোলাঘাট স্টেশনে পানবিক্রেতা জনৈক স্ত্রীলোকের কলঙ্কের ইতিহাস শরৎচন্দ্রকে নাড়া দিয়েছিল : "আমার 'বামুনের মেয়ে'তে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের যা চরিত্র, তা আমি এ থেকেই পেয়েছি।" ঐ স্ত্রীলোকের "ছেলেরা তাদের জন্ম সম্বন্ধে এতটুকু সন্দিগ্ধ নয়, অথচ সেই প্রশ্নেই তাদের মায়ের মুখ কালো হয়ে ওঠে।" নিজ কলঙ্কের অপচ্ছায়া থেকে সন্তানদের রক্ষার জন্য এই নারী চিরতরে গৃহত্যাগী, তারপর সে পানবিক্রেতা ; সমাজ ও সংসারের কাছে নিজ অস্তিত্ব নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। তারই পদস্থ সরকারী চাকুরে ছেলে বংশগর্বে স্ফীত, "না থাকবেই বা কেন? সে তো জানেনা যে কি দুঃখে তার মা ঘর ছেড়ে চলে গেছে—আর ফিরে আসেনি।"[২১]

হরিহর শেঠ অপর একটি কাহিনী শরৎচন্দ্রের কাছে শুনেছেন। কালনার কাছে 'সোনার নদী বা ঐরূপ নামের কোনো একটি গ্রামে' শরৎচন্দ্র অপরিচিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে অতিথি, সে পরিবারে বিধবা কন্যা থাকা সত্ত্বেও দুদিন তিনি স্বপাকী ; পরে "সেই ব্রাহ্মণ কন্যার কৌলীন্য প্রথার কফলোদ্ভূত জন্মগত কলঙ্কের কথা বিশদভাবে অবগত হইলেন।"[২২]

এসব ছবি মিলেমিশে নির্মিত প্রিয় মুখুজ্যের মা। স্বামী মুকুন্দ মুখুজ্যের পরিচয়ে

আগত 'হিরু নাপতে'র সঙ্গে সহবাসের ফলে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন পুত্র প্রিয়কে। কলঙ্ক প্রকাশের পর তিনি কাশীবাসী "সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি তিনি কাউকে মুখ দেখান নি।"

ভৈরবীর সঠিক চরিত্র কি শরৎচন্দ্র আঁকতে পেরেছেন? এ-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা কি যথাযথ? প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথের। একবার মৌখিক আলাপে, দ্বিতীয়বার দুটি চিঠিতে কবির একই প্রশ্ন। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসদনে দিলীপকুমার রায়ের উপস্থিতিতে শরৎচন্দ্রকে ঠাট্টা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "...তোমার ভৈরবীকে দেখলে গানের সুরে 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' বলতে ইচ্ছে হলেও মনে হয়, গদ্য নাটক নভেলে তো বিভীষিকাই জাগবার কথা—অন্তত নাম শুনলে।"[২৩] 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' পড়েও রবীন্দ্রনাথের মনোভাব একই। ৪ ফাল্গুন ১৩৩৪-এর শরৎচন্দ্রকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন : "যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়।...যে-কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত, সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা,· লোকরঞ্জনকর আধুনিককালের চলতি সেন্টিমেন্টমিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়।"[২৪]

১১.০৩.১৯২৮-এ পুনশ্চ তিনি লিখলেন : "তোমার নাটকে যে পারস্‌পেকটিভ-এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত, তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে বলতে, তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্যরকম হতো —মূল কথাটা বজায় থাকত, কিন্তু [বর্তমান] রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।"[২৫ক]

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ খণ্ডন ক'রে ফিরতি চিঠিতে শরৎচন্দ্র দৃঢ়ভাবে লিখেছেন, "অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে" লিখিত 'ষোড়শী' নাটক। এই অতিরিক্ত বাস্তবতার জন্য তাঁর কল্পনার আনন্দ ও গতি প্রতি মুহূর্তে খর্বিত। ফলে "অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা"—এই সন্দেহ তাঁর ক্রমেই গভীর। মোটকথা, অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য 'দেনাপাওনা' উপন্যাস এবং 'ষোড়শী' নাটকে যে ছিলই, শরৎচন্দ্র তা স্পষ্ট ক'রেই জানিয়েছেন।[২৫খ]

॥ ৫ ॥

কথাসাহিত্যে আত্মপ্রসঙ্গ : জীবনের বঞ্চনায় সাহিত্যে যন্ত্রণার ছবি

উত্তরজীবনে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত শরৎচন্দ্র নিজ অতীত সম্পর্কে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার কারণে সে ব্যাপারে অন্যের লাগামছাড়া কৌতূহলে রুষ্ট হয়েছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র তাঁর সেই জীবনের ছবি দু'এক ঝলক দেখেছেন—শরৎচন্দ্রেরই

স্মৃতিমেদুর এবং স্মৃতিবিধুর কণ্ঠস্বরে। এঁরা ভাগ্যবান। তেমনই একজন অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শুভদা' উপন্যাস পড়ে অবিনাশচন্দ্র বুঝেছিলেন, ব্যক্তিজীবনের কঠিন দারিদ্র্য উপন্যাসে অন্নহীন মানুষের ক্ষুধিত চেহারায় মূর্ত। অবশ্য স্রষ্টার নৈর্ব্যক্তিকতা উপন্যাসে বজায় ছিল।

আপন দারিদ্র্যের কথা অবিনাশচন্দ্রকে বলার কালে শরৎচন্দ্র বিত্তবান মানুষ। তবু পূর্বতন ভয়ংকর স্মৃতি কোন্ গভীর রেখায় তাঁর মনকে রক্তাক্ত ক'রে রেখেছিল, তা তিনি কোনোভাবে তা গোপন করেন নি : "দুঃখ জিনিসটা এমনি যে জীবন দিয়ে তাকে উপলব্ধি না করলে, কোনোদিন তার সত্য রূপটা ধরা পড়েনা। এদের [সামতাবেড়ের হতদরিদ্র মানুষদের] দেখে আমার নিজের গোড়ার জীবনটা যেন ছবির মতো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।"

একথা বলার সময় এই ইঙ্গিতও ছিল, শরৎচন্দ্রের কোনো একটি উপন্যাসে সে ছবি এসেছে। পরে 'শুভদা' পড়ে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন : " 'শুভদা'র মধ্যে পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন দুঃখকষ্টের যে মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে subjective মনের এমন একটি পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাঁর নিজের বাল্যজীবনেরই চিত্র বলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এমনকি [উপন্যাসের] উক্ত পরিবারের পোষ্যদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তদানীন্তন পরিবারবর্গেরও একটা মোটামুটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়।...জীবনধারণের দুঃখ যে 'লঙ্কা-মরিচের মতো জ্বলে', তা শরৎচন্দ্র নিজের জীবনে তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই 'শুভদা' লিখতে পেরেছিলেন।" [২৬]

অপরের কাছ থেকে কেবল অর্থসম্পদ লাভে নয়, অন্যের হৃদয়সম্পদ লাভেও বঞ্চিত তিনি। নিরুপমার প্রতি তাঁর নিরুচ্চার প্রেমের রূপ দেখেছি 'নিঃশব্দ প্রেম : দারুণ দহন' অধ্যায়ে। তাঁর জীবন ও তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সেতু রচনা করেছে এই ব্যর্থ প্রেম তাঁর প্রথম পর্যায়ের চারখানি গল্প-উপন্যাসে—'মন্দির', 'বড়দিদি', 'পল্লীসমাজ', 'পথনির্দেশ'। শরৎচন্দ্রের মতোই ক্রমজাগ্রত প্রেমের উপলব্ধি গল্পের নায়কদের মধ্যেও ; আর নিরুপমার মতো অনুভূতিশীল বালবিধবা নায়িকা কর্তৃক সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান। এই ছক ধরা পড়েছিল রাধারানী দেবীর কাছে। রাধারানী দেখিয়েছেন, প্রথমত শরৎচন্দ্রের জীবন ও হৃদয়ের কেন্দ্রীয় সমস্যা তাঁর সাহিত্যেরও সমস্যা ; দ্বিতীয়ত ঐ চার গল্পের নায়ক কিছু পরিমাণে শরৎচন্দ্রের আদলে এবং নায়িকারা অনেকাংশে নিরুপমার অন্তঃপ্রকৃতি অনুযায়ী গঠিত ; তৃতীয়ত নায়ক-নায়িকার চারিত্রিক ক্রমবিকাশ ঘটেছে গল্প থেকে গল্পান্তরে। বিবাহে পরিণতি না-পাওয়া অচরিতার্থ প্রেম সম্পর্কে শরৎ-চিন্তনেও ক্রমবিবর্তন লক্ষিত। রাধারানীর এই মত আমরা বহুলাংশে স্বীকার করি। ক্ষেত্রবিশেষে অন্য মতও পোষণ করেছি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর উপরিউক্ত গল্পের নায়কদের কেবল অন্তর্গত নয়, বহির্গত কিছু সাদৃশ্যও আছে। 'মন্দির' গল্পের শক্তিনাথ এবং 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটেছে—তা যেন শরৎচন্দ্রের যৌবনসত্তার মৃত্যু, যে চেয়েছিল নিরুপমাকে। বাঞ্ছিতাকে না-পাওয়ার বেদনা মৃত্যুর থেকে কম নয়। লক্ষণীয়, এই দুই নায়কের মধ্যে শরৎচন্দ্র

তাঁর ব্যক্তিজীবনের বৈষয়িক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে অনায়াসে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। শক্তিনাথ তাঁরই মতো মাতৃহীন, সামাজিক দায়িত্বহীন কিশোর-যুবা। যে-বৈষয়িক প্রাচুর্য থাকলে নিরুপমার দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত তিনি হতে পারতেন বলে ভেবেছেন, তা সবই ছিল সুরেন্দ্রনাথের—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, পৈতৃক সম্পত্তি, মাতামহের জমিদারী। 'পল্লীসমাজে'র রমেশ এবং 'পথনির্দেশে'র গুণীন্দ্রও বিত্তশালী জমিদার। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের কঠিন দারিদ্র্যের ফল দাঁড়িয়েছে তাঁর তিন প্রভৃত অর্থবান নায়কের জন্ম। স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়—সাহিত্যে হয় কল্পনায়।

নায়িকা চরিত্রের বিন্যাসের ক্ষেত্রে নিরুপমার ছায়া লক্ষ্য করেছেন রাধারানী। তাঁর মতে, অর্পণা প্রথমে শক্তিনাথের প্রেম সম্পর্কে বোধহীন, পরে শক্তিনাথের মৃত্যুতে অর্পণার মধ্যে প্রেমবোধের উন্মেষ ; "কুড়িয়ে আনা দেলখোস হাতে নিয়ে জন্ম হলো যুবতী অর্পণার।" অর্পণা চরিত্রের অধিক বিকশিত রূপ মাধবী। সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর প্রতি "নিজের মনের গভীর অনুরাগের প্রকৃতি চিনতে পারেনি।" কিন্তু মাধবী পেরেছে এবং তা "লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরম উপভোগ মনে করি। এখানে তাঁর হৃদয়ের নিজস্ব সার্থকতার পরিতৃপ্তি।" 'পল্লীসমাজে'র রমা প্রেমের উপরে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সুনামকে স্থান দিয়ে সমাজবিধির কাছে নতশির নায়িকা, সে 'স্বার্থপর'। "কড়া কর্তব্যবোধ আর সামাজিক কল্যাণবুদ্ধিকে হাতিয়ার ক'রে নিজেরই সঙ্গে নিজের লড়াই তার।" অন্যদিকে, "খোলাখুলি হিন্দু বালবিধবা প্রেমের মুখে ভালবাসার কথা বসান লেখক।...হেমের মন নির্ভীক, সে সমাজকে গ্রাহ্য করেনা। তার কাছে নিজের হৃদয়, মন আর আশা আকাঙ্ক্ষা একটুও অস্পষ্ট নয়।"[২৮]

রাধারানী কর্তৃক নায়ক-নায়িকা চরিত্রের এই বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে সনতারিখের হিসাব নেওয়া প্রয়োজন। ১৩০৯-এ 'মন্দির', বৈশাখ ১৩১৪-এ 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি', বৈশাখ ১৩২০ 'যমুনা' পত্রিকায় 'পথনির্দেশ', আশ্বিন-পৌষ ১৩২২-এ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'পল্লীসমাজ' প্রকাশিত। গল্প প্রকাশের এই কালপরম্পরা না-মেনে নায়ক-নায়িকা-চরিত্র বিকাশে লেখকের মনোভাবের ক্রমবিবর্তন দেখিয়েছেন রাধারানী—'পথনির্দেশে'র আগে স্থান দিয়েছেন 'পল্লীসমাজ'কে। তা করার কারণ ইঙ্গিতে তিনি বলেছেন :

"শরৎচন্দ্রের সংকেত-কুশলতা 'বড়দিদি' বই থেকেই সার্থক হয়ে শুরু। আমার মনে হয় 'বড়দিদি' বইখানি পড়ার পরেই সম্ভবত লেখকের কাছে নিরুপমার অনুরোধ এসে থাকতে পারে, 'বালবিধবা চরিত্র আপনি না আঁকলে ভালো হয়'।"[২৮]

তাহলে 'বড়দিদি'র পরেও 'পথনির্দেশে' বালবিধবা চরিত্র আঁকলেন কেন শরৎচন্দ্র? নিরুপমার অনুরোধ কখন এসেছিল তাঁর কাছে—'বড়দিদি', অথবা 'পথনির্দেশ রচনার পরে? 'বড়দিদি' রচনার সাত বছর পরে বৈশাখ ১৩২০-তে 'পথনির্দেশে' শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন গুণীন্দ্রের কাছে বিধবা হেমের সর্বস্ব নিবেদন। গুণীর ইতস্তত মনোভাব সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে গুণীন্দ্র-হেমের বিবাহ না দিয়ে ভাইবোনের মতো তাদের কাশীবাস করিয়েছেন লেখক। এই গল্প প্রকাশের ঠিক এক বছরের মাথায় চৈত্র ১৩২০-র 'সাহিত্য' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র পুনশ্চ লিখলেন 'অনুপমার প্রেম' যেখানে জল

থেকে উদ্ধারের পর বিধবা অনুপমার সঙ্গে ললিতমোহনের বিবাহের সম্ভাবনা ছিলই। এ গল্পটি রাধারানীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এখানে নিরুপমা-শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের ছায়াপাত লক্ষ্য ক'রে গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন :

"[অনুপমার মতো] নিরুপমা দেবীও ধনী নফরচন্দ্র ভট্টর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা ছিলেন। [অনুপমার মতো] নিরুপমাও অল্প বয়সে গল্প-উপন্যাস পড়তেন। তাঁর স্বামী নবগোপাল ভট্ট বি.এ. পড়ার সময় যক্ষ্মারোগে মারা যান [অনুপমার স্বামী রামদুলাল দত্তের 'কাশরোগে মৃত্যু']। তিনি বিধবা হয়ে বড় ভাই-এর সংসারে ছিলেন। 'অনুপমার প্রেম' গল্পের ললিতের ন্যায় শরৎচন্দ্রও যে-কোনো কারণেই হোক অল্প বয়সেই মদ ধরেছিলেন এবং তিনিও ছিলেন ভাগলপুরে খঞ্জরপুর পল্লীতে নিরুপমা দেবীদের প্রতিবেশী। 'অনুপমার প্রেম' গল্প লেখার মধ্যে শরৎচন্দ্রের মনের কথা বা উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি কি এই গল্পে নিরুপমা দেবীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, বিধবা হয়ে দাদা-বৌদির সংসারে থাকার চেয়ে যে তাঁকে সত্যকার ভালবাসে তাকে বিয়ে করা অনেক ভালো!" [২৯]

এইখানে রাধারানীর বক্তব্য বিষয়ে আমার মত ভিন্ন। 'বড়দিদি' নয়, 'পথনির্দেশ' এবং 'অনুপমার প্রেম' পড়েই নিরুপমা বালবিধবার চরিত্রাঙ্কনে বারণ ক'রে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। শরৎচন্দ্র ভুল শুধরে নিয়ে ১৩২২-এ ধারাবাহিকভাবে 'পল্লীসমাজ' লেখেন যেখানে বিধবা রমা তার সম্ভ্রম রক্ষা ক'রে কাশীতে চলে গেছে। বিধবাবিবাহের সম্ভাবনা তখন সুদূরপরাহত।

প্রথম জীবনে অন্তত দুবার সন্ন্যাসী হন শরৎচন্দ্র। প্রথমবার ভাগলপুর থেকে। রাধারানীকে তিনি বলেছেন, একটি 'চিরকুট' এসেছিল নিরুপমার কাছ [পূর্বোদ্ধৃত সেই কথাগুলি এখানে পুনশ্চ উদ্ধৃত] : "আপনি এদেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যান। এখানে আর আসিবেন না। আমাকে এভাবে নষ্ট করিবেন না।" রাধারানীর মতে ঐ 'নষ্ট' শব্দটি শরৎচন্দ্রের বুকে দাগ কেটে বসে যায়। তাই বালবিধবা রমা এবং হেমের মুখে ঐ শব্দটি তিনি বসিয়েছেন। রমা বলেছে :

"আমি মিনতি করচি রমেশদা, ***আমাকে সবদিকে নষ্ট কোরো না, তুমি যাও।—যাও এদেশ থেকে।"***

হেমের কথা একই :

"তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা বলচো, আমি স্পষ্ট ক'রে তোমার মুখের সামনেই তা বলচি। ***তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও। বিধবার আবার বিয়ে কি গুণিদা?***

এই দুই সংলাপের প্রেক্ষিতে রাধারানীর সঙ্গত মন্তব্য :

"এ কার মুখের নির্মম কথা তিনি তাঁর নায়িকার মুখে তুলে দিয়ে অক্ষয় ক'রে গেছেন!" [৩০]

শরৎচন্দ্র আরো একটি কাজ করেছেন—রাধারাণীর লেখায় তা অনুপস্থিত। নিরুপমার ব্যবহারিক জীবনকে তিনি তাঁর নায়িকাদের মধ্যে কার্যত ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। অর্পণা ধর্মপ্রাণা, আচারবিচারে অভ্যস্ত ; মাধবী গৃহকর্ত্রী হিসাবে সকলের

প্রতি যত্নপরায়ণা, সাংসারিক প্রতি কাজে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ; হেম এবং অনুপমা পড়াশোনায় মনোযোগী, গ্রন্থ তাদের জীবনসম্বল। এই সবক'টি কাজ নিরুপমাকে করতে দেখা গেছে। একটি ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটতে পারে। আমরা জানিনা, রমার মতো নিরুপমাও দাপটে জমিদারী চালাতেন কিনা। সব মিলিয়ে এটা বলতেই পারি, নিরুপমার ছবিকে শরৎচন্দ্র তাঁর নায়িকাদের মধ্যে ফোটাতে আগ্রহী ছিলেন।

ব্যক্তিপ্রসঙ্গের সূত্রে 'শ্রীকান্ত'-র উল্লেখ করতেই হয়। এই আত্মজৈবনিক উপন্যাসের বিষয়ে চিঠিতে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি—তাঁর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে এই উপন্যাসেব বিশেষ যোগ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ঐ কাহিনী মুদ্রিত হবে, এই কথা জেনে (অথবা মুদ্রিত হওয়ার অনতিবিলম্বে) পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ১৫.১১.১৯১৫-এ তিনি লিখেছেন :

"শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে [আমার] কতকটা সম্বন্ধ তো থাকিবেই, তাছাড়া ওটা [আমার] ভ্রমণই বটে। তবে 'আমি' 'আমি' নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।" [৩১]

শরৎচন্দ্র আগ্রহী ছিলেন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' সম্বন্ধে পাঠকের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে। পাঠকের মত তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে, তা না শোনা পর্যন্ত পুনরায় ঐ ভ্রমণকাহিনী লিখতে তিনি নারাজ। সেকথা বলার সময়ে শ্রীকান্তর সঙ্গে নিজের পার্থক্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখবে না।" [৩২]

এমনও হওয়া সম্ভব, 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' শুরু করার সময় শরৎচন্দ্র নিজে এটিকে ভ্রমণকাহিনীর বেশি ভাবতে চাননি। গল্পের দীর্ঘ সম্ভাবনার উল্লেখ ক'রে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন : "যদি বলেন তো আরো লিখি—আরো অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে।...শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।" [৩৩] অর্থাৎ আত্মকাহিনী থাকছেই। তবে অমিত্রের প্রচার সেখানে থাকবে না—একথা বোঝানোর সময় সপক্ষে 'রবিবাবুর' 'আত্মকাহিনী'র উল্লেখ করেছেন। পরে পরিকল্পনা বদল করায় 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' চার পর্বের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দাঁড়িয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে ও পারিবারিক জীবনের কোন্ প্রেক্ষায় 'শ্রীকান্ত' রচিত, তার পক্ষে একাধিক বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করব। 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম পর্বে অভিভাবকদের কঠিন শাসন, মেজদার কড়া তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করা, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের' আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনার সত্য ভিত্তি সম্বন্ধে অবহিত করেছেন শরৎ-মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অবশ্য কাহিনীর খাতিরে শরৎচন্দ্র কিছু পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু মূল সত্য একই।

"আমাদের বাড়ির কর্তারা ছিলেন বড় কড়া। ছেলেমেয়েদের স্নেহ কি আদর দিলে তাহাদের পরকাল নষ্ট হইবে মনে করিয়া শাসনের মাত্রা সকল সময়েই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। তাঁহাদের প্রীতি পাইবার উপায় ছিল বই-শ্লেট লইয়া বাহিরের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া অতি প্রভাতে তারস্বরে চিৎকার করা, এবং সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে একটি ম্লান প্রদীপের চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া পাঠ-অভ্যাস।...আমার অগ্রজ দাদা এবং শরতের সেটা ছাত্রবৃত্তির

বয়স—তাই নিরন্তর পাঠে মন আছে, এমন দেখানোর প্রয়োজন হইত। বলা বাহুল্য যে এই বয়সে কিছুতেই পাঠে মন বসিতে চাহে না।...

"একদিন চামচিকা-বধের আগ্রহাতিশয্যে একজনের লাঠি প্রদীপে আসিয়া ঠেকিল। পলকে ঘর অন্ধকার। এবং শিকারী বীর দুইজন ঘর হইতে পা-টিপিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া সটান রান্নাঘরে গিয়া, পড়িতে পড়িতে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করায়, খাইতে বসিয়া গেলেন। বাহিরের দাওয়ায় নেওয়ারের খাটে বাড়ির কর্তা ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। [বাড়ির চাকর এবং ছেলেদের শাসনযম] মুসাইকে ডাক দিতে সে কুপ্পি লইয়া আসিয়া দেখে—ফর্সা বিছানার উপর প্রদীপ উপুড়, তাহার পার্শ্বে একজন কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রিত —প্রদীপের তেল সাদা চাদরের উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। ইহা তো অমার্জনীয় অপরাধ! [মুসাইয়ের] অনুমান হনুমানের মতো এক লম্ফে স্থির করিল যে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে ঐ দাদাটি [সুরেন্দ্রনাথের এক নিরীহ জেঠতুতো দাদা] এই সকল অপকর্ম করিয়াছেন। মুসাইয়ের কান মলায় গাত্রোত্থান করিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া রহিলেন।" ('শরৎচন্দ্র', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্লোল', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২)।

বাড়ির অকর্মণ্য দারোয়ানদের কাহিনীও লিখেছেন সুরেন্দ্রনাথ : "একেবারে বাইরের বাড়িতে একদল পেয়াদা থাকত। তাদের কাজকর্ম এবং জীবনধারণের পদ্ধতি সংসারে পেয়াদাকুলের যেমন হইয়া থাকে—ঠিক তাই ছিল। নিমতলার পূর্বদিকে রসুইঘরে, ধোঁয়া, ময়লা এবং অন্ধকারের মলিনতায়, বেলা দশটার মধ্যে মোটা ডালভাতে উদরপূর্তি ক'রে তারা উর্দি-চাপরাশ চড়িয়ে কাছারি চলে যেত। দুপুরে সব ভো ভো। বিকেলে সিদ্ধি ঘোটার ধুমধাম। সন্ধ্যা হতে না হতে ডাল-রুটির শ্রাদ্ধ ক'রে এই অসুরের দল নাক ডাকাতে শুরু ক'রে দিত।" ('শরৎচন্দ্র', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্লোল', শ্রাবণ ১৩৩২)।

বাড়ির বিপদের সময়ে এদের কর্মপটুতাকে ব্যঙ্গ ক'রে 'শ্রীকান্ত'-র পিসিমার মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র বলিয়েছেন : "যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমাদের দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও [ছিনাথ] বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে।"

শরৎচন্দ্রের নিজের স্মৃতিকথা থেকে দেখা গেছে তাঁর জীবনের নানা সময়ের ঘটনাপ্রবাহ একত্রে মিশে অখণ্ড রসমূর্তি লাভ করেছে। সাবালকত্বপ্রাপ্ত রাজকুমারের আহ্বানে তাঁর শিকার-পার্টিতে গিয়ে শ্রীকান্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় শরৎচন্দ্রেরই অভিজ্ঞতার আভাস : "আমি কিছুদিন বনেলী স্টেটে কাজ করি।...ডাঙার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেন্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন ক'রে নাচগানের মজলিশ দিতেন।" ('শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)। এক্ষেত্রে সামান্য কর্মচারী শরৎচন্দ্রের পক্ষে ঐ মজলিশে হাজির থাকা সম্ভব ছিল কিনা বলা মুশকিল। তবে দেখা যায়, মজঃফরপুরে জনৈক জমিদারের 'আশ্রয়ে' থাকার সময় গানবাজনার সুবাদে শরৎচন্দ্র 'জমিদারের প্রাণের বন্ধু', "তাঁকে নইলে জমিদারের গানবাজনার আসর কিছুতেই জমত না।" ('স্মৃতিপূজা', পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। স্মৃতিকার পাঁচুগোপালের জানা ছিলনা ঐ আসরে রাজলক্ষ্মীও উপস্থিত থাকতেন কিনা।

পুনশ্চ রাধারানী দেবীর কথা স্মরণ করছি। তাঁর মনে হয়েছে, "শরৎচন্দ্র তাঁর বইগুলির মধ্য দিয়ে কোনো কোনো জায়গায় নিরুপমার সঙ্গে কথা কইতে চেয়েছেন। নিজের কথা বলা, নিজের বিষয়ে ভাবা তাঁর প্রকৃতি ছিলনা। তিনি হয়তো তাঁর লেখায় নিরুপমারই হৃদয়কে বারবার খুলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন নায়িকার মাধ্যমে। 'শ্রীকান্ত'-এ এটি সুস্পষ্টভাবে অনেক জায়গায় ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ ক'রে তৃতীয় পর্বে তো বটেই।"[৩৪]

তৃতীয় পর্বের প্রসঙ্গ পরে আসবে। তার আগেই এসে গেছে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নিরুপমার ছায়াবিস্তার। রাজলক্ষ্মী চরিত্রের একাধিক বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্র পেয়ে গেছেন নিরুপমার মধ্যে, অথবা কল্পনায় নিরুপমাকে সামনে রেখে সম্ভাব্য কিছু গুণাবলী আরোপ করেছেন রাজলক্ষ্মীতে। রাজলক্ষ্মী রূপে-গুণে-ঐশ্বর্যে সম্রাজ্ঞীর মহিমাসীন। তার ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড এবং অপরের উপর প্রয়োগও দেখা যায়। একই সঙ্গে প্রেমাস্পদের কাছে তার দীন মূর্তি। একদিকে তার বৈধব্য সংস্কার, অন্যদিকে তার স্বেচ্ছামাতৃত্বের সঙ্গে প্রেমের সংঘাত। সব জড়িয়ে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র।

এসবের মধ্য থেকে শ্রীকান্তের কাছে বড় হয়ে উঠেছে রাজলক্ষ্মীর প্রেমিকা.মূর্তি। সেই প্রেমিকা—যার প্রেম নায়ককে বিবাহের [এক্ষেত্রে একত্রবাসের] ক্ষুদ্র বন্ধনে বেঁধে না রেখে উন্মুক্ত পৃথিবীতে স্বাধীনতা দিয়েছে। 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম পর্বের অন্তিমে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।"

'শ্রীকান্ত'-র প্রথম পর্ব প্রকাশের ('ভারতবর্ষ', মাঘ ১৩২২—মাঘ ১৩২৩) অনেক পরে বালবিধবা রাধারানীকে পুনর্বিবাহে উৎসাহ দিয়ে যে-চিঠি শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে অনিবার্যভাবে রয়ে গেছে নিজের ঐ ব্যর্থ প্রেমের কথা, ঐ প্রেম কিভাবে তাঁর সাহিত্যকে সম্ভব করেছে, তাও। স্পষ্টত শ্রীকান্তর মুখে বসানো বড় প্রেম যে তাঁর জীবনের অসফল নিরুপমা-প্রেম, সেদিন তিনি তা গোপন করেন নি : "আমার সাহিত্যে তোমরা যা পেয়েছ, তা যদি আমি আমার নিজের জীবনে না পেতুম ভাই, এ সাহিত্য সম্ভব হতো কি?"

একথা লেখার সময় স্বাভাবিক সতর্কতা শরৎচন্দ্রের ছিলই। রাধারানীকে লেখা ঐ চিঠির গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে চিঠির শেষাংশে তাঁর উদ্বেগ : "এ চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলো, আমার অনুরোধ।"[৩৫]

রাজলক্ষ্মীকে নিরুপমার মধ্যে দর্শনের এই অভ্রান্ত প্রমাণের কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে।

'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বের অন্তিমে ধর্মগতপ্রাণা রাজলক্ষ্মীর শুচিতাময়ী বৈধব্য মূর্তিটিকে যেভাবে ফোটানো হয়েছে, তাতে সচেতন পাঠকের সন্দেহ থাকেনা—এ ছবি নিরুপমারই। সেই প্রাসঙ্গিক অংশ : "...তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যে শুধু থানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলংকার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মতো পিঠজোড়া চুলের রাশিও আর নাই। মাথার পরে ললাটের প্রান্ত পর্যন্ত আঁচলটানা, তথাপি তাহার ফাঁক দিয়া কাটা-চুলের দুই চারি গোছা অলক কণ্ঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা

মুখের পরে ফুটিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল, এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।...কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মতো এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি।"

নিরুপমা সম্ভবত শেষে জোর ক'রে শরৎচন্দ্রকে সরিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মনোজীবন থেকে। তৃতীয় পর্ব প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত নিরুপমা তাঁর লেখার বিষয়ে মতামত জানিয়েছেন (রাধারানীকে শরৎচন্দ্র নিজে সেকথা বলেছেন)। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় পর্ব প্রকাশের সময় থেকে তিনি নীরব। তাঁর প্রতিক্রিয়া—নিজ জীবনেব শূন্যতার হাহাকার অথবা গোপন বিষয়কে লোকলোচনে আনার জন্য লেখকের প্রতি বিরক্তি ও ক্ষোভ—তার রূপ কী আমরা জানিনা। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল শরৎচন্দ্র তাঁর পবিত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। সুতরাং বিদায়—চির বিদায়।

শরৎচন্দ্রের বোধেও তা ধরা পড়েছিল। 'শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী'র তৃতীয় পর্ব রচনার (কিছু ছেদ-সহ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২৭ পৌষ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) সমকালে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে (১৪.০৮.১৯১৯) শ্রীকান্তর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। হৃদয়ের স্পর্শকাতর অংশে কোনো পাঠক কিংবা কোনো জনশ্রুতির প্রবেশে একান্ত নারাজ শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ওসব মিছে বানানো গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বই তো নয়। ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি সত্যি? কার কাহিনী?" ৩৬

এই অস্বীকারই সব চেয়ে বড় স্বীকার।

॥ ৬ ॥

অভিজ্ঞতার আরো কয়েকটি খণ্ড রূপ

দুটি বাড়ির ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন দুজন মানুষ—গিরীন্দ্রনাথ সরকার, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। বাড়ি দুটির বাসিন্দা শরৎচন্দ্র—রেঙ্গুনে এবং হাওড়ার বাজে-শিবপুরে। গিরীন্দ্রনাথের বর্ণনার প্রতিরূপ শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসে দেখেছি। অবিনাশচন্দ্রের নিজের মনে হয়েছিল, বাজে-শিবপুরের বাড়ি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে উঠে এসেছে।

রেঙ্গুনের বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলে শরৎচন্দ্রের ভাড়াবাড়ি হাজির 'পথের দাবী'তে—তা অপূর্বর বাড়ি। গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলেন—"একটি বড় ঘরকে বেড়া দিয়া ভাগ করা হইয়াছে, ঘরের মধ্যেই রান্নাঘর, স্নানের জায়গা ও পাইখানা—চমৎকার ব্যবস্থা। ঘরে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের বাতি মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল, পার্শ্বে একটি ছোট টেবিলের উপর মোটা মোটা কয়েকখানি বই, একখানি ক্যাম্বিসের ইজি-চেয়ার, একটি গড়গড়া, একটি রেঙ্গুন প্যাটার্নের কাঠের সিন্দুক, কাঠের আলনায় কয়েকখানি কাপড়। সামান্য জিনিসপত্রে ঘরটি সাজানো, কোনো বিলাসিতার চিহ্ন নাই।" ৩৭

রেঙ্গুনের ভাড়া-করা শরৎচন্দ্রের বাসা উপন্যাসে এই প্রকার :

"কাঠের বেড়া-দেওয়া পাশাপাশি ছোটবড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই—মাঝের এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্বশেষ রাস্তার ধারের কক্ষটি—অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত—এইটি শয়ন-মন্দির। অফিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটুখানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখা যায়। ঘরের মধ্যে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্য দিয়া আর একটায় যাইতে হয়।"

গিরীন্দ্রনাথ রাতের অন্ধকারে শরৎচন্দ্রের ঘরে মিটমিটে লণ্ঠন জ্বলতে দেখেছিলেন। দিনের বেলা উপস্থিত হলে তিনি হয়তো আলো-হাওয়াহীন ঘরের কথা লিখতেন। আমরা জেনেছি, শরৎচন্দ্রের কাঠের ভাড়াবাড়ি আগুনে পুড়ে যায়, সেইসঙ্গে তাঁর আঁকা ছবি, 'চরিত্রহীনে'র প্রথম পাণ্ডুলিপি, নারীর ইতিহাস প্রভৃতিও নষ্ট হয়। ঐ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি তাঁর মনে ভিড় করেছিল অপূর্বর বাড়ির বর্ণনা দেবার সময় : "...ইহার সমস্তই কাঠের—দেওয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের, সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয়—এত বড় সর্বাঙ্গসুন্দর জতুগৃহ বোধকরি রাজা দুর্যোধনও তাঁর পাণ্ডব ভায়াদের জন্য তৈরি করিয়া উঠিতে পারেন নাই।"

শরৎচন্দ্রের হাওড়ার বাজে-শিবপুরের বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে অবিনাশচন্দ্র কার্যত চমকে উঠেছিলেন। এ কোন গলির মধ্যে তিনি এলেন? এই গলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের বাসা, নাকি 'চরিত্রহীনে'র নায়িকা কিরণময়ীর বাড়ি? সবিস্ময়ে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন : "তাঁর [শরৎচন্দ্রের] বাড়ির গলির মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার কিরণময়ীর বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। তিনি কিরণময়ীর বাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর নিজের বাড়িটিও ঠিক তাই। একটি সরু গলি, এক পাশে নর্দমা, সামনে ইট-বের-করা তাঁর বাড়ি।" ('শরৎপ্রসঙ্গ', অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'বাতায়ন', ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

কিরণময়ীর বাড়িতে প্রবেশ-পথটির রূপ : "উপেন্দ্র ও সতীশ পাথুরেঘাটায় একটা অতি সংকীর্ণ গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন।...পায়ের নীচেই দুর্গন্ধ-পঙ্কিল খোলা নর্দমা,...এক স্থানে ক্ষুদ্র গলি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'চরিত্রহীনে'র প্রথম পাণ্ডুলিপি পুড়ে যাওয়ার পর রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার 'চরিত্রহীন' লেখেন যা আংশিকভাবে ১৩২০ এবং ১৩২১-এ 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত। পরে ১৯১৭-এ পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্র তাতে আবশ্যিক পরিমার্জনা ক'রে কি বাজে-শিবপুরের গলির প্রসঙ্গ এনেছিলেন, নাকি রেঙ্গুনে ঐ ধরনের চাপা দুর্গন্ধময় গলির ভিতরের একটি ভাঙা বাড়ি ছবি এঁকেছিলেন?

নারী-মনস্তত্ত্বের বিচিত্র প্রকাশ ভালবাসার ক্ষেত্রে ঘটে। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে —বৈধ স্বামীর প্রতি আবশ্যিক প্রেমানুগত্য কি অন্য পুরুষের প্রতি একই মাত্রায় থাকা সম্ভব? ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের সামনে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছিল এবং তিনি সমাধানে পৌঁছেছিলেন নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। 'পথের দাবী'-র অভয়া চরিত্র সেই

প্রেক্ষায় রচিত। একাধিক বিবাহকারী একটি দুশ্চরিত্র বর্বর পুরুষ তার প্রথম স্ত্রী অভয়াকে যখন নিষ্ঠুর শারীরিক নিগ্রহ ক'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল—তার পূর্ব পর্যন্ত অভয়া তার স্বামীর ঘরে মুখ বুজে কাটিয়ে দিতে রাজি ছিল। পরিত্যক্ত বিতাড়িত অভয়া এরপর কিন্তু স্বামীর বন্ধ দরজায় মাথা ঠোকেনি। পরিবর্তে তার মুখ থেকে লাভাস্রোতের মতো কিছু জ্বলন্ত কথা বেরিয়ে এসেছে :

"একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য ; আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?"

না, অভয়া তার নারীত্বকে ব্যর্থ বা পঙ্গু হতে দেয়নি। রোহিণীর সঙ্গে সে নতুন ঘর বেঁধেছে।

রেঙ্গুনে প্রায় একই অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, অসুস্থ স্বামীর সেবারতা এক 'সতী সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীগতপ্রাণা, মুহূর্তের অদর্শন সইতে পারেনা', স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে মরণাপন্ন—কয়েক মাস পরে 'সে আবার বিয়ে করেছে—তেমনি স্বামীগতপ্রাণা, তেমনি সুশীলা।' সেই নরীর হৃদয়টাই ছিল 'ভালবাসায় পূর্ণ। ওইটেই হলো তার স্বভাব, ও নইলে সে বাঁচতে পারেনা। তাই জন্যে সে দুজনকেই সমান ভালবাসতে পারলে।' ('শরৎচন্দ্র', গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

॥ ৭ ॥

অভিজ্ঞতার স্বল্পতা এবং প্রকাশের বাধা বিষয়ে শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের রচনায় অভিজ্ঞতার ব্যাপ্ত রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠে বলেছিলেন :

"শরৎ, তুমি আমাদের বঙ্গসমাজকে দেখেছ অন্দরমহলে ঢুকে। আমি দেখেছি বাইরে থেকে উঁকি মেরে। না, সত্যিই তাই। কারণ আমরা যে ছিলাম এক ঘরে। তাই তুমি বঙ্গসমাজের অনেক কিছু দেখেছ যার নাগাল আমি পাইনি।" [৩৮]

'তবু ভরিল না চিত্ত'। দর্শনের আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রে অপ্রশমিত। বহুল অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মানুষকে আরো কাছ থেকে, আরো ভালভাবে দেখার তৃষ্ণায় তিনি অধীর। নারী স্বাধীনতার অতি-সংকুচিত রূপে তাঁর মন ভরেনি। লেখক হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে অনায়াসে হাত ধরাধরি-ক'রে হাঁটা মানব-মানবীকে। সে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতো কথাশিল্পীর জগৎ। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার সময় তিনি বলেছিলেন : "মন্টু, ওদেশে নরনারীর রঙ্গমঞ্চের কত বিভাব, কত পাদপ্রদীপ, গল্পের প্লট নিয়ে কী নিরন্তর বৈচিত্র্য,...জাহাজ, হোটেল, খনি, সানিটোরিয়াম, বিশ্বভ্রমণ, আরো কত রকম পরিবেশে কত রকমের নরনারী এসে হাত মেলাচ্ছে, নানা অ্যাডভেঞ্চারে কাঁধ মেলাচ্ছে কত রকমের অভাবনীয় রথ টানতে, কিন্তু আমাদের দেশে

এ-স্বাধীনাতার অবকাশ কোথায়? সেই চিরকেলে থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। রোমান্সের পাখা এখানে কত দুর্বল, প্রেমলীলার বৈচিত্র্য কত কম বলো দেখি! ওদের পটভূমিকার বিশালতার পাশে আমাদের আটপৌরে গায়ে হলুদ, ফুলশয্যার শাঁখ, আলো, বাঁশি, ফুলঝুরির উৎসব দেখ দেখি! তাহলে বুঝবে আমাকে এদেশে রোমান্সের নাট্যলীলা সৃষ্টি করতে কেন এত বেগ পেতে হয়েছে।"[৩৯]

শুধু এটুকুই? যা তিনি দেখেছেন, তার পূর্ণরূপ কি প্রকাশ করতে পেরেছেন? বাধা কি আসেনি বিশেষ মানুষের কাছ থেকে? তাঁর কলম কি স্বেচ্ছায় গলায় শৃঙ্খল জড়ায় নি?

এ সম্বন্ধে সত্য কথাটা শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যে কোনোদিন স্বীকার করেন নি। কিন্তু মর্মজ্ঞ নারী রাধারানী দেবীর কাছে আত্মউন্মোচন ক'রে নিরুপমা দেবীর কথা বলেছেন, যার দূর-নিয়ন্ত্রণ তাঁকে প্রশমিত রেখেছিল। চিঠিতেও নাম না-ক'রে লিখেছেন [পুনশ্চ উদ্ধার করছি] :

"আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন।...তাঁর মতো কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলোমেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াত না।"[৪০]

রাধারানী বলেছেন, নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে চিঠিতে তাঁর লেখার বিষয়ে মতামত জানাতেন। তার মধ্যে থাকত 'উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর অভিনন্দন।' অনুমান করতে পারি সমালোচনাও থাকত। কিন্তু "শরৎচন্দ্রের কোনো উপায় ছিলনা উত্তর দেবার। তিনি তাঁর মুখ খুলতেন নিজের মুদ্রিত রচনারই মধ্যে। সাহিত্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকত তাঁর নিজের মনের ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ। যথাস্থানে পৌঁছতেও, গোলমাল হতো না।"[৪১] এইখানে একটু তথ্য যোগ করা যায়। স্বয়ং নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে লেখা প্রবন্ধে সেকথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'যমুনা' পত্রিকায় 'চরিত্রহীন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কালে ঐ উপন্যাস "আমাদের কেমন লাগিতেছে [শরৎচন্দ্র] জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।" ('আমাদের শরৎদাদা', নিরুপমা দেবী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)। গৌরবে বহুবচন 'আমাদের' মধ্যে 'আমিই' প্রধান—একথা ধরে নিয়ে বলতে পারি, নিরুপমা উত্তর দিতে বিলম্ব করেন নি, যদিও সে সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে তিনি নীরব। শুধু এই ইঙ্গিত আছে —শরৎচন্দ্র নিজের রচনা বিষয়ে নিরুপমার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

সেই গুরুত্বের পরিমাণ কতখানি, আজন্ম উচ্ছৃঙ্খল শরৎচন্দ্র কিভাবে একটি নারীর মতামতের কাছে নিজের শিল্পীসত্তাকে পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন, তার সেরা ভাষ্য রচনা করেছেন রাধারানী। তাঁর সেই মন্তব্য শরৎচন্দ্রের শিল্পীবিবেকের যথার্থ রূপ নির্ণয়ের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান :

"শরৎচন্দ্রের মনের আকাশে সে-সময়ে একটি অদৃশ্য তর্জনী শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ও সাহিত্যকে নিঃশব্দে নিয়ন্ত্রণ করত, যে-নিয়ন্ত্রণকে শরৎচন্দ্রের হৃদয় কোনোদিন অস্বীকার করতে পারেনি।...প্রথম জীবনে নিজের শিল্পকে অন্যের মুখ-চাওয়া ক'রে রাখার মধ্যে শিল্পীর যে অসামান্য আত্মত্যাগ আছে—বাউণ্ডুলে বেহিসেবী মানুষ বলেই তা সম্ভব

হয়ে থাকবে। এই আত্মসমর্পণের স্পষ্ট প্রতিদান তিনি সারা জীবনে কখনো পাননি। ...প্রশ্নহীনভাবে এই বিদ্রোহী যুবক এক অন্তঃপুরিকার বিভ্রান্ত চিত্তের ব্যথিত নির্দেশ মাথা নত ক'রে পালন ক'রে গিয়েছেন। বিন্ধ্যপর্বতের মতো নুইয়ে রেখেছিলেন নিজের সমুন্নত তেজ আর যৌবনের বিদ্রোহী সত্তাকে, এক অদৃশ্যচারিণীর সম্মানে।" [৪২ক]

রাধারানীর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি—নিরুপমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তিনি বালবিধবা চরিত্রে সবিশেষ সংযম আরোপ করেছেন। নচেৎ তা 'তাঁর নিরুপমার' 'সম্মানে বা মনে' আঘাত করতে পারত। অন্তত বালবিধবার আনুষ্ঠানিক বিবাহ দিয়ে সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত হননি।

কিন্তু কেন? এইখানে শরৎচন্দ্রের মনে নানামুখী চিন্তার টানাপোড়েন চলেছিল। প্রথমত ঔপন্যাসিকের পক্ষে সমাজসত্যের দায় আছে। বিধবাবিবাহ আইনত বৈধ হলেও বৃহত্তর সমাজমনের স্বীকৃতি সেকালে পায়নি। [৪২খ] প্রেমাসক্ত বিধবা নারীও বিধবাবিবাহের অনৌচিত্য সম্পর্কে দীর্ঘকাল পোষিত সংস্কারে আবদ্ধ। সংস্কার ও প্রেমের দ্বন্দ্বে বিধবা নারী সংস্কারকে মূল্য দিয়েছে প্রেমের বাঞ্ছিত পরিণতিকে বলিদান দিয়ে। তার চিত্রণের দ্বারা লেখক শরৎচন্দ্র হয়ে উঠেছেন সত্যকার বাস্তবতাবাদী লেখক। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তিনি অচরিতার্থ প্রেমের যন্ত্রণাকে গভীর রেখায় অঙ্কন ক'রে অসাড় সমাজের সামনে আরক্ত প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—ভাবীকালে যাতে জীবনের সত্য মূল্য স্বীকৃত হয়। একই সঙ্গে বলা যায় শরৎচন্দ্র সমাজসংস্থিতির প্রয়োজনকেও স্বীকার করতেন। [এ-বিষয়ের শরৎচন্দ্রের মতামত 'জীবনেব ধর্ম—ধর্মের জীবন' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩২খ পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।]

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আবার বিধবার প্রেমের কদর্য রূপও ধরা পড়েছিল। অনেক বিধবাব প্রেম প্রবৃত্তির কদর্যলীলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যভিচারে লিপ্ত পত্নী যদি সারাক্ষণ স্বামীর মৃত্যুকামনা করে যাতে বিধবা হওয়া মাত্র অবাধে বাঞ্ছিত পুরুষটির শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে, সেক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের ছিল অবিমিশ্র ঘৃণা। বর্মায় তিনি দেখেছেন তাঁর জনৈক গোয়ানিজ বন্ধু দেশ থেকে স্ত্রীকে আনার পর, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরই বন্ধু ব্যভিচারে লিপ্ত। এই মর্মান্তিক আঘাত অসহায় স্বামীর চরম অসুস্থতার কারণ। কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীকে এই ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময় মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর সংলাপ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন (তা এমনই তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল) :

"বন্ধুটি আমার দিকে এক দৃষ্টে খানিক চেয়ে রইল। ছলছল চক্ষে শেষে বললে—চ্যাটার্জী, আমি মলে আমার স্ত্রীর কোনো অভাবই হবেনা। আমার মৃত্যু হলেই সে বাঁচে—লরেন্সকে বিয়ে করতে পারে। তারা প্রতি মুহূর্তেই আমার মৃত্যুকামনা করছে। বিশ্বাস করো, আমার মৃত্যুর কারণই আমার স্ত্রী—অন্তত আমার মরণ তারাই এগিয়ে দিয়েছে। জানিনা সে আমাকে ওষুধ দেয় কি বিষ দেয়। যেদিন থেকে তাদের ব্যভিচার আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি মৃত্যুপথের পথিক হয়েছি।" ('শরৎচন্দ্র ও সমাজনীতি', কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'বাতায়ন', ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রচলিত পুনর্বিবাহের পরিণামের একটি ঘটনার উল্লেখ শরৎচন্দ্র কুমুদচন্দ্রকে করেছেন। সন্তানবতী বিধবার বিবাহের ফল দাঁড়িয়েছিল

তার কিশোর সন্তানের 'অনন্ত দুর্গতি'।—"[উচ্চ বর্ণের] হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের রীতি না থাকাটা বুঝি ভালোই হয়েছে। হিন্দুসমাজে স্বামী স্ত্রীর অনন্যগতি হওয়াতে অন্তত সে স্বামীর মৃত্যুকামনা করতে পারেনা—স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্তত সন্তানদের অনন্ত দুর্গতির কারণ ঘটেনা।...তাই সময়ে সময়ে আমার Conservative মনের উত্তেজনায় মনে হয়—হিন্দুর নিয়মই বুঝি ভালো।" ('শরৎচন্দ্র ও সমাজনীতি', কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

কোনো নিয়মই চিরকাল ভালো বা মন্দ থাকেনা। সময়ের সঙ্গে নিয়মের চরিত্র বদলায়। শরৎচন্দ্রের মতো অসামান্য শক্তিশালী ঔপন্যাসিক খোলাখুলি প্রচার ক'রে সমাজশরীরে ওলটপালট ঘটাবার চেষ্টা করতে পারতেন। সেকাজ তিনি করেন নি। তার মূলে ছিল—নানা ধরনের বিধবা চরিত্র সম্বন্ধে নিজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, নাকি কেবল নিরুপমার 'অদৃশ্য তর্জনী'—কে তা নির্ণয় করবে?

॥ ৮ ॥

সমাজের অভিমুখে

কল্পনা ছাড়া সাহিত্যে আছোলা অভিজ্ঞতা পরিবেশনের মূল্য কতখানি? সে ধরনের লেখা বাক্যের ফোটোগ্রাফি ছাড়া কি? কল্পনাই বাস্তবকে পল্লবিত ও রসায়িত ক'রে সাহিত্য পদবাচ্য ক'রে তোলে। শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার নানা স্তরবিন্যাসের কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে দিয়েছি। তাঁর জীবনীসূত্রে জেনেছি যে, সন্ন্যাসী সেজে বা না-সেজে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন, যার মধ্যে গ্রাম-বাংলাও ছিল। ব্রহ্মপ্রবাসে তাঁর দীর্ঘদিন কেটেছে। সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এবং পরে শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মানুষদের দেখেছেন। পরিচয় ঘটেছে একাধিক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। সে সমস্ত কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে এসে গেছে তাঁর সাহিত্যে। বহমান সময়স্রোত থেকে তুলে আনা সেইসব বহুমাত্রিক বস্তুসমূহের পরিচয় স্বল্পাকারে দেওয়া যেতে পারে।

ছবিটা আমরা কল্পনার চোখে দেখে নিতে পারি—এক পথিকের ছবি। পথিক শরৎচন্দ্র। তিনি চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখে দেখে নিতে চাইছেন সমাজকে, হিন্দুসমাজকে, যা তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু দুঃখের কারণ। বর্ণাশ্রম প্রথায় বিভক্ত, কুসংস্কারে আবদ্ধ, স্ববিরোধিতায় পূর্ণ সেই হিন্দুসমাজের ছবি বড় আকারে এসে গেছে তাঁর সাহিত্যে। একইসঙ্গে হিন্দুসমাজ থেকে গা-বাঁচানো, গোষ্ঠীতে আবদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজ এবং মুসলমান ও খ্রীস্টান সমাজও বাদ পড়েনি।

উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মনুষ্য-সমন্বিত গ্রামীণ হিন্দুসমাজের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের রূপ—কেবল নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের নয়, উচ্চবর্ণের মানুষেরাও পরস্পরের সর্বনাশসন্ধানী। এক্ষেত্রে কৌলীন্যপ্রথার অর্থহীন জাঁকের উল্লেখ তাঁর রচনায় আছে। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে গোলক চাটুজ্যে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের কুলকলঙ্ক টেনে বার করেছিলেন প্রতিশোধ নেবার জন্য। প্রিয়

মুখুজ্যের কন্যা সন্ধ্যার সঙ্গে গোলোক চাটুজ্যের বিবাহ দেওয়া হয়নি—এ-ই ছিল কুলীন প্রিয় মুখুজ্যের অপরাধ। 'অরক্ষণীয়া'-তে—বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিবাহ দিতে না পারা সমাজের চোখে ক্ষমাহীন অপরাধ। জ্ঞানদার মা দুর্গামণির আতঙ্কিত উক্তি : "এই মেয়েটা দেখতে দেখতে তেরোয় পা দিলে।...ওর পানে চাইলেই যেন আমার বুকেব রক্ত হু হু ক'রে শুকিয়ে যায়।...এ আমাদের মৃত্যুযন্ত্রণা! সমাজ আমি জানি তো! মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেই জাত যাবে ; কিন্তু দেব কি ক'রে? টাকা চাই—কিন্তু পাব কোথা?" কৌলীন্যপ্রথার সর্বাঙ্গে জড়িত এই বিষাক্ত সত্য—অর্থ নেই অথচ জাত বাঁচাতে বিবাহ দিতেই হবে। ফল : নমো নমো বিবাহ—পাওনা-গণ্ডা আদায় ক'রে কুলীন স্বামীর প্রস্থান, অনেক সময়ে চিরতরে, ঘাটের মড়া স্বামী হলে অল্পদিনেই পত্নীর বৈধব্য এবং সমাজে বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। শরৎচন্দ্রের আঁকা বালবিধবা চরিত্ররা এই নিষ্ঠুর প্রথার শিকার। সামান্য অংশ উদ্ধার করা যাক 'অনুপমার প্রেম' থেকে। অনুপমার বিবাহের জন্য নির্ধারিত পাত্র সুরেশ অন্তর্হিত হওয়ার পর "রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশবর্ষীয় কাশরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচজন—জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।...অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল—'বাবা, আমাকে মেরে ফেল, আমি বিষ খাব।'—'যা ইচ্ছা হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তারপর যেমন খুশি করো, বিষ খেয়ো, জলে ডুবে মরো, আমি একবারও বারণ করব না।'...দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জগবন্ধুবাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্প্রদান করিলেন।" বিবাহের দু' বছর পরে যক্ষ্মারোগী বৃদ্ধ রামদুলাল দত্ত চিরতরে 'সংসার-ত্যাগ করিলেন।'

অনুপমার ভাগ্য এক অর্থে ভালো। স্বামী বৃদ্ধ এবং অসুস্থ হলেও 'সদানন্দ'। কিন্তু বিবাহ যেখানে পেশামাত্র, সেখানে নারীত্বের চূড়ান্ত অসম্মানের ছবিটাও আছে। রাজলক্ষ্মী ও তার দিদি সুরলক্ষ্মীর বিবাহ ওভাবেই হয়েছে—বিরিঞ্চি দত্তের পাচক ব্রাহ্মণ জনৈক ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে। "বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে।" দেখা গেল একদিন পর্যন্ত 'হাবা-গোবা ভালমানুষ' বলে পরিচিত 'পাচক ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়।' একান্ন টাকা পণে দুই বিবাহ করতে সে রাজি নয়, ও-টাকায় এক জোড়া ভাল রামছাগল যখন পাওয়া যায়না, জামাই কি করে হবে? "বাজারে যাচিয়ে দেখুন।" কমপক্ষে একশ এক টাকা পণ প্রয়োজন—"দুটো ষাঁড় কেনার খরচাটাও দেবেন না?" রফা সত্তর টাকায়।

কুলীন স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীদের সম্পর্ক শুধু টাকার। বিয়ের রাত্রির পরদিনই বরের বিদায়। ফলে তার চেহারা কন্যাসহ বাড়ির অন্যান্যদের অজানা। মাঝে মাঝে উক্ত মহাশয় স্ত্রীর কাছে আসতেন টাকার প্রয়োজনে। যখন নিজে যেতে পারতেন না, তখন গোপনে এক জনের সঙ্গে রফা ক'রে নিজের পরিচয়ে অপরিচিত পত্নীদের কাছে তাকে পাঠাতেন। বিচিত্র এই কুলীনদের ধর্মবুদ্ধি—একদিকে অন্যের কন্যার বিবাহ যথাকালে না হলে তার জাতিচ্যুতি, অন্যদিকে নিজের স্ত্রীকে, নিজের নামে পাঠানো ব্যক্তির সঙ্গে একই শয্যায় শয়নের দিকে ঠেলে দেওয়া। কৌলীন্য-অনুমোদিত পতিতাবৃত্তির চমৎকার নিদর্শন।। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে মুকুন্দ মুখুজ্যের পরিচয়ে আগত হিরু নাপ্তে ধরা পড়ার পর স্বীকারোক্তি করেছে :

"এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুজ্যের আদেশেই করেচে। একে বুড়োমানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর, একটা পৈতে তৈরি ক'রে রাখ, এখন থেকে যা-কিছু রোজগার ক'রে আনবি তার অর্ধেক ভাগ পাবি।—আরো দশ-বারো জায়গা থেকে সে [হিরু] এমনি ক'রে প্রভুর জন্যে রোজগার ক'রে নিয়ে যেত।...এ কাজ নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করেন না—এমন অনেক ব্রাহ্মণেই দূরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।"

নৈতিকতার লেশমাত্র এইসব কুলীন স্বামীদের ছিলনা, যা ছিল ধর্মভীরু নিম্নবর্ণের মধ্যে। পাপভীত হিরু নাপ্‌তেকে সান্ত্বনা দিয়ে মুকুন্দ মুখুজ্যে হেসে বলেছিলেন : "তারা আমার স্ত্রী, তোর নয়। তোর এত দরদ কিসের? যাদের চোখে দেখিনি, চোখে দেখব না, তাদের গতি কি হবে না হবে সে চিন্তা আমারই কি, তোরই বা কি! আমাদের চিন্তা টাকা রোজগার।" পাকা হিসেব!

পতিত ব্রাহ্মণ অগ্রদানীর স্থান সমাজে কোথায় তাও দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ না করলে শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ। অথচ যিনি দানগ্রহণ করবেন তাঁর ভাগ্যে জুটবে 'পতিত' শিরোনাম। সুতরাং তাঁদের ঘর ছাইবার লোক নেই, এমন কি শ্মশানবন্ধু পর্যন্ত মেলেনা। 'শ্রীকান্ত'-র তৃতীয় পর্বে অগ্রদানী চক্রবর্তী-গৃহিণীর মুখে সামাজিক অবহেলা ও অসম্মানের যে-ছবি পাওয়া গেছে, তা অগ্রদানী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক চিত্র।

সামাজিক অত্যাচার অবশ্যই বর্ধিত আকারে নেমেছে নিম্নবর্ণের মানুষের উপরে। একাধিক স্থানে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন—তাদের অস্পৃশ্য ক'রে রাখা হয়েছে—বিবাহ থেকে মৃত্যু সর্বক্ষেত্রে তারা অধিকারবঞ্চিত। 'দুলেপাড়া'র স্পর্শদোষ এড়াতে 'বামুনপাড়া' জাত্যাভিমানের অচলায়তনবাসী। তাদের ঘৃণাপ্রকাশের ভাষা মনুষ্যত্বের চরম অসম্মানের সনদ :

"অকস্মাৎ তাঁহার [রাসমণি] দৃষ্টি পড়িল বারো-তেরো বছরের একটি দুলেদের মেয়ের প্রতি।...তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, তুই কে লা? মরণ আর কি, একেবারে গা ঘেঁষে চলেছিস যে! চোখে-কানে দেখতে পাসনে? বলি, মেয়েটার গায়ে তোর আঁচলটা ঠেকিয়ে দিলিনে তো?

"দুলে মেয়েটি ভয় জড়সড় হইয়া বলিল, না মাঠান, আমি তো হেথা দিয়ে যাচ্ছি.

"রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, হেথা দিয়ে যাচ্ছি! তোর হেথা দিয়ে যাবার দরকার কি লা?...বলি কি জাতের মেয়ে তুই?

"আমরা দুলে মাঠান।

"দুলে! অ্যাঁ, এঁই অবেলায় মেয়েটাকে ছুঁয়ে দিয়ে তুই নাওয়ালি?

"তাঁহার নাতিনী বলিয়া উঠিল, আমাকে তো ছোঁয়নি ঠাকুমা—

"রাসমণি ধমক দিলেন, তুই থাম পোড়ারমুখী। আমি দেখলুম যেন দুলে-ছুঁড়ীর আঁচলের ডগাটা তোর গায়ে ঠেকে গেল। যা—এই পড়ন্তবেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মরগে যা। দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবি। না বাপু জাতজন্ম আর রইল না। ছোটলোকের বড় বাড়বাড়ন্ত

হয়েচে, দেবতা-বামুন আর গেরাহ্যিই করেনা! হারামজাদী দুলেপাড়া থেকে ছাগল বাঁধতে এসেচ বামুনপাড়ার মধ্যে?" ('বামুনের মেয়ে')।

নিম্নবর্ণের প্রতি বহু বঞ্চনার অন্যতম উদাহরণ বিবাহক্ষেত্রে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ তাদের বিবাহ দিতে অসম্মত। এমন-কি তাদের বিবাহ ব্যাপারটাই উচ্চবর্ণের কাছে নিষ্ঠুর রসিকতার বিষয়। গঙ্গামাটি গ্রামে মধু ডোমের কন্যার বিবাহে কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের ভুল ধরে বরপক্ষীয় পুরোহিত বিবাহ বন্ধ ক'রে দিয়েছে—এই সংবাদ শুনে রাজলক্ষ্মীর খাস চাকর রতন উঁচু জাতের অহংকার দেখাতে কসুর করেনি :

"তোদের আবার পুরুত কি রে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারিতে আসিয়া পর্যন্ত সে [রতন] 'তুমি' বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত ; এ কি আমাদের বামুন-কায়েত-নবশাক পেয়েচিস যে বিয়ে দিতে আসবে বামুনঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আমার ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্বে চাহিতে লাগিল। এখানে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন জাতিতে নাপিত।" ('শ্রীকান্ত', তৃতীয় পর্ব)।

নিম্নবর্ণের মানুষ নিরন্তর উচ্চবর্ণের মানুষের অর্থনৈতিক শোষণের শিকার। প্রথমেই হাত পড়ে তাদের কৃষিজমিতে। কখনো দেনার দায়ে, কখনো অন্য কৌশলে তারা বাধ্য হয় জমি বিক্রিতে। জমিদার-গোমস্তা-সম্পদশালী মানুষের লোলুপদৃষ্টি কিভাবে সেই জমি গ্রাস করেছে, তার উদাহরণ শরৎচন্দ্র দিয়েছেন 'শ্রীকান্ত' এবং 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে। গঙ্গামাটি গ্রামের অধিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রীকান্তর উক্তি—"কেবলমাত্র চাঙ্গারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সংগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি তো ভাবিয়া পাইলাম না।"

নির্যাতিত মানুষগুলির অসাড় সহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্মরণীয় ছত্রগুলি :

"মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমামে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।"

শরৎচন্দ্রের আর্ত গদ্যে সেই বঞ্চনার রূপ :

"পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোনো হিসাব কেহ কখনো রাখেনা, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ

এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।"

লাথি খেতে খেতে একসময় মানুষ মাথা তোলেই। অধিকারবোধহীন, প্রতিবাদহীন মানুষের মুখেও যে ধীরে ধীরে প্রতিরোধের ভাষা জন্ম নিচ্ছে, তাও দেখেছেন শরৎচন্দ্র। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে অত্যাচারী জমিগ্রাসী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী এবং জনার্দন রায়ের বিরুদ্ধে এই সর্বস্ব হারানো প্রজারা আইনের লড়াইতে নেমেছে। 'বিপ্রদাস'-এ প্রজারা পতাকা হাতে মিছিল ক'রে জমিদারের বাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে।

নিম্নবর্ণের মানুষের নিজস্ব সমাজ আছে। একাধিক বিবাহ, বিধবা নারীর অন্য পুরুষকে 'নিকে', উৎসব উপলক্ষে উদ্দাম নৃত্যগীত—এসব শরৎচন্দ্রের লেখায় পেয়েছি। 'পথের দাবী'তে রবিবারের সকালে স্ত্রী-পুরুষের একত্র মজলিসের নারকীয় দৃশ্য :

'অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশজন স্ত্রীলোকে মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছিল, একজন বুড়া গোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে—তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষই বসিয়া গিয়াছে—আজ রবিবার, পুরুষদের ছুটির দিন। ...একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধহয় তখনো পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়তো অল্পদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাকটা টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্যাপ্ত থু থু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল।"

এ ছবি রেঙ্গুনের বাঙালি কুলিলাইনের, তবে অন্যত্র নিম্নবর্ণের সমাজে এমন কিছুটা দেখা যেত না তা নয়।

উচ্চবর্ণের সমাজের নিষ্ঠুরতার আর এক পরিচয় শরৎচন্দ্র দিয়েছেন 'অভাগীর স্বর্গে'। উচ্চবর্ণের মতো চিতা সাজিয়ে দাহকার্যের অধিকার নিম্নবর্ণের ছিলনা। গ্রামের সমস্ত গাছ উচ্চবর্ণের ভূস্বামীর সম্পত্তি। অভাগীর মৃত্যুর পর ঐ অধিকার চেয়ে চূড়ান্ত লাঞ্ছিত অভাগীর ছেলে কাঙালিচরণ। তার অপরাধ মায়ের স্বপ্নকে সত্য করতে চাওয়া। অভাগীর কল্পনার দৌড় অসীম—স্বর্গ পর্যন্ত ধাবিত। ঠাকুরদাস মুখুজ্যের স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতার ধোঁয়ার মধ্যে অভাগী "ছোট একখানি রথের চেহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায়না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো।" এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে অভাগীর মৃত্যু এবং তার উঠোনে তারই হাতে পোঁতা গাছ জমিদারের বিনা অনুমতিতে কাটার চেষ্টায় কাঙালিচরণকে অশেষ নির্যাতন—জমিদারের দারোয়ান, গোমস্তা এবং স্বয়ং জমিদারেরও। অধিকন্তু পুরোহিত ভট্টাচার্য মশায়ের বিদ্রূপবাক্য—"তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু

নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।" সমর্থন ছিল জমিদারপুত্রেরও—"ভটচায মশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়।"

এ-ই হিন্দুসমাজ! শরৎচন্দ্রের অনুভূতিশীল মন হাহাকার ক'রে কেঁদেছে—পরতে পরতে জমে ওঠা অজ্ঞতা-কুসংস্কার-স্ববিরোধিতা-অত্যাচার-অবিচার-অনাচারের হাত থেকে কে সমাজকে মুক্তি দেবে? কে সরাবে এই জগদ্দল পাথর? "অর্থহীন অবিবেচনায় পরস্পরের জীবন দুর্ভর ক'রে তোলাই যেন এ সমাজের মজ্জাগত সংস্কার।...জানিয়া বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে, সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া তা ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।" ('শ্রীকান্ত', ৩য় পর্ব, ১৩ পরিচ্ছেদ)

শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাননি।

গ্রামীণ হিন্দুসমাজের বিপরীত প্রেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বিলাতফেরত আধুনিক সমাজ। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ ঐ সমাজের যে-পরিচয় দিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের আঁকা ছবি তার কাছাকাছি যেতে চেয়েছে। 'নববিধান'-এ শৈলেশ, ক্ষেত্রমোহন ও তাব স্ত্রী বিভা; 'চরিত্রহীন'-এ সরোজিনী, জ্যোতিষ, শশাঙ্কমোহন; 'বিপ্রদাস'-এ বন্দনা ও তার পিতা অনাথ রায়; 'অনুরাধা'-তে বিজয়, অজয় ও তার পত্নী প্রভাকে—এই সমাজের প্রতিনিধি ক'রে শরৎচন্দ্র হাজির করেছেন। তাঁর দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য—একদিকে হিন্দুসমাজের দমবন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে খোলামেলা জীবনের স্রোত কিছুটা বইয়ে দেওয়া, অন্যদিকে এই নব্য বিলেতি-বাঙালি সমাজের রীতিনীতির মধ্যে বিলেতি সমাজের বিকট অনুকরণের চেহারা—দুইই দেখানো। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ সক্রিয় ছিল ঐ কাজ করার কালে। তিনি সনাতনী নন, কিন্তু পুরাতন মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠাংশ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ছিলেন। তাই দেখা যায় 'আলোকপ্রাপ্ত' আধুনিক সমাজে বেড়ে-ওঠা কন্যাকে তিনি ঠেলে দিয়েছেন পুরাতনী কিন্তু শ্রেয়াশ্রয়ী সমাজের মধ্যে—শেষ পর্যন্ত আধুনিককে মাথা নত করতে হয়েছে স্নেহ-মায়া-মমতার নম্র সৌন্দর্যের কাছে। দৃষ্টান্ত, 'বিপ্রদাস'-এ বন্দনা, 'চরিত্রহীন'-এ সরোজিনী। পুরুষের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত, 'নববিধান' গল্পের শৈলেশ, 'অনুরাধা'র বিজয়।

শরৎচন্দ্রের অপছন্দের স্বার্থপর চরিত্ররা (পুরুষ ও নারী উভয়ই) আধুনিক সমাজের মধ্য থেকে উঁকি দিয়েছে। ঐ মানুষেরা ক্লাব-পার্টি ইত্যাদি ঘেরাটোপে আবদ্ধ। বিজয়ের বড় ভাই অজয় অ্যাটনি, অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজের স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে ব্যস্ত, বিষয় ভাগাভাগি ছাড়া সংসারের অন্য বিষয়ে উদাসীন, শেষোক্ত ক্ষেত্রে "তাহার এক জোড়া চক্ষু দশ জোড়ার কাজ করে।" তার স্ত্রী প্রভার পরিচয় দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের কলম মধুবর্ষণ করেনি। "প্রভাময়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, বাড়ির লোকজনের সংবাদ লওয়া তো দূরের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ি বাঁচিয়া আছে কিনা খবর লইবার সে বেশি অবকাশ পায়না। গোটা পাঁচ-ছয় ঘর লইয়া বাটীর যে অংশে তাহার মহল, সেখানে পরিজনবর্গের গতিবিধি সঙ্কুচিত, তাহার ঝি-চাকর আলাদা—উড়ে বেহারা আছে। শুধু বুড়া কর্তার অত্যন্ত নিষেধ থাকায় আজো মুসলমান বাবুর্চি নিযুক্ত হইতে পারে নাই। এই অভাবটা প্রভাকে পীড়া

দেয়। আশা আছে শ্বশুর মরিলেই ইহার প্রতিকার হইবে। দেবর বিজয়ের প্রতি তাহার চিরদিনই অবজ্ঞা, শুধু বিলাত প্রত্যাবর্তনের পরে মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে।”

অতি-আত্মকেন্দ্রিক মানুষের ঐ ছবির আঁকার সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে জাগ্রত ছিল এই কথাটা—আধুনিক শিক্ষা উপরের চামড়ায় পালিশ চড়ালেও ভিতরের রঙবদল সব সময় ঘটেনা। এখানে সংস্কারমুক্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্নের গলাগলি অবস্থান।

আধুনিক সমাজে পুরাতনী সমাজের মতোই উদার মনের মানুষও ছিলেন—যথা ক্ষেত্রমোহন (‘নববিধান’), অনাথ রায় (‘বিপ্রদাস’)। হিন্দুসমাজের গ্রহণযোগ্য বস্তুসমূহ নেবার মতো মন তাঁদের ছিল। ক্ষেত্রমোহন শৈলেশকে মুখের উপর জানাতে দ্বিধা করেন নি, বিলেতি রীতিমাফিক চলতে গিয়ে শৈলেশ প্রায় সর্বস্বান্ত। আর অনাথ রায়ের নিখুঁত বিলেতি পোশাক সত্ত্বেও তাঁর খাঁটি স্বদেশী মনকে সহজে চেনা যায়। প্রাচীন বা আধুনিক —সব ধরনের মানুষের ভিতর ও বাহির দেখেই শরৎচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

নির্দিষ্ট সমাজগঠন ক'রে স্থিরীকৃত বিশ্বাস নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ শরৎচন্দ্রের গল্পে-উপন্যাসে উপস্থিত। ব্রাহ্মধর্মীরা প্রথম পর্বে হিন্দুসমাজ থেকে যে প্রবল প্রতিরোধ ও আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল, তার ছবি শরৎচন্দ্রের লেখায় বিশেষ নেই। কেবল ‘দত্তা’ উপন্যাসে রাসবিহারীর কথায় তার কিছু আভাস পাওয়া যায় : “বুঝলে না মা বিজয়া, আমি আর তোমার বাবা...সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্যধর্ম গ্রহণ করতে বাধা কম পাইনি। ...কিন্তু বনমালীর কোমল হৃদয়ে গ্রামের অত্যাচার সহ্য হলো না—তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য ক'রে গ্রামে থাকতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। উঃ —সে কি নির্যাতন!”

ব্রাহ্মদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সত্যকার মনোভাব কি ছিল?

শরৎচন্দ্র অন্তত দুটি গল্পে এবং তিনটি উপন্যাসে ব্রাহ্মচরিত্র এনেছেন। আঙ্কিক হিসাবে সেখানে ভালো এবং মন্দ দুই ধরনের মানুষ দেখা যায়। তবু শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন—এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠেই। জীবনের প্রথম পর্বে ভাগলপুরে থাকার সময়ে ‘অভিমান’ গল্পে ব্রাহ্মচরিত্র চিত্রণে তাঁর নেতিবাচক মনোভাব প্রায় তাঁর শারীরিক নিগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিরুপমা দেবী লিখেছেন : “[‘অভিমান’] গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলে অভিভূত, তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে—‘এই গল্পটি পড়ে একজন [ব্রাহ্ম] ন্যাড়াকে [শরৎচন্দ্রকে] মারতে ছুটে ; তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়’।” (‘আমাদের শরৎদাদা’, নিরুপমা দেবী, ‘ভারতবর্ষ’, চৈত্র ১৩৪৪)।

রাধারানী দেবীর মতে শরৎচন্দ্র ‘ব্রাহ্ম’ শব্দটির অর্থব্যাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। নব্য শহুরে বিলেত-প্রত্যাগত শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণভাবে (এবং অবশ্যই ব্রাহ্মরা) ঐ শব্দের লক্ষ্য ছিলেন। শরৎচন্দ্র যখনই রাধারাণীকে ব্রাহ্ম বলে ঠাট্টা করেছেন, রাধারাণীর ম[illegible]য়েছে —গ্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে অজ্ঞ এবং তার প্রতি কটাক্ষে অভ্যস্ত প্রতীচ্যভাবের মানুষেরা ঐ ‘ব্রাহ্ম’। “‘ব্রাহ্ম’ শব্দ ব্যবহারে শহুরে এলিটদের প্রতি অনেক [illegible]ময়ে

[শরৎচন্দ্র] শরনিক্ষেপ করেছেন। অনেকের ভুল ধারণা, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু তা ঠিক নয়। শহুরে উন্নাসিকদেরই তিনি বিদ্রূপ করতেন আমি জানি।" [৪৩]

শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মবিরোধী মনোভাবকে রাধারানী অনেক নরম ক'রে দেখাতে চাইলেও অনেকেই সেই ধারণা গ্রহণে পরাঙ্মুখ। গোপালচন্দ্র রায়ের মতে, 'প্রবাসী' পত্রিকার ব্রাহ্ম-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা না ছাপানোয় শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মদের সম্পর্কে অপ্রসন্ন হন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এর পঞ্চম খণ্ড পড়েও ('হিতবাদীর লাইবেল মোকদ্দমা ও কলিকাতা ত্যাগ' অধ্যায়) শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বিরূপ হয়েছিলেন। গোপালচন্দ্র এও বলেছেন, ১৯১৪ সালে 'গৃহদাহ' রচনার মুহূর্তের শরৎচন্দ্র বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন, "গৃহদাহের খানিকটা লিখেছি, তাতে হরিনাম গাইব, কেউ যেন না সে লেখার নিন্দা করতে পারে।" পরে "সেই শরৎচন্দ্র ১৯১৭ সালে গৃহদাহে হরিনামের বদলে অপব এক সম্প্রদায়ের—ব্রাহ্মদের, কেচ্ছা গাইতে আরম্ভ করলেন কেন? একেবারে সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার!" [৪৪]

গোপালচন্দ্র রায় কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্ম-বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ দেননি। যেসব কারণের উল্লেখ তিনি করেছেন, সেগুলি একমাত্র কারণ হলে শরৎচন্দ্রের বিচারবোধ সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি হবে। আসল কারণ বোধহয় অন্যত্র আছে। শত দোষ সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁর প্রীতির আকর্ষণ মুছে যায়নি। ভিতর থেকে এই সমাজের শোধনের চেষ্টা না ক'রে যাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দ্বৈপায়নী মনোভাব দেখিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বিরাগ তিনি বোধ করেছিলেন। গৃহদাহের গোড়ার দিকে সুরেশের কথায় যেন শরৎচন্দ্রের চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

তিনি পক্ষপাতদুষ্ট—একথা অপ্রমাণ করতে শরৎচন্দ্র সমতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। 'দত্তা'-র রাসবিহারী যেমন স্বার্থান্বেষী, ঘোর বিষয়ী, ভণ্ড মানুষ, তেমনি উল্টোদিকে 'পরিণীতা'র গিরীন, 'পথনির্দেশে'র গুণীন্দ্র—উদার মহৎ মানুষ। মধ্যভাগে রয়েছেন ভালোমন্দায় জড়ানো 'গৃহদাহ'-র কেদারবাবু। 'দত্তা'-র উগ্র ব্রাহ্ম বিলাসবিহারীর মধ্যে কিন্তু ভণ্ডামী ছিলনা। গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তার আকুলতা আন্তরিক। আর সত্যকার ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্ম-আচার্যের চরিত্র নিয়ে হাজির আছেন দয়াল, যাঁর ধর্মবোধে সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা।

তুলনায় নারীচরিত্র অন্য মাত্রার। 'দত্তা'-র বিজয়া বিশেষ ব্রাহ্ম-চরিত্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়না। 'গৃহদাহ'-র অচলা বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দ্বৈত মনোভাব। 'গৃহদাহ'-কে আদ্যোপান্ত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ক'রে তোলার ইচ্ছায় মানবমনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার রূপ এখানে তিনি দেখিয়েছেন।

ব্যক্তিগত স্তরে ব্রাহ্মিকাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব বিশেষ প্রসন্ন ছিলনা। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "ব্রাহ্ম মহিলারা?...ঐ দূরে থেকে শুনতেই ব্রাহ্ম মহিলারা উচ্চশিক্ষিতা।...তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা

বুঝি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি।...এঁদের মতো সংকীর্ণচিত্তের স্ত্রীলোক বাংলাদেশে আর নেই।...ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডাব আর জামাকাপড়ের দ্বারা, আর নাকি খোনা গলায় কথা কয়ে যতদূর চলে।"[৪৫]

ব্রাহ্ম মেয়েদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গোঁড়ামি ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। লীলাবানীকে পুনশ্চ লিখেছেন : "ব্রাহ্ম মেয়েদের হাতে আমি কোনোদিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ মা দুজনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েছে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হোন তাতে আসে যায়না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো জাত হলে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে, শবৎবাবু লেখেন শুধু বড বড কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বড় গোঁডা। আমি গোঁড়া নই লীলা, শুধু রাগ ক'রেই এদের হাতে খাইনে।"[৪৬]

শরৎচন্দ্রের লেখায় অবশ্য ব্যতিক্রমী ব্রাহ্মিকাদের কথাও ছিল, যারা "বি. এ. পাস করা সত্ত্বেও আমাদেব বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ কবা যায়না। এতই ভাল, মনে হয় তাঁবা হিন্দুব মেয়ে হয়ে আজও আছেন।"[৪৭]

ব্রাহ্ম মহিলাদেব রূপ ও শিক্ষা বিষয়ে যেসব বিতৃষ্ণাকর কথা শরৎচন্দ্র চিঠিতে বলেছেন, তাব প্রতিধ্বনি শোনা গেছে 'গৃহদাহ'-র প্রারম্ভে :

"কি আছে ওদের? ঐ শুকনো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্থ ক'বে ক'বে গায়ে কোথাও এক ফোঁটা বক্ত পর্যন্ত যেন নেই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসে পডছে এমন ভয় হয়—গলার স্বরটা পর্যন্ত এমনি চি চি ক'রে যে শুনলে ঘৃণা হয়।" এমন কি 'নির্জীব কাঠের পুতুল' বিশেষণও ব্যবহার কবা হয়েছে।

ব্রাহ্মিকাদের হাতে আহাব সম্বন্ধে শবৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতও এসে গেছে 'গৃহদাহ'-র মধ্যে। ডিহরীর রামবাবু স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণে, অন্যের হাতে অন্নগ্রহণ করেন না ("এই পরম নিষ্ঠাবান নিরামিষাহারী স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখনো আহাব করেন না। তাঁহার রান্নাঘরটি একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" ত্রয়স্ত্রিংশ পবিচ্ছেদ)। সেই তিনি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে অচলার হাতে অন্নগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সুরেশের উপবীত দেখে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্ম কেদার মুখুজ্যের মেয়ে অচলার বিবাহ হয়েছে ব্রাহ্মণ সুরেশের সঙ্গে (রামবাবু তাই ভেবেছিলেন), সুতরাং ওখানে আহারে বাধা নেই। রামবাবুর এই মত শরৎচন্দ্রেরও মত। 'গৃহদাহ'-তে আরো আছে : "তা [কেদার মুখুজ্যে] হলেনই বা ব্রাহ্ম, মেয়ে তো আর তাঁর ঘাতক নয় যে, এখন ভয় করতে হবে। বরঞ্চ যাঁব [সুরেশ] সঙ্গে তুমি ধর্ম ভাগ ক'রে নিয়েচ মা, তিনি যখন হিন্দু, তাঁর গলায় যখন যজ্ঞোপবীত শোভা পাচ্চে, তিনি যখন ঐ সুতো ক'গাছার এখনো অপমান করেন নি, তখন বাপের কর্ম তো তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।...আজ তোমাকে ভাত রেঁধে দিতেই হবে।" (ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ)।

উদারচরিত ব্রাহ্মিকার রূপ দেখা গেছে 'দত্তা'-র বিজয়ার মধ্যে। সে শিক্ষিতা, শোভন রুচিসম্পন্না। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে তার সহানুভূতিশীল মনোভাব। রাসবিহারী-বিলাসবিহারীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের একমাত্র দুর্গাপূজায় সে অনুমতি দিয়েছে। হিন্দু প্রজা-অধ্যুষিত গ্রামে ব্রাহ্মমন্দির

স্থাপন ক'রে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা কতখানি যুক্তিযুক্ত, এ সন্দেহ তার ছিল—"এখানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার কোনো সার্থকতা নেই।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ)। এই নারী তার পিতৃবন্ধুর পুত্র নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, যদিও নরেন হিন্দুসমাজের মানুষ। কাহিনীর শেষে নরেনের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ হিন্দুমতে, ব্রাহ্মমতে নয়। ঐ বিবাহে প্রধান ভূমিকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য দয়ালের। হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে আচার্যের মনের দ্বিধা দূর হয়ে গেছে তাঁরই ভাগিনেয়ী নলিনীর কথায়। এবং দয়াল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাঁধা পরিচয় ত্যাগ ক'রে বৃহত্তর মানব সমাজের অংশ হয়ে গেছেন। বিজয়ার দ্বিধা দূর করতে তিনি বলেছেন : "হিন্দুবিবাহ কি বিবাহ নয় মা?...মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্‌চায্যিমশাই পড়াবেন কি আচার্যমশাই পড়াবেন, তাতে কি আসে যায়...?" (ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ)।

এখানে চেনা যায় শরৎচন্দ্রকে। নৈতিকতাসম্পন্ন মুক্তমনা মানুষের সন্ধান তিনি করেছেন। সে মানুষ হিন্দু হতে পারেন, ব্রাহ্ম হওয়াও সম্ভব। কিন্তু সর্বঅর্থে মনুষ্যত্বসম্পন্ন হওয়াটাই বড় কথা। শরৎ-সাহিত্যে তেমন মানুষই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়েছে।

বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের কথা লেখার তাগিদ শরৎচন্দ্র অনুভব করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ঢাকায় উপস্থিত হয়ে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের। কেন তিনি মুসলমান সমাজের কথা লিখবেন, তার দুটি স্পষ্ট কারণ জানিয়েছেন। প্রথমত, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলমানদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে আমার মন সব জায়গায় সায় দেয়না।" দ্বিতীয়ত, বাংলার জনগণের একাংশ হিন্দুসমাজের কথা যখন সাহিত্যের প্রধানাংশে লিখেছেন, তখন অপর অংশ মুসলমান সমাজের কথা লেখার দায়িত্ব আছে। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। সেকথা স্বীকার ক'রে ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে "মুসলমান-সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের...ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত" হয়েছিলেন। সাগ্রহে বলেছিলেন, "একবার তোমাদের [মুসলমানদের] জীবনযাত্রা-প্রণালী আমাকে ভালো ক'রে দেখাতে পারো?" আবার তাঁর আশঙ্কাও ছিল, মুসলমান সমাজের 'দোষত্রুটি' হিন্দু লেখকের কলমে চিত্রিত হলে তা ঐ সমাজের মানুষের বিরক্তির কারণ হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মুসলমান সমাজের বিতৃষ্ণাকর ধারণার পুনরাবৃত্তি তিনি নিজের ক্ষেত্রে ঘটাতে চাননি। মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখার বিষয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢাকায় বলেছেন :

"চারু, জ্বরের ঘোরে আজ দুপুরে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছিলাম যে, [আসন্ন] উপন্যাসখানি কিভাবে আরম্ভ ক'রে কিভাবে সেটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাব। আজ সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন আমার মধ্যে একটা পরিষ্কার প্লট আমি গড়ে তুলেছি —তার আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্তিক ১৩৪৫)।[৪৮]

এই উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখতে পারেন নি। ঢাকা থেকে ফেরার পর ক্রমিক অসুস্থতা, এবং এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু। তবু তাঁর গল্পে-উপন্যাসে হিন্দুসমাজের পাশে মুসলমান সমাজও উঁকি দিয়েছে। সেসব অংশ এমনই মর্মস্পর্শী যে, লেখকের অভিজ্ঞতা স্বল্প হলেও তাতে খাদ ছিলনা।

হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সমাজের পারস্পরিক তুলনার সময় শরৎচন্দ্রের মনে হয়েছে, একেশ্বরবাদ মুসলমান সমাজের বহির্গঠনকে দৃঢ় করেছে, আর ধর্মীয় সম্প্রদায়ভেদ হিন্দুসমাজের নানা সামাজিক অসাম্যের কারণ। "হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসা-দ্বেষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রই ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মতো হিন্দুদের নাই এবং হইতেও পারে না।" ('পল্লীসমাজ', বাবো পরিচ্ছেদ)। ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক একতা ব্যাপারটি শরৎচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন বলে, গ্রামের বিধবা নারীর মুখে মুসলমান সমাজের প্রশংসা শোনা গেছে, যা সেকালেব প্রেক্ষিতে বিস্ময়কর : "বিশ্বেশ্বরী কহিলেন,...মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যিকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।...মুসলমানদের মধ্যেও তো অজ্ঞান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সবদিকে শুধরে রেখেচে।" (ঐ)।

নিজ সমাজের প্রতিপত্তিশালী অর্থবান ব্যক্তি অপরাধী হলে তাকে শাস্তি দিতে পরাঙ্মুখ নয় মুসলমানেরা। বিশ্বেশ্বরীর মুখে শুনেছি, পিরপুর গ্রামে "জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে ক'রে রেখেচে, সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয়না বলে।" প্রায় একই অপরাধে হিন্দুসমাজের গোবিন্দ গাঙ্গুলির কোনো শাস্তি হয়না ('গোবিন্দ গাঙ্গুলি সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা ক'রে দিলে'), কারণ সে নিজেই 'সমাজের মাথা'। মুসলমানরা তাদের সমাজকে যথেষ্ট মান্য ক'রে। হিন্দুদের মতো প্রতি কথায় তারা 'বিবাদ' করে না, সামান্য ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দমার প্রবৃত্তিও তাদের নেই। "বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচারফলই, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষত বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোনো হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।"

শরৎচন্দ্রের আঁকা মুসলমান সমাজের টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে পাই—অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন, ব্যবসায়ী মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু মহাজনের লেনদেন, সাহায্যকারী হিন্দু জমিদারের সম্পর্কে মুসলমানের আবেগময় ভালবাসা, নিমকের মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অত্যাচার বড় আকারে দেখা গেছে 'মহেশ' গল্পে, 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে। 'মহেশ' গল্পের গফুরের কাছে মেয়ে আমিনার এবং নিজের অনাহারের থেকেও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল—তাদের গৃহপালিত বলদ মহেশের তৃষ্ণার জল এবং

খাবার শুকনো খড় না জোটা। তার গভীর বেদনার উচ্চারণ : "কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশাই সব ধরে রাখলেন। কেঁদেকেটে হাতে পায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণ দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপে বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে মহেশ আমার মরে যাবে।"

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে একই ছবি। মহাজনের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান প্রজা চড়া সুদে ঋণ করে, তারপর "সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারেনা। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ-বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু।"

সামাজিক পীড়নের মাত্রা শিক্ষার ক্ষেত্রেও কম ছিলনা। হিন্দু জমিদারের অধীন মুসলমান প্রজার ছেলের স্থান হয়না হিন্দু-পরিচালিত স্কুলে। এই ক্ষোভের কারণে পিরপুর গ্রামের মুসলমানেরা নিজেদের স্কুল তৈরি করেছিল।

অন্যদিকে সুদখোর হিন্দু মহাজন এবং ধনী মুসলমান ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক লেনদেন দেখেছি 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে। 'পরম হিন্দু', ধর্মধ্বজী গোলক চাটুজ্যে গো-চালান দেবার জন্য মুসলমান ব্যবসায়ীকে নির্দ্বিধায় ঋণ দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রেব বিদ্রূপের লক্ষ্য হিন্দু মহাজন হলেও, দেখা যাচ্ছে অর্থস্বার্থে উভয় ধর্মের উপরিতলের মানুষ ধর্মবিবাদ স্বচ্ছন্দে সরিয়ে রাখে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কিছু মুসলমান চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দাগ কেটে গেছে। যেমন 'পল্লীসমাজে'র আকবর। জীবনের তোয়াক্কা না ক'রে মুসলমান নিমকের মূল্য দেয়—এই সত্য আকবরের বাক্যে এবং কার্যে ঘোষিত। রমেশের হাতের লাঠিতে শরীরের রক্ত ঝরিয়ে বেণীর নিমকের ঋণ শোধ করেছে আকবর। সে কেন বেইমান অপবাদ সহ্য করবে ("খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারিনা।")। আকবরের অহংকারও ছিল—"পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না?"—সে কিভাবে ছোটবাবু রমেশের নামে থানায় মিথ্যা নালিশ করবে?

কোনো হিন্দু যখন মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্নবান হন, তখন তাঁর জন্য মুসলমানের আবেগময় ভালবাসা। 'পল্লীসমাজে'র রমেশ সম্পর্কে পিরপুর গ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের সেইরকমই মনোভাব। সম্পর্কিত-ভাই বেণীর চক্রান্তে রমেশ জেলে যাওয়ার পর "পিরপুরের মোচলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। ছোটবাবু [রমেশ জেল থেকে] ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে...। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে ফিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে।" জাফর আলির মতো ধনী কৃপণ মানুষও (সৎমাকে অনাহারে রাখায় সমাজ যাকে একঘরে করেছে) রমেশের জেল হওয়ার দিন, পিরপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠায় রমেশের ভূমিকা স্মরণ ক'রে 'একটি হাজার টাকা দান করেচে।' সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার—"মসজিদে তাঁর [রমেশের] নাম ক'রে নাকি নেমাজ পর্যন্ত পড়া হয়।"

হিন্দুসমাজের তুলনামুখে মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গ এনেছিলেন শবৎচন্দ্র। এর বেশি সুযোগ তাঁর সামনে ছিলনা। হিন্দুসমাজের মতো গভীরভাবে ঐ সমাজকে দেখাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু সামান্য অভিজ্ঞতার অসামান্য ব্যবহার তিনি কবেছেন।

খ্রীস্টান মিশনারি এবং খ্রীস্টান সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব প্রসন্ন ছিলনা। প্রতীচ্য-সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টার অন্যতম আয়ুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে খ্রীস্টধর্মকে। মিশনারিদের লক্ষ্য, একদিকে বিজিত দেশের ধর্ম সম্বন্ধে অবিরত নিন্দা-কুৎসাব ঝড় বইয়ে দেওয়া, অন্যদিকে আর্থিক সুযোগসুবিধার টোপ ব্যবহার ক'রে দুর্বলচিত্ত মানুষকে ধর্মান্তরিত করা। খ্রীস্টান সাম্রাজ্য বিস্তারের নোংরা চেহারাটা শরৎচন্দ্র খুলে ধরেছিলেন 'পথের দাবী'-তে। অন্যত্রও তা অল্প পরিমাণে আছে।

খ্রীস্টান ভারতীকে তার আজন্মের ধর্ম-সমাজ-সভ্যতার স্বরূপ শুনিয়েছেন সব্যসাচী: "লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশুশক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর [খ্রীস্টান সভ্যতার] মূল মন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমেব বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আব ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোনো দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মবক্ষা করতে পাবেনি। ...ন্যায়ধর্মই সকলের বড়, এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই অধীনতার শৃঙ্খলা তার পায়ে পবিয়ে সেই পঙ্গুর সকল প্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম কর্তব্য—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারিব ধর্মপ্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।"

পৃথিবীব্যাপী খ্রীস্টান সাম্রাজ্য গড়ে তোলাব কাজে কিভাবে খ্রীস্টধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ছবি সব্যসাচীব সংলাপে : "তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করে, এত রাজ্য হলো তোমাদের কি ক'রে? নাবিক বললে, অতি সহজে, যে দেশ আত্মসাৎ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে মাল, হাতে পায়ে পড়ে ব্যবসার জন্য দেশের রাজার কাছে চেয়ে নিই এক ফোঁটা জমি। তারপরে আনি মিশনারি, তারা যত না করে ক্রীশ্চান, তার চেয়ে বেশি করে সেদেশের ধর্মকে গালিগালাজ। লোকে ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ফেলে দু-একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের কামান-বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্যসামন্ত। আমাদের সভ্য দেশের মানুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরে প্রমাণিত ক'রে দিই। শুনে জাপান বললে, প্রভু! আপনারা তাহলে গা তুলুন, আপনাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি ক'রে দিলে—চন্দ্র-সূর্য যতদিন উদয় হবে ক্রীশ্চান যেন না আর আমাদের দেশে পা দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড!" (ছাব্বিশ অধ্যায়)।

ইতিহাসের এই সত্য।

অন্যদিকে সাদা চামড়া অথবা কালো চামড়া খ্রীস্টান প্রভুদের বুটের লাথি এদেশের মানুষের মনে কি পরিমাণ ঘৃণার সৃষ্টি করেছে (অক্ষমের একমাত্র অস্ত্র), তাও দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। ভাতের হাঁড়ির ধর্মাশ্রয়ী হিন্দুরা (বিবেকানন্দের প্রয়োগ) প্রাণপণে জাত রক্ষার

চেষ্টা করেছে খ্রীস্টানদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। 'খ্রীস্টানের জল' কাঠের মেঝে চুঁইয়ে অপূর্বর চিঁড়ে-মুড়কি-সন্দেশের হাঁড়ি স্পর্শ করতে পারেনি বলে কোনো গতিকে অপূর্ব আহার করতে পেরেছিল। আর তার ভৃত্য তেওয়ারি খ্রীস্টান ভারতীর পর্বদিনে দেওয়া ফল প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করেনি। অপূর্ব নিজেও খ্রীস্টান পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করাকে অত্যন্ত 'বিতৃষ্ণা'র মনে করেছে। খ্রীস্টান বাঙালির বিষয়ে সাধারণ হিন্দুর ধারণা—ওরা তো খ্রীস্টান, বাঙালি নয় :

"লোকটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলছেন বাঙালি—আবার খ্রীস্টান কি রকম? খ্রীস্টান হলে আবার বাঙালি থাকে নাকি? খ্রীস্টান—খ্রীস্টান। মোচলমান—মোচলমান। বস্, এই তো জানি মশায়। অপূর্ব বলিল, আহা বাংলাদেশের লোক তো। বাংলা ভাষা বলে তো! সে গরম হইয়া বলিল, ভাষা বললেই হলো? যে জাত দিয়ে খ্রীস্টান হয়ে গেল, তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাঙালি তার সঙ্গে একবার আচার-ব্যবহার করুক দেখি তো?"

শরৎচন্দ্র নিজে তথাকথিত সামাজিক নীতির পরোয়া না ক'রে জীবন কাটিয়েছেন। 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম পর্বে ইন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, "মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ।" এতবড় জীবনসত্য সত্যকার বৃহৎ মনের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব। সেই মন শরৎচন্দ্রেরও। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের বাড়াবাড়ি তাঁর ছিলনা। হিঁদুয়ানির বিরুদ্ধে ভারতীর মুখের কথাকে তাই শরৎচন্দ্রের নিজের কথা বলে ধরে নিতে পারি। ভারতী অপূর্বকে কার্যত ধিক্কার দিয়ে বলেছিল :

"ম্লেচ্ছকে প্রাণ দিলে দোষ নেই, মুখে জল দিলেই তার প্রায়শ্চিত্ত চাই, না?"

যে ধর্ম অন্ধ আচার-বিচারের খিল তুলে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়, সেই আত্মঘাতী ধর্মকে ধিক্কার দিয়ে শরৎচন্দ্র সর্বদাই অত্যাচারিতের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। কোনো নির্যাতিত হিন্দু খ্রীস্টধর্মে আশ্রয় নিলে অন্নবস্ত্র-সহ তার সামাজিক সমস্যার সমাধান ঘটে—তখন লেখকের অনুভূতিশীল মন তার বিষয়ে বিরূপতা বোধ করতে পারেনি। অগ্রদানী বামুন চক্রবর্তী-গৃহিণী তাঁদের সামাজিক এবং আর্থিক দুরবস্থার উল্লেখ ক'রে চোখের জলে ভেসে বলেছিলেন, তাঁর খ্রীস্ট-ধর্মান্তরিত খুড়শ্বশুর মশায়ের 'আর কোনো কষ্টই নেই।' এখন তিনি 'রাজার জাত'। ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে শ্রীকান্তের উপলব্ধি একই :

"হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্মান্তর গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশবোধ হয়, কিন্তু সান্ত্বনাই বা দিব কি করিয়া? একদিন জানিতাম অস্পৃশ্য, নীচ জাতি যাহারা আছে, তাহারাই শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্যাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম কেহ বাদ যায়না।" (তৃতীয় পর্ব)।

ধর্মান্তরিত মানুষের সামাজিক নীতি-নিয়ম সম্বন্ধে বাঙালি হিন্দুর ভ্রান্ত ধারণার মোচনেও লেখক অগ্রসর। "অপূর্বর...মনে হইল ইহাদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান নাই, এঁটো-কাঁটা মানেনা, সামাজিক ভালমন্দের কোনো বোধ নাই।" এই অপূর্বকেই ভারতীর কাছে শুনতে হয়েছিল খ্রীস্টান সমাজের নৈতিক নিয়মের কথা : "ম্লেচ্ছদেরও একটা সমাজ

আছে, আপনার সঙ্গে একরাত্রি [এক] ঘরে কাটালে তারাও ভালো বলেনা।...আমাদের ম্লেচ্ছসমাজে কি সুনাম দুর্নাম বলে জিনিস নেই? আমাকে কি তার ভয় ক'রে চলতে হয়না?"

শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে প্রেমের নানামুখী চরিত্র। সেখানে মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল রূপের প্রকাশ। কেবল আবেগময়তা শরৎ-উপন্যাসেব নারীপুরুষের বৈশিষ্ট্য—এই ব্যাখ্যা অতিসরলীকরণ ছাড়া কিছু নয়।

ঐসব নারীপুরুষের মধ্যে যেমন সামাজিক অবস্থার তারতম্য, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য। যথা, শ্রীকান্ত-পিয়ারী-রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্ত-কমললতা, অভয়া-রোহিণী, অন্নদা-শাহজী, সুনন্দা-যদুনাথ, গফুর-কমললতা ইত্যাদি ('শ্রীকান্ত') ; সতীশ-সাবিত্রী, সতীশ-সরোজিনী, উপেন্দ্র-সুরবালা, উপেন্দ্র-কিরণময়ী, কিরণময়ী-অনঙ্গমোহন, কিরণময়ী-দিবাকর ('চরিত্রহীন') ; সুরেশ-অচলা, মহিম-অচলা, মৃণাল-মহিম, মৃণাল-ভবানী ঘোষাল ('গৃহদাহ') ; গুণীন্দ্র-হেম ('পথনির্দেশ') ; রমা-রমেশ ('পল্লীসমাজ') ; মাধবী-সুরেন্দ্রনাথ ('বড়দিদি') ; জীবানন্দ-ষোড়শী ('দেনাপাওনা') ; বিরাজ বৌ-নীলাম্বর ('বিরাজ বৌ') ; সত্যেন্দ্র-বিজলী, সত্যেন্দ্র-রাধারাণী ('আঁধারে আলো') ; কাশীনাথ-কমলা ('কাশীনাথ') ; সুরমা-যজ্ঞদত্ত ('আলো ও ছায়া') ; অপর্ণা-শক্তিনাথ ('মন্দির') ; অনুপমা-ললিতমোহন ('অনুপমার প্রেম') ; বা থিন-মা শোয়ে ('ছবি') ; বিলাসী-মৃত্যুঞ্জয় ('বিলাসী') ; অনুরাধা-বিজয় ('অনুরাধা') ; দেবদাস-পার্বতী ('দেবদাস') ; নরেন্দ্র-বিজয়া ('দত্তা') ; অজিত-কমল, শিবনাথ-মনোরমা ('শেষ প্রশ্ন') ; ভারতী-অপূর্ব, সব্যসাচী-সুমিত্রা ('পথের দাবী') ; অরুণ-সন্ধ্যা ('বামুনের মেয়ে') ; জ্ঞানদা-অতুল ('অরক্ষণীয়া') ; শেখর-ললিতা ('পরিণীতা')।

এসব চরিত্রের মধ্য থেকে কয়েকটি নির্বাচন ক'রে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার নানা তল দেখব। সংস্কার এবং প্রেমের জটিল বিন্যাস শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের বিষয়। যেমন উদ্‌ভ্রান্ত আবেগে মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে বিরাজ বৌ-র মধ্যে। মহিম-অচলা-সুরেশের সমস্যা ভিন্ন। ত্রিকোণ প্রেম সেখানে চরিত্রদের ট্রাজিক পরিণতির কারণ। মহিমের প্রতি অচলার প্রেম কিছুটা অবচেতন কিছুটা চেতন। তার গভীর অস্তিত্বের সঙ্গেই তা জড়িত। অনেক পরে অচলা তা অনুভব করেছে যখন সে সুরেশের শয্যাসঙ্গিনী। অচলার প্রেম মহিমও বুঝতে পারেনি। হিমালয়তুল্য অভ্রভেদী গাম্ভীর্য নিয়ে সে অবস্থিত। আবার অচলার মানসিক শূন্যতা প্রকট হয়েছে সুরেশের মৃত্যুতে। তা আক্ষরিক অর্থে ধূ ধূ শূন্যতা। সুরেশের প্রেম বহুলাংশে দৈহিক, তার কামনার কাছে দেহই যথেষ্ট। মনের খোঁজ সে রাখতে চেষ্টা করেনি। অথচ বহির্গতভাবে অচলার প্রেমের জন্য তার কাঙালপনাও আছে। সুরেশের শেষ উপলব্ধি—দেহকে পেলেই প্রেমকে পাওয়া যায়না। বলতে পারি, স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ থেকে অচলাকে যেন উৎপাটিত ক'রে ভিন্ন পরিবেশে নিক্ষেপ করা হয়েছে—এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে পা রেখে সে বিপর্যস্ত। ফলে অস্বস্তি, আঘাত ও বঞ্চনা, মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ এবং পরবর্তী তীব্র আত্মদাহ। অচলার জীবনে ও প্রেমে আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা ও শূন্য পরিণাম।

কিরণময়ীর প্রেমের সঙ্গে অচলার প্রেম অবশ্যই মেলেনা। সর্বঅর্থে বঞ্চিত জীবন কিরণময়ীর। একদিকে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য, অন্যদিকে নিস্পৃহ উদাসীন স্বামী, শাশুড়ির উৎপীড়ন, অপরিতৃপ্ত যৌবনক্ষুধায় এবং অন্নের প্রয়োজনে লুব্ধ পুরুষ ডাক্তার অনঙ্গমোহনের কাছে আত্মদান, তার তীব্র গ্লানি, তারপর উপেন্দ্র-সুরবালার মধ্যে আদর্শ দাম্পত্যজীবনের ছবি দেখে নীরস কাষ্ঠবৎ মরণোন্মুখ স্বামীকে ভালবাসার শেষ চেষ্টা। একইসঙ্গে রয়েছে—কিরণময়ীর সত্যকার ভালবাসার পাত্র উপেন্দ্রর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের পর হিংস্র আক্রোশে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা—দিবাকরকে প্রলুব্ধ ক'রে গৃহত্যাগ ও ব্রহ্মপ্রবাস। অন্তিমে আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত উম্মাদ জীবন। কিরণময়ীর প্রেমের এই চালচিত্র।

মাতৃত্ব এবং বৈধব্য সংস্কারের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর প্রেমের দ্বন্দ্ব। অপরের কাছে ব্যক্তিত্বময়ী রাজলক্ষ্মী প্রেমাস্পদের কাছে নতজানু-মূর্তি। অন্যদিকে শ্রীকান্ত স্বাধীন মুক্ত স্বভাবের মানুষ। এক ধরনের দার্শনিক ঔদাস্য তার আত্মগত। রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মহিমা স্বীকার করলেও তার কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য শ্রীকান্তের ভিতরে ক্ষুব্ধ অসন্তোষ ছিলই। শ্রীকান্ত কমললতাকে ভালবেসেছিল কিনা নিশ্চিতভাবে বলা চলেনা। কিন্তু কমললতার দাবিহীন মুক্ত প্রেম শ্রীকান্তের পুরুষাভিমানকে তৃপ্তি দিয়েছিল। অবশ্য কমললতার প্রতি গফুরের অনিঃশেষ প্রেমের কথাও শ্রীকান্ত জানত। শ্রীকান্তের প্রতি কমললতার প্রেম 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বিনে আর জানিনে।' কমললতার প্রতি গফুরের প্রেম একই প্রকৃতির, যা করুণ আত্মবিলয়ে পরিসমাপ্ত। সুনন্দার স্বামীপ্রেম কঠিন 'নৈতিকতা'য় আপসহীন। অন্নদা-শাহ্জীর প্রেমের বিপরীত প্রেক্ষায় অবস্থিত অভয়-রোহিণীর ভালবাসা। নরহত্যায় অভিযুক্ত ধর্মান্তরিত শাহ্জীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসায় অন্নদা ঘর ছেড়েছেন অকারণ কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়ে। আর অভয়া একাধিক বিবাহিত নিষ্ঠুর বর্বর স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে নতুন ঘর গড়েছে সত্যকার ভালবাসার মানুষ রোহিণীর সঙ্গে।

অন্নদার থেকেও অনেক বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ছোটগল্প 'বিলাসী'। সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেমকাহিনী উপস্থিত করার কালে শরৎচন্দ্র একটি ফুটনোট যোগ করা আবশ্যিক বোধ করেছিলেন :

"জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল। তার আসল নামটা কাহার জানিবার প্রয়োজন নাই, নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন, ন্যাড়া।"

'ন্যাড়া' শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের ডাকনাম।

ঐ স্বীকারোক্তির পরে এই গল্পটি যে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থাপিত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা। অসম সামাজিক পরিবেশে মানুষ হওয়া দুই নরনারী এই কাহিনীতে এমন গভীর প্রেমে আসক্ত, যার কাছে সমাজ, বিষয়-সম্পত্তি, এমনকি ধর্ম তুচ্ছ হয়েছে। ঐ প্রেমের কাছে মৃত্যুও কার্যত পরাস্ত। সর্প-দংশাহত মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর বিলাসীর আত্মহত্যা—এ ছবি চিরন্তন প্রেমের।

ষোড়শী-জীবনান্দের প্রেম ভিন্ন মাত্রার। বিশেষ প্রথার প্রতি আনুগত্যে ষোড়শী হয়েছে সন্ন্যাসিনী ভৈরবী। অভ্যস্ত ভৈরবী জীবনের মধ্যে সহসা বাল্যসখী হৈমবতীর সুখী

দাম্পত্যজীবনের ছবি প্রত্যক্ষ ক'রে নিজের বঞ্চিত দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সহসা সে সচেতন হয়েছে। ঠিক সেই সময় নামমাত্র বিবাহকারী নিজের দুশ্চরিত্র স্বামীকে দেখে ভিতরে ভিতরে সে এমনই আলোড়িত হয়েছিল যে, উক্ত স্বামীর সঙ্গে রাত্রিবাসের মিথ্যা কলঙ্ক পর্যন্ত মাথায় তুলে নিয়েছে। এই সহসা জাগ্রত স্বামীপ্রেমের পরিণতি—উপন্যাসের সমাপ্তিতে স্বামী জীবানন্দকে নিয়ে, ভৈরবী জীবন ত্যাগ ক'রে, পত্নী ষোড়শী কিংবা অলকা হয়ে তার গ্রামত্যাগ। উল্টোদিকে নিজের ক্লেদাক্ত জীবনের মধ্যে সত্যকার প্রেমের অনুভূতি জীবানন্দের মনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এবং সে গ্রহণ করেছে ষোড়শীর অসমাপ্ত কর্ম। এমন-কি কারাবাস-সহ অন্য যে-কোনো ঝুঁকি পর্যন্ত গ্রহণে সে প্রস্তুত। ষোড়শী-জীবানন্দের প্রেম-পরিণতির কাহিনীতে অকথিত থেকে গেছে একটি সংবাদ —জীবানন্দকে নিয়ে প্রস্থানের ফলে ষোড়শীর সন্তানতুল্য প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কিনা। এক্ষেত্রে আরব্ধ কর্তব্যের উপর ষোড়শীর স্বামীপ্রেমের নিঃসংশয় প্রাধান্য।

॥ ৯ ॥

শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ তাঁর রচনাবলীর ভাষ্য

এই অধ্যায়ের সূচনায় একাগ্র শ্রোতা শরৎচন্দ্রের কথা বলেছি যিনি গভীর মনোযোগে অপরের কথা শুনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন। শরৎচন্দ্রের এই শ্রোতা-ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ —কম গুরুত্বপূর্ণ নয় শরৎচন্দ্রের কথক-ভূমিকা। বর্তমান অধ্যায়ের সমাপ্তিতে সেকথা স্মরণ করব। মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন :

"লেখার মধ্যে আর্টের সূক্ষ্ম আবরণে মানুষটির একটি পরিচয় পাই ; কিন্তু আলাপের উপযুক্ত আসরে, কোনো গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণায় তাঁহার অন্তরের পরিচয় আরো স্বচ্ছ হইয়া উঠে ; এবং সেই কারণে, তাঁহার রচনাবলীর ভাষ্যরূপে তাহা যেন শ্রোতার পক্ষে আরো মূল্যবান।"

মোহিতলাল সেই পরম জীবন-অভিজ্ঞ মানুষটিকে আমাদের চোখের সামনে হাজির ক'রে দিয়েছেন, যাঁর কণ্ঠস্বর "মৃদু অথচ দৃঢ় এবং কথার ভাষা...পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুট ও প্রাণময়।" [৪৯] এসবের পিছনে ছিল শরৎচন্দ্রের সহজ ও সুদৃঢ় প্রত্যয়। জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে সেই প্রত্যয়ের জন্ম।

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ৯-১০।
২. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৩৭, ১০৬-০৭।
৩. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৩২।
৪. রাধারানী দেবীকে চিঠি. ঐ, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

৫. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ২৯।
৬. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১১৮।
৭. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯৫।
৮. 'প্রবর্তক' পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৩৩৭ (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫)।
৯. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৮। একই কথা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন ৫৭তম জন্মদিনে কলকাতার টাউন হলে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে : "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।...তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।"
১০. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৮।
১১. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২১৪।
১২. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ১৬।
১৩. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯৬-৯৭, ১১৩।
১৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৪৪-৪৬।
১৫. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৮৯-৯০।
১৬. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ২৯-৩১।
১৭. 'শরৎপরিচয়', মোহিতলাল মজুমদার, (আকর : 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থ, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ. ১০২)।
১৮. ঐ, পৃ. ১০০-১০১।
১৯. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৯৩।
২০. 'প্রবর্তক', কার্ত্তিক ১৩৪৭ (আকর : 'শরৎচন্দ্র', ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৫)।
২১. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২০-২১।
২২. 'শরৎচন্দ্র' (৪র্থ খণ্ড), পৃ. ২৬৫-২৬৬।
২৩. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ৮২।
২৪. শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৬৩।
২৫ক. ঐ, পৃ. ২৬৫।
২৫খ. রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের চিঠি, ঐ, পৃ. ২৫৯-২৬২।
২৬. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৪১-৪৩।
২৭. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৮১-৯৩।
২৮. ঐ, পৃ. ৮৫।
২৯. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।
৩০. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৫৯, ৮৮।
৩১. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৩২।
৩২. ঐ, পৃ. ১৩৩।
৩৩. ঐ, পৃ. ১৩২।
৩৪. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৯৪।
৩৫. রাধারানী দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পরিশিষ্ট, পৃ. ৯৫।

৩৬. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২১৬।
৩৭. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৭৮।
৩৮. 'শ্রীশরৎচন্দ্র', দিলীপকুমার রায় (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', পৃ. ৩১৯)।
৩৯. ঐ।
৪০. বাধারানী দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৯৩।
৪১. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৬৬।
৪২ক. ঐ, পৃ. ৪৯।
৪২খ. হিন্দু সমাজমনের প্রত্যাখ্যানের ফলে বিধবা-বিবাহ হিন্দু সমাজে যেমন গ্রাহ্য হয়নি, তেমনি ঐ কারণে সাহিত্যেও বিধবা-বিবাহ দেখা যায়নি। শরৎচন্দ্র তীক্ষ্ণ ভাষায় লিখেছেন : "বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসেব মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়ে কোনো সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্রই তাঁর মন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দু মনের বিচার করেন নি। তাই আইন পাস হলো বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল।...তখনকার দিনের কোনো সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয়তো এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিলনা, হয়তো তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল, যে জন্যই হউক, সেদিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হযে রইল—সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলেনা।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, যদি সাহিত্যিকেরা সেদিন বিদ্যাসাগর মশায়েব প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতেন, তাহলে নিন্দা, গ্লানি, সামাজিক নির্যাতন তাঁদের সহ্য করতে হলেও "আজ হয়তো আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')।
৪৩. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১০৭।
৪৪. 'শবৎচন্দ্র' (৪র্থ খণ্ড), পৃ. ২৩৭।
৪৫. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২১৩-২১৪।
৪৬. ঐ।
৪৭. ঐ।
৪৮. ঢাকায় অবস্থানকালে মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনায় শরৎচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি কলকাতায় হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক কারণে কলকাতা তখন উত্তপ্ত। অনেকে মনে করেছিলেন উপাধি প্রাপ্তির আতিশয্যে শরৎচন্দ্র বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছেন। 'শনিবারের চিঠি' লিখেছিল : "ঢাকায় মুসলমানী সাহিত্য রচনার প্রতিশ্রুতি দিবার পর হইতে আমাদের ডক্টর শরৎচন্দ্রের দিন বড় খারাপ যাইতেছে। অথবা এমন হইতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি তাঁহার সহিতেছে না।" ('সংবাদ সাহিত্য', 'শনিবারের চিঠি', আষাঢ় ১৩৪৪)। এসব সমালোচনা শরৎচন্দ্রের কাছের মানুষদের যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁদের একজন অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত ঐসব নিন্দাশরের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন : "শবৎচন্দ্রকে যখন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট. উপাধি দান করেন, তখন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার জের বেশ তীব্র ছিল। এমন সময় কলকাতায় সংবাদ এলো, ঢাকার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র নাকি বলেছেন, এবার তিনি মুসলিম সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন। তিনি ঠিক কি বলেছেন—যে সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে, সেটা কতখানি সত্য, সেসব বিচার করবার আর কারুব ধৈর্য রইল না—তাঁকে নিয়ে কাগজপত্রে গালিগালাজের বন্যা বয়ে গেল। দু'একটি নমুনা দিচ্ছি—

(১) 'বহু বাঞ্ছিত ডি.লিট. যখন নভেল লিখেই পাওয়া গেল এবং তা যখন রহমান সাহেবের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাইস-চ্যান্সেলার) হাত দিয়েই এলো, তখন এই ব্রাহ্মণবটু আতিশয্যে বলে ফেললেন, তিনি অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়েই নভেল চালাবেন।'

(২) 'হায় শরৎচন্দ্র, তোমার এই প্রাণের দায়ে কাঙালপনা দেখিয়া সত্যই তোমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়'।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৭২)।

শরৎচন্দ্র নিজেও কলকাতায় ফিরে আত্মপক্ষ সমর্থন প্রয়োজন বোধ ক'রে অবিনাশচন্দ্রকে বলেছেন, উপাধি বিতরণের পর লাটসাহেবের সঙ্গে একত্র আহারের সময় লাটসাহেব পরামর্শ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য দূর করার জন্য শরৎচন্দ্রের উচিত মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনা করা। "আমি তাঁর একথায় সম্মতি জানাই। ভেবে দেখলুম তিনি কিছু অন্যায় বলেন নি। বাস্তবিকই আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে আমাদের বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করিনা কেন, আসলে ওরা আমাদের দেশেরই—এখানেই ওদের সব। আমাদের যা মাতৃভাষা, ওদের মাতৃভাষাও তাই। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়ে যদি তাদের কথা লিখি, তারা তা শুনবেই—না শুনে পারেনা।" (ঐ)।

৪৯. 'শরৎপরিচয়', মোহিতলাল মজুমদার।

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

॥ ১ ॥

পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ এবং অনুজ সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আবেগময় ভালবাসা —শরৎচন্দ্রের কলমে এ-ই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সর্বদা তা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কদাচিৎ তিনি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর মনোভাব প্রশংসা-সমালোচনা মিশ্রিত। এক পর্বে আধুনিকদের জন্য উত্তেজিত সমর্থন জানালেও পরে তা প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন। শরৎ-মানসিকতার এই নানা মাত্রা দৃশ্যত বিস্ময়কর।

॥ ২ ॥

'বঙ্কিমচন্দ্রের...অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা...করেছি'

এই উক্তি শরৎচন্দ্রের। সাহিত্যিক হিসাবে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি ফিরে তাকিয়েছেন সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্বের দিকে, মনে পড়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাঁকে কি পরিমাণে আলোড়িত করেছিল। বিদ্যালয়জীবনে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। "উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল।" এমন কি 'অন্ধ অনুকরণের' প্রয়াসও তাঁব ছিল। "লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।" ('আত্মচরিত', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

এটুকু অন্তত স্পষ্ট, বঙ্কিমচন্দ্রকে একেবারে অস্বীকার করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বঙ্কিম-সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ছিল সমুচ্চ মনস্বিতা। তিনিই.সত্যকার আধুনিক উপন্যাসের প্রবর্তক এবং তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। শরৎচন্দ্রও মূলত ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিলনা। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ হিসাবে তাঁর পরিবর্তিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক দৃষ্টির বহুতর পার্থক্য।

বঙ্কিম-বিষয়ে দুটি অভিযোগ তুলেছেন শরৎচন্দ্র—প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমানবিরোধী রচনা পড়ে মুসলমানদের মর্যাদাবোধ আহত, দ্বিতীয়ত সমাজ-স্বাস্থ্যরক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর স্খলিতপদ নায়িকাদের উপর নীতির দণ্ডবিধান করেছেন। এসব প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্রের লিখিত রচনায় এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁর মৌখিক আলাপে পাওয়া গেছে।

'জীবন, প্রত্যক্ষ জীবন—শরৎসাহিত্যের ভিত্তি' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে দেখেছি,

ঢাকায় ডি.লিট. গ্রহণ-পর্বে শরৎচন্দ্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য করবেন। তা আকস্মিক কিংবা উপাধিপ্রাপ্তির উচ্ছ্বাসপ্রসূত ছিলনা, সেকথা জেনেছি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় : "অনেক পূর্ব হইতে তাহার [শরৎচন্দ্রের] মনে একটা ইচ্ছা বর্তমান ছিল। সে বলিত, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলমানদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে আমার মন সব জায়গায় সায় দেয় না। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁ যখন নিশাকরের কথা গুণতে গুণতে এক বাত হুয়া দো বাত হুয়া বলছিল, তখন নিশাকর উত্তর দিয়েছিল—ওস্তাদজি, শুয়োর গুণছ নাকি?—এই রকম সব উক্তির দ্বারা অনর্থক তিনি মুসলমান সমাজের দোষ ত্রুটি না দেখাইয়া উপন্যাস রচনা করিলে মুসলমানেরা ব্যথিত হইতেন না হয়ত।' এইজন্য সে মুসলমান সমাজ ও জীবনকে লইয়া একখানি উপন্যাস লিখিবার সংকল্প করিয়াছিল।" ঐ উপন্যাস লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত শরৎচন্দ্র অনুরোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে সে প্রস্তাব খারিজ ক'রে "তাহাকে [শরৎচন্দ্রকে] বলেন, '...সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুব গভীর, তুমিই এ বিষয়ের যোগ্যতম ব্যক্তি'।" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫)।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপে একই প্রসঙ্গ উঠেছিল। তাঁর স্নেহভাজন আকরম খাঁ-র বঙ্কিম-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ("সেদিন আকরম খাঁ বলছিল, দাদা, বঙ্কিমবাবু শিক্ষিত মুসলমানদের যে-রকম শত্রু ক'রে গেছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যের উপর যদি তাদের বিতৃষ্ণা জাগে, সেটা কি দোষের বলেন?") উল্লেখ ক'রে, শরৎচন্দ্র নিজের মতো ক'রে বঙ্কিম-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করেছেন :

"[আকরমকে] বললুম, ভাই, বঙ্কিমবাবু যে তাঁদের ভুল বুঝবার কিছু সুযোগ দেন নি তা আমি বলব না। কিন্তু সেটা তাঁর ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষ বলে মনে কোরো না। সমাজের গণ্ডীর মধ্যে সাহিত্যকে বেঁধে রাখতে গিয়েই তিনি বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিলেন। ...হিন্দুসমাজ তোমাদের সমাজের মতো উদার নয়—আর বঙ্কিমবাবুর যুগে সে অনুদারতা কি রকম ভয়াবহ ছিল বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টার দুঃখভোগ থেকেই বুঝতে পারো। অতএব এই সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে উপন্যাস লেখা যে কি রকম অসুবিধাজনক তা বঙ্কিমবাবু টের পেয়েছিলেন। অথচ উপন্যাস তাঁর দরকার...তাই যতটুকু মালমশলা স্বচ্ছন্দে হিন্দুসমাজ থেকে পাওয়া যায় তা তিনি নিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে ক'রে উপন্যাসের কলেবরই বলো, আখ্যানভাগই বলো, রুগীর দেহের মতোই শীর্ণ হয়। এই মুস্কিলের আসান করতে গিয়ে তাঁকে সামাজিক কাহিনীর সঙ্গে তথাকথিত ইতিহাসের কাহিনীকে ভেজাল দিতে হয়েছিল, আর এই ভেজাল—কুফলস্বরূপ তোমাদের সমাজের লোকেদের তাঁকে ভুল বুঝবার সুযোগ তৈরি ক'রে দিয়েছিল।" [১]

শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের বক্তব্য নির্বিচারে লেখকের বক্তব্য হতে পারেনা। নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে চরিত্রদের স্থাপন ক'রে ঔপন্যাসিক তাদের স্বাধীনতা দেন। তাদের রসরক্তসিক্ত হৃদয়ছবি তাঁর রচনাবিষয়। সে প্রয়োজনে যদি কোনো চরিত্রের মুখে মুসলমানবিরোধী কথা শোনা যায়, তাহলে তা সেই চরিত্রের নিজস্ব বক্তব্য, লেখকের নয়। অন্যদিকে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দলনী,

মীরকাসেমের মতো অসামান্য চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। তা কিন্তু শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েনি। মুসলমানবিদ্বেষ প্রচার করাই যদি লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে শৈবলিনীর বিপরীত প্রেক্ষায় দলনীর গহন গভীর প্রেমকে তিনি উপস্থিত করলেন কেন? নিজেকে এসব প্রশ্ন করতে শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর বিচারভ্রান্তি এখানেই—তিনি ঘটনাগতভাবে বঙ্কিম-উপন্যাসের বিচার করেছেন, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

আবেগসম্পন্ন শরৎচন্দ্রের হৃদয়োচ্ছ্বাস বহুক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিষয়টি উল্লেখ ক'রে সাহিত্যিক-সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "ভাবের উপর অভিজ্ঞতার সাহায্যে, হৃদয়ের আনুকূল্যে যে-সিদ্ধান্ত রচনার বিষয়বস্তু হয়, সেটি একদেশদর্শী হতে বাধ্য।...শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিলনা।...শরৎচন্দ্রের চোখ ছিল বুকে।" ('আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। বঙ্কিম-সমালোচনার ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র এই মনোভাবের দ্বারা চালিত। তাঁর আলোচনায় তাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে রোহিণীর প্রসঙ্গ, কখনো শৈবলিনীও। একাধিক রচনায় ('আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত', 'সাহিত্য ও নীতি') এবং মৌখিক আলাপে কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রাদ্ধ তিনি করেছেন। বঙ্কিম-বিষয়ে তাঁর বিরোধী মতের মানুষের সঙ্গে (সে মানুষ তাঁর অন্তরঙ্গ হলেও) বাক্যালাপ দীর্ঘকাল বন্ধ রেখেছেন। শরৎচন্দ্র এতখানি বঙ্কিম-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন!

শরৎচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—শিল্পী বঙ্কিমের উপর নীতিবাদী বঙ্কিমের আধিপত্য।

"গোবিন্দলালকে রোহিণী অকপট এবং অকৃত্রিমভাবেই ভালবেসেছিল—সমস্ত হৃদয়-প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায়নি তাও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের অধিকারী সে নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হলোও সে।...মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্ত এবং [গোবিন্দলালের] পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির মৃত্যুতে। হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠকপাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে সমাজের বিধি ও নীতির Convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর, art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।" ('সাহিত্য ও নীতি')।

'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত' প্রবন্ধে এবং মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে মৌখিক আলাপে ('শরৎ পরিচয়' প্রবন্ধ) রোহিণী-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য একই। ঐ 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত' প্রবন্ধে শৈবলিনী সম্বন্ধেও তিনি মমত্বযুক্ত। গ্রন্থের শেষে শৈবলিনীর 'শাস্তিভোগ' সেকালের পাঠকদের খুশি করলেও "এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক,...নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায় শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার [প্রতাপের প্রতি] কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কিনা এবং এতবড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কিনা।"

শৈবলিনী সম্বন্ধে না হলেও রোহিণীর সম্বন্ধে তাঁর মত সমকালে নির্বিচারে গৃহীত হয়নি। অন্তরঙ্গ হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিতভাবে প্রতিবাদ ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছিলেন : "শরৎচন্দ্রের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি সেকেলে নন, কারণ শরৎচন্দ্রও একাধিক উপন্যাসে পাপের পরাজয় দেখাতে ছাড়েন নি, এবং তাঁর কোনো কোনো নায়িকা পাপের জন্যে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন দণ্ড ভোগ করেছে।" হেমেন্দ্রকুমারের এই অপরাধে শরৎচন্দ্র দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে রেখেছেন।[২]

অন্যদিকে ঢাকায় অসুস্থ শরৎচন্দ্রের মুখের উপর কড়া জবাব দিয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। নিজ 'ধর্মগুরু' বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে মোহিতলাল 'একটু শক্ত' হয়ে ভিন্ন মতের কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি নিয়ে পাঠক যদি লেখকের সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে রোহিণীর 'অসঙ্গত বিকাশ' সম্পূর্ণ অসঙ্গত না মনে হতে পারে। বরং শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ'-র আচরণে অসঙ্গতি আছে (শরৎচন্দ্রের মুখের উপর একথা মোহিতলাল বলতে পেরেছিলেন!)। সুতরাং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো কোনো রচনার (প্রতিভার নিঃসংশয় পরিচয় যেখানে আছে) ত্রুটি বিচারের সময় সৃষ্ট চরিত্রগুলির অন্তরবাহির সকল অবস্থার পরিচয় ভালোভাবে নেওয়া প্রয়োজন। মোহিতলাল স্বীকার করেছেন, "আজি আমি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীচরিত্র-ঘটিত বাদবিতর্কের প্রসঙ্গে...যাহা লিখিলাম—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় এত কথা এমনভাবে বলি নাই।...কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিকটে আমার মূল বক্তব্য ছিল ইহাই।"[৩]

মোহিতলালের সামনে শরৎচন্দ্র মোহিতলালের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন (অসুস্থ অবস্থায় বাগবিতণ্ডা বাড়াতে চাননি বলে, অথবা মোহিতলালের প্রবল বক্তব্যশক্তির বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা?)। "শরৎচন্দ্র অতিশয় নিবিষ্ট মনে আমার বক্তব্য শুনিলেন।...তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সত্যই এদিক দিয়া কখনো ভাবিয়া দেখেন নাই—সেজন্য যেন লজ্জিত ও দুঃখিত।...তিনি বলিলেন, 'মোহিত, তোমার সঙ্গে এইরূপ আলাপ-আলোচনার সুযোগ যদি হইত, তাহা হইলে তোমার ও আমার দুইজনেরই উপকার হইত'।"[৪] কলকাতায় ফিরে শরৎচন্দ্র এই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "...মোহিতের...সমালোচনা লেখবার শক্তি আছে।...একটু prejudiced বটে, কিন্তু সমালোচনার বোধ আছে।"[৫] মোহিতলালের সমালোচনা-শক্তিকে স্বীকার করেও শরৎচন্দ্র রোহিণী বিষয়ে তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সরে এসেছিলেন বলে মনে হয়না।

শরৎজীবনের অন্তিম পর্বের এই ঘটনার অনেক আগে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র লেখক সম্পর্কে শরৎচন্দ্র কিন্তু বলেছিলেন—নীতিবাদী নন, শিল্পী বঙ্কিম ঐ উপন্যাসের রচয়িতা। তাঁর ৫৫তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনায় পঠিত 'অভিভাষণে' শরৎচন্দ্র বলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মনে করেন যে, 'আনন্দমঠে'র স্রষ্টা 'প্রচারক ও শিক্ষক' বঙ্কিমের উপরে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র লেখক বঙ্কিমের স্থান। শরৎচন্দ্রের সম্ভবত মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহমত পোষণ না করলে ইন্টেলেকচুয়াল মহলে তাঁর কদর কমে যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ

সম্পর্কে প্রশস্তিবাক্যসহ তিনি বলেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা, বোধ করি...[রবীন্দ্রনাথের] পূর্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। এবং একথাও হয়তো নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, কথাসাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত সবাই গ্রাহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু যারা পারবে, উত্তরকালে তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। এবং যারা পারবে না, তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের—যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।"

মূল প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—বঙ্কিম-বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য কতদূর সমর্থনযোগ্য? ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি কেবল বঙ্কিমের উপর 'নীতিবাদী' তকমা সেঁটে দেবার জন্য অত ব্যস্ত হলেন কেন? তাছাড়া 'আনন্দমঠ' শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা আন্দোলনে, বিশেষত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে, কী প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তাও শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত নয়। তাঁর নিজের প্রচারধর্মী বৈপ্লবিক উপন্যাস 'পথের দাবী' যখন সরকারি রোষে বাজেয়াপ্ত (এবং প্রতিবাদে অস্বীকৃত রবীন্দ্রনাথের উপর তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ, রুষ্ট), তখন কি তাঁর মনে পড়েনি 'আনন্দমঠে'র সম-ভূমিকার কথা? বঙ্কিমচন্দ্র যা করেছেন তার ইতিবাচক আলোচনাই শরৎচন্দ্রের কলমে প্রত্যাশিত ছিল। 'নীতিবাদী' বঙ্কিমচন্দ্র তবু বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন, সংস্কারবাদী শরৎচন্দ্র বেশ কয়েকটি যোগ্য বিধবার সৃষ্টি করলেও তাদের পুনর্বিবাহ দিতে পারেন নি। বস্তুত তা পারা সম্ভব ছিলনা। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন নৈতিক সংস্কার। মনের দৃঢ়মূল সংস্কার মানুষের গভীর সুখ ও অসুখের কারণ। লেখক সেই সংস্কারের রূপ তাঁর সাহিত্যে দেখাবেন—এটাই প্রত্যাশিত। নীতির প্রশ্নে বিবেচ্য—লেখকের ঈপ্সিত আদর্শের ঘোষণা করাই কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য, নাকি সমাজবাস্তবতা রক্ষা ক'রে তার অন্তঃসারশূন্যতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা? চিত্ত-আলোড়নকারী প্রশ্ন জাগাতে পারলেই সমাজের মধ্য থেকে সংস্কারেচ্ছা জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রশ্ন জাগিয়েছিলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'। তার সব থেকে বড় উদাহরণ—খড়্গহস্ত শরৎচন্দ্র। অথচ তিনি নিজে কোথাও বিধবাবিবাহ দিতে পারেন নি। তাই যদি হয়, তিনি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা করলেন কোন্ যুক্তিতে? বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে অনেকগুলো বছর এগিয়ে গেছে যে পৃথিবী তার বাসিন্দা তো শরৎচন্দ্র!

॥ ২ ॥

'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই'

বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষটির নাম শরৎচন্দ্র। কৈশোর থেকে আমৃত্যু রবীন্দ্র-সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী পাঠক তিনি। অনর্গল আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর গ্রন্থাগারে "রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পূর্বতন ও আধুনিক গ্রন্থ" ছিল। ('শরৎচন্দ্র', রাধারানী দেবী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। * রবীন্দ্র-বিরোধী দলের বিরোধিতা করার সময় রাগে উত্তেজনায় তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে যেত। তবু—

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক সহজ ছিলনা। কোনো একটা বাধা যে ছিল তা পারস্পরিক মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যায়। অথচ উভয়েই উভয়ের সমাদর করেছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনকালে তাঁর গল্প-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের ঐ বিষয়ক জনপ্রিয়তাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গেছে। অন্যদিকে ইন্টেলেকচুয়াল মহলে তাঁর লেখা যথেষ্ট সমাদর পায়নি বলে তাঁর ক্ষোভ ছিল।[৭] হীনমন্যতার বোধ থেকে প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মনে ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে। এও দেখেছি, সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার অলৌকিক বিচ্ছুরণ শরৎচন্দ্রকে মোহিত এবং লুব্ধ করেছে।[৮] তাছাড়া সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পার্থক্যও যথেষ্ট। তাই বহু ব্যবহারে ক্লিষ্ট 'প্রেম ও ঘৃণা' তত্ত্বটি (Love and Hate Theory) এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে কিনা, এমন কথা উঠতে পারে।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্র-মুগ্ধতার কয়েকটি ছবি

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টির কাহিনী বলার সময় শরৎ-কণ্ঠ স্মৃতিভারাতুর। 'কোন্ আলো লাগল চোখে।'

"আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি, বাড়ির মেয়েদের জড়ো ক'রে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এল।...পেলাম...[কাব্যের] প্রথম সত্য পরিচয়।"

শরৎচন্দ্র সগৌরবে বলেছেন, তাঁর বোহেমিয়ান হবার প্রথম শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছে। ঐ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়ার পরে "এ বাড়ির উকিল হবার কঠোর নিয়ম সংযম আর ধাতে সইল না।" ('আত্মচরিত', শরৎচন্দ্র, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)। মসৃণ ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখ থেকে মুছে ফেলে নতুন স্বপ্নে আকীর্ণ শরৎচন্দ্র জীবনতরণী ভাসিয়েছেন অন্য সাগরে—ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনাথ।

জীবনের বহু ওলটপালটের মধ্যেও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-ধ্রুবতারকাটিকে কখনো হারান নি। "রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আমাদের সাহিত্যের স্বচ্ছ মননশীল দৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মনোভাব এবং সমাজনিষিদ্ধ জীবনের প্রতি উম্মত্ত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র সেজন্য তাঁহাকেই সাহিত্যক্ষেত্রে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।"[৯] রেঙ্গুনের বৈচিত্র্যময় জীবনে তাঁর সঙ্গী ছিল "কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথাসাহিত্য। এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বইই বারবার ক'রে পড়েছি —কি তাঁর ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথাসাহিত্যে, আমার এই ছিল পুঁজি।" ('আত্মচরিত', শরৎচন্দ্র, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

নিজের বিখ্যাত জীবনে পৌঁছে অহেতুক রবীন্দ্রভক্তি জাহির করার উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র ঐসব কথা বলেন নি। তার প্রমাণ হাজির করেছেন গিরীন্দ্রনাথ সরকার, যা আপাতভাবে সামান্য, কিন্তু শরৎ-মনস্তত্ত্বের পরিচয়দানে সত্যই মূল্যবান। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শান্তিদেবীর প্লেগ হওয়ার সংবাদ শুনে গিরীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বোটাটং-পোজানডং অঞ্চলে—শরৎচন্দ্রের ভাড়াকরা বাসায়। সেখানে দেখেছেন সেই ছবি যা মুহূর্তে ঐ পরিবেশের রঙ বদলে দেয়—"দেওয়ালে কয়েকখানি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারের মধ্যে একখানি রবিঠাকুরের বাঁধানো ছবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।"[১০]

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সাহিত্য বিষয়ে মত বিনিময় হতো। নানা বিষয়ের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য অবশ্যই ছিল। সামান্য মাইনের চাকুরে শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথের মুখে 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি'র কথা শুনে ডাকখরচ দিয়ে কলকাতা থেকে বইদুটি আনিয়ে পড়েছেন। তারপর গর্বের সঙ্গে বলেছেন : "আমার মতন এমন ক'রে রবিবাবুর বই বোধহয় কেউ পড়েনি। আমি বলে দিতে পারি কোন কথাটার পর ঠিক কোন কথাটা বইয়ে আছে।" অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' কিনে তিনি দান করেছেন রেঙ্গুনের বেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরীতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভাবের উৎসার ঘটিয়েছে—" 'জীবনে যত পূজা হলো না সারা,/জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' বলিতে বলিতে শরৎচন্দ্রের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।"[১১]

শুধু কবিতা? গানও ছিল। 'রবিবাবু'র গান। রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবিবাবুর গান গেয়ে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন, নবীনচন্দ্রকেও। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখন তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ওহে, সে ছোকরাটি কোথায় থাকে হে? রবির গান সে বড় চমৎকার গায়'।"[১২]

কলকাতার জীবনে শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার পরিচয় না পেলেও কবিতা আবৃত্তি ছিলই। তার উল্লেখ করেছেন রাধারানী দেবী : "রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিল ; 'বলাকা' ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাব্য। 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি ক'রে যেতেন ; স্মরণশক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ। কোনোখানে আটকাত না বা ভুল হতোনা।...তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার গুটিকয়েক পংক্তি প্রায়ই শোনা যেত,...আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়চে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে বারংবার শোনা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন ক'টি :

"বাঁশি যখন থামবে ঘরে, নিভ্‌বে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে পড়বে যবনিকা ;...
নাই ঘনালো দল-বেদলের কোলাহলের মোহ।"

('শরৎচন্দ্র', রাধারানী দেবী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

জীবনের শেষ পর্বে ঢাকায় গিয়ে জ্বরের ঘোরে অবিশ্রাম 'বলাকা'র কবিতা আবৃত্তি করেছেন তিনি।[১৩]

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার বিস্তৃত উল্লেখ আছে শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে, কিছু অন্যের স্মৃতিকথাতেও। প্রথমে রাধারানী দেবীর স্মৃতিকথা : "রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর

সাহিত্যগুরু বলে মনে মনে পূজা করতেন, কিন্তু সেও তাঁর ঐ নাস্তিকতার আবরণে আবৃত আস্তিক্য বুদ্ধির মতোই ছিল একান্ত সঙ্গোপন। যাঁদের কাছে মন খুলে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা জানেন, কী শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি। তিনি বলতেন—'বাংলা সাহিত্য বলতে আর অন্য কিছু আছে কি? বাংলা পড়তে হলে একমাত্র রবিবাবুই তো সম্বল।...বাংলাদেশে প্রকৃত রসিক সাহিত্য-সমঝদার এখন বেশি জন্মেনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক রস গ্রহণ করতে পারে, এমন সমঝদার শিক্ষিত লোকের মধ্যেও কম'।" (ঐ)।

তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ মর্মগ্রাহী—এমন সূক্ষ্ম অহংকারও শরৎচন্দ্রের থাকা সম্ভব। দেখেছেন অরসিক মানুষের রবীন্দ্রসাহিত্য না-বুঝেও বোঝার আস্ফালন। "অধিকাংশ লোকই দেখি বুঝুক না বুঝুক ফ্যাসানের খাতিরে বুঝদারের ভান ক'রে। কিন্তু চেপে ধরলে আবার তারাই দেখি রবীন্দ্রসাহিত্যের দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেয় সবচেয়ে বেশি। এদের সাথে একটু বিপরীত সুরে কথা কয়ে দেখেচি, এরা প্রাণ খুলে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও ত্রুটির তালিকা দিতে শুরু ক'রে দেয় এবং আমাকেও ওদের দলের একজন ঠাউরে নিয়ে খুশি হয়ে ওঠে।" (ঐ)।

কেবল রাধারানী নন, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রভক্তির পরিচয় উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনিন্দার দ্বারা শরৎচন্দ্রের স্তাবকতা করা যায়—এই ঘৃণ্য মনোভাবকে ব্যঙ্গ ক'রে শরৎচন্দ্র বলেছেন—হাঁ, আমি লিখি আপনাদের জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমার জন্য।[১৪] এবং সেই মানুষগুলি তাঁর কাছে করুণাব পাত্র যারা জানেনা রবীন্দ্রবিদূষণের ভাষা তারা রবীন্দ্রনাথের কাছেই পেয়েছে।[১৫]

কথাপ্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে শরৎচন্দ্র এও বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে। এক্ষেত্রে অগ্রজ ঔপন্যাসিকের পুরো সম্মান রবীন্দ্রনাথকে তিনি দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়। সেকথা বলার সময় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রসঙ্গ টেনে যোগ করেছিলেন : "রোহিণীকে আজ গুলি ক'রে মারতে হবেনা। এই যে অবস্থার পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, সাহিত্যের এই মোহান্ধতা দূরীকরণের জন্যে আমরা যাঁর কাছে ঋণী,...তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।"[১৬]

দিলীপকুমারকে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রই। সম্ভবত 'আনন্দবিদায়' নাটক উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের নষ্ট সম্পর্কের জন্য রবীন্দ্র-সকাশে হাজির হতে দিলীপকুমারের স্বাভাবিক সংকোচ ছিল। সেই সংকোচ ভেঙে দিতে শরৎচন্দ্র যে-উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেছেন দিলীপকুমার : "শরৎদার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হয়, তখনো মনের মধ্যে একটা চাপা বিমুখতা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি। তিনি [শরৎচন্দ্র]...প্রকাশ্য প্রতিবাদে বলতেন : 'মণ্টু, রবীন্দ্রনাথ তা নন নন নন—যা তুমি তাঁকে ভাবছ। তিনি একজন সত্যিই বিরাট মানুষ, বিশ্বাস করো।...চলো তুমি আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে।'...শরৎদার কথা ঠেলা সম্ভব হলোনা শেষটায়। গেলাম তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় কবির কাছে।"[১৭]

রবীন্দ্র-সমীপে শরৎচন্দ্রের ছবি কল্পনা করতে লোভ হয়। বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান স্তম্ভ কোন্ ভঙ্গিতে ভাব বিনিময় করেছেন, তা পেয়েছি রাধারানী দেবীর স্মৃতিতে।

তাঁর মনে হয়েছে "সেই গ্রাম্যভাবাপন্ন, চঞ্চল প্রকৃতি, লঘুভাষী, অসংযতবাক শরৎচন্দ্রকেই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের তেতালার বৈঠকখানায় দেখেছি—একেবার অন্য মানুষ।...এ শরৎচন্দ্রই নন। একটি গূঢ়বিষণ্ণতায় ম্লান, অকৃত্রিম বিনয়ে নম্র, একটি মুগ্ধ ভক্তের মৌন মূর্তি। তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] সামনে শরৎদা খুব সামান্যই কথা বলতেন, গুরুদেবের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত বিনীত উত্তর। গুরুদেবই কথা বলেছেন প্রায় সবটাই, এই সাক্ষাৎকারে।...রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁকে যে গভীরভাবে স্পর্শ করত, এ আমি ভাল করেই জানি। স্বচক্ষে দেখেছি।" [১৮]

একাধিক লেখায় শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-প্রণাম। তার মধ্যে সেরা ১৩৩৮-এ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর লিখিত ভাষণ। সেখানে কবিকে ছাপিয়ে ব্যক্তি যেন বড় হয়ে উঠেছেন। "কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে।" শরৎচন্দ্র মনে করেছেন বাঙালির জাতীয় সত্তা রবীন্দ্র-প্রতিভার নির্মাণ। জীবনের সর্বদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আমাদের সম্পন্ন করেছেন, গম্ভীর মন্ত্রপাঠের সুরে শরৎকণ্ঠে সেই উচ্চারণ :

"কবি, তুমি অনেক দিয়েচ, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল, সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েছ তুমি, তুমি দিয়েছ বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছ অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছ জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছ যা সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছ বড় ক'রে।"

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত মানপত্রটি শরৎচন্দ্রেরই রচনা। তা নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধার্পণ হলেও বিশেষে শরৎচন্দ্র নামক ভক্তের প্রণাম। বিখ্যাত সেই রচনার কিয়দংশ :

"কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।...হাত পাতিয়া আমরা জগতের কাছে নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে মনস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি।"

রবীন্দ্র-আবিষ্ট শরৎচন্দ্রকে পেয়েছি তাঁর চিঠিতেও। রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ অমল হোমকে লিখেছেন : "আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে—আমার চাইতে কেউ বেশি মক্সো করেনি তাঁর লেখা।...আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভালো বলে, সে তাঁরই জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।" [১৯] এই গুরুভক্ত মানুষটি গুরুর 'অপার্থিব' দৈহিক সৌন্দর্য দেখে রূপের বনে মন হারিয়েছেন। "অনেকদিন পরে সেদিন বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য সুন্দর—চোখ ফেরানো যায়না। বয়স যত বাড়ছে, রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য। জগতে এতবড় বিস্ময় জানিনা।" [২০] স্নিগ্ধ কৌতুকও তিনি করেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। অমল হোমকে লিখেছেন : "বাস্‌রে, বুড়োকে নিয়ে তোমরা কি টানাহ্যাঁচড়াটাই না করলে! পারেনও বটে উনি...।" [২১] আবার রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথের দাড়ি নিয়ে অনেক রকম হাসির গল্পও তিনি বানিয়েছেন। [২২]

॥ ৪ ॥

বিরোধিতার পর্ব থেকে পর্বান্তর

মুগ্ধতার কালেই শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-বিরোধিতার শুরু। এ এক বিচিত্র মনস্তত্ত্ব। সঠিকভাবে বলতে গেলে রেঙ্গুনে ঐ কাজ তিনি করেছেন রবীন্দ্রনাথকে খোঁচা দিয়ে 'গুরু-শিষ্য সংবাদ' ('যমুনা', ফাল্গুন ১৩২০) প্রবন্ধ লিখে। ওখানে গুরুর মুখে 'রসো বৈ সঃ', 'ভূমানন্দ', 'ত্যাগানন্দ', 'বিশ্বমানবতা' ইত্যাদি শব্দ বসানো হয়েছে যা রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুবার পাওয়া গেছে। গুরু শিষ্যকে ত্যাগানন্দের অর্থ বুঝিয়েছেন :

"শিষ্য। প্রভু, ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ত্যাগের দ্বারা কি করিয়া পাইব? ত্যাগ করিলেই তো হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

গুরু। বৎস, ভুল বুঝিতেছ। তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, ত্যাগের দ্বারা পাইতে বলিতেছি। অর্থাৎ পাঁচজনে ত্যাগ করিতে থাকিলে সম্ভবত তোমার যে প্রাপ্তি ঘটিবে, সেই ত্যাগের যে পাওয়া, সেই যে বড় দুঃখের পাওয়া, তাহাকে বিশ্বপতির দান বলিয়া হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবে বরণ করিয়া লইলেই তোমার ত্যাগানন্দ জন্মিবে। আহা, সে কি আনন্দ রে!"

সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথের বলা ঐসব কথা নিছক ভাবের কথা, সত্যবস্তু তাতে কিছুমাত্র নেই। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের আসনে বসে বস্তুজগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাবের ফানুস বাতাসে ওড়াচ্ছেন—শরৎচন্দ্র ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মতপার্থক্য রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক। রাজনৈতিক মতভেদ তৈরি হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে, এবং 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থের 'শরৎচন্দ্র 'রাজনীতি ও রাজনৈতিক সাহিত্যে' শীর্ষক একাদশ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। সেখানে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ শরৎচন্দ্রকে।

আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র ক'রেও রবীন্দ্র-শরৎ দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' ('বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রবন্ধ প্রকাশের পর তাঁকে দৃষ্টিকটুভাবে আক্রমণ ক'রে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' ('বঙ্গবাণী', আশ্বিন ১৩৩৪) লেখেন। এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধে দিয়েছেন—'সাহিত্যে নবত্ব' ('প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) এবং 'সাহিত্যবিচার' ('প্রবাসী', কার্তিক ১৩৩৬)।

সমকালীন 'আধুনিক সাহিত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নেতিবাচক। সেসব কথা বলার ইচ্ছা তাঁর অনেকদিনের। সেই ইচ্ছাকে প্রকাশের পথ খুলে দিল 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাসের সমালোচনার উদ্যম এবং অমল হোমের একটি প্রবন্ধ। অমল হোমের উক্ত 'অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' ('ভারতবর্ষ', মাঘ ১৩৩৩) প্রবন্ধের যুক্তি ছিল—নব্য বাংলা সাহিত্য 'সৃষ্টির আনন্দে' নির্মিত হচ্ছে না, হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়-লালসার...অস্পষ্ট ইঙ্গিত' দেবার জন্য। ফলে সেখানে 'কৃত্রিম ভাববিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য

অভিনয়, আন্তরিকতাহীন অনুভূতির মায়াকান্না' চোখে পড়ে। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি সাহিত্যগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি' কিছু আগে থেকেই দংশাত্মক সমালোচনা প্রকাশ ক'রে আসছিল। অমল হোমের প্রবন্ধ পড়ে আধুনিকদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে জোটবদ্ধ করতে উৎসাহী হলেন সজনীকান্ত দাস।

সজনীকান্ত তাঁর 'শ্রদ্ধাভাজন কবি' মোহিতলাল মজুমদাবের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের সাক্ষ্যগ্রহণ এবং প্রকাশ্য সংগ্রামে তাঁকে সামিল করার জন্য সামতাবেড় গিয়েছিলেন। সজনীকান্তের মতে, শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, শরীর সুস্থ থাকলে তিনি নিজেই ঐ বিষয়ে লিখতেন। কারণ "শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করলে [বরং] সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিত-পটুত্ব তাঁহাকে কোনো বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারেনা, কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মতো পণ্ডিতজন যখন [গল্প-উপন্যাস লিখে] এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন, তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে।" শরৎচন্দ্রের এই কথায় সজনীকান্ত এবং মোহিতলালের ধারণা হয়েছিল, "আগাছা-ক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যেব দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন।...তাঁহাব মতে কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।" [২৪]

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথকে খোলা চিঠি দিয়েছেন সজনীকান্ত : "সম্প্রতি...বাংলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য ক'বে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়।...কবিতা ও গদ্যেব যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম, লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ ক'রে চলেনা। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধন-হারা, ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature-এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি পড়ে বাহবা দেন তাঁরা সাধারণত প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদেব সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন।" [২৫] সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এইসব লেখকদের অন্যতম নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, 'যুবনাশ্ব' (মনীশ ঘটক), নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩-এ সজনীকান্তের চিঠির জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

"আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু খুলে গেছে। সেটাকে আমি সুশ্রী বলি এমন ভুল কোরো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব—তাই এখন বাগবাত্যার ধুলো দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই।" [২৬]

সজনীকান্তের আহ্বান রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। নিজের তাগিদও ছিল। 'সাহিত্যধর্ম' ('বিচিত্রা', শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রবন্ধে খোলা কলমে লিখলেন : "বিদেশ থেকে

আমদানি করা বে-আব্রুতা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞানের অপক্ষপাত কৌতূহল সাহিত্যিকদের শোভা পায়না, অলংকৃত বাক্য রসাত্মক বাক্য বা কাব্য।" রবীন্দ্রনাথের অপ্রসন্ন মনোভাব পরিষ্কার লিপিবদ্ধ এখানে। তা মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপের তুল্য। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' ('বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৩৪) নামক জোরালো প্রতিবাদী রচনায় বলা হলো—রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটি 'রসরচনা' মাত্র। বিতর্ক জমিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে 'শনিবারের চিঠি'তে (ভাদ্র ১৩৩৪) সজনীকান্ত আধুনিক সাহিত্যের বিপক্ষে যুদ্ধে নামার আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথেব প্রত্যুত্তর প্রকাশ করলেন, সেইসঙ্গে সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সজনীকান্তের সাহিত্যালাপ। এই আলাপ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সন্দেহ করায়, শরৎচন্দ্র তাঁকে চিঠিতে লেখেন :

"আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষত এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেছেন, আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেচি কিনা স্মরণ করতে পারিনে। কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এবং একটু বেশি রকমই আছে।...আমি নিজেব একটা অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। প্রকাশ করো।" [২৭]

'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে ঐ লেখাটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সরাসরি সমর্থন জানালেন আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের, ব্যঙ্গ করলেন অসম্পূর্ণ ধারণার ভিত্তিতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে : "কবি তো থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলেতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়গহস্তা শুচিধর্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশীধারী অশুচিধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল কল্লোল কালিকলমের দল?...এ সকল অধ্যয়ন করিবার মতো সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনোটাই কবির নাই। তাঁহার অনেক কাজ। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।" এই লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত কটাক্ষ বিলক্ষণ। 'অনেক কাজে' ব্যস্ত কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্য পড়ার জন্য মোটেও সময় দিতে পারেন না, অথচ তার সমালোচনা পুরোমাত্রায় করেন—শরৎচন্দ্রের এই অভিযোগের ঝাঁঝ যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরার কারণে আশঙ্কিত নরেশচন্দ্র এবার শরৎচন্দ্রকে স্বদলে পেলেন। আধুনিকদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী মারফত উমাপ্রসাদ নরেশচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলেন। নরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সাহিত্যিক 'আশ্রয়' প্রার্থনা করলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। আশ্রিতকে আশ্বস্ত ক'রে শরৎচন্দ্রের উত্তর : "ইচ্ছা করিয়া সাহিত্যের রুচিকে আপনি বিকৃত করিতেছেন, এ অভিযোগ যেমন অসঙ্গত তেমনি অন্যায়। মতবিভেদও থাকে, রুচিভেদও থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার শুভবুদ্ধি ও সাহিত্যিক সততার প্রতি এই ধরনের অপরাধ চাপানোর মতো অপরাধ অল্পই আছে।" [২৮]

প্রশ্ন উঠেছে এখানে, সজনীকান্তের কথা অনুযায়ী শরৎচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথের মতো

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন, তাহ্‌লে তিনি তা প্রত্যাহার ক'রে নিলেন কেন? সম্ভাব্য কারণ 'পথের দাবী'-কেন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তিক্ত সম্পর্ক। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শরৎচন্দ্র পূর্বের সিদ্ধান্ত বদলে আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষে যোগ দেবার নতুন সিদ্ধান্ত নেন, কেননা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এই কথার পক্ষে প্রমাণ হিসাবে হাজির করতে পারি অমল হোমকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি, যেখানে ছিল অমল হোমের 'অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতি শরৎচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন : "তোমার 'অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' আমি সেইদিন পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।" [২৯] ইতিমধ্যে জেনেছি ঐ প্রবন্ধটি আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রশংসা ক'রে লেখা হয়নি।

রাধারানী দেবী এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের দুটি চিঠিও প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করব। স্বল্প ব্যবধানে লেখা চিঠি দুটিতে (উমাপ্রসাদকে শরৎচন্দ্র লিখেছেন ১০ ভাদ্র ১৩৩৪, আর রাধারানীকে তাঁর লেখা চিঠির তারিখ ১০ অক্টোবর ১৯২৭) উমাপ্রসাদ এবং রাধারানীর কাছে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে জমে থাকা গরল উগরে দিয়েছেন। সে ভাষা যেমন তীব্র তেমনি তিক্ত। শরৎচন্দ্র গোপন করেন নি 'পথের দাবী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির প্রতিক্রিয়ায় তাঁর 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' রচিত। শরৎচন্দ্রেব চিঠি দুটি অংশত উদ্ধার কবা যাক।

"রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছা হয়না। এমন কি ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়।... রবিবাবুর ['পথের দাবী' প্রসঙ্গে লেখা] সে চিঠি আমি ভুলতে পারিনি, কোনোদিন পারব বলেও ভরসা হয়না।" (উমাপ্রসাদকে লেখা চিঠি)।

উমাপ্রসাদকে এই চিঠি লেখার পর 'বঙ্গবাণী'তে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' বেরোয়। এর সম্পর্কে পাঠকমহলের একটি অংশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেনেও রাধারানীকে চিঠি লেখার সময় শরৎচন্দ্র আপন মতে অবিচল।

"আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতিনীতি' পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছ লিখেছ। তোমার মনে হয়েছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে, লেখাটা আর একবার পড়েও তো আমি খুঁজে পেলাম না।...পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন তো একটা কাজ হয়...। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—'পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরেজ রাজশক্তির মতো সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই...।'...ঠিক বলতে পারিনে, হয়তো এই কথা মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন 'সাহিত্যের রীতিনীতি' লিখি। তাতেই বোধহয় কোথাও কোনো জায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে।" (রাধারানী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি)। [৩০]

সজনীকান্ত দাস অবশ্য শরৎচন্দ্রের শিবির বদলের ভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। "শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি ছিল নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ লক্ষ্য-অলক্ষ্য কাহারও নাম ছিলনা, ছিল নিত্যসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের কথা। তাহাতেই

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিচলিত হইয়া ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় গুরুতর প্রতিবাদ জানাইলেন ('সাহিত্যধর্মের সীমানা')। কিন্তু ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার প্রবন্ধে অনেকগুলি নাম একসঙ্গে কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভীরু শরৎচন্দ্র প্রমাদ গণিলেন, বিশেষ করিয়া নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত আমি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন। তাড়াতাড়ি সামলাইবার জন্য আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী'তে (১৩৩৪) 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া বসিলেন। ফাঁদাই বটে, কারণ প্রবন্ধটি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' প্রবাদের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।...সকল সাধুব্যক্তির ন্যায় তিনিও উকিলের জেরাকে অতিশয় ভয় করিলেন—মস্ত উকিলের তো কথাই নাই। ...তিনি নরেশচন্দ্রের রচনাকে কখনোই অনবদ্য জ্ঞান করিতেন না, তর্কের ঝোঁকে হঠাৎ বিড়ালকে বাঘ কল্পনা করিয়া বসিলেন।"[৩১]

এটুকু বলতে পারি, সজনীকান্তের অনুমান সজনীকান্তেরই।

রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যে নরেশচন্দ্রের উপর দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচির চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহদাকার মুষল এসে পড়েছিল ('সাহিত্যধর্মের সীমানা বিচার', 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৩৪)। সমালোচক হিসাবে নরেশচন্দ্রের যোগ্যতা সম্পর্কে সে লেখায় প্রশ্ন ছিল : "নরেশবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়েছেন স্কুল মাস্টার ও উকিলের চোখ দিয়ে, রসজ্ঞ তত্ত্ববিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে নয়।" শরৎচন্দ্রকে পক্ষে পেয়ে উৎসাহিত নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণকে আক্রমণ করলেন ('কৈফিয়ৎ', 'বিচিত্রা', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-সমর্থনে ব্রজদুর্লভ হাজরার প্রবন্ধও ('রস ও রুচি', 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৩৪) বেরিয়েছে।

নিজেকে আধুনিক সাহিত্যের কুলপতি ধরে নিয়ে শরৎচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ এবং ব্রজদুর্লভ হাজরার প্রবন্ধদুটিকে নিদারুণ ব্যঙ্গ ক'রে লিখলেন পত্রপ্রবন্ধ 'রসসেবায়েৎ' ('আত্মশক্তি', আশ্বিন ১৩৩৪)। তার একদিকে ছিল দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের 'ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী' রচনা সম্পর্কে বিদ্রূপ-বিশেষণের পরম্পরা : "['সাহিত্যধর্মের সীমানা বিচার' প্রবন্ধের] যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য! বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বলনীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত। বাপরে বাপ। মানুষে এত পড়েই বা কখন এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া! ইহার পার্শ্বে 'লাল শালু মণ্ডিত বংশদণ্ড-নির্মিত ক্রীড়া গাণ্ডীব-ধারী' নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপ্টাইয়া গিয়াছেন।...নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি যুক্ত হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভালো।"

অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যের বিপক্ষীয়, প্রাক্তন 'ডেপুটি' ব্রজদুর্লভ হাজরা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তীব্র বিতৃষ্ণায় 'রসসেবায়েৎ'-এ লিখেছেন : "এই ব্যক্তি ডেপুটি-গিরি করিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্ব দেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।...মানুষের দৈন্যকে খোঁচা

দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্রসমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জন করিলেই সাহিত্যের 'রসের' বিচারে অধিকার জন্মায় না।"

'ডেপুটি' ব্রজদুর্লভ হাজরাও কোমর কষে লিখলেন : "এই 'রসসেবায়েৎ' না 'সাহিত্য-সেবক' না 'সাহিত্য-সেবী' শরৎচন্দ্রের পরিচয় আমি বিশেষ জানিনা, তবে অনুমান হয়, তিনি তন্নামখ্যাত উপন্যাস প্রদেশের সম্রাট, আর তিনি 'ঠাকুরঘরের' ভিতরেই আছেন, সাড়া দিতেছেন।...'বাপরে বাপ!' আমি ঘটি চুরি মুড়ি চুরির বিচারই কাঁচাপাকা সকল অবস্থাতেই করিয়াছি। ডেপুটির অধিকার ঐ পর্যন্তই। গৃহদাহাদির বিষম ব্যাপারের বিচার দায়রার বড় বড় জজ বাহাদুরগণই করেন—তাও জুরির সহযোগে। তবে চরিত্রহীন সামান্য চোরের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া শুনিয়াও সাহিত্যের রত্নচোর চিনিবাব শক্তি হারাই নাই। সে শক্তি যে,...চট্টোপাধ্যায় মহাশয় না জানিতে পারেন—মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি-নিহিত ; ডেপুটির পক্কতা বা উপন্যাস-প্রণেতার প্রতিষ্ঠা-প্রসূত নয়।" ('আত্মশক্তি', কার্ত্তিক ১৩৩৪)।

শরৎচন্দ্রের ফেরত মার : "মানুষে অত্যন্ত রাগিলে যেমন মুখ দিয়া কতক কথা বাহির হয় এবং কতক বাহির হয়না, এ চিঠিখানির রচনাও সেইরূপ।...ব্রজদুর্লভবাবু রিটায়ার্ড ডেপুটি—ভাগ্যবান লোক। হয়তো উপহাস করাই তাঁহার [পক্ষে] সহজ। এবং একথা বুঝা তাঁহার পক্ষে কঠিন যে...বেকার রাজনীতি চর্চাকারীই হোক বা হাঁড়ি-না-চড়া সাহিত্যিকই হোক, কাহারও দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করা আমার কাছে সুরুচি সঙ্গত মনে হয় নাই, এবং বলিয়াছিলামও তাহাই। কেবল ভুলিয়াছিলাম যে লোকের রুচি এক নয়। ব্রজদুর্লভবাবুর মতে তিক্তরসে পিত্তনাশ হয়। বেশ, তিনি তাহাই করিতে থাকুন।...শুধু ভাবি এই ব্যক্তি পেন্সন না লইয়া চাকুরিতে নিযুক্ত থাকিলেই যে ছিল ভালো।" ('আত্মশক্তি', কার্ত্তিক ১৩৩৪)।

যবনিকা পড়েছিল 'আত্মশক্তি' সম্পাদকের শান্তি বচনে : "এ সম্বন্ধে আর কোনো বাদানুবাদ আত্মশক্তিতে প্রকাশিত হইবে না।" [৩২]

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ অথবা ব্রজদুর্লভ উপলক্ষ মাত্র, শরৎচন্দ্রের মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথই। তাই কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' ('পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৪০) পড়ে শরৎচন্দ্রের 'সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে' গেছে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেছেন ঐ একই নামে ('সাহিত্যের মাত্রা') লেখা রচনায়, যার মধ্যে আক্রমণের তীব্রতা কম নয় এবং যার ফলাফল সম্বন্ধে নিজেই লিখেছেন : "যা লিখে ফেলেছি সে তো আর ফেরাতে পারব না। এখন কবির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধকরি আমার পরিপূর্ণ হলো।" [৩৩]

নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি শরৎচন্দ্র খুঁজে বার করেছিলেন। কখনো উপন্যাসের উপমা প্রয়োগ, কখনো কবির অতিকথন সম্বন্ধে খোঁচা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। উপন্যাসের কৃৎকৌশল সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায়কে পরামর্শ দেবার সময় শরৎচন্দ্র : "উপমা উদাহরণ—কোনোটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও অসম্বন্ধ না হয়।" [৩৪] ঠাট্টার সুর ছিল রাধারানী দেবীকে লেখা চিঠিতে—বেশি বয়সের অতিকথন দোষে রবীন্দ্রনাথের লেখায় যুক্তিবোধের জলাঞ্জলি : "দেখচ না তোমার গুরুদেবের কাণ্ড! একটা পয়েন্টে কথা শুরু ক'রে কোথায় কোন্‌দিকে কোন্ পথে যে চলে যান তার আর হালহদিশ খুঁজে

মেলা দায় হয়। এইটাই হলো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ লক্ষণ। যদিও তোমরা (তার সঙ্গে উনিও) তা কিছুতেই মানতে চাও না।"[৩৫] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিতেও মুখ বাঁকানো অখুশির সুর। কবি তাঁকে 'কালের যাত্রা' উৎসর্গ করার পর শরৎচন্দ্র : "আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে-কোনো সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথও নিশ্চুপ ছিলেন না। স্বপক্ষ ও স্বদলের সমর্থনে কলম ধরে 'সাহিত্যধর্মে'র পরিপূরক প্রবন্ধ 'সাহিত্যে নবত্ব' ('প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) রচনায় আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে লিখলেন—"বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে—লংকার গুঁড়ো বেশি ক'রে থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে —অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারিপাউডার'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।" বছর দুয়েক পরে লেখা 'সাহিত্যবিচার'-এ ('প্রবাসী', কার্তিক ১৩৩৬) শরৎচন্দ্রের অস্ত্র শরৎচন্দ্রের উপরেই নিক্ষেপ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, শরৎচন্দ্রের রচনাও তো আন্তর্জাতিক চেহারা ধরেছে। তাহলে কেবল রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য ছায়াচ্ছন্ন বলা হচ্ছে কেন? সাহিত্যিকের 'বলার আদর্শ' সর্বকালীন ও সর্বজনীন। তাই "শরৎ চাটুজ্যের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়, সেইজন্যে তাঁর গল্পসাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না।" তাতেই প্রমাণিত 'প্রতিভার সারবত্তা'। এসব কথা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কবির মনে শরৎ-বাক্যের ছুরি বিঁধেছিল। তাই তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর—সাহিত্য বিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা 'বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা' দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

এটুকু পরিষ্কার যে, শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের আক্রমণে রবীন্দ্রনাথ বেশ বিচলিত। দিলীপকুমার রায়কে চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর 'সাহিত্যধর্ম', 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ বেশ 'আলোড়ন জাগিয়েছে।' এটাও ঠিক "সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনটাই খুব বেশি দরকারী নয়—দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিয়তচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে।"[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলই, শরৎচন্দ্র অকারণে তাঁকে বারম্বার আঘাত হেনেছেন। উভয়ের পার্থক্য কমিয়ে আনার ইচ্ছায় দিলীপকুমার রায় শরৎচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ১৩৩৩-এর ২৫ বৈশাখ তিনি ও শরৎচন্দ্র শান্তিনিকেতনে যাবেন রবীন্দ্র-জন্মদিনে প্রণাম নিবেদনে। কিন্তু তাঁরা কেউই যাননি। দারুণ অপমানিত রবীন্দ্রনাথ সেদিনই শরৎচন্দ্রের নামোল্লেখ ক'রে দিলীপকুমারকে চিঠি দিলেন : "আমি জানতুম শরৎ আসবেন না।...প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে

ভুল বুঝতেন, কেননা তাঁর মন বিমুখ হয়েছে।...খুব সম্ভব আমার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে না।" ৩৮ এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কি কয়েক মাস পরে শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে (২৭ মাঘ ১৩৩৩) বাজেয়াপ্ত 'পথের দাবী'ব সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ কোনো কথাই বলেন নি? বৎসরাধিক পরে শরৎচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধকে আক্রমণ করায় রবীন্দ্রনাথ জ্বলে উঠেছিলেন : "ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটাকে অপবাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি, সেটা বিশ্বাস করে নিয়ো।" পরের উক্তিতে যথেষ্ট কাঠিন্য : "তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ কবেছ—আমি কোনোদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনোই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমার নিন্দা ক'রে শোধ তুলিনি। এবারেও সেই ফর্দে আব একটি সংখ্যা বাড়ল।" ৩৯

ব্যাপারটা আরো দূর এগিয়েছিল। ১৩৩৫-এর ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের জন্মদিনের প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথেব কাছে গিয়েছিলেন অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। অবিনাশচন্দ্রের মুখের উপর, "তোমাব শবৎদার সভায় আমি যেতে পারব না" বলে, রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছিলেন : "[আমন্ত্রণপত্রে] আমার নাম তোমরা দাও—কিন্তু আমি যাব না—আমি বরঞ্চ একটা 'তার' পাঠিয়ে দেব যে আমি অসুস্থ। তাহলেই তো তুমি খুশি হবে।" অবিনাশচন্দ্রও ফিরে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "আপনার তো সত্যিই অসুখ করবে না, তাহলে এটা তো মিথ্যা কথা বলা হবে। এর জন্যে বিশ্বকবিকে আমি মিথ্যাবাদী করতে চাইনা।" ৪০ শেষ পর্যন্ত সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে বয়স, অসুস্থতার ইঙ্গিত ছিল : "আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, সেকথা স্মবণ করবার নানা উপলক্ষ সর্বদাই ঘটে।" একইসঙ্গে ছিল তাঁর আশীর্বাদ : "এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত ক'রে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয়শিখরে আপন প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করছেন।"

তবু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর অন্তর্গহনে যে ধারণাই থাক, বাইরে তার প্রকাশ কদাচিৎ। ১৩৩৫-এর ৩১ ভাদ্র শরৎ-জন্মদিনে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সভায় রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত থাকলেও, অবিনাশচন্দ্র বলেছেন, তার "কয়েকদিন পরেই বোধহয় হাওড়া টাউন হলে, হাওড়ার কোনো এক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে...[শরৎচন্দ্রের] সাহিত্য সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ।" ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ কোথাও মুদ্রিত হয়নি, অবিনাশচন্দ্রের মতে। সভাশেষের পর তাঁকে কাছে ডেকে কবি বলেছেন : "তোমার শরৎদা সম্পর্কে যা বললাম, তা তোমার কেমন লাগল?...[অবিনাশচন্দ্র বললেন] চমৎকার, আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনি এভাবে বলবেন।" ঐদিন কবি তাঁকে আরো বলেছিলেন, "তুমি দু' একদিনের মধ্যে বোলপুর দেখা কোরো।" অবিনাশচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেতে পারেন নি। পরে তাঁর মুখে ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ শুনে ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া : "কি জিনিস যে তুমি হারিয়েছ! আমি বেশ

বলতে পারি আমার সম্পর্কে উনি প্রাণ খুলে সেখানে কথা কইতেন।"[৪১]

কবির এই 'প্রাণ খুলে কথা কওয়া' কি শরৎচন্দ্রের পক্ষে যেত? বলা মুশকিল। কবি যদি অবিনাশচন্দ্রের সামনে প্রাণ খুলে কথা বলতেন, তাহলেও তাঁর আশা থাকতই অবিনাশচন্দ্রও তাঁর সামনে শরৎ-বিষয়ে সত্যবাক্য বলবেন (যেভাবে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখের উপর 'বিশ্বকবিকে আমি মিথ্যাবাদী করতে চাইনা' উচ্চারণ করার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন)। শরৎ-ঘনিষ্ঠ অবিনাশচন্দ্র কি তা বলতে পারতেন? অবশ্যই এসব অনুমান। তবে অবিনাশচন্দ্র সে যাত্রায় শান্তিনিকেতনে হাজির হলে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোজনার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই উচ্চমূল্য দিয়েছেন। রাধারানী দেবীর কাছে শরৎসাহিত্য সম্পর্কে তিনি 'উজ্জ্বল আশা আর আনন্দই' প্রকাশ করেছেন। কখনো কখনো প্রশ্ন করেছেন, "কি গো আধুনিকা, তোমাদের শরৎদাদার খবর কি বলো, শুনি। কী লিখছেন তিনি আজকাল?" এমন কি "ব্যক্তি মানুষটি সম্পর্কে জানবার উৎসুক আগ্রহ তাঁর ছিল।"[৪২]

'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের ইংরেজি ভাষান্তর *Delivcrence* এর ভূমিকা-লেখক রবীন্দ্রনাথ। সেখানে অপর্যাপ্ত প্রশংসা : "He [Sarat Chandra] has imported a new power to our language and in his stories he has shed the light of Bengal's heart revealing the significance of the obscure trilles in people's personality. He has achieved the best reward of a novelist : he has completely won the hearts of Bengali Readers." কবির সর্বোচ্চ প্রশংসা তাঁর 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় মেলে। সেখানে শরৎচন্দ্রের নাযিকা এলোকেশীর ভাগ্যোন্নতি দেখে ঐ কবিতার নায়িকা শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল তাকে নিয়েও গল্প লিখতে। বঞ্চিতা নারীর দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ এই কবিতাটিতে শরৎচন্দ্রের মানবপ্রেমিক লেখকসত্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

শরৎ-প্রশংসার আরো উদাহরণ আছে। ১৩৩৮-এ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত শরৎ-সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় 'শরৎচন্দ্র' নামে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটি পরে 'প্রবাসী'র আশ্বিন ১৩৩৮-এ মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "তাঁর [গল্পে] যে রসকে তিনি নিবিড় ক'রে জুগিয়েছেন, সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্বের চেয়ে পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর ক'রে।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন, আধুনিক লেখকেরা শরৎচন্দ্রের পথেরই অনুসারী। "একদিন তারা হয়তো সেকথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না।"

১৩৩৯-এর ৩১ ভাদ্র কলকাতার টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শরৎ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক কারণে উপস্থিত হতে না পারলেও লেখা পাঠিয়েছিলেন : "ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করছে। ...দাঁড়িটানা সময় তোমার নয়, এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনাবিস্ময়ে নব

নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যেসব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে—তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য।" একইসঙ্গে 'কালের যাত্রা' নাটিকা শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ ক'রে তিনি জানিয়েছেন, "মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত,...সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ।...কালের রথযাত্রার [এই] বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক।" একই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিতে দেশের 'গভীর অন্তরে' শরৎচন্দ্রের অনায়াস প্রবেশের স্বীকৃতি ছিল। সেইসঙ্গে ছিল বাংলা সাহিত্যের 'জ্যোতিঃশিখায়' শরৎচন্দ্রের রচনা 'দীর্ঘ আয়ু সঞ্চার' করবে, এই বিশ্বাসের ঘোষণা।

১৩৪৩-এ শরৎচন্দ্রের একষট্টি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সাহিত্যিক সংস্থা 'রবিবাসর' উদযাপিত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অকৃপণ আশীর্বাদ করেছিলেন: "আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে।...শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংগঠিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে।" এরপর কবির আসন থেকে রবীন্দ্রনাথ "বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান" করেছিলেন। এই রচনাটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' শিরোনামে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চার ছত্রের শোকজ্ঞাপক কবিতা ('যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে...দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'।) লিখেছেন। এত অল্পে এত গভীর কথা প্রকাশ তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এও যথেষ্ট বলে তাঁর মনে হয়নি। তাই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার শরৎস্মৃতি সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৪৪) লেখা দেবার জন্য প্রবোধচন্দ্র সান্যালের অনুরোধ 'সহজে স্বীকার্য' নয় বলেও, চিঠির আকারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করেছেন:

"[আধুনিক বাংলা সাহিত্যের] তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়।...বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য-মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হতে দেরি হলোনা। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়েছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে একসঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয়না।"

সেইসঙ্গে এই দুঃখ ছিলই, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দেখাশোনা কথাবার্তা' হলেও উভয়ের 'পরিচয়' ঘটেনি। 'সমসাময়িকতার [সেই] সুযোগ' না ঘটলেও

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মাধ্যমে 'কাছের মানুষকে পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।'

মৃত্যুতে সমস্ত তিক্ততার অবসান, ব্যক্তি-সম্পর্কের ওঠাপড়া তখন আর নেই। রয়েছে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি বিষয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের মহাকবির অলংকারহীন উচ্চারণ—'ভালবাসা'।

॥ ৫ ॥

আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে বলে নিয়েছি আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে শরৎ-মনোভাবে পালাবদল ঘটেছে। প্রথমে এঁদের পক্ষে প্রবল প্রচারক হিসাবে আবির্ভূত হয়েও পরে সেই স্বেচ্ছাগৃহীত দায়ভার ত্যাগ ক'রে, তিনি এঁদেরই কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত। চিঠিপত্রে, মৌখিক আলাপে এবং লিখিত প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের ইত্যাকার পরিচয় চোখে পড়ে। তার মূল কারণ মনস্তাত্ত্বিক। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নেতিবাচক বক্তব্যে প্ররোচিত হয়ে তিনি আধুনিকদের দলভুক্ত হয়েছেন। সেই ঝড়ো হাওয়া প্রশমনের পর এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রের স্থির সিদ্ধান্ত জেনেছি।

একাধিক প্রবন্ধে ('আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত', আষাঢ় ১৩৩০ ; 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', চৈত্র ১৩৩১) রবীন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্ত দাস-সহ 'শনিবারের চিঠি'-গোষ্ঠীর মতকে সবলে আঘাত করেছেন শরৎচন্দ্র। ঐ রচনাদুটিতে তিনি বলতে চেয়েছেন—আধুনিক সাহিত্যিকরা দুর্নীতিপূর্ণ নাটক নভেল লেখেন না। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল নিজে মৌলিক সাহিত্যের রচয়িতা না হলে অন্যের মৌলিক রচনা সমালোচনার অধিকার জন্মায় না। আধুনিক সাহিত্যবিরোধী লেখকদের তিনি মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টা বিবেচনা করেন নি। "সাহিত্য রচনার কাজটাকে বাহুল্য মনে করিয়া [এঁরা] ...ইহার সমালোচনার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন।" আধুনিক সাহিত্যিকদের বিবেচনায় বঙ্কিম-সাহিত্যে মানুষের স্বাভাবিক কামনাবাসনার স্বীকৃতি নেই। সেজন্য তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে নতুন পথ চলা শুরু করেছেন। ফলে তাঁদের সাহিত্যে মানুষের স্বাভাবিক কামনাবাসনা অনেক বেশি মর্যাদা প্রাপ্ত। তাই বলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিছক রিয়ালিস্টিকও নয়। খাঁটি রিয়ালিস্টিক সাহিত্য শরৎচন্দ্র রাশিয়ান সাহিত্যে কেবল দেখেছেন। তবে এ আশাও তাঁর ছিল : "এই অভিশপ্ত দেশে, এই অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশসাহিত্যের মতো যেদিন সে [আধুনিক সাহিত্য] আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।"

'নবীন লেখকদের' প্রতি তিনি যে 'আন্তরিক স্নেহে' আপ্লুত ছিলেন, তা রাধারানী দেবীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন : "তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের

লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে।"[৪৩]

এই পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের আধুনিক সাহিত্য প্রশংসা। উল্টো স্রোত কিছুদিনের মধ্যে বইতে শুরু করেছিল। যে উচ্চ লক্ষণ ঐ সাহিত্যের মধ্যে আছে মনে করেছিলেন, অনতিবিলম্বে দেখলেন তার শোচনীয় বিচ্যুতি। তাঁর ৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র নতভাবে স্বীকার করলেন, আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বলা 'কঠোর কথাটাই' সত্য। সেদিন তাকে অসত্য মনে হলেও 'এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে।' ('মাসিক বসুমতী', ফাল্গুন ১৩৩৬)।[৪৪] ঐ বছরই 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে তিনি যেকথা বলেছেন, তাতে তাঁকে আধুনিক সাহিত্যিকদের অবলম্বিত পন্থার বিরোধী রূপেই দেখা যাচ্ছে : "তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন করোনি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু।"[৪৫] অন্যদিকে কবি কালিদাস রায়কে লেখা চিঠি থেকে দেখা যায় তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্যরচনার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি কর্দম নিক্ষেপের প্রবৃত্তি শরৎচন্দ্রের হতাশ্বাসের কারণ : "তরুণ দলের মধ্যে আজকাল একি হতে চলল? নিন্দে করার একি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের একি নির্দয় অধ্যবসায়! কেবলি একজন·আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়।...ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায়না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা ক'রে এরা যে কি সান্ত্বনা অনুভব ক'রে, আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলাদেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোনো সম্বলই নেই।"[৪৬]

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে ভগ্নমোহ শরৎচন্দ্র মৌখিক আলাপেও সেই দুঃখ গোপন করেন নি। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছিলেন : "আজকালকার এই যে ঢং উঠেছে sex না হলে লেখা চলেনা, এর কোনো মানে আমি বুঝতে পারিনে। চরিত্র নেই, ঘটনা নেই, রস নেই—খালি Vulgarity দিয়ে কখনো সাহিত্যসৃষ্টি করা যায়না।" ('শরৎপ্রসঙ্গ', অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।[৪৭] সাহিত্যিক নামধারী এইসব অসাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দিয়ে অন্য বিষয়কে 'উপজীবিকা' করতেও শরৎচন্দ্র পরামর্শ দিয়েছেন। "এরা সকলেই শিক্ষিত—কেউ বি.এ. পাশ করেছে, কেউ এম.এ. পাশ করেছে—উপার্জনের এদের অন্য পথও খোলা আছে। কিন্তু কে যে এদের সাহিত্যকে উপজীবিকা করবার পরামর্শ দিয়েছিল, তাই আমি ভাবি।" (ঐ)

শরৎচন্দ্র এখানে স্পষ্টই আত্মখণ্ডন করেছেন। ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র আশ্বিন সংখ্যায় আধুনিক সাহিত্যিকদের বিদ্রূপ ক'রে ব্রজদুর্লভ হাজরা যখন লিখেছেন, রুটি রোজগারের জন্য এঁরা কামনাপঙ্কিল সাহিত্যের আমদানি করেন ("হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে"), তখন শরৎচন্দ্র 'রিটায়ার্ড ডেপুটি' ব্রজদুর্লভের কঠোর সমালোচনা করতে কসুর করেন নি। সেই তিনিই বছর চারেক পরে ১৩৩৮-এ রায়

দিলেন—আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষে সাহিত্য নামক 'উপজীবিকা' পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। শরৎচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে রাধারানী দেবীকে লেখা তাঁরই চিঠির কথা : "কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের [আধুনিক সাহিত্যিকদের] দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এইসব নোংরা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল ক'রেই জানি বিরুদ্ধদলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।" [৪৮]

শরৎচন্দ্র সত্যই গতিশীল চরিত্রের মানুষ।

আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার বিশেষ রীতিও শরৎচন্দ্রের অপছন্দ ছিল। ওখানে "দলে দলে লোক আসে, সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোনো বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয়, এতে লাভ কি?" জীবনে এবং সাহিত্যে নির্বিশেষের মধ্যে বিশেষের সন্ধানী শরৎচন্দ্রের ক্লান্ত কণ্ঠ : "মন খুশি হয়না।" [৪৯]

সমকালীন সাহিত্যিকদের নিয়ে পৃথক প্রবন্ধ লেখার সুযোগ শরৎচন্দ্রের ছিলনা। চিঠিতে ছোট ছোট স্কেচ করেছেন। পেন্সিলের গভীব টানে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে পাওয়া গেছে।

প্রথমে **প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গ**। চৌধুরী মহাশয়ের তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত—এই আত্ম-পরিচয় যেন শরৎচন্দ্রের কাছে শ্লাঘনীয়। প্রমথ চৌধুরীর দুটি গ্রন্থ 'চারইয়ারী কথা' এবং 'বড়বাবুর বড়দিন' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার উল্লেখ পেয়েছি। 'চার-ইয়ারী কথা' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বিশেষ মুগ্ধতা। কোনো পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা লিখতে যেমন তাঁর আগ্রহ, বিনয়ও কম নয় : "আমার সমালোচনা নিশ্চয়ই ভালো হবেনা, কারণ এ বিষয়ে শক্তি আমার বড় কম।...অক্ষমের তুলির আঁচড়ে জিনিসটা পাছে আজকালকার ইণ্ডিয়ান আর্টের উৎকৃষ্ট নমুনার মতো দেখায়, সেই আমার ভয়।" এরপর ঐ গ্রন্থের যে-আলোচনা তিনি করেছেন, তাতে ফুটেছে তাঁর উচ্চাঙ্গের রসবোধ। তার কিয়দংশ এই রকম : "গল্প পড়ে এত আনন্দ বহুকাল পাইনি। এর বিশেষ সুখ্যাতি করতে যাওয়ার নাম এর সমালোচনা করা।...এ লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, এর নিজস্ব সৌন্দর্য কোনখানে, কোথায় এর মধুর কাব্যরস,...একথা লিখতে পারা যে কত শক্ত, একথা বুঝবে বোধকরি তারাই যাদের নিজেদের হাতেকলমে লেখার বাতিক আছে।...আমার আসল কথাটা এই যে, এক রবিবাবুর লেখা পড়ে মনে হয়েচে চেষ্টা করলেও আমি এমন পারিনে, আর কাল আপনার এই গল্পের বইটা পড়ে মনে হলো, চেষ্টা করলে আমি এমন ক'রে কিছুতেই লিখতে পারিনে।...পাঠকের ইনটেলিজেন্স এবং কালচার একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছন পর্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হতেই পারে না।" [৫০] প্রমথ চৌধুরীর গল্প বলার 'সহজ শান্ত রিফাইণ্ড ভঙ্গি', 'মানুষকে মানুষ ক'রে দেখবার ক্ষমতা'য় শরৎচন্দ্র আবিষ্ট।

ঐ মুগ্ধতা ছিলনা চৌধুরী মহাশয়ের 'বড়বাবুর বড়দিন' সম্বন্ধে। 'মুন্সিয়ানা' লেখাটিতে থাকলেও 'আমার কিন্তু ভাল লাগল না।' ওখানে 'বিদ্রূপ ব্যঙ্গের খোঁচায়

মানুষের বিশেষ কোনো একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস' ক'রে তুলেছেন প্রমথ চৌধুরী, যদিচ শরৎচন্দ্রের ধারণা, প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে জানালেন, "মানুষকে মানুষ ক'রে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি।"[৫১]

দিলীপকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, আশালতা সিংহ প্রমুখ মানুষদের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কলমে স্নেহশীল অগ্রজ সাহিত্যিকের প্রশ্রয় ও প্রীতি।

তিনটি মাত্রায় দিলীপকুমার রায় তাঁর কাছে উপস্থিত—মৌলিক সাহিত্যিক, সমালোচক এবং অনুবাদক। চিঠির পর চিঠিতে শরৎচন্দ্র তাঁকে উপন্যাসের আঙ্গিক বিষয়ে সতর্ক করেছেন—সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকা ঔপন্যাসিকের প্রধান গুণ। তথাপি প্রশংসার তার ক্রমাগত চড়িয়ে গেছেন দিলীপকুমারের উজ্জ্বল ঔপন্যাসিক-ভবিষ্যতের কথা বলে : "আমি মনে মনে জানি মণ্টুর উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরো চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায়? তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রয়েছে আর্টিস্ট হৃদয়। যেমন বৃহৎ তেমনি ভদ্র তেমনি পরদুঃখকাতর।"[৫২] ক্ষেত্রবিশেষে দিলীপকুমারের রচনার ঘটনাংশ তেমন উচ্চমানের না হলেও (যেমন 'চাকর' গল্পটি) 'ডায়লগ' লেখা হয়েছে চমৎকার। শরৎচন্দ্রের আশা, গল্প লেখার কৌশলের সঙ্গে ডায়ালগের সঠিক মিলন যেদিন দিলীপকুমারের রচনায় হবে, সেদিনই তাঁর প্রকাশ ঘটবে শক্তিমান সাহিত্যিকরূপে।[৫৩] 'অনামী' গ্রন্থের প্রসঙ্গেও শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বাস যথেষ্ট। উক্ত কাব্যের উপর আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার আহ্বানে মনস্থির কবতে এবং চিঠি লিখে জানাতে তিনি যে মাত্র 'দেড় মিনিট' সময় নিয়েছেন, তা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে লিখেছেন।[৫৪ক] দিলীপকুমারের 'সাহিত্যসাধনা'র একনিষ্ঠা দেখে তাঁকে মন খুলে শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদ, "কিছুদিন থেকে তুমি দেখচি তুমি বেশ মন দিয়েই সাহিত্যসাধনা শুরু করেছ, ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই, যা-তা যেমন-তেমন ক'রে যশের কাঙালপনা নেই, এইবার তোমার সফলতা সুনিশ্চিত।"[৫৪খ]

শরৎচন্দ্রের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা ছিল দিলীপকুমারের 'দুধারা' সম্বন্ধে। 'বাস্তবিকই বইখানি ভালো' বলাই যথেষ্ট তিনি মনে করেন নি, বিশেষ চিন্তিত ছিলেন ইদানীং সমালোচকদের উত্তম বস্তুর প্রতি 'অবহেলা' দেখে। "এখানে এমন ঢের কথা আছে যা আমিও ইতিপূর্বে চিন্তা ক'রে দেখিনি।"[৫৫] এতখানি প্রশংসা দিলীপকুমারের প্রহসন 'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ' সম্বন্ধে ছিলনা। 'বেশ হয়েছে' বলেও শরৎচন্দ্র রচনাটির অসংযমের উল্লেখ করেছেন।[৫৬] 'দোলা' উপন্যাসটি বড় বেশি ছড়িয়ে গিয়েছিল। সেটির সংশোধনের পর, লেখকের আত্মমর্যাদা রক্ষা ক'রে নরম সুরে বলেছেন : "তুমি নিজে যদি এত বাদ দেওয়া পছন্দ না করতে পারো, তোমার ওখানেই কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখিয়ে মত নিয়ো। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, যেসব লেখা এখন কেটে দিয়েছি, তার কিছু কিছু হয়তো আমিই আবার জুড়ে দেব যখন বইয়ের শেষে পৌঁছব।"[৫৭]

সমালোচক দিলীপকুমারের পড়াশোনার ভিত্তি অনেকাংশে গড়ে উঠেছে পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আবহাওয়ায় : "ওখানে থেকে তোমার পড়াশোনা হয়েছে যেমন ব্যাপক সুদূরপ্রসারী, তেমনি হয়েছে গভীর এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য, কেননা

তোমার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যেমন বিনয়ী তেমনি শান্ত।" [৫৮] দিলীপকুমারের এই পরিচয় শরৎচন্দ্রের কাছে স্পষ্টতর তাঁরই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের দিলীপকুমার-কৃত সমালোচনা পড়ে। 'বিচিত্রা' পত্রে প্রকাশিত ঐ আলোচনাটি তিনি একাধিকবার পড়েছেন : "লেখাটি সত্যই চমৎকার।" [৫৯] অবশ্য গ্রন্থটির রচয়িতা হওয়ার দরুন তাঁর স্বাভাবিক সঙ্কোচও ছিল খোলাখুলি দিলীপকুমারের সমালোচনা প্রবন্ধের প্রশংসা করতে। সবিস্ময়ে দেখেছিলেন, 'কথোপকথনের ছলে' সাহিত্য-সমালোচনা দিলীপকুমারের নতুন আবিষ্কার, "এ রকম ধরনে না লিখলে এত বড় প্রবন্ধ যত ভালোই হোক, লোকের পড়বার হয়তো ধৈর্য থাকত না। [এখন] যেন একটি সুন্দর গল্পের মতো পড়তে লাগে।" [৬০]

অনুবাদক দিলীপকুমাবেব যোগ্যতায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ আস্থা। 'নিষ্কৃতি' ও 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজি ভাষান্তরে তাঁর আগ্রহ ছিল। দিলীপকুমার 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ পড়ে খুশি শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া : ""নিষ্কৃতি'র যে তর্জমা তুমি করেছ, তার চেয়ে ভালোই বা কে করত?" [৬১] বইটির ফরাসী অনুবাদের সম্ভাবনার কথা জেনে ভাগ্যচক্রে তিনি আস্থাবান হয়ে উঠেছেন, শ্রীঅরবিন্দেব 'আশীর্বাদে অঘটন' ঘটার কথাও বলেছেন। [৬২]

ইংরেজিতে 'শ্রীকান্ত' অনুবাদ কবার জন্য শরৎচন্দ্র বারংবার দিলীপকুমারকে অনুবোধ করেছেন। [৬৩] সে অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দ দেখে দেবেন শুনে তাঁর উৎফুল্ল উচ্ছ্বাস : "তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করব হয়তো বাঙালি একজন গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ অসম্ভবও হয়তো একদিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।" [৬৪] সকরুণ মিনতিও ছিল : "মণ্টু, এবার শ্রীকান্ত ধরো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই।" [৬৫] কিন্তু দিলীপকুমার ছাড়া অন্যের অনুবাদকে ঢালাও ছাড়পত্র দিতে শরৎচন্দ্র নারাজ ছিলেন। [৬৬]

নরেন্দ্র দেবের 'খেলার পুতুল' পাবার পর শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া, সাগ্রহে সেই 'রাত্রেই ৭০/৮০ পাতা পড়েচি, আজ রাত্রেও পড়ব।' যেটুকু পড়েছেন তাতে তার মনে হয়েছে 'বেশ লেখে।' এইসঙ্গে সামান্য সমালোচনাও তাঁর ছিল, "যদি কোথায় থামতে হয়, এ কৌশলটাও জানত।" [৬৭]

স্নেহধন্যা রাধারানী দেবীর কোনো রচনাই শরৎচন্দ্রের 'নজর' এড়িয়ে যেত না। সেসব পড়ে লেখিকার প্রশংসা যেমন করেছেন, তেমনি সতর্কও। [৬৮] 'লীলাকমল' কাব্য প্রসঙ্গে সমালোচক মহলের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে তাঁকে দেখা গেছে। রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্যপ্রসঙ্গে অন্য দুই সমালোচকের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তীয় মন্তব্য নিয়েও তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। [৬৯] তাঁর নিজের বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্য আতিশয্য ছিল। রসনারোচন ভোজকে কাব্যরস বিচারের উপযুক্ত উপমা মনে করেছেন। এই কাব্যের ভাষার বাঁধুনি এবং প্রকাশভঙ্গি 'নিখুঁত' বললেও অত্যুক্তি হয়না। এই মত সামান্য পরেই তিনি বদলে ফেলেছেন। ২০ বৈশাখ ১৩৩৭-এ প্রথম চিঠি লেখার দিন তিনেক পরে ২৩ বৈশাখ ১৩৩৭-এ লেখা চিঠিতে তাঁর অন্য কথা। ঐ 'অন্তস্পর্শী' কবিতাগুলি লেখিকার 'বাস্তব অনুভূতি'র ভিত্তিতে রচিত নয়। সেখানেই শরৎচন্দ্রের আপত্তি— "কল্পনার সাহায্যে যাকে তুমি [রাধারানী] আয়ত্ত করেছ, তাকে এমন ক'রে প্রকাশ

করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক, আমি বলব তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই।" পরে অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছেন, "বইখানির ছাপা বাঁধাই সাজসজ্জা অতি পরিপাটি চমৎকার হয়েছে।" [৭০] এই সান্ত্বনাবাক্য রাধারানী দেবীর কাছে কতখানি মিষ্ট লেগেছিল তা বলা মুশকিল।

দিলীপকুমার রায়ের মাধ্যমে আশালতা সিংহের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়। আশালতার অল্প বয়সের লেখায় শক্তি আভাস পেয়ে তাঁর ত্রুটি শুধরে দিতে শরৎচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ত্রুটির পরিচয় দুই দিকে—অনর্থক বিদ্যা জাহিরের প্রবণতায় এবং অনাবশ্যক দ্রুত লেখায়। "ছেলেবয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে অনেক বই পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে কিছুই থাকেনা ; থাকে শুধু মুখস্ত-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা।" শরৎচন্দ্রের পরামর্শ—'সংযত' হও। তাঁর আশঙ্কাও ছিল, আশালতার "সাহিত্যিক হিরো যদি হয়ে থাকে বুদ্ধদেব বসু, তাহলে ওকে সামলানো যাবে না।" আশালতার প্রবন্ধকেও শরৎচন্দ্র নির্দোষ মনে কবেন নি। কেননা ওখানে দ্রুতবেগ যতখানি, চিন্তাবেগ ততটাই কম। "অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের উপরেই হোক বা নারীর উপরেই হোক।" [৭১] নারী-জীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সুবিপুল অভিজ্ঞতার পাশে আশালতার লেখা 'নারী' প্রবন্ধটি নিতান্তই অভিজ্ঞতাহীন জলো বলে তাঁর মনে হয়েছে। [৭২] আশালতার লেখা 'শরৎচন্দ্র ও গলসওয়ার্দি' প্রবন্ধ পড়ে শরৎচন্দ্র চমকে গেছেন। তাঁর লেখার 'সুখ্যাতি' এবং গলসওয়ার্দির 'রাশি রাশি কোটেশন' প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য। তা থেকে শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেন নি গলসওয়ার্দির সঙ্গে তাঁর লেখার মিল-অমিল কোথায়। এটুকু বুঝেছেন যে, "গলসওয়ার্দি ভদ্রলোক যেই হোন, অনেক ভালো ভালো বচন দিয়ে গেছেন। এবং সেসব পড়লে জ্ঞান জন্মায়।" [৭৩] মৌখিক আলাপেও অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন, কিছু ইংরেজি পড়ার বদহজম আশালতার লেখায় দেখা যায় : "[আশালতা] বাড়িতে কিছু ইংরেজি বইও পড়েছে। তা পড়ুক, কিন্তু পড়েছে বলেই যে লিখতে হবে 'আমি Kant-এর ও যুক্তিটা মানিনা' বা 'Russel ও দু' লাইন না লিখলেই পারতেন', 'Bernard Shaw হলে একথা বলতেন না'—এ কেমন কথা!...লোকে হাসে।" ('শরৎপ্রসঙ্গ', অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের সামনেই তাঁর লেখার প্রশংসা করেছেন শরৎচন্দ্র। অবিনাশচন্দ্রের 'তচনচ' বইয়ের প্লট তাঁর 'চমৎকার' লেগেছে। এও বলেছেন লেখকের সংযমের অভাব তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক। (ঐ)।

অন্নদাশংকর রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী—এই তিনজনের রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অসংযম—শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন। 'শেষ প্রশ্নে'র বিরোধিতার জন্য অন্নদাশংকরের প্রতি শরৎচন্দ্রের অপ্রসন্ন মনোভাব। তারই ছায়াপাত অন্নদাশংকরের লেখার আলোচনায়—"আর এক ধরনের অসংযম দেখতে পাই অন্নদাশংকর রায়ের লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো ; বিলেতেও গেছে—এই যাওয়াটা ও এক মুহূর্তের জন্যও

ভুলতে পারেনা। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্গদ 'আদেকলেপনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ ক'রে।"[৭৪]

হাস্যরসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও মাত্রাজ্ঞানের অভাব আছে বলে শরৎচন্দ্রের ধারণা। স্বয়ং লেখককে তিনি তা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রশংসাও ছিল। 'কোষ্ঠীর ফলাফল' পড়ে মুগ্ধতা গোপন করতে পারেন নি শরৎচন্দ্র : "চমৎকার লাগল। দীন দুঃখী কেরানীকে কেউ আজও এমন অন্তর দিয়ে ভিতরে পেয়ে এত মধুর কলম দিয়ে সংসারে প্রকাশ করেনি। ব্যথায় বুকের মধ্যে যেন টনটন করতে থাকে।" বইটির মধ্যে 'পরিহাসের ছলে' বলা 'গভীর' এবং 'মধুর' কথা শরৎচন্দ্রকে এমনই আবিষ্ট করেছে যে, বইখানির পাতা মাঝে মাঝে উল্টে তিনি 'দশ পনের মিনিট' পড়েন।[৭৫]

অনুরূপা দেবীর রচনাতে যথেষ্ট 'আতিশয্য' লক্ষ্য ক'রে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, কালিদাস, ভবভূতি "সবাই ঢোকবার জন্য যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকর্ত্রীর এই মনোভাবটি ধরা পড়ে—দ্যাখো তোমরা, আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি।"[৭৬ক] অনুরূপা দেবীর লেখা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণা কোনোদিনই ভালো ছিলনা। অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'যমুনা' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩১৯ সংখ্যায় 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের বহু ছিদ্র শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন। বিষয়টি বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ('নিঃশব্দ প্রেম : দারুণ দহন') গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার 'স্টাইল' শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। ভাদ্র ১৩২০-এর 'যমুনা' পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীলাভ' গল্প পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। "আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেকদিন পড়ি নাই। হয়তো তোমার 'বেস্ট' এটি।" সার্থক গল্পের নানা গুণ (যথা আড়ম্বরহীনতা, অকারণে মানুষের দোষ না দেখানো, জীবনের দুঃখ এবং আনন্দের দিক উভয়ই প্রকাশ করা ইত্যাদি) 'লক্ষ্মীলাভে'র মধ্যে লক্ষ্য ক'রে আবেগঘন ভাষায় শরৎচন্দ্র বলেছেন, এ গল্প 'শুধু একটি সুন্দর ফুলের মতো নির্মল এবং পবিত্র। মধুর, অতি মধুর!' উপেন্দ্রনাথের কলমে এমন ভালো গল্প আরো পাবার দাবিও এসেছিল শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে।[৭৬খ]

লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায় যাতে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসাবে জনসমক্ষে উপস্থিত হতে পারেন, সেজন্য উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁকে একাধিক পত্র লিখেছেন। কখনো লীলারানীর রচনার ত্রুটি নির্দেশ, কখনো আরো ভালোভাবে লেখার পথ দেখিয়ে দেওয়া —এসবই শরৎচন্দ্রের চিঠিতে চোখে পড়ে।

শরৎচন্দ্রের পত্রানুযায়ী লীলারানীকে পাওয়া গেছে শরৎ-উপন্যাসের পরিশিষ্ট রচয়িতারূপে। বঙ্কিমচন্দ্র-বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায় যেমন 'কপালকুণ্ডলা'র পরিশিষ্ট লিখেছিলেন, তেমনি লীলারানীও শরৎচন্দ্রের 'পথনির্দেশে'র পরিশিষ্টরূপে লিখেছেন 'মিলন'—যেখানে হেম-গুণীন্দ্র বিবাহে মিলিত। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল সামাজিক সংস্কার যেখানে বিধবা-বিবাহকে স্বীকার করেনা, সেখানে জোর ক'রে বিধবা-বিবাহ দেওয়া অর্থহীন। "এ 'মিলনে'র বিশেষ কোনো মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারিনা।"[৭৭] সেকারণে ঐ রচনার 'ভালমন্দ বিচার' করতেও তিনি অনিচ্ছুক। তবে

লীলারানীর লেখার গুণ 'সৎসাহস ও সরলতা'। রচনা হিসাবে উন্নত মানের না হলেও 'অকৃত্রিমতা ইহাকে সুন্দর করিয়াছে।' শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন যে, মেয়েদের অভিজ্ঞতার পরিধি কম, কিন্তু তারা ছেলেদের মতো অন্যের লেখা নকল করেনা। লীলারানী নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই সাহিত্যচর্চা করছেন। তাই তাঁর প্রতি শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদ ছিল। "আমার পরিশিষ্ট লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিও না—স্বাধীনভাবে বই লিখিও, আমি আশীর্বাদ করিতেছি তুমি কাহারও চেয়ে হীন হইবে না।" [৭৮] নিজের আশীর্বাদ সার্থক করতে শরৎচন্দ্র নিজেই আসরে নেমে পড়েছেন। উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—লীলারানীর কাছে "অনেক দামের মালমশলা মজুত আছে,...কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল।" কিভাবে লেখায় শৃঙ্খলা আনতে হয়, কম লিখে পাঠকের অন্তরে বোধের সঞ্চার করতে হয়, তাও লেখিকাকে সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। লীলারানীর গল্প লেখার 'খাতাখানা' পরিমার্জনা করেছেন, এবং লেখিকার 'কালো' গল্পটিকে নিজের 'পরিণীতা'র ধরনে ঢেলে সাজিয়ে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। লীলারানীকে তিনি সাহিত্যিক 'শিষ্যা' করতে ইচ্ছুক। [৭৯]

অতএব শিষ্যার লেখা ছাপানোর দায়িত্ব গুরুরই। গুরু শরৎচন্দ্র কথা দিয়েছেন, এক বছর পরে লীলারানীর লেখার উন্নতি হলে (এবং তা হবেই বলে গুরুর বিশ্বাস) তিনি নিজেই তা 'মাসিকপত্রে' ছাপতে দেবেন। [৮০] ইতিমধ্যে 'মিলন' গল্পটি ছাপবার জন্য 'একজন' তার কাছে ধরনা দিলেও তিনি আমল দেননি। সব মিলিয়ে 'লেখিকা' লীলারানীকে লেখিকাকুলে উচ্চ আসনে দেখতে তিনি আগ্রহী : "তারা [প্রকাশক] তোমার বইয়ের আশায় হাঁ ক'রে চেয়ে আছে, আর আশা করচি তুমি তোমার দাদার মান রেখে একটা লিখে দেবে। এবং তা এমন হবে যে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েমানুষের হাত দিয়ে সে রকম আর হয়নি।...তোমার উপর আমার ভারি আশা হয়েছে।" [৮১]

শরৎচন্দ্রের সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেছে। যে-কোনো কারণেই হোক লীলারানী তাঁর রচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন নি। তাতে বাংলা সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি হয়েছে বলা কঠিন, কিন্তু এটা স্বীকার্য লীলারানীকে উপলক্ষ ক'রে শরৎচন্দ্র যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছিলেন, তা সাহিত্যচর্চাকারী যে-কোনো মানুষের কাছে প্রেরণা-উৎস হয়ে থাকবে।

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৩৯-৪০।
২. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৫।
৩. 'শরৎপরিচয়', মোহিতলাল মজুমদাব (আকর : 'সাহিত্যবিতান', পৃ. ১০১-১০৮)।
৪. ঐ।
৫. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৯২।
৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ির গ্রন্থাগারে বিজ্ঞানের বই ছাড়া কেবল রবীন্দ্রনাথের বই ছিল—অন্য কোনো সাহিত্য গ্রন্থ সেখানে রাখায় শরৎচন্দ্র আগ্রহী ছিলেন না। ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫)।
৭. শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে : "আধুনিক

কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালিগালাজ ক'রে, [তখন] সভয়ে চুপ ক'রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য কত সামান্য।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৪)।

৮. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'শেষ প্রশ্ন' বিষয়ে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের মত এই যে, "চরিত্রহীনের শেষ দিকটা...রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩)।

৯. 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', অজিতকুমাব ঘোষ, শিল্পীসংস্থা, কলকাতা-৭০০ ০০৪, ১৯৭৬, পৃ. ১২৭-১২৯।

১০. 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র', পৃ. ১৭৮।

১১. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৯। যোগেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, অনেকেব মতে "রবিবাবুর কবিতা বড্ডই শক্ত।" তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ শরৎচন্দ্রের : "শক্ত যে সেকথা ঠিক। কিন্তু সেই শক্তটুকুকে সহানুভূতির তাপে নরম করতে পারলে যে জিনিসটা দাঁড়ায়, সেটিকে মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, নচেৎ কবিতা বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কবিতা জিনিসটি এমন হওয়া চাই, যা পড়তে ভালো—শুনতে ভালো, একবার পড়ে বা শুনে যাতে তৃপ্তি হয়না, যার ভেতরে এমন একটা উচ্চাঙ্গের ভাব রয়েছে, যা সহজ ধারণার অতীত।" (ঐ, পৃ. ৫৬)। ববীন্দ্রকবিতা ছাড়া পড়বার মতো অন্য কোনো কাব্যে শরৎচন্দ্র তা খুঁজে পাননি। তাঁর এও বিশ্বাস, রবীন্দ্রকবিতার যোগ্য অনুভূতিশীল পাঠক তখনো দেশে তৈরি হয়নি। তাঁর এই মত বর্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় উপ-অধ্যায়ে ('রবীন্দ্র-মুগ্ধতার কয়েকটি ছবি') কিছু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছি।

১২. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ২।

১৩. 'শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫।

১৪. অরসিকের চাটুকারিতায় বিরক্ত শরৎচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন : "সেদিন আমার এক বন্ধু আমায় বলেছিলেন, আপনার লেখা তবুও বোঝা যায়, কিন্তু ববিবাবুব লেখা কিছু বোঝা যায় না। তার উত্তরে তাঁকে আমি বলি, আমি বই লিখি আপনাদের জন্যে, আর তিনি বই লেখেন আমাদের জন্য—তফাত এইখানে।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ১৪)।

১৫. "কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে সে [শরৎচন্দ্র] বড় ব্যথিত হইত।...মাসিক মোহম্মদীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার বিরুদ্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে সে বলিয়াছিল, 'আরে, ওরা সব ভুলে যায় যে, এই গাল দেবার—নিন্দা করবার ভাষাটাই বা ওদের কে শিখিয়েছেন'?" ('শরৎস্মৃতি', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫)।

১৬. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৩৮। শরৎচন্দ্র 'আত্মচরিত' লেখায় 'চোখের বালি'র প্রসঙ্গে বলেছেন : "তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্চে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল।...কোনো কিছুকে যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে পায়, এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।...ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ আমার হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?" ('আত্মচরিত', শরৎচন্দ্র, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতিসংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

১৭. 'স্মৃতিচারণ' (২য় খণ্ড), পৃ. ১০২-১০৩।

১৮. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ৯৭, ১১৩-১১৪।
১৯. অমল হোমকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৭৫।
২০. ঐ, পৃ. ২৭৩।
২১. ঐ, পৃ. ২৭৮।
২২. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৭৭। রাধারানী অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের দাড়ি নিয়ে রসিকতা অমার্জনীয় মনে করেছেন : "এটি তাঁর [শরৎচন্দ্রের] স্কুল বালকসুলভ কৌতুককর খেলার মতো ছিল। আমাদের কাছে যদিও এটি খেলা ঠেকত না, অপরাধ ঠেকত।" (ঐ)।
২৩. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮৮। 'গুরুশিষ্য-সংবাদ' রচনাটি সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া গেছে—সম্পূর্ণ লেখাটির প্রথমার্ধ মাত্র 'যমুনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। যোগেন্দ্রনাথকে প্রথমার্ধ পড়তে দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁকে পরবর্তী অংশ তাঁর মতো ক'রে লিখতে বলেছিলেন। বলা বাহুল্য যোগেন্দ্রনাথের লেখা সেই মানে পৌঁছায় নি। কারণ শরৎচন্দ্রের লেখায় 'চোখালো চোখালো বাণের খোঁচা' ছিল। তা পড়ে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনবাসী কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু অসন্তুষ্ট হয়ে 'চোট ঝাড়িলেন...শরৎচন্দ্রের উপর।' তাতে 'বিরক্ত' শরৎচন্দ্র বলেছেন, "কাজ নেই এ লেখা ছাপিয়ে। লেখাটায় রবিবাবুর উপর খোঁচা আছে, তা সকলেরই চোখে পড়বে।" কিন্তু লেখাটার প্রথমার্ধ ছাপা হয়েছিল। এবং তা 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলন' পত্রিকায় যথেষ্ট সমালোচিতও হয়। যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, " 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলন' এক হাত লইতে কসুর করিল না।...লেখকের অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন, তাই এক 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলন' বাদে অন্য কোনো পত্রিকাই কোনো উচ্চবাচ্য করিল না।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮৮-৮৯)। 'ঢাকা রিভিউ সম্মিলনে'র তিক্ত সমালোচনার কারণও ছিল—শরৎচন্দ্র তাঁদের লেখা দেননি। "তাই লেখা না পাইয়া লেখকের উপর একটুখানি ভালো মতো গায়ের ঝাল মিটাইয়া লইবার সুযোগ কিছুতেই সে ত্যাগ করিতে পারিল না, বেশ কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিল।" (ঐ)
২৪. 'আত্মস্মৃতি' (১ম খণ্ড), সজনীকান্ত দাস, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা-৭০০ ০০৬, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ. ২৩৩-২৩৪। অতঃপর 'আত্মস্মৃতি'।
২৫. 'কল্লোল যুগ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, আশ্বিন ১৩৯৫, পৃ. ১১৬-১১৭।
২৬. ঐ, পৃ. ১১৭-১১৮।
২৭. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪১৬।
২৮. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৭০-৩৭১।
২৯. অমল হোমকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৭২।
৩০. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪১৬।
রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।
৩১. 'আত্মস্মৃতি' (১ম খণ্ড), পৃ. ২৪৮-২৪৯।
৩২. 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৭৭-৩৭৯।
৩৩. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৫৬।
৩৪. ঐ, পৃ. ৩৬০।
৩৫. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯৬।
৩৬. রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৬৬।
৩৭. 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক' (৩য় খণ্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ. ৩৩৯।

৩৮. 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩১৭-৩১৮। শরৎচন্দ্র কেন শান্তিনিকেতনে যাননি, তার কারণ নিজেই চিঠিতে দিলীপকুমার রায়কে উল্লেখ করেছেন : "আমার ধারণা ছিল তিনি [রবীন্দ্রনাথ] আমার প্রতি বিরক্ত, তাই ১লা বৈশাখে বোলপুর যাবার জন্যে আমাকে তুমি অনুরোধ করলেও আমি যাইনি।" (ঐ, পৃ. ৩১৫)।

৩৯. 'শরৎ-রবি', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত, শারদীয় দেশ ১৩৮২, পৃ. ৪৭।

৪০. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৩২-৩৩।

৪১. ঐ, পৃ. ৩৫-৩৭। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে হাওড়ায় আসার বিষয়ে অন্য উল্লেখ পাইনি।

৪২. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৬৮, ১৭১-১৭২। শরৎসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ ধারণা প্রকাশিত হয়েছে দিলীপকুমার রায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠিতেও : "অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকে, তাতে আমার ভাবনার কারণ এই জন্যে নেই যে, কাব্যরচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেকথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবে না।...দেশে যে-কেউ, যে-কোনো বিষয়েই শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না কেন, আমি যে সে গৌরবের শরিক।...আমার দেশে আমার চেয়ে নানা বিষয়েই নানা লোক বড়, এই অহঙ্কার জগতের কাছে যেন করতে পারি।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-২৮৩)। এই উচ্চ প্রশংসার মধ্যে কি রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ ক্লিষ্ট মনের ছায়াপাত ঘটেনি?

৪৩. রাধারানী দেবীকে লেখা চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৮৩।

৪৪. ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৬-৪৭।

৪৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫৫।

৪৬. কালিদাস রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৬১।

৪৭. অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল অন্যত্র একই কথা লিখেছেন। ভাষার সামান্য বদল হতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মূল বক্তব্য বদলায়নি : "উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করা সাহিত্যের কাজ নয়। যারা অতি আধুনিক সাহিত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রচার করতে বসেছে, তারা আর যাই করুক, সাহিত্য সৃষ্টি করচে না।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২১)।

৪৮. রাধারানী দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৮৩।

৪৯. রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৬০।

৫০. প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৭৯-১৮০।

৫১. ঐ, পৃ. ১৮২-১৮৩।

৫২. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৬৭।

৫৩. ঐ, পৃ. ৩২৪, ৩৩৬, ৩৬০।

৫৪ক. ঐ, পৃ. ৩৫৫।

৫৪খ. ঐ, পৃ. ৩৩৯।

৫৫. ঐ, পৃ. ৩২৪।

৫৬. ঐ, পৃ. ৩৪৭।

৫৭. ঐ, পৃ. ৩৪১-৩৪২। 'দোলা' সম্বন্ধে একই ধরনের কথা পরেও লিখেছেন যা দিলীপকুমারকে ক্রুদ্ধ করতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা : "দোলার কাটাকাটিগুলো একটু বিবেচনা ক'রে পড়ো। হঠাৎ চটে যেয়ো না।" (ঐ, পৃ. ৩৪৪)। 'দোলা'র প্রশংসাও শরৎচন্দ্র করেছেন। অন্তত অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে'র মতো বিলেত সম্পর্কে লোলুপ ভক্তি ওখানে নেই, "এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয়, এও বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু, কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই।" (ঐ, পৃ. ৩৩১)। শরৎচন্দ্র স্পষ্টই স্ববিরোধিতা করেছেন। বিলেত

সম্পর্কে 'অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা' 'দোলা'য় না থাকলেও 'অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা' সেখানে নিশ্চয় ছিল। সেজন্যই তিনি 'দোলা'ব পরিমার্জনার কথা দিলীপকুমাবকে একাধিক চিঠিতে বলেছেন।

৫৮. ঐ, পৃ. ৩৪৮।

৫৯. ঐ, পৃ. ৩৫৭।

৬০. ঐ, পৃ. ৩৫৩। 'শ্রীকান্ত'-ব লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রেব স্বাভাবিক সংকোচ সত্ত্বেও দিলীপকুমাবের ঐ সমালোচনা-প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি নিজেব পরিতৃপ্তি না জানিয়ে পাবেন নি : "এ আলোচনা তুমি যে-কোনো বইয়ের সম্বন্ধেই [যদি] কবতে, আমাব এমনই ভালো লাগত।...সাহিত্যবিচারেব যে ধারাটি তুমি এমন মধুব ক'রে এমন হৃদয় দিয়ে আলোচনা করেছ, তা যে শুধু সুন্দব হয়েছে তাই নয়, নিবপেক্ষ সুবিচাব হয়েছে বলে যে-কোনো দবদী পাঠকই স্বীকার করবে।" ('শবৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৫৩)।

৬১. ঐ, পৃ. ৩৬১।

৬২. ঐ, পৃ. ৩৬৬।

৬৩. 'শ্রীকান্ত'-র অনুবাদ বিষযে দিলীপকুমাবকে শবৎচন্দ্র লিখেছেন : "তুমি শ্রীকান্ত তর্জমা কবতে সঙ্কোচ বোধ কবছ কেন? যদি হয তো তোমাকে দিযেই হবে।" (ঐ, পৃ. ৩৬১)।

৬৪. ঐ, পৃ. ৩৬৩-৬৪।

৬৫. ঐ, পৃ. ৩৬৬।

৬৬. সঠিক ভাষান্তর করার উপযুক্ত লোকেব অভাব শবৎচন্দ্র বোধ করেছিলেন। কাবোর অনুবাদ ইংরেজি 'খববেব কাগজের' ভাষাগন্ধী অর্থাৎ নিতান্তই সাংবাদিকেব ইংরেজি। এবং তিনি লিখেছেন : "আমার নিজের কাছেই বযেছে 'পণ্ডিত মশাযে'র তর্জমা, কিন্তু সে দেখলেও তোমাব হযতো দুঃখ হবে।" (ঐ, পৃ. ৩৬১-৩৬২)।

৬৭. রাধাবানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৮৯।

৬৮. শবৎচন্দ্র রাধাবানীকে লিখেছেন, "স্বাধীন অভিমতটা যেন কুসংস্কারে গিযে না দাঁড়ায। তাবও সীমানা আছে এবং আছে বলেই তার মূল্য।" (ঐ)।

৬৯. রাধারানী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্য সম্পর্কে সমালোচক মহলের অভিমত শবৎচন্দ্র লেখিকাকে জানিয়েছেন : "কেউ বললেন, এমন বই আর হয়নি। এর ভাষা ভাব ছন্দ ছাপা ছবি—অতুলনীয়। নবশক্তি কাগজে আর এক বিশেষজ্ঞ—কে এক লীলাময় [অন্নদাশংকর রায়] লিখলেন, এমন বিশ্রী বই আর হয়নি। এর সব খারাপ। এমন কি যতীনের [যতীন্দ্রকুমার সেন] ছবিটা পর্যন্ত তার কলঙ্ক। এবং তিনি হলে এর নাম বাখতেন 'সূর্যমুখী'। একটাও ছবি দিতেন না এবং বালির কাগজে ছেপে প্রকাশ করতেন।" (ঐ, পৃ. ৩৯১)।

৭০. ঐ, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

৭১. দিলীপকুমার বায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩২৫, ৩৫৬। আশালতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র আরো লিখেছেন : "অস্থানে অকারণে পরের লেখার কোটেশন-এর চেয়ে অসুন্দর জিনিস আর নেই।...এই সব যেন রূঢ়ভাবে পাঠককে বলতে চায়, 'তোমরা দ্যাখো আমার এইটুকু বয়সে কত বুঝেছি, কত বই পড়েচি'।" (ঐ)।

৭২. ঐ, পৃ. ৩২৫। আশালতার নারী-বিষয়ক রচনাটি রবীন্দ্রনাথের এমনই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যে, তিনি আশাতলাকে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য : " 'নারী' বলে তোমার প্রবন্ধটি আমার হাতে এসে পড়েচে। এই বিষয়ে অনেক বাঙালি মেয়ে আজকাল লিখতে বসেচেন। সেসব লেখায় মুদ্রাদোষ অত্যন্ত বেশি। তাঁদের লেখা অশান্ত, তাতে উদ্দীপনা কম, উত্তেজনা বেশি।...তোমার লেখায় আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের শান্তি, এতে

কলহের ঝাঁঝ পাওয়া গেলনা। যে-বিষয় নিয়ে আলোচনা করেচ সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।" রবীন্দ্রনাথের এই বলা অবশ্য 'কিছু'তে থামেনি, যথেষ্টই দীর্ঘ হয়েছে, যার মধ্যে নারীকে সামাজিক-আধ্যাত্মিকভাবে শৃঙ্খলিত ক'রে রাখার বিষয়টি আলোচিত। ভগিনী নিবেদিতার নারীসত্তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা ওখানে দেখেছি : "ভগিনী নিবেদিতার ভারতভক্তি আমি দেখেচি, তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রেম ভরা ছিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর তিনি যেন মাতৃস্বরূপ ছিলেন। সেই মাতৃবোধে যেমন ছিল তেজ, তেমনি ছিল করুণা। তিনি তাঁর বুদ্ধিকে অবচ্ছিন্নভাবে কেবলি সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করেন নি। তিনি ভারতবর্ষকে একেবারে প্রাণবান মানুষের মতোই সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, চিন্তার দ্বারা বেষ্টন করেছিলেন।" আশালতার 'নারী' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, সেকথা জানিয়ে প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছেন : "চিঠি লিখতেই বসেছিলুম, কিন্তু ঝরনা হয়ে গেল নদী। মাথার মধ্যে অনেক কথাই বরফের মতো অচল হয়ে জমে থাকে, হঠাৎ সূর্যের তাপে একবার যদি গলতে শুরু ক'রে তাহলেই বন্যা নামে এ চিঠিটা সেই রকমের একটা আকস্মিক উৎপাত।" (আশালতা সিংহকে রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য, শারদীয় 'দেশ', ১৪০২)। নিজের পত্র-প্রবন্ধকে রবীন্দ্রনাথ 'আকস্মিক উৎপাত' বললেও একথা গোপন করেন নি, আশালতার 'নারী' রচনাটি তাঁর কাছে 'হঠাৎ সূর্যের তাপ' যা তাঁর মাথায় জনে থাকা অনেক দিনের চিন্তাকে গলিয়ে জল ক'রে বইয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসা আশালতার কাছে বিশেষ প্রাপ্তি।

৭৩. দিলীপকুমারকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩২৫। তাঁর লেখা সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে দিলীপকুমারের কাছে শরৎচন্দ্রের মতামত শুনে দৃশ্যত খুশি আশালতা শরৎচন্দ্রকে তাঁর 'প্রথম উপন্যাসখানি' পাঠিয়ে 'বিনম্র প্রণাম' নিবেদন করেছেন। এই অনুরোধও ছিল : "যদি আপনার অসীম কাজের মাঝে কোনো একটুখানি সময়ে গল্পটা পড়ে ভালমন্দের কথা গুটি পাঁচ ছয় লাইন লেখেন খুব খুশি হবো।" (ঐ, পৃ. ৩৫৮)। শরৎচন্দ্র আশালতার উপন্যাস পড়ে কোনো উত্তর লিখেছিলেন কিনা, তা জানা যায়নি।

৭৪. ঐ, পৃ. ৩৩১। অন্নদাশংকরকে বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছেন শরৎচন্দ্র 'কাঁচা শ্রীগু'-র কথা লিখে। বিলেতের বর্ণনায় ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে লেখা জমবে না, এই অন্নদাশংকরীয় ধারণাকে ঠুকে শরৎচন্দ্র তাঁর গিরীন মামার কথা লিখেছেন। শ্রীধাম খেতুরীর প্রসাদ খেলে অম্বল সারে এই বিশ্বাস ছিল গিরীনমামার : "স্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত মুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন। কি হলো? বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি। তাঁর ভয় ছিল ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়তো অম্বল সারবে না।" (ঐ, পৃ. ৩৩১)।

৭৫. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৮৬, ২৮৮। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে 'মুরুব্বিয়ানা'র চালে মন্তব্য করার দুঃসাহস তাঁর নেই বলেও, শরৎচন্দ্র কেদারনাথকে লিখেছেন : "নিতান্তই যদি হুকুম করেন তো যথাসাধ্য গল্পের সর্বনাশ করতেই হবে।" (ঐ, পৃ. ২৮৯)।

৭৬ক. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৩১।

৭৬খ. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৭।

৭৭. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২০৩।

৭৮. ঐ, পৃ. ২০৫।

৭৯. ঐ, পৃ. ২০৯-২১০, ২১৫।

৮০. ঐ, পৃ. ২১৫-২২০।

৮১. ঐ, পৃ. ২২০।

নবম অধ্যায়

শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা

॥ ১ ॥

সাহিত্যিকজীবনের সূচনা থেকে সমালোচনার নানা তরঙ্গে ভাসমান শরৎচন্দ্র কখনো নন্দিত কখনো নিন্দিত কথাশিল্পী। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪-এ 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশের সময় থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত। 'ভারতী', 'ভারতবর্ষ', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'শনিবারের চিঠি', 'বাতায়ন', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সবুজপত্র', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকা তাঁর বিষয়ে নানা রচনা প্রকাশে অগ্রসর। লেখকদের অনেকেই সেকালের বিখ্যাত মানুষ।

পত্রিকা প্রসঙ্গে দু-একটি কথা স্মর্তব্য। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতার উদাহরণ 'কল্লোল' ও 'কালিকলমের' একাধিক সংখ্যা। 'কল্লোলে'র ১৩৩২ বর্ষে 'শরৎচন্দ্র' নামে ধারাবাহিক শরৎজীবনী লিখেছেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায়। 'কালিকলমে'র ভাদ্র ১৩৩৫ সংখ্যাটিকে শরৎ-সংখ্যা বলতে পারি। এখানে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অন্যদের লেখা যেমন, তেমনি ঐ বছর শরৎচন্দ্রের ৫৩-তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে আয়োজিত শরৎ-সংবর্ধনাব অভিনন্দনপত্র, প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্রের 'মনের কথা' নামক অভিভাষণ মুদ্রিত। মনে রাখা দরকার, ঐ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মূলত শরৎচন্দ্রের নবীন সাহিত্যিকবন্ধুদের আগ্রহে উদযাপিত। ১৩৩৫-এ কেবল নয়, 'কালিকলমে'র ১৩৩৪ বর্ষেও শরৎ-বিষয়ক রচনা প্রকাশিত।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যাদুটি শরৎ-স্মরণসংখ্যা। 'বাতায়ন' পত্রিকার ২৮ জানুআরি ১৯৩৮ সংখ্যাটিও তাই। অর্থাৎ 'কল্লোল'-'কালিকলম' গোষ্ঠীর সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি পত্রিকার মতাদর্শগত বিভেদ থাকলেও শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে এরা নমনীয়, এদের মনোভাব শ্রদ্ধানত। অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি' একইসঙ্গে শরৎ-নিন্দা ও প্রশংসায় মুখর। নিন্দার প্রসঙ্গে বলতে পারি, চৈত্র ১৩৪১-এ মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত 'শিবশক্তি' নাটকের প্রধান অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নটরাজ-বেশধারী একটি ছবি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছবির নীচে লেখা ছিল 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। ইনি অভিনেতা অথবা লেখক কিংবা অভিনীত নাটকের নামোল্লেখ, কিছুই ছিলনা। অর্থাৎ পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে লেখক শরৎচন্দ্রের পরিচয় এখন দাঁড়াল—সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দিয়ে মঞ্চে উঠে নৃত্য করা। বলা বাহুল্য গভীর মর্মবেদনা এবং ক্রোধ শরৎচন্দ্রকে "যেন একেবারে উন্মত্ত ক'রে তুলেছিল।" [১]

১৩৩৮ শ্রাবণের প্রথম সংখ্যা থেকে 'পরিচয়' পত্রিকা শরৎ-বিরোধী। ফলে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ছোঁয়াছুঁয়ি যথাসম্ভব বাঁচিয়ে পরিচয়-গোষ্ঠী প্রমথ চৌধুরীর কলমে

শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে—এই ভঙ্গি দূর থেকে ফুল ছুঁড়ে দেওয়ার। অভিজাত পত্রিকা 'প্রবাসী'র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল—শরৎচন্দ্রকে ব্রাহ্মবিদ্বেষী ধরে নিয়ে ওখানে তাঁর লেখা ছাপা হয়নি। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ, তার প্রতিবাদ ইত্যাদি বেরিয়েছে। সব মিলিয়ে বলতে পারি শরৎ-সমালোচকদের মতভেদ, স্বরভেদের ইতিহাস রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। পত্রিকা ছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গত স্মরণে রেখেছি। বর্তমান অধ্যায়ে পর্ব থেকে পর্বান্তরে এই সব শরৎ-সমালোচনা উপস্থিত করব।

॥ ২ ॥

শরৎসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য : সমালোচকের দৃষ্টিতে

শরৎচন্দ্র মানবতাবাদী—তাঁর বিষয়ে সমালোচকদের এটি মূল সিদ্ধান্ত। অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে আছে—শরৎচন্দ্রের ভাষা, তাঁর সাহিত্যে প্রতীচ্য সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব, হাস্যরস, তাঁর শেষ পর্যায়ের কথাসাহিত্যে তাত্ত্বিকতার প্রাবল্য ইত্যাদি। মনে রাখা দরকার, সমালোচকদের অনেকেই শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ হওয়ায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মৌখিক আলাপ তাঁদের আলোচনাকে প্রভাবিত করেছে।[২]

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'বাতায়ন' পত্রিকায় (২৮ জানুআরি ১৯৩৮ সংখ্যা) প্রকাশিত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাটিকে ('শরৎচন্দ্র') বর্তমান প্রসঙ্গের আবাহন গীতি মনে করতে পারি। কত সংক্ষেপে শরৎচন্দ্রের রচনাবৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যায়, তার নিদর্শন এখানে পেয়েছি। শ্রীকুমারের মতে, অত্যন্ত সাধারণ জীবনে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত, 'নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সনাতন ভালবাসার রূপ' শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন। "তাঁহার মন্ত্রপূত লেখনী আমাদের অন্তর্নিহিত করুণ রসকে জাগরূক করিয়া সাহিত্যকে প্লাবিত করিয়াছে, নূতন সম্পদে সাহিত্যকে ভূষিত করিয়াছে।" উপন্যাসের নব বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে দিক্‌নির্দেশকারী ভূমিকায় আবির্ভূত শরৎচন্দ্রকে তাই বাংলা সাহিত্যে 'ভগীরথ' মনে করেছেন সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সমালোচকদের মূল সিদ্ধান্তের কথা একটু আগে বলেছি। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'হ্যুম্যানিস্ট' শরৎচন্দ্র 'সমাজকে তীব্রভাবে কশাঘাত ক'রে গেছেন।' ('আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী স্মরণ করিয়েছেন মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের 'অপরিসীম সহানুভূতির' কথা। ('শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত', জনার্দন চক্রবর্তী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।[৩] মোহিতলাল মজুমদার অতিরিক্ত বলেছেন, শরৎচন্দ্র স্বয়ং সমাজের 'যন্ত্রণা' অনুভব ক'রে তাঁর সাহিত্যে তার রূপদান করেছেন।[৪] 'শরৎচন্দ্রের মানবিকতা' নামত রচনায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "মানবিকতার এমন বিপুল ও গভীর আদর্শ কেহই আঁকিতে পারেন নাই যাহা শত অন্যায় ও অধর্ম, পাপ ও দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ বঙ্কিম পথ দিয়া উজ্জ্বল দীপশলাকার মতো তাঁহার কল্পলোকের নরনারীকে দিকদর্শন করাইয়াছে।" ('শরৎচন্দ্রের মানবিকতা', রাধাকমল মুখোপাধ্যায়,

'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য—সমস্ত দুর্বলতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা (Love of Man as Man) শরৎসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।[৫]

সমালোচকদের পারস্পরিক মতভেদও ছিল। 'শরৎচন্দ্রের চোখ ছিল বুকে', তাঁর রচনায় 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' নেই—এ-ই ধূর্জটিপ্রসাদের ধারণা। জনার্দন চক্রবর্তী অবশ্যই তা মনে করেন নি। 'জীবনের খ্যাত অখ্যাত সবদিকেই ব্যাপক এবং অন্তর্নিবিষ্ট...সমদৃষ্টিসম্পন্ন শরৎচন্দ্র যেভাবে মানব মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন, তা কিভাবে অবৈজ্ঞানিক হওয়া সম্ভব? জনার্দন চক্রবর্তীর এই কথার সমর্থন পাওয়া গেছে দীনেশচন্দ্র সেনের লেখায়। 'অসামান্য সাহিত্যিক বুদ্ধি ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞান' শরৎ-রচনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণ ক'রে।[৬]

শরৎচন্দ্রের মানবতাবোধের একাধিক পরিচয় সমালোচকেরা দিয়েছেন—বঞ্চিতা নারীর আত্মসচেতন হয়ে ওঠা, প্রেমের বহুবর্ণ চিত্র, নীচের মধ্যে মহত্ত্ব আবিষ্কার।

নারী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অতীব স্পর্শকাতর। মৌখিক আলাপে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রীকে তিনি আবেগভরে বলেছেন : "দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোনো সমাজই কখনই সুবিচার করেনি। আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভর তারই প্রতিবাদ করব।"[৭]

১৯২৮ সালে লিখিত দুটি সমালোচনা প্রবন্ধের বক্তব্য একই—শরৎসাহিত্যে পুরুষের উপর নারীর অসামান্য প্রভাব। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন : শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির "সর্বত্র পুরুষদিগের উপরে নারীর অসাধারণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" ('যুগপ্রকাশক শরৎচন্দ্র', বিপিনচন্দ্র পাল, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। মণিব্রজ ভারতী মনে করেছেন, শরৎ-সাহিত্যের নারী একদিকে আত্মসচেতন ("পুরুষের সমাজে পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে কেমন ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারা যায়, তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত এবং ইঙ্গিত এদের চলাফেরা কথাবার্তায় একান্ত সহজ সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে।"), অন্যদিকে সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্বে সে মহিমান্বিত। মণিব্রজ কিছু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : "নারী আজ আর তার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, এখন আমাদের মনের মধ্যে এই কথা জাগ্রত হয়েছে যে, নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়?" ('সাহিত্যে শরৎচন্দ্র', মণিব্রজ ভারতী, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৪)।

মণিব্রজের বক্তব্য কার্যত স্বীকার করেছেন ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, আমি নারী—এই দৃপ্ত ঘোষণা শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রে বর্তমান। শরৎসাহিত্যে "সমাজের বিধিবিধানের অনুশাসনকে অতিক্রম ক'রে দেহের গণ্ডী ছাড়িয়ে নারীর আত্মিক মূল্য ঘোষিত হয়েছে, তার সত্তা স্বীকৃত হয়েছে।" এই স্বীকৃতি তারাশংকরের কাছে যথেষ্ট বৈপ্লবিক। এও তাঁর ধারণা, ১৯২১ সালে রাজনৈতিক গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণেচ্ছু নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠনের সঙ্গে ব্যাপারটি তুলনীয়।

নিপীড়িতা নারীর পক্ষে শরৎচন্দ্রের সংগ্রামকে মূল্য দিয়েছে 'শনিবারের চিঠি'। 'পুরুষের সকল অত্যাচার, সকল পাপের বোঝা' বহনকারী নারীর 'ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা' শরৎচন্দ্র দেখেছেন। নারীর 'দুঃখ সহ্য করবার [ঐ] অসাধারণ শক্তি' তাঁকে এমনই

'অভিভূত' করেছে যে, তিনি হয়ে উঠেছেন 'Daughter of Woman'-এর মহিমা-কীর্তনকারী সাহিত্যিক। ('শরৎচন্দ্র', 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৩৫)।

একই কথা রমেশচন্দ্র মজুমদারেরও। পতিতা নারীর পক্ষে শরৎচন্দ্রের কলম চালনাকে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করেছেন : "যে সমুদয় অভাগিনী নারী সামাজিক নীতি লঙ্ঘনের ফলে বা তাহার অপবাদে কেবল অর্থসম্পদ নহে, সামাজিক মানমর্যাদা, আত্মীয়স্বজন—এ সকল হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের এই গভীরতর ও অধিকতর বেদনাব্যঞ্জক নিঃস্বতার দিকে তিনি আমাদের মনে যে সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগাইয়াছেন, শরৎচন্দ্রের পূর্বে আর কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিক তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।" [৮]

শরৎচন্দ্র প্রেমের বহুবর্ণ চিত্র এঁকেছেন—এই অভিমত কোনো একক সমালোচকের নয়। কেউ দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ওখানে দেখেছেন, কারো মতে সামাজিক সংস্কারের কাছে মাথা নামিয়ে প্রেমকে বলিদান দিয়েছে শরৎসাহিত্যের নারী। 'শুচিশুভ্র' দাম্পত্য প্রেমের পক্ষপাতী জনার্দন চক্রবর্তী শরৎসাহিত্যে ঐ বস্তু লক্ষ্য ক'রে বলেছেন সীতা-সাবিত্রী, দ্রৌপদী-দময়ন্তী, মালবিকা-শকুন্তলা ইত্যাদি দেবীমূর্তি শরৎসাহিত্যে নতন রূপগ্রহণ করেছেন। "প্রাত্যহিক জীবনে এই দেবীনিবহের সোদরা-কন্যকাগণকে শরৎচন্দ্র পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের সুবর্ণপ্রতিমা গড়িয়াছেন, 'প্রণতিনম্রশিরোধরাংস' ইঁহাদিগকে স্তুতি-প্রণতি জানাইয়াছেন।" তাঁর বক্তব্য পাছে প্রশ্ন উদ্রেক ক'রে, সেজন্য জনার্দন চক্রবর্তী অগ্রিম প্রতিপ্রশ্ন করেছেন : "শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস পাঠকগণকে কি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? আমাদের দেশ যে সত্যই 'মা-বোনের' দেশ, একথা এমন গর্বোদ্বেল হর্ষাপ্লুতচিত্তে কে বলিয়াছেন?" ('শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত', জনার্দন চক্রবর্তী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

শরৎসাহিত্যে প্রেমিকা নারীর ছবি দেখেছেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ও বস্তু 'বিশ্বসাহিত্যে বিরল'। প্রেমের পরীক্ষায় পুরুষের তুলনায় নারীকে কোন মূল্য দিতে হয়েছে, তাও জানিয়েছেন তিনি : "নারীর অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে, তাহার অগৌরব ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে তিনি [শরৎচন্দ্র] যে অটল ধৈর্য ও অসঙ্কোচ সততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উহার সমস্ত কলঙ্ক ও অধর্মকে শোধন করিয়া দিয়াছে।" ('শরৎচন্দ্রের মানবিকতা', রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

সমাজ সংস্কার ও প্রেমের দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত নারী চরিত্র প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "মানুষ যে কত প্রকারে বিরুদ্ধ অবস্থাচক্রে পরস্পরবিরোধী মনোভাব লইয়া কাজ করিতে পারে, তাহা 'পল্লীসমাজে'র রমার নহে, 'পণ্ডিতমশাই' গল্পে কুসুম চরিত্রে দেখা যাইতেছে।...সাবিত্রী চরিত্রের নিগূঢ় আত্মত্যাগ, নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া প্রণয়ীকে পবিত্রতাদান,...ইহা যে কত বড় প্রেমের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, পাঠকগণ পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।" দীনেশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত : "এই ত্যাগই প্রকৃত প্রেম।" [৯]

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র দুঃসাহসিক মানুষ—কালিদাস রায় তাই মনে করেছিলেন।

মহতের মধ্যে মহত্ত্ব আবিষ্কারের যে পরিচিত প্রয়াস, তার বিপরীত রাস্তায় হেঁটেছেন শরৎচন্দ্র। তিনি "বহু অনাদৃত অনাবিষ্কৃত প্রত্যাশিত ক্ষেত্রে মহত্ত্বের ছবি দেখিয়েছেন। তাঁর এ আবিষ্কারে আমাদের সংস্কারে আঘাত লেগেছে।...[কিন্তু] অনাদরে তো সত্য মরে না। চিরপোষিত সংস্কার যে সদ্যোজাত সত্যের চেয়ে বড় নয়। চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র এই সত্যের মর্যাদা রেখেছেন।" ('শরৎসাহিত্য', কালিদাস রায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

কালিদাস রায়ের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে শরৎচন্দ্রকে লেখা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠিতে। তাঁর মনে হয়েছিল সাধারণ মানুষের মহত্ত্ব আবিষ্কারের দ্বারা শরৎচন্দ্র 'জাতীয় জীবন' রক্ষা করেছেন। "তাহাতে [সাধারণ মানুষের জীবনে] যে কি মহত্ত্ব আছে, কি মহত্ত্ব সম্ভব, তাহা দেখিয়াও দেখিনা, অথচ আমাদের সম্মুখেই ঘটিতেছে। অপ্রাকৃত ও অসম্ভাবিত চরিত্রের কথা [আপনি] বলেন নাই।" ('শরৎচন্দ্রকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠি', 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)। জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি শরৎচন্দ্রের পক্ষে অহংকার এবং অলংকার।

একই প্রসঙ্গে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্টভাবে বলেছেন, সামান্য মানুষের গভীর হৃদয়বত্তার পরিচয় গফুর চরিত্রে প্রকাশিত। "কোটি কোটি...ভাষাহীন মূক, অন্নহীন —অর্ধনগ্ন, জীর্ণ, শতছিদ্র আশ্রয়ের তলদেশে" মাথা গুজে পড়ে-থাকা মানুষের একজন গফুর কোন হৃদয়ধর্মে সম্পন্ন, শরৎচন্দ্র তা দেখিয়েছেন।[১০]

প্রতীচ্য সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব

প্রতীচ্য প্রভাবের রূপনির্ণয় যেমন বিশিষ্ট সমালোচকের প্রধান লক্ষ্য, তেমনি শরৎসাহিত্যে স্বদেশভাবনার পূর্ণ প্রতিফলন বর্ণনায় আগ্রহী সমালোচকও ছিলেন। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র শেষোক্তদের কাছে কার্যত দেশপ্রীতি-প্রচারক হয়ে উঠেছেন। শরৎচন্দ্র নিজে কিন্তু প্রচারধর্মী সাহিত্যের অত্যন্ত বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সেটাই তাঁর প্রধান অভিযোগ। তবু কালিদাস রায় না বলে পারেন নি, বাংলাদেশের নগরপল্লীর গোপনতম কুটীরের ভিতরে উঁকি দিয়েছেন শরৎচন্দ্র, বাঙালির আচার-আচরণ-বৃত্তি সমস্তই তাঁর নখদর্পণে, যে দরদের সঙ্গে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের কথা বলে গেছেন, তাতে "তাঁর চেয়ে দেশপ্রীতি সাহিত্যে আর বড় কেউ প্রচার করেন নি।" জাতীয় জাগরণে শরৎসাহিত্যের মহান ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়েছেন কালিদাস, "সমগ্র জাতির প্রাণের কথা না জানলে জাতিপ্রেম কি ক'রে জাগবে?" ('শরৎসাহিত্য', কালিদাস রায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

'কালিকলম' পত্রিকার একই ভাদ্র ১৩৩৫ সংখ্যায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র' রচনাটিকে কালিদাস রায়ের প্রতিবাদী মনে করা যেতে পারে। প্রথমত শরৎচন্দ্রকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারক ভাবতে পারেন নি নরেশচন্দ্র ("সমাজকে কোনো বিশিষ্ট আদর্শের দিকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি [শরৎচন্দ্র] কোনো গল্প লেখেন নাই।...তাঁর কল্পিত মানবচরিত্রের ভিতর হইতে আমরা হয়তো অনেক

উপদেশ লাভ করিতে পারি, কিন্তু সে কেবল তাঁর চরিত্র-চিত্রগুলি সত্য বলিয়া।"), দ্বিতীয়ত খাঁটি বাঙালি জীবনের ছবি শরৎসাহিত্যে থাকলেও 'চিত্রাঙ্কনে...কঠোর সত্যনিষ্ঠা'র শিক্ষা শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে পেয়েছেন, "এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের শিষ্য।" নরেশচন্দ্র অবশ্য এও মেনেছেন, "শরৎচন্দ্রের কথার ভিতর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব কেহই দেখাইতে পারিবে না।" ('কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

নরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় মতটিকে আঘাত করেছেন প্রমথ চৌধুরী। না রেখেঢেকে তিনি বলেছেন : "তাঁর [শরৎচন্দ্রের] নভেল কোনো ইংরেজি নভেলের নকল নয়। এই বাঙালি সমাজে যা ঘটতে পারে ও ঘটে, তাই তাঁর কথার একমাত্র উপাদান। বর্তমান সমাজ তিনি সাহিত্যিকের চোখে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন।" ('শরৎচন্দ্র', প্রমথ চৌধুরী, 'পরিচয়', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

হাস্যরঙ্গ

"শরৎচন্দ্র রঙ্গরস বিসর্জন দিয়া ভারিক্কি চালে চলেন নাই।" নিজের এই মন্তব্যের পক্ষে কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন উদাহরণ উপস্থিত করেছেন, তেমনি শরৎসাহিত্যে হাস্যরসের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, শরৎচন্দ্রের রঙ্গব্যঙ্গের পশ্চাতে লেখকের 'দরদী প্রাণ' অনুভব করা যায়। তা পাঠককে সচেতন ক'রে, 'বুদ্ধিবৃত্তিতে ঘা দেয়।' শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গের "গতি স্থির ও ধীর ; বিবিধ অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে ইহা অতর্কিত আবির্ভূত হয় এবং নিমেষেই মিলাইয়া যায়। অনেক সময় শিল্পীর অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ও অতিশয় সত্য বলিবার চেষ্টায় ইহা অন্তর্হিত থাকে। ইহা অনেক সময় রচনা-পদ্ধতির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়।" ('শরৎসাহিত্যে হাস্যরস', কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

শরৎসাহিত্য হাস্যরস বর্জিত নয়—সেকথা জানিয়েছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন, ঐ হাস্যরসের মূলে আছে ব্যঙ্গকৌতুক এবং মাধুর্য। নির্বুদ্ধিতার তলে মনুষ্যত্বের যে-ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত, তাকে হাসির কলরোলে মুখর ক'রে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'শ্রীকান্তে'র প্রথম খণ্ড যেখানে বাঘবেশী বহুরূপীকে দেখে বাড়ির সকলের অনবদ্য আচরণের ছবি দেওয়া হয়েছে।[১১]

ভাষাপ্রসঙ্গ

চারজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক (যাঁদের মধ্যে একজন ভাষাতাত্ত্বিকও আছেন) শরৎচন্দ্রের সাহিত্যভাষার অনর্গল প্রশংসা করেছেন। এঁদের মূল বক্তব্য এক—সহজ সরল হৃদয়গ্রাহিতা শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রধান লক্ষণ। এও এঁরা বলতে চেয়েছেন, ঐ ভাষার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত।

লেখকের অন্তর্গত ভাবনা প্রকাশের বাহন তাঁর ভাষা। সেই "ভাষা শ্রোতার অন্তরে

রসসঞ্চার ক'রে।" এই বক্তব্য কালিদাস রায়ের। এও তিনি বলেছেন, অলংকৃত ভাষা রচনার পথ ত্যাগ ক'রে 'তার স্বাভাবিক লীলাচাতুর্যের পক্ষপাতী' ছিলেন শরৎচন্দ্র। ('শরৎসাহিত্য', কালিদাস রায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

শরৎচন্দ্রের ভাষা বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বীরবলী গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য মূল্যবান বিবেচিত হবে। গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেই ভাষাকেই গুরুত্ব দিতে আগ্রহী যা 'গড়গড়িয়ে' এগিয়ে এসে পাঠকের মনকে টেনে নেবে। শরৎচন্দ্রের ভাষা তাই, তা 'সরল ও সচল আর তার flow আছে।' ('শরৎচন্দ্র', প্রমথ চৌধুরী, 'পরিচয়', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

জনার্দন চক্রবর্তী বলতে চেয়েছেন, শরৎ-ব্যক্তিত্ব তাঁর ভাষায় প্রকাশিত। "তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গি ছিল সহজ অথচ শাণিত, সংক্ষিপ্ত অথচ দীপ্ত। ভাষা ও রীতির বিচার করিয়া এ ব্যক্তিকে যথার্থই বলা চলে, 'The style is the man.' " ('শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত', জনার্দন চক্রবর্তী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কার্যত চমকে গিয়েছিলেন যখন শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পের মধ্যে একটি শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগের ঔচিত্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে উদ্বিগ্ন আলোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্র এতখানি শব্দসচেতন? এর পাশে সমকালীন সাহিত্যিকদের আলগা শব্দ ব্যবহারকে সুনীতিকুমার "anarchy" ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের লেখায় অজস্র প্রশংসাবর্ষণ ছিলই : "Saratchandra was a master stylist in Bengali. Without much of a formal education, his genius as a writer of Bengal made him wielder of a fine, nervous and highly expressive Bengali which was true to its native spirit in both idiom and vocabulary and was the joy of his countrymen who could appreciate good and idiomatic Bengali...Saratchandra was fully alive to his responsibilities as a writer of his mother tongue, and would weigh each new expression which he wished to introduce in a story he was then writing." [১২]

তাত্ত্বিকতার প্রাধান্যযুক্ত অন্তিম পর্যায়ের শরৎসাহিত্য

একদা যে-মোহিতলাল মজুমদার শরৎচন্দ্রের প্রথম পর্বের রচনায় জীবন-মন্থিত 'তান্ত্রিকতা' লক্ষ্য ক'রে উল্লসিত হয়েছিলেন, সেই তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ পর্বে শরৎ-রচনায় তাত্ত্বিকতা-প্রীতি দেখে নৈরাশ্য বোধ করেছেন। তাঁর ধারণা শেষ জীবনে স্বচ্ছল নাগরিকতায় প্রতিষ্ঠিত শরৎচন্দ্র আধুনিকতাবিলাসী কিছু পারিষদের দ্বারা পরিবৃত থাকায়, শরৎচন্দ্রের রচনার ঐ প্রকার খাতবদল হয়েছে। পরিণাম : "তাঁহার শেষ রচনাগুলিতে [বিশেষত 'শেষ প্রশ্ন'] জীবনের সম্বন্ধে সেই সহজ দৃষ্টি আর নাই, সমাজবিজ্ঞান এবং ব্যক্তিধর্মের নানা কূটকঠিন প্রশ্নমীমাংসায় তাঁহার অনুভূতিকল্পনা নিয়োজিত হইয়াছে,...জীবনসাধক তান্ত্রিক এখন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন।" [১৩ক]

মোহিতলালের এই দৃষ্টিভঙ্গির একাংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে। সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্ব থেকে নারীজীবন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বৈজ্ঞানিক কৌতূহল দেখিয়েছেন, রেঙ্গুনে অনেক

যত্নে কয়েক শত কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন, অনিলা দেবী ছদ্মনামে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ লিখেছেন। তারই বিস্তারিত রূপ 'শেষ প্রশ্ন'। মুক্ত জীবন এবং মুক্ত চিন্তায় নারীর অধিকার-অনধিকার নিয়ে নানা কথা সেখানে ছিল। বস্তুত শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে নারীর পক্ষে যে-সংগ্রাম করেছেন, তার ঔপন্যাসিক আকার 'শেষ প্রশ্নে' তিনি ধরে দিয়েছিলেন। বলতে পারি 'নারীব মূল্য' প্রবন্ধ রচনার সময় শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর চিঠিতে পাই : উক্ত প্রবন্ধে "যেসব কথা বলিবার আছে, নানা প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে লিখিবার ইচ্ছা আছে।"[১৩৭] শরৎচন্দ্রের এই সামগ্রিক চিন্তারেখা মোহিতলালের লক্ষ্যগোচর ছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য মোহিতলালেব পক্ষে কেউ বলতে পারেন, রচনার বিকাশ তার প্রকাশিত রূপ নিয়ে করা হয়। লেখকের পড়াশোনা, তার গবেষণার হিসাব দেখিয়ে তাঁর রচিত সাহিত্যের বিচার করা যায়না। বড়জোর, তাঁর বিশেষ ভূমিকার পশ্চাদপট বিশ্লেষণে তা কাজে লাগে। কিন্তু উপন্যাসেব বিচার তার রসশিল্পের উপরেই।

॥ ৩ ॥

সমালোচক মহলের প্রশংসা এবং প্রশ্ন

শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে নিন্দা এবং প্রশংসা দুইই জুটেছিল। সে নিন্দার চরিত্র জানিয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : "রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি।" ('আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের ছবি ছাপিয়ে 'শনিবারের চিঠি' কিভাবে তাঁকে অসম্মানিত করেছিল, তা আগে দেখেছি। তাঁর গ্রন্থের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে পাঠকমহলের মনোহরণ তিনি কিভাবে করেছেন। সমালোচকদের বড় অংশের রায় তাঁর পক্ষে গেছে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক আক্রমণকাবীর দংশনও কম তীক্ষ্ণ ছিলনা। ঐসব আলোচনার প্রকৃতি এখন দেখে নেব।

শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্রের মহাকাব্যোপম উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রায় দুই দশক ধরে এই উপন্যাসের চারটি পর্ব শরৎচন্দ্র লিখেছেন। মাঘ ১৩২২-এ ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীকান্ত' শুরু হওয়ার পর এর সমালোচনারও শুরু। ১৩৪৪-এ শরৎচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত সে সমালোচনায় প্রশংসা বেশি, নিন্দা অল্প। বিস্ময়ের কথা, এই কালপর্বের তিনটি সমালোচনা ইন্দ্রনাথ চরিত্রকেন্দ্রিক। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার চৈত্র ১৩২২ সংখ্যায় ('মাসিক সাহিত্য সমালোচনা') লেখা হয়—"শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী দুই সংখ্যায় যতখানি পড়িলাম, তাহার মধ্যে ইন্দ্রনাথের চরিত্রটি সুন্দর হইয়াছে।" 'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে একটু খোঁচাও ছিল : "রচনাটি উপভোগ্য, তবে দীর্ঘ ভূমিকা না থাকিলেই ভালো হইত। কোনো একটা কথা বলিবার পূর্বে একটা দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদিয়া বসা আমাদের রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ঐ সমালোচনার প্রায় পনেরো বছর পরে বিপিনচন্দ্র পালের 'শ্রীকান্ত' স্তুতি একই মাত্রাযুক্ত : "শরৎচন্দ্রের বড় সৃষ্টি আমার মনে হয়, 'শ্রীকান্ত' [উপন্যাস] এবং শ্রীকান্তের সখা, গুরু, সুহৃদ ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি।" ঐ অপূর্বত্বের হেতুও ব্যাখ্যা করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল—আধুনিক বাংলাব 'নবযৌবন' ইন্দ্রনাথে মূর্ত। সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ছুটে চলার বেগ ইন্দ্রনাথে সঞ্চারিত। 'বিশ্বজনীন যৌবনের' এই প্রতীক চরিত্র সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত উক্তি : "গ্রীকশিল্পী যেমন পাথরে Apollo Velvedere এপেলো ভেলভিডিয়ারের ছবি খুদিয়া বিশ্ব-যৌবনের দেহকে চিরদিনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের শরৎচন্দ্র সেইরূপ বিশ্ব-যৌবনের মনকে বাংলা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু।"[১৪] বহু পাঠকের আস্বাদনফল বিপিনচন্দ্রের কলমে এখানে প্রকাশিত।

'শ্রীকান্ত' প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বিপিনচন্দ্র পালের মতো উচ্ছ্বাস না থাকলেও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি জানিয়েছেন, গভীর রাতের ভরা বর্ষায় গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের অভিযান তাঁর মনের মধ্যে ছবি এঁকে দিয়েছে। "বর্ণনাটি আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল। লেখকের শক্তির পরিচয় এ বর্ণনায় পুরো ফুটে উঠেছে। যাঁর কলম এসব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।" ('শরৎচন্দ্র', প্রমথ চৌধুরী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

পূর্ববর্তী তিন সমালোচকের মতো কেবল ইন্দ্রনাথকে বিবেচনাধীন না ক'রে 'শ্রীকান্তে'র তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত আলোচনার মধ্যে এনেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের অবলম্বন ক'রে জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার যে অসাধারণ বিন্যাস শরৎচন্দ্র ঘটিয়েছেন, তাতে সমালোচক নবেশচন্দ্রকে বলতে হয়েছিল, এই উপন্যাস 'সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি।' ('কথাসাহিত্যে শবৎচন্দ্র', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে আরো একটি লেখার উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'An Acre of green grass' গ্রন্থে এবং অন্যত্র বক্তৃতায় বুদ্ধদেব বসু সাধারণভাবে শরৎসাহিত্য এবং বিশেষভাবে 'শ্রীকান্ত' প্রসঙ্গে যে-আলোচনা করেছেন, তা নরেন্দ্র দেবের কাছে প্রতিবাদযোগ্য মনে হয়েছিল। বুদ্ধদেবের বক্তব্য, শরৎচন্দ্র বড় গল্প লিখলেও উপন্যাস লেখেন নি। উপন্যাসে বহু চরিত্র, বিচিত্র ঘটনা ও জটিলতার প্রয়োজন। সমাজবিদ্রোহী চরিত্র তিনি আঁকেন নি জনপ্রিয়তা নষ্ট হওয়ার ভয়ে। বুদ্ধদেবের এই সব কথা নরেন্দ্র দেবের অসহ্য। প্রিয় ঔপন্যাসিককে (ধরে নিতে পারি প্রিয় মানুষকেও) অপদস্থ করার চেষ্টা দেখে বুদ্ধদেবের প্রতি ক্রমান্বয়ে বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়েছেন নরেন্দ্র দেব। যথা, বুদ্ধদেব 'বিশেষজ্ঞের মুখোস-পরা বিজ্ঞ অথচ অনভিজ্ঞ সমালোচক'; কলেজের টেকসট বুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর মধ্যে বুদ্ধদেবের "শৌখিন জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং সেই দুষ্প্রাপ্য বিদ্যার ভোঁতা হাতিয়ার হাতে যিনি সাহিত্যের কমলবনে অর্বাচীনের ন্যায় হাতির অনুকরণে বিপুল দম্ভে ভেকের নৃত্য করেছেন, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এত বড় কথা বলার সাহস তাঁর পক্ষেই সম্ভব,...এই শ্রেণীর fanatic সমালোচকেরা শুধু দেশসুদ্ধ সুলেখককে কামড়ে তাঁদের শুড়শুড়ি নিবারণ করেন

মাত্র।" নরেন্দ্র দেবের আলোচ্য প্রবন্ধের নামটিও বুদ্ধদেবের প্রতি বিদ্রূপযুক্ত : 'বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও শরৎচন্দ্র'। বিদ্রূপ ছাড়াও বুদ্ধদেবের মতামতের বিরোধী যুক্তি দিয়েছেন নরেন্দ্র দেব। সেইসঙ্গে বলেছেন : "'শ্রীকান্ত' বৈদেশিক দৃষ্টিভঙ্গির চশমা এঁটে ও 'কন্টিনেন্টাল' মনোবৃত্তির অনুকরণে, বিদেশের ধারকরা মালমশলা নিয়ে লেখা তথাকথিত ব্যর্থ বাংলা উপন্যাস নয়। নিজের দেশের মাটি ও জলহাওয়ার মধ্যে জাতীয় চরিত্র ও তার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা, শ্রীকান্তের মধ্যে নিরপেক্ষ নৈপুণ্যে মূর্ত। এই সুখ-দুঃখের চিত্র, আনন্দবেদনার অনুভূতি স্বদেশ ও স্বজাতির সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবের আবেদ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।" [১৫]

মন্দির

কুন্তলীন পুরস্কারে ভূষিত 'মন্দির' গল্প পড়ে প্রমথ চৌধুরী 'চমকে' গিয়েছিলেন। তাঁর মতো 'Critic'-এর মনে কিভাবে 'বিস্ময়ের' সঞ্চার করলেন একজন 'সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন কি নামহীন লেখক'? সেই ঘোর কাটিয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, ঐ গল্পটি তাঁর মনে 'impression'-এর সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাঁর 'Critic [সত্তার] বাগ্‌বিস্তার' : "'মন্দির' গল্পটির কথাবস্তু সম্পূর্ণ নূতন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত।" মনে রাখা দরকার 'মন্দির' গল্প রচনার (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) পঁয়ত্রিশ বছর পরে ১৩৪৪-এ লিখিত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে ('শরৎচন্দ্র', প্রমথ চৌধুরী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪) গল্পটি সম্বন্ধে তাঁর আবেগঘন অনুভূতি একই প্রকার ছিল।

বড়দিদি

শরৎচন্দ্রের অশেষ ভাগ্য, 'বড়দিদি' লেখার জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশ থেকে বহু দূরবর্তী রেঙ্গুনে পড়ে-থাকা শরৎচন্দ্রের কলমের শক্তি বিষয়ে নিঃসংশয় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন বাংলা সাহিত্যে তাঁকে পূর্ণরূপে দেখার জন্য। উৎকণ্ঠিতভাবে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে বলেছেন : "যেমন করে পারো তাঁকে [শরৎচন্দ্রকে] আনাও সৌরীন,...তাঁকে ধরে এনে লেখাও। বাংলাদেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।" [১৬] রেঙ্গুনের বাঙালি সমজে বড়দিদি কি পরিমাণে আলোড়ন তুলেছিল তার রেখাঙ্কন করেছেন যোগেন্দ্রনাথ সরকার। তার মধ্যে তাঁর নিজের কথাও রয়ে গিয়েছিল : "বই পড়িয়া সকলেই তাঁহার গল্পের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল।" [১৭]

রামের সুমতি

'যমুনা' পত্রিকায় 'রামের সুমতি' প্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যে লিখিত দুটি সমালোচনার উল্লেখ করতে পারি। দ্বিতীয়টি লিখেছেন দীনেশচন্দ্র সেন। সে প্রসঙ্গ পরে।

'রামের সুমতি'র পাণ্ডুলিপি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথ সরকারের।[১৮] রচনার প্রথমাংশ পড়েই যে-আনন্দে তিনি ভেসেছেন, অবিলম্বে অন্যদেরও ভাসাতে চেয়েছেন। তাতে পাঠকদের খুশির কথা শুনে লেখকের প্রতিক্রিয়ার কথাও তিনি লিখেছেন : "অচিরেই তাঁহাদের [পাঠকের] উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লেখকেরও কর্ণে গিয়া প্রবেশ করিল। তিনি ইহাতে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিলেন।...অন্তরের বিপুল আনন্দ কোনো বাধা বন্ধনই মানিল না—ওষ্ঠভ্রান্ত দিয়া ও দুইটি চোখের কোণ দিয়া উছলিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল।"[১৯] লেখকজীবনের প্রথম পর্বে পাঠকের অভিনন্দনে আলোড়িত শরৎচন্দ্রের দুর্লভ এই ছবি।

'রামের সুমতি' সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের লেখায় অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণভঙ্গি আছে। গল্পটির অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ ধরে তিনি দেখিয়েছেন আকারে ক্ষুদ্র গল্পটি ব্যাপ্তিতে মহাকাব্য তুল্য, বাৎসল্য রসের অত্যুচ্চ প্রকাশ এখানে ঘটেছে। "গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে এত ঘটনার বাহুল্য আছে যে, ইহার প্রত্যেক চিত্র একটি মহাকাব্যের অধ্যায়ের মতো...ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিতে যেন বাল্যলীলার একটা জগৎ আমাদেব চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে।"

হৃদয়ানুভূতি ঢেলে দীনেশচন্দ্র বলতে চেয়েছেন, 'রামের সুমতি' 'বোধহয় লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প'। অন্য লেখকদের রাশি রাশি ছোটগল্পের করুণরস এই গল্পের তুলনায় 'সিন্ধুর নিকট বিন্দু'। কেবল নিজেই পড়াই যথেষ্ট মনে করেন নি দীনেশচন্দ্র, 'প্রবীণ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে' পড়ে শুনিয়েছিলেন, "তিনি [অক্ষয়চন্দ্র] কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন : 'আপনি আমার চক্ষুপীড়া বাড়াইয়া দিলেন'।"[২০]

বিন্দুর ছেলে

'রামের সুমতি'র তুল্য না হলেও 'বিন্দুর ছেলে' সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের মনোভাব কম আবেগময় ছিলনা। "বহুদিন পরে বাংলা সাহিত্যে শরৎবাবুর ['বিন্দুর ছেলে'] গল্পে সজীব মানুষ দেখিলাম।" বৈষ্ণব পদাবলীমুগ্ধ দীনেশচন্দ্র এই গল্পে বাৎসল্য রসের অনায়াস প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন : "স্নেহের এই অনির্বচনীয়ত্ব, এই গূঢ় গতিবিধি শরৎবাবুর ['বিন্দুর ছেলে'] লেখায় আমরা দেখিতে পাই। বৈষ্ণবদিগের মুখে এই সুর শুনিয়াছি বলিয়া উহা আমাদের কানে এত মিষ্টি লাগিয়াছে।" সেইসঙ্গে সংযত ভাষায় দু-একটি টানে চরিত্রনির্মাণও ওখানে ছিল, 'উহা আদৌ ফেনাইয়া লেখা হয় নাই।'[২১]

'রামের সুমতি'র মতো 'বিন্দুর ছেলে'র পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর মনে হয়েছিল, 'বিন্দুর ছেলে' উচ্চতর শিল্প। 'যমুনা'য় গল্পটি প্রকাশের 'সঙ্গে সঙ্গে লেখকের যশোগানে [রেঙ্গুনের] পাঠকসমাজ আরো মুখর হইয়া উঠিল।'[২২]

পথনির্দেশ

সমালোচক হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ সরকারের উপর শরৎচন্দ্রের আস্থা ছিল। প্রতিদিন কিছু কিছু লেখা 'পথনির্দেশে'র গল্প অফিসের কর্মবিরতির ফাঁকে যোগেন্দ্রনাথকে শুনিয়ে

তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন শরৎচন্দ্র। কখনো কখনো তাঁর পরামর্শও নিয়েছেন। বিশেষত 'পথনির্দেশে'র শেষাংশ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথের আপত্তি মেনে নিয়ে ঐ অংশটি পুনর্লিখন করেছেন। "যেদিন সম্পূর্ণ গল্পটি পুনরায় পড়িবার অবকাশ পাইলাম, সেদিন মনে হইল, ঐন্দ্রজালিকের কাঠির স্পর্শে শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আগাগোড়া গল্পটিকে এমন শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, যাহা এক কথায় বলিতে গেলে —অনুপম। বাস্তবিকই দুইটি নরনারীর চরিত্র লইয়া এরূপ জাদুকরের মতন ভোজবাজি দেখানো বড় সহজ কৃতিত্বের কথা নয়। কোনোরূপ গুরুতর সম্পর্কের বন্ধন উভয়ের মধ্যে নাই—যাহা আছে, সেটি দুজনের উদ্দাম যৌবনের মুখে ফুৎকারের মতো ছিড়িয়া যাইতে কতক্ষণ?" [২৩] কেবল যোগেন্দ্রনাথ নন, এই রচনা সম্পর্কে বাংলাদেশের পাঠকের মতামতও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের চিঠিতে (যোগেন্দ্রনাথের ভাষায় সেটি 'ছোটখাট সমালোচনা') জেনে খুশিতে ডগমগ শরৎচন্দ্র 'গাম্ভীর্যের ভান' সত্ত্বেও 'অন্তরের স্বভাবসুলভ আনন্দটুকু গোপন করতে' পারেন নি। [২৪ক]

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠক। 'পথনির্দেশ' কাহিনীর গতিপ্রকৃতি কি হবে, তা নিয়ে তিনি ঈষৎ আশঙ্কিত ছিলেন। ভয় ছিল, পাছে শরৎচন্দ্র সুলভ মিলনান্ত পরিণতি ঘটান। তা না হওয়ায় তিনি আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে তিনি চিঠিতে লেখেন : "সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়! আপনার 'পথনির্দেশ পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে, অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না। কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে, যে-পথটা বড় তাহা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই।" ('ভারতবর্ষ', মাঘ ১৩২৩)। [২৭খ]

চন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের সংযমবোধ তাঁর তরুণ বয়সের 'চন্দ্রনাথে'ও বর্তমান—এই সিদ্ধান্ত সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেনের। এ গল্প তাঁর এমনই মনোহরণ করেছিল যে পাঠকের হাত ধরে গল্পের অন্দরমহলে তিনি নিয়ে গেছেন। "ইহাতে লেখকের অসামান্য সাহিত্যিক বুদ্ধি ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।" গল্পের অন্তিমে চন্দ্রনাথ-সরযূর মিলন বর্ণনায় যে-ভাষা দীনেশচন্দ্র প্রয়োগ করেছেন, তাতে সন্দেহ হয় সমালোচক স্বয়ং বুঝি ঐ অশ্রুময় মিলন-পরিবেশের সাক্ষী ছিলেন! "শরতের রাত্রিতে যেরূপ ফুলের পাপড়ির উপর ধীরে ধীরে নীহার জমিয়া উঠে, এই মিলনচিত্রে সেইরূপ করুণরস ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের কোনো স্থানে এ ভাবের সংক্ষিপ্ত রচনায় করুণ রসের এরূপ অপর্যাপ্ত মুক্ত পরিচয় আর পাই নাই।" [২৫]

'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকাতেও 'চন্দ্রনাথে'র বেশ প্রশংসা : "ইহা শরৎবাবুর গৌরব ও কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।" ('১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ', 'মানসী ও মর্মবাণী', কার্তিক ১৩২৩)।

এমন কি মোহিতলাল মজুমদারের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকও 'চন্দ্রনাথে'র শেষাংশের অপর্যাপ্ত প্রশস্তি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে কাবুলিওয়ালার

ব্যথার সঙ্গে 'চন্দ্রনাথ' গল্পের কৈলাসখুড়োর ব্যথার তুলনা ক'রে তিনি লিখেছেন : "['চন্দ্রনাথ'] উপন্যাসখানির শেষের দিকে এই যে চিত্রটি ফুটিয়াছে, তাহাতে মূল কাহিনী ম্লান হইয়া গিয়াছে। এ কি শুধু বাস্তবের তীব্র অনুভূতি? কত বড় রস-কল্পনার প্রমাণ ঐ চিত্রটি! ইহার সঙ্গে একদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির তুলনা করা যায়। 'কাবুলিওয়ালা'র ব্যথা বিশ্বজনীন হইয়া এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিয়াছে বটে, তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের করুণ রস যেন আরো গভীর, আরো উজ্জ্বল।" [২৬]

তথাপি একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ব্যথার অনুভূতি ক্ষেত্রে কাবুলিওয়ালার ব্যথা ও কৈলাসখুড়োর ব্যথার যে-তুলনাই মোহিতলাল করুন না কেন, সে তুলনা খুবই আংশিক। কেননা 'কাবুলিওয়ালা' নিখুঁত সৃষ্টি, 'চন্দ্রনাথ' কাঠামোগতভাবে অত্যন্ত অসংলগ্ন।

বিরাজ বৌ

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কয়েক মাসের ব্যবধানে 'কল্লোল'-'কালিকলম' পত্রিকায় 'বিরাজ বৌ' সম্পর্কে দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। 'কল্লোলে'র রচনাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'কালিকলমে' 'বিরাজ বৌ'-র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্য কয়েকটি রচনাও আলোচিত। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থেও এ-বিষয়ে মন্তব্য আছে। যোগেন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রথমে দেখা যাক।

'বিরাজ বৌ' পড়ে মুগ্ধ যোগেন্দ্রনাথ একটি আপত্তি তুলেছেন। সে আপত্তি, তাঁর মতে, রেঙ্গুনের বাঙালি সমাজেরও—'বিরাজের ঐ সাময়িক অধঃপতন' কেউই সহ্য করতে পারেন নি। অবশ্য গ্রন্থকার শরৎচন্দ্র পাঠকের ঐ মত ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে যোগেন্দ্রনাথকে বলেছেন : "সংসারে অসম্ভব বলে কিছু নেই। যারা শেকসপীয়র পড়েছে ভালো ক'রে, তারা একথার উত্তর দিতে পারবে বেশি ক'রে।" [২৭]

সংক্ষেপে বিরাজ বৌ চরিত্রের রেখাঙ্কন করেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : "আমাদের ঘরের কোলেই 'বিরাজ বৌ'-এর বাস, কিন্তু সেই চির পরিচিতের ভিতর 'বিরাজ বৌ' সম্পূর্ণ নূতন—সম্পূর্ণ অসাধারণ।...সে স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিলাসী জমিদারের সঙ্গে গৃহত্যাগী হইল। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার যাহার দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে, তেমন করিয়াই বিরাজ বৌকে তিনি আঁকিয়াছেন।" ('কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনাকে তাঁর ঐ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করায় 'বিরাজ বৌ'-র প্রতি নরেশচন্দ্র এর থেকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন নি।

'বিরাজ বৌ'-এর অন্য সমালোচক অবনীনাথ রায় কিছুটা প্রাচীনপন্থী হলেও বইটির অনুকূল সমালোচক। এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর প্রধান বক্তব্য—'ভারতবর্ষীয় ভাগ্যবাদ' এবং নারীর সতীত্বধর্ম এখানে উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত। "বইখানি একেবারে খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় (eastern)—ইহার মধ্যে পাশ্চাত্যদেশের আদর্শবাদের অথবা ঘটনাবিন্যাসের কোনোরূপ ছায়াপাত নাই।" উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন সমালোচক। দু'একটি উদাহরণ—

"সমস্ত বইখানির মধ্য দিয়া নীলাম্বর এবং বিরাজ বৌ-এর অপরিসীম দুঃখের করুণ কাহিনী স্বচ্ছ বর্ত্তিকার মতো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।"

"[পীতাম্বরের স্ত্রী] ছোট বৌ-এর কথা। এমন একটি মধুর চরিত্র কদাচিৎ চোখে পড়ে।...ছোট বৌ-র স্বভাবে বিনয়বস্তু আশ্চর্যরকম পরিণতি লাভ করিয়াছিল।...কিন্তু এই যে কোমল প্রকৃতির মানুষ, কর্তব্যক্ষেত্রে এও ইস্পাতের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

বিরাজ বৌ কি অনৈতিক চরিত্র? উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ ক'রে অবনীনাথ লিখেছেন, "শরৎচন্দ্রকে যদি কেহ দুষ্কৃতিপ্রচারক বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি ভুল করিবেন। অপরপক্ষে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র খুব বড় taskmaster, বিরাজ বৌ-র ঐ পদস্খলনের জন্য তিনি তাহাকে বড় কম সাজা দেন নাই।" পাছে এ তথ্য যথেষ্ট না মনে হয়, অবনীনাথ ভিক্টর হ্যুগোর উপন্যাসের তুলনা পর্যন্ত টেনেছেন।

'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের চরম রসাবেদন কোথায়—তার দিক্‌নির্দেশ ক'রে অবনীনাথ লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের লেখার আবেদন পাঠকের ইন্টালেকটের কাছে নয়, তার রসবোধের কাছে। "যাঁহারা জীবনে দুঃখের এবং নিরাশার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া সোনা হইয়াছেন, তাঁহারা এই সাহিত্যে এমন এক রসস্রোতের সন্ধান পাইবেন, যাহা সত্য সত্যই অভিনব এবং অমূল্য।" ('বিরাজ বৌ', অবনীনাথ রায়, 'কল্লোল', চৈত্র ১৩৩৫)।

মেজদিদি-দর্পচূর্ণ-আঁধারে আলো

'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার কার্ত্তিক ১৩২৩ সংখ্যায় ('১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ') উপরিউক্ত তিনটি গল্প একত্র সমালোচিত। সমালোচনার পরিমাণ অল্প, নিছক প্রশংসা সেখানে ছিলনা। আলোচকের মতে 'মেজদিদি' গল্পটি শরৎচন্দ্রেরই 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'র 'হুবহু অনুকরণ'। বাকি 'দর্পচূর্ণ' 'গল্পটির প্রথমাংশ বেশ সুন্দর, শেষটা লেখক বড়ই তাড়াতাড়ি করিয়া সারিয়াছেন।' 'আঁধারে আলো' গল্পের 'উপসংহার ভাগ উজ্জ্বল'। কিন্তু নীতিবাদী আলোচক গল্পের প্রারম্ভে পতিতালয়ের ছবি দেখে শিউরে উঠে গালমন্দও করেছেন : "গোড়ার অংশটি জঘন্য রুচির পরিচায়ক।"

স্বামী

'স্বামী' গল্প প্রকাশের অনতিবিলম্বে 'ভারতী' পত্রিকার কার্ত্তিক ১৩২৪ সংখ্যায় ঐ নামেই লিখিত সমালোচনার বড় অংশে ছিল গল্পটির সংক্ষিপ্ত রূপ। কারণ গল্পটির সঙ্গে অপরিচিত পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে বিষয়বস্তুর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করা সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর উদ্দেশ্য। অজিতকুমার লিখেছেন : "এমনটি যে এদেশে ঘটে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। [তবে] সাহিত্যের মস্ত ভরসা এই যে, 'যা ঘটে তা সব সত্য নহে।'...ঔপন্যাসিকের কল্পনায় যাহা সত্য, তাহা বাস্তব সত্যের চেয়ে

সত্যতর।" এই কৈফিয়তের সঙ্গে ছিল গল্পটি তাঁর ভাললাগার কারণ : "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনের কোথাও কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা, অথচ শেষ কালটাতে মিলনটা সত্য সত্যই ঘটিয়া উঠিল, তাহা কোনো সামাজিক সংস্কারের তাড়নায় ঘটে নাই। সমস্ত গল্পটার ভিতরকার অভিব্যক্তি হইতেই গল্পের পরিণামটা অমনি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত সৌদামিনীকে কোথাও কৃত্রিম সতী বানাইবার চেষ্টামাত্র করেন নাই।" অজিতকুমার বলতে চেয়েছেন শান্ত নিরুচ্চার প্রেম মানুষের অজ্ঞাতে তার প্রতিরোধের দেওয়ালে ফাটল ধরিয়ে দেয়। 'স্বামী' গল্পে তারই ফলিত রূপ।

দত্তা

'দত্তা' উপন্যাসের সাধারণ সাহিত্যিক আলোচনার পরিবর্তে, ঐ উপন্যাসে বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অবমাননা শরৎচন্দ্র সত্যই করেছেন কিনা, তা বিচার করতে অগ্রসর সমালোচক রমা নিয়োগী। শরৎ-প্রয়াণের কয়েক বছরের মধ্যে আশ্বিন ১৩৪৯-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শরৎসাহিত্য কি ব্রাহ্মবিদ্বেষী' প্রবন্ধ লিখে সমালোচক প্রমাণ করতে চেয়েছেন—শরৎচন্দ্র সত্যই তা নন। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের ধারাবাহিক অভিযোগের (শরৎচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাহ্মচরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়েছেন) প্রতিবাদে লিখিত এই সমালোচনার ভাষা তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ এবং যুক্তির পারম্পর্য সেখানে বর্তমান। শরৎচন্দ্রের পক্ষে এটি সত্যকার জোরালো লেখা।

রমা নিয়োগীর আলোচনার একাংশে ছিল রাসবিহারী চরিত্রের বিচার, অন্য অংশে দয়ালের মতো উজ্জ্বল ব্রাহ্ম চরিত্র, এবং কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও বিলাসবিহারীর পক্ষ সমর্থন। সমালোচক লিখেছেন : "ধর্মের ভোল আমরা বদলাই বটে, কিন্তু ভিতরে থেকে যায় সেই অনুদার বিকৃত দৃষ্টি।...উপন্যাস পড়তে গিয়ে তাই তার চরিত্রগুলিকে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মবিভাগে না ফেলে ব্যক্তিগত চরিত্রের তারতম্য অনুসারে এক একটি মোটামুটি type বা শ্রেণীতে ফেলে বিচার করতে বসলে ভুল হবার আশঙ্কা অর্ধেক চলে যায়।...রাসবিহারী চরিত্র আগাগোড়া আলোচনা করলে দেখা যায় ব্রাহ্মধর্মের কণামাত্রও তাঁর মধ্যে নেই, তিনি ব্রাহ্মধর্মের মুখোশধারী কুচক্রী ভণ্ড শয়তান মাত্র—ধর্মোচ্ছ্বাস তাঁর বাইরের ছদ্মবেশ মাত্র, তারই আড়ালে আত্মগোপন ক'রে তিনি নেকড়ে বাঘের মতো ওৎ পেতে বনমালীর জমিদারীর উপর চোখ রেখে বসেছিলেন।"

রাসবিহারীর মতো 'ভণ্ড প্রতারক' বিলাসবিহারী নয়। সমালোচকের মতে, বিলাসবিহারীর জীবনের 'পরম সত্য' বিজয়াকে ভালবাসা। তা যখন ব্যর্থ হলো তখন উপন্যাস থেকে তার নিঃশব্দ প্রস্থান। "তার বেদনা, সান্ত্বনাতীত হতাশাকে শেষ মুহূর্তে স্তব্ধ যবনিকার অন্তরালে রেখেই তার...প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা [শরৎচন্দ্র] দেখিয়েছেন, ব্রাহ্ম বলে বিলাসের উপর এতটুকু অবিচারও...করেন নি।"

অন্যদিকে দয়াল নিঃসংশয়ে মহৎ চরিত্র। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য তিনি, বৈষয়িক প্রাপ্তি তাঁর যথেষ্ট কম। "কিন্তু তাঁর কাচের মতো স্বচ্ছ মনটি ছিল সহজ সত্যের আলোয়

প্রতিভাত, তখন নরেনের মুখে [শরৎচন্দ্র] তাঁকে মানুষ হিসাবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।"

'দত্ত' সম্পর্কে রমা নিয়োগীর এই বক্তব্য 'গৃহদাহ' সম্পর্কেও প্রসারিত। একটু পরে তা দেখব।

গৃহদাহ

'গৃহদাহ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিশেষ মমত্ব। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি এমনই উৎসাহ দেখিয়েছেন যে, অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের মনে হয়েছিল " 'গৃহদাহ'ই শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয়।" [২৮] শরৎ-সমালোচকদের অনেকে অবশ্য শরৎচন্দ্রের মতে সায় দিয়ে এটিকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলতে পারেন নি। হেমেন্দ্রকুমার রায় স্পষ্টই বলেছেন, "ঐ উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের মধ্যেও উচ্চস্থান অধিকার ক'রে নেই।" [২৯] 'শনিবারের চিঠি' কিছু অন্যভাবে খোঁচা দিয়েছে। মাঘ-পৌষ ১৩৩৫ সংখ্যায় ('কেন ফিরাইলাম') শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের সঙ্গে কাল্পনিক সাক্ষাতের বিবরণ দেওয়ার সময় অচলার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "অচলাকেও আমি চিনি। ডিহিরিতে 'রাক্ষুসী'র বাড়িতে সেবার ঘণ্টাদুয়েকের জন্য আলাপ হয়েছিল। মহিমের সঙ্গে আর তার পুনর্মিলন হয়নি বলে দুঃখ করছিল।" অচলার দুঃখে ছদ্ম দুঃখপ্রকাশও 'শনিবারের চিঠি'র এই লেখাটিতে আছে, "মেয়েটির আর সবই ছিল, কিন্তু দুঃসাহস নেই। জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ এরা তো ক'রেই, অপরকেও করায়।"

রমা নিয়োগীর 'শরৎসাহিত্য কি ব্রাহ্মবিদ্বেষী' ('ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩৪৯) লেখাটি পুনরায় স্মরণ করছি। 'দত্তা'র 'বিজয়া'র মতো 'গৃহদাহ'র অচলাকেও বিশেষভাবে ব্রাহ্ম মনে করেন নি সমালোচক। সে "পৃথিবীর যে-কোনো ধর্মাবলম্বী হতে পারত। কারণ ধর্মের প্রভাব তার জীবনে পড়েনি। অচলা চরিত্রে দেখানো হয়েছে একটি অস্থিরমতি হঠকারী, ভ্রমপ্রবণ দুর্বল শ্রেণীর চরিত্রের পরিণতি। এই শ্রেণীর চরিত্রের এইরকম বিকাশ ও পরিণতি আমাদের তৃপ্তি দেয়না।" অন্যদিকে অচলার পিতা কেদারবাবু 'সুবিধাবাদী' মানুষ। তাঁর মধ্য দিয়ে "আমাদের সামনে ভেসে ওঠে একটি সংকীর্ণ স্বার্থপর সন্দিগ্ধমতি দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্রের ছবি। তবু যে অবর্ণনীয় লজ্জা, দুঃসহ বেদনার ভেতর দিয়ে তাঁকে এসবের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল, তা মনে করলে আমরা তাঁকে অনুকম্পা করুণা না ক'রে পারিনা।"

রমা নিয়োগীর ঐ আলোচনায় একটি প্রতিপ্রশ্নও চোখে পড়ে। হিন্দুদের ভণ্ডামীও যথেষ্ট পরিমাণে শরৎচন্দ্রের রচনায় থাকায় তাঁকে কি হিন্দুবিদ্বেষী বলা যায়? "অথচ শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য আর কিছু হতে পারেনা।" রমা নিয়োগীর এই মন্তব্যের সত্যতা স্বীকার ক'রে বলব, হিন্দুসমাজের নানা দোষ ত্রুটি উন্মোচনের কালে শরৎচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, ঐ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের নেতিবাচক দিক চিহ্নিত না করলে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর নিরপেক্ষতা থাকবে না। 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ' সেই অনুভবের বাস্তব রূপায়ণ মাত্র।

শেষের পরিচয়

আষাঢ় ১৩৩৯ থেকে বৈশাখ ১৩৪২ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কিছু বিচ্ছিন্নভাবে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি অসমাপ্ত থেকে যায়, যদিও শেষ কিস্তি লেখার পরে আরো তিন বছর শরৎচন্দ্র জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক ও অন্যান্যদের অনুরোধে রাধারানী দেবী 'শেষের পরিচয়' শেষ করেন। স্বভাবতই 'শেষের পরিচয়' সম্বন্ধে সমালোচকদের বিশেষ আগ্রহ ছিলনা। তবে যে-আলোচকেরা এটিকে বিচারযোগ্য মনে করেছেন, তাঁরা এর গুরুত্বের কথা ভেবেই তা করেছেন। সুশৃঙ্খল, সচ্ছল সংসার ছেড়ে কেন একজন নারী কুলত্যাগ ক'রে, তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ শরৎচন্দ্র এখানে খুঁজেছেন বলে সমালোচকদের অভিমত।

অগ্রহায়ণ ১৩৪৯-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শেষের পরিচয়'-এর আলোচনায় ("শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়") রাধারানী দেবী লিখিত অংশটুকুও বিবেচনাভুক্ত করেছিলেন। সেই অংশ সম্পর্কে মণীন্দ্রনাথের মত বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দেখব। এই উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র সবিতা এবং ব্রজবাবু সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য :

"সবিতার জীবনে দেখা যায় তিনি স্বামীর গৃহে সকল তৃপ্তিই লাভ করিয়াছিলেন ; কেবল যৌবনের উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব ছিল বলিয়াই তাঁহার পতন হইয়াছিল। ...মানবমনের অন্তলবিহারী, মনঃসমীক্ষক ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র রমণীবাবুর প্রসঙ্গে সবিতার উচ্ছ্বসিত যৌবনপিপাসাকে ভদ্র আবরণ দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।"

"ধর্মভীরু ও সত্ত্বগুণাদর্শ মধ্যবয়স্ক...ব্রজবাবু...গোবিন্দের সেবা করেন, প্রকৃত বৈষ্ণব হইবার জন্য মনে প্রাণে সাধনা করেন,...আপাতদৃষ্টিতে বলা যায়, ব্রজবাবু দুর্বল, যখন যাঁহার নিকট থাকেন, তখন তাহার নিকটই অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসেন, একাধিক নারীর তিনি পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীর উপযুক্ত মর্যাদা বা সম্মান তিনি কাহাকেও দিতে পারেন নাই। স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন না। তিনি হিন্দুশাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। ইহা তাঁহার জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল এবং ধর্মজগতের ছাত্র হিসাবে নিছক ঔচিত্যানুচিত্যের বিচার করিয়াই তাঁহার সকল কর্তব্য সম্পাদন করিতেন।"

প্রধান দুই চরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্রদেরও মণীন্দ্রনাথ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিচার ক'রে দেখাতে চেয়েছেন তাদের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে কোন শেষের পরিচয় পায়া যায়। শেষত মৃত শরৎচন্দ্রের দিকে তীর ছুঁড়েছেন। উপন্যাসের সূচনায় সবিতার গৃহত্যাগ প্রসঙ্গে তারকের সংলাপ : 'একখানা ইংরেজি উপন্যাসের আভাস পাচ্ছি।' ঐ উপন্যাসের নাম মণীন্দ্রনাথের জানা ছিলনা এবং ব্রজবাবুর চরিত্রে বিদেশী প্রভাব দেখতেও তিনি রাজি ছিলেন না ("ব্রজবাবু এমনভাবে বাংলার নিজস্ব চরিত্র এবং উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস এমনইভাবে আমাদের ঘরের জিনিস যে, ইহাতে কোনো অনুকরণ থাকা সম্ভব নহে।")। 'শেষের পরিচয়ে' ইংরেজি চলতি বাক্যের অনূদিত আকারে বাংলা বাক্যমধ্যে প্রবেশ দেখেও ('এযে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা!')

মণীন্দ্রনাথ বিরক্ত। 'এরূপ উৎকটভাবে ইংরেজি অনুকরণ' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য : "শরৎবাবুর কি বৃদ্ধ বয়সে অতি আধুনিকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল নাকি?"

"এখানে তিনি [শরৎচন্দ্র] তাহাদের [পতিতা রমণীদের] জীবনের মৌলিক প্রশ্ন আলোচনা করিয়াছেন—ইহাদের পদস্খলন হয় কেন এবং সেই পদস্খলন ইহাদের জীবনের বা চরিত্রের উপর রেখাপাত ক'রে কিনা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই ['শেষের পরিচয়'] উপন্যাস সত্য সত্যই শরৎচন্দ্রের শেষ পরিচয় দেয়।" এই মন্তব্য সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের। তাঁর মতে উপন্যাসটির বক্তব্য যদি অতি নাটকীয় মনে হয় তাহলে উপন্যাসটির অসমাপ্তি তার কারণ। যেটুকু পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে সুবোধচন্দ্র মনে করেছেন, স্বামীর প্রতি 'একনিষ্ঠ ভক্তি' থাকা সত্ত্বেও সবিতার কুলত্যাগের কারণ যৌন আকর্ষণ। "স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে যৌন আকর্ষণ, তাহার সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতির সম্পর্ক কম, ইহাকে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা অসম্ভব।" এবং "নারীর হৃদয়ের রহস্যের ঠিক এই দিকটা শরৎচন্দ্র অন্য কোনো উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত করিতে চেষ্টা করেন নাই।" [৩০]

অসমাপ্ত 'শেষের পরিচয়' কিভাবে সমাপ্ত হতো, তার কথা শরৎচন্দ্রের মুখে রাধারানী শুনেছেন বলে জানিয়েছেন। সেই শ্রুতির উপর নির্ভর ক'রে তিনি 'শেষের পরিচয়ে'র পরিশিষ্ট রচনা করেন। শরৎচন্দ্রের কথা সত্য হলে ধরে নিতে হবে, শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্বর রাধারানী নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন। রাধারানী বলেছেন : "এই রকম লেখা আমি কি এখন লিখতে পারব? না। কখনোই পারব না। এইরকম ভাষাভঙ্গি তো নয়ই, এর ভিতরকার বস্তু যা আছে, এখানেও তো আমার নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই। এর মতামত আমার নিজের মতামত নয়, উচ্চারণও আমার নিজের নয়।"

রাধারানীর মনে হয়েছিল, সবিতা চরিত্রটি দুভাবে ব্যাখ্যেয়। প্রথমত গভীর অভিমানাহত নারীর দিক থেকে, দ্বিতীয়ত ঐ নারীর যৌন সমস্যার দিক থেকেও। প্রথম সূত্রটির ব্যাখ্যা রাধারানী পেয়েছেন শরৎচন্দ্রেরই কাছে। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "এমনও তো হতে পারে লোকটি [রমণীবাবু] অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অসুস্থ মানুষের তদারকে যে-কোনো মানুষ যে-কোনো লোকের ঘরে ঢুকতে পারে—সবিতার মতো নির্ভীক মেয়ে রমণীবাবুর কোনো তদারকের জন্যে বেশি রাত্রেও ঘরে ঢুকতে ভয় না পেতে পারে...।" তার ফল বাড়িসুদ্ধ লোকের সামনে দিয়ে রমণীবাবুর হাত ধরে সবিতার বেরিয়ে যাওয়া। "হয়তো.বা তার [সবিতার] নিজের স্বামীর উপর নির্ভরতা এতই ছিল, যাতে সে ভেবেছিল অতিথির প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তার [ব্রজবাবুর] প্রবল অভিমানী স্ত্রী নিজেকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে—এটা স্বামী কখনোই ঘটতে দিতে পারেন না নিজে উপস্থিত থেকে।" সেদিন তা না হওয়ায় প্রবল অভিমানিনী সবিতার গৃহত্যাগ। ব্যাপারটিকে আরো সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা ক'রে রাধারানী বলেছেন, শরৎসাহিত্যে নারীর জীবনের বাইরের স্তর আর ভিতরের স্তরের রূপ উদ্‌ঘাটিত। দেখা গেছে পুরুষেরা বাইরের স্তরেই খেলা ক'রে, অন্তর্গহ্বনে তাদের প্রবেশাধিকার প্রায় নেই। ফলে নারীকে বোঝার ভুল পুরুষের হয়। তাই 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে "সবিতার চরিত্রেও একটি নিঃশব্দ অথচ প্রবল অভিমান সক্রিয়।"

সবিতা চরিত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি প্রথম ব্যাখ্যার অনুবর্তী। রাধারানী বলেছেন, "যৌনতা মানুষের জীবনের এমনই একটি অস্পষ্ট, রহস্যময় আবৃত দিক—যা মানুষের নিজের কাছেও হয়তো সব সময়ে স্পষ্ট নয়, যার জন্য আপাদমস্তক মর্যাদায় মোড়া এই অভিজাত, সৎ, শুদ্ধ অন্তঃকরণের মহিলাটি স্বেচ্ছায় অসতী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন।" ব্রজবাবুর প্রতি সবিতার মমতা কিংবা যথোচিত ভক্তি থাকলেও, রাধারানী বলতে পারেন নি, শ্রদ্ধা ছিল। উল্টোদিকে রমণীবাবুর সমস্ত কিছু সবিতার কাছে ঘৃণ্য হলেও যে মিলন-সূত্র উভয়ের মধ্যে ছিল, তা প্রেম নয়, এমন কি তা 'যৌনতার শান্তি'-ও নয়, তা স্বামী ব্রজবাবুর প্রতি গভীর অভিমানজাত, ব্রজবাবুর নিজের 'ভুল সংশোধনের উপায়হীনতার জন্য' রমণীবাবু-সবিতার মধ্যে রচিত ঐ ক্লীন্ন সেতু।[৩১ক]

'শেষের পরিচয়' সম্পর্কে রাধারানী বা অপর কোনো সমালোচক একটি কথা বলেন নি যা শরৎচন্দ্রের পাঠক হিসাবে আমার ক্রমে দৃঢ় হয়েছে—'শেষের পরিচয়'-এর খণ্ডিত রূপ কি শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত? নচেৎ 'শেষের পরিচয়'-এর পনেরো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখার পর, শরৎচন্দ্র তিন বছর কাটালেও তা সমাপ্ত করেন নি কেন? তাঁর তবে কি আশঙ্কা হয়েছিল—নারী বিষয়ে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত 'শেষের পরিচয়'-এ প্রকাশিত—পাঠক এই ধারণায় পৌঁছে যাবে? তাঁর সমকাল বিশেষত পরবর্তীকালের পাঠককে সেই সুযোগ তিনি দিতে চাননি বলেই কি 'শেষের পরিচয়' অসমাপ্ত রেখে গেলেন? ঘটনার ধারা যেদিকে চলছিল, তাতে মনে হতে পারে, 'নারীর মূল্যে'র লেখক, 'শেষ প্রশ্নে'র লেখক শরৎচন্দ্র নারীর শেষের পরিচয় হিসাবে নারীর যৌন-স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ব্যাপারটি তাঁর সামগ্রিক লেখক-চরিত্রের পক্ষে মারাত্মক। চিরন্তনী মাতৃমূর্তির এই বন্দিত রূপকার শেষ বয়সে চিন্তার এমন উলটপুরাণ রচনা করবেন—ব্যাপারটি বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্র 'শেষের পরিচয়ে'র অনেকখানি লেখার পরে চিত্তসংকটে পড়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এতাবৎ গঠিত ধারণার এতবড় বিপর্যয় ঘটাতে সম্ভবত তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। রাধারানী দেবীর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর সে ধরনের মনোভাব দেখা যায়। রাধারানীর স্মৃতি অনুযায়ী শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসেও শেষ পর্যন্ত নারীর মাতৃমূর্তিকেই স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।[৩১খ]

'শেষের পরিচয়' বাংলা সাহিত্যে মোনালিসার হাসি।

নারীর মূল্য

'যমুনা' পত্রিকার বৈশাখ-আশ্বিন ১৩২০ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'নারীর মূল্য' এক দশক পরে ১৯২৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। পত্রিকা এবং গ্রন্থ উভয় ক্ষেত্রেই প্রবন্ধটি আলোড়ন তুলেছিল। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া দেখে নেব।

'নারীর মূল্য' গ্রন্থ প্রকাশের পর অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে শরৎচন্দ্র জানিয়েছেন, "মেয়েদের মধ্যে...আত্মসম্মান জাগাবার জন্য' তিনি ঐ প্রবন্ধটি লিখেছেন। "চিরদিন পিছনে থেকে ওদের অস্তিত্বই এমনি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ওরাও যে সমাজের মানুষ

—ওদেরও যে পৃথক সত্তা আছে, একথা আর ওদের নিজেদেরই মনে ছিলনা।" এর উত্তরে অবিনাশচন্দ্রের কাছে যে-কথা শরৎচন্দ্র জেনেছেন, তা তাঁর শিরে সর্পাঘাতের তুল্য। নারীর অধিকারবোধ আজ এমনই জাগ্রত যে তাঁরা 'বাতায়ন' পত্রিকায় চিঠি লিখে জানাতে দ্বিধা করেন না, "তাঁরা বাঙালি পুরুষদের দেহ দেখে ঘৃণা অনুভব করেন,...যদি তাঁদের সকল সময়ে পুরুষ বাছাই ক'রে নেবার অধিকার থাকত, তাহলে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ বিদেশী পুরুষদের বাছাই ক'রে নিতেন।" শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া সুকঠিন। অত্যন্ত ধীরে তিনি অবিনাশচন্দ্রকে বলেছেন, "...উত্তর লিখব আমি। তুমি আমায় সব কাগজগুলো আজই...দিয়ে যাবে।" [৩২]

সে উত্তর লেখা হয়ে ওঠেনি। উত্তেজনার প্রশমনের পর শরৎচন্দ্র হয়তো ভেবেছেন, তাৎক্ষণিক উত্তর-পত্র তাঁর পক্ষে অশোভন। তিনি উত্তর দেবেন অন্যভাবে। এবারে লিখবেন 'পুরুষের মূল্য'। রাধারানীকে তেমনই বলেছেন তিনি—

"নারীর মূল্য লিখেছিলুম অভিজ্ঞতা কাঁচা থাকতে। একপেশে নজর নিয়ে। এর পালটা দিকটাও আছে।...আমি পুরুষের মূল্যও লিখে যাব।...পুরুষ নিপীড়িত হয় মেয়েদের কাছে ভেতর থেকে। সেটা অনেক বেশি নিষ্ঠুর। সেটা চোখে দেখা যায়না, অদৃশ্য। এখানে ওদের [মেয়েদের] নির্মমতা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতি ওদের হাতে এমন অনেক অস্ত্র দিয়েছে, যা ব্যবহার ক'রে ওরা পুরুষকে নির্বীর্য নির্বীজ ক'রে দেয় অনায়াসে।" [৩৩]

শরৎচন্দ্রের 'পুরুষের মূল্য' রচিত হলে, জানিনা তার ফলে নারীপুরুষের কোন্ নতুন বিরোধ বাধত, এবং শরৎচন্দ্রের 'নারী-দরদী' শিরোপা খসে পড়ত কিনা?

'যমুনা পত্রিকায় 'নারীর মূল্য' পড়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব বিশেষ প্রশংসার। আসন্নপ্রকাশ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক-তালিকায় শরৎচন্দ্রের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের তিনি অনুরোধ করেছেন, " 'নারীর মূল্য' অমূল্য। তোমরা এ লেখককে হাত করবার চেষ্টা করো।" [৩৪]

'নারীর মূল্য' সম্বন্ধে অন্নদাশংকর রায়ের প্রশংসা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধের নামেই 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩১ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, "...fact, fiction-এর মতো চিত্তাকর্ষক হবে না, যদি না তার সঙ্গে থাকে আকর্ষণী শক্তিবিশিষ্ট ভাষার আবরণ। Fact যে কত সরেস হতে পারে, যুক্তিতথ্যের কঙ্কালে কতখানি প্রাণসঞ্চার করা যেতে পারে, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য'।"

অন্নদাশংকরের সমালোচনাটির বৈশিষ্ট্য, শরৎচন্দ্রের রচনার নানা স্থান উদ্ধৃত ক'রে প্রয়োজনে নিজ মন্তব্য যোগ করা। সেসবের মধ্যে আছে—'নারীর relative মূল্যই পুরুষের নির্ভর'; এই প্রবন্ধ 'সমস্ত পৃথিবীর নারীজাতির দুর্দশার ইতিহাস, পুরুষের কলঙ্কের কাহিনী'; পুরুষের সুখ ও সুবিধার দিক থেকে নারীর সতীত্ব ও তার স্বাভাবিক পরিণতি সহমরণ, এই প্রবন্ধে চোখে পড়ে; বিধবাকে জোর ক'রে দেবী করা হয়েছে পুরুষের স্বার্থে; সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার কিছু পালিশযুক্ত হয়েছে—'প্রবৃত্তি হয়েছে প্রেম, খাটুনি হয়েছে গৃহকর্ম আর সম্পত্তি হয়েছে বিবাহের একতরফা অধিকার' (অন্নদাশংকর অবশ্য স্বীকার করেছেন ক্রমবিকাশের ধারানুযায়ী

নারীর ঐ অবস্থার কিছু উন্নতিও হয়েছে, কেবল নামের পরিবর্তন হয়নি)।

'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নারীর রূপ সংক্রান্ত বক্তব্য অন্নদাশংকরের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচনার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কেননা 'বইখানিতে যত ভাববার কথা আছে, [এটি] তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' অবশ্য শরৎচন্দ্রকে সঠিক 'interpretation' করতে পারবেন কিনা, এই সংকোচও তাঁর ছিল। অন্নদাশংকরের মত, "নারীর আসল মূল্য হচ্ছে রূপ।...বাহুবলের মতো রূপেরও অনেক সুবিধা আছে। অতি বড় দুর্দান্ত অত্যাচারীও রূপের কাছে মাথা নত ক'রে।...রূপকে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা চিরকাল ঘৃণা ক'রে এসেছেন।...[নারীর] এই রূপ বা বলের উন্নতি করতে হলে 'কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা ও প্রশস্ত স্থান অত্যাবশ্যক'।"

'নারীর মূল্য' বইটিকে সংস্কারমুক্ত চিন্তাশীল নবীনের দল ভালবাসবেন বলে তাঁর আশা। লেখকের সম্পর্কে অন্নদাশংকরের অনুযোগ ছিল—'বইখানা বড্ড ছোট'। আব অভিযোগ এই, অনিলা দেবীর নামে লেখা প্রবন্ধে নারীর চোখ দিয়ে নারীর সমস্যাকে দেখবার চেষ্টা শরৎচন্দ্র করলেও 'যেখানে নারীর দোষ দেখেছেন, সেখানে এমন কঠোর ভাব অবলম্বন করেছেন যে, কোনো নারীই তা পারতেন না।' অন্নদাশংকরের সত্যকার অভিযোগ অবশ্য অন্য। শরৎচন্দ্র বারবার আমেরিকান মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল বলেছেন। তার কঠোর প্রতিবাদ ক'রে অন্নদাশংকর বলেছেন, আমেরিকান পুরুষেরা অন্যদেশেব পুরুষদের মতোই উচ্ছৃঙ্খল। তাছাড়া পৃথিবীর নানা দেশের নারীরা 'অল্পবিস্তর শৃঙ্খলিত' বলেই আমেরিকান মেয়েদের ঐ রকম মনে হয়। অন্নদাশংকবের এই বাগবাহুল্যের মূলে কি এই ঘটনা—তিনি নিজে আমেরিকান মহিলাকে বিবাহ করেছেন? গৃহ এবং গৃহিণীব মর্যাদা রক্ষায় পুরুষদেব যোদ্ধৃরূপ ধরতেই হয়।

॥ ৪ ॥

সম্মুখ সমরে শরৎচন্দ্র : বিষয় নীতি-দুর্নীতি ও অন্যান্য

মৌলিক সাহিত্যিকের ভূমি থেকে কিছু সরে এসে প্রবন্ধচর্চায় শরৎচন্দ্রের আগ্রহ দেখে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন কয়েকজন নীতিবাদী প্রাবন্ধিক। ইতিমধ্যে তাঁদের ধারণা হয়েছিল দুর্নীতিগ্রস্ত সাহিত্য লিখে দেশের মানুষকে (বিশেষত যুব সম্প্রদায়কে) নরকস্থ হবার পথ দেখাচ্ছেন শরৎচন্দ্র। সেই তিনি যদি এখন প্রবন্ধের মাধ্যমে স্বভূমি সমর্থন করেন, তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত সাহিত্যচর্চার চার পোয়া পূর্ণ হয়ে বাকি কোথায়! সুতরাং প্রতিবাদ শুরু হলো। শরৎচন্দ্রও ছেড়ে দেবার মানুষ ছিলেন না বলে আসরে নেমে পড়লেন। পরিণাম : কলমের শরজালে এবং উভয় পক্ষের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে আচ্ছন্ন সাহিত্যের আকাশ!

বিতর্ক শুরু করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে। ওখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কাউকেই রেয়াত করেননি। এঁদের উপন্যাস দুর্নীতিপূর্ণ এবং কলুষিত, তা প্রমাণে যতীন্দ্রমোহনের দারুণ যথেষ্ট তৎপরতা। সে লেখার প্রতিবাদ করেছিলেন মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী 'সাহিত্যে নৈতিকতা' ('ভারতী', চৈত্র

১৩২৯) প্রবন্ধে। সাহিত্যের নৈতিকতা সম্বন্ধে মহীতোষকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ : "সাহিত্যের নৈতিকতা তাহার বিষয়ের উপর নহে—বিষয়ের বিবৃতি-ভঙ্গীর উপরই নির্ভর ক'রে।...দুঃখের বিষয় এই কথা না বুঝিয়া যতীন্দ্রবাবুর মতো আরো কেহ কেহ সাহিত্যে পাপমাত্রকেই পরাজিত ও পুণ্যকে জয়যুক্ত করিয়া, পাপীর দণ্ড এবং পুণ্যবানের পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।...ইহা না হইলে ইঁহাদের মতে সাহিত্য দুর্নীতিপূর্ণ হয়।" 'গৃহদাহ' এবং 'চরিত্রহীনে'র প্রতি যতীন্দ্রমোহনের আক্রমণকে প্রতিঘাত করেছেন মহীতোষকুমার। অবশ্য দিবাকর-কিরণময়ীর কিছু ঘটনা সমর্থনযোগ্য না হলেও "এই পুস্তকের প্রধান সুর যাহা তাহা সুনীতির, দুর্নীতির নহে।...'অচলা' যে অপরাধ করিয়াছে তাহার মার্জনা নাই,...তবু এই চিত্র উদঘাটন করিয়া লেখক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহা আমরা মনে করিনা।...অচলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হয়না, বরং তাহার অবলম্বিত পথ যে পাপ-পঙ্কিল, এই ধারণাই আমাদের মনে থাকিয়া যায়।"

মহীতোষকুমারের এই প্রবন্ধ রচনার বছর দুয়েক পরে বক্তৃতার আয়ুধ হস্তে শরৎচন্দ্রের আসরে প্রবেশ। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পড়ে তিনি বেশ উত্তেজিত।[৩৭] উপযুক্ত স্থানে উত্তর দেবার অপেক্ষায় অধীর। সেই সুযোগ এলো। স্থির করলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি উত্তর দেবেন। ওখানে বিদ্বৎমণ্ডলীর সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়াও তাঁর তরুণ সাহিত্যিক-বন্ধুদের উৎসাহও দেওয়া যাবে। শরৎচন্দ্র ভালোভাবেই মুখ খুললেন। শুরু হলো নীতি-দুর্নীতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে শরৎ-কেন্দ্রিক বিতর্ক।

ঐ অধিবেশনে (১০ আশ্বিন ১৩৩১) শরৎচন্দ্রের পঠিত 'সাহিত্য ও নীতি' ('বঙ্গবাণী', পৌষ ১৩৩১) নামক ভাষণে ছিল ক্ষুব্ধ অভিযোগ—'পণ্ডিত'রা 'কেতাব' লিখে প্রমাণ করেছেন "বাঙ্গলা ভাষার [আসলে বাংলা সাহিত্যের] আমি একেবারে সর্বনাশ ক'রে দিয়েছি।" আত্মসমর্থনে তাঁর বক্তব্য, কলাকৈবল্যবাদ কথাটি সত্য হলে কিছুতেই তা অকল্যাণকর এবং অনৈতিক হতে পারে না। 'উপন্যাসেব চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙ্গানিতে তার মরা চলে না।' শরৎচন্দ্র দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, যতীন্দ্রমোহন সিংহ যেভাবে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে 'পল্লীসমাজে'র রমাকে বিদ্রূপ করেছেন তা সমাজনীতির অনুশাসন ঘোষণা, সাহিত্যের বিচার নয়।

শরৎচন্দ্রের উপর ইতিমধ্যে খড়্গহস্ত যতীন্দ্রমোহন নতুন আক্রমণের সুযোগ পেয়ে লিখলেন—'আর্টের অনুশাসন' ('মানসী ও মর্মবাণী', চৈত্র ১৩৩১)। সমাজ ও নীতির নিরিখে সাহিত্যের বিচার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি একদিকে নীতি ও সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মূল বক্তব্যগুলির উত্তর দিয়েছেন, অন্যদিকে সাহিত্যের ভিত্তি সম্পর্কে নিজের নীতিবাদী মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। রোহিণীর মৃত্যু সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রবল আপত্তি খণ্ডন ক'রে নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থনে যতীন্দ্রমোহন বলেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্র মোরালিটির মর্যাদা রক্ষার খাতিরে রোহিণীকে গোবিন্দলালের দ্বারা জোর করিয়া মারেন নাই।...গোবিন্দলাল এবং ভ্রমরের চরিত্রবিকাশের জন্য রোহিণীকে হত্যা করিবার প্রয়োজনও ছিল। [শরৎচন্দ্রকে ব্যঙ্গ ক'রে যতীন্দ্রমোহন আরো লিখেছেন] শ্রীকান্ত

যেমন রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আজীবন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিল, গোবিন্দলালের রোহিণীকে লইয়া সেরূপ বেড়াইলে চলিবে কেন? গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের চরিত্রবিকাশের দ্বারা যে বিরাট ট্রাজেডির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সফলতার জন্য রোহিণীর এইরূপ অকালমৃত্যুব প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আর্টের অনুশাসনে, আর্টের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই রোহিণী মরিল। এখানে সমাজনীতির চোখরাঙানি আদৌ নাই।" পুনশ্চ বললেন, রমা চরিত্র যেমন আর্টের বিচারে প্রশংসনীয় নয়, তেমনি 'সুনীতির দিক দিয়াও তাহা দূষণীয়।' যতীন্দ্রমোহনের স্থির সিদ্ধান্ত, সামাজিক নীতির আইন মেনে সাহিত্য রচনা করতে হবে। "আর্ট যদি 'চির সুন্দর' ও 'চির কল্যাণকর'কে প্রকাশ ক'রে, তবে তাহা অবশ্যই [সামাজিক] নীতির [দ্বারা] শাসিত হইবে।" শরৎসাহিত্যে তা ঘটেনি।

এবার শরৎচন্দ্রের জবাব দেবার পালা। চৈত্র ১৩৩১-এ মুন্সীগঞ্জ সাহিত্যসভায় সভাপতির ভাষণে ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি', 'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৩১) তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার ধারাকে সমর্থন ক'রে (সেইসঙ্গে আত্মসমর্থনও ছিল) আবেগভরে তিনি বললেন, " মানবের সুগভীর বাসনা, নরনারীব একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে [আধুনিক সাহিত্যিক] প্রকাশ করবে না তো করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে?" যতীন্দ্রমোহনের নাম না ক'রে বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়ে দিলেন "সতীত্বেব মহিমা-প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য!" অথচ সতীত্বের ধারণা সময়ান্তবে বদলায়। "একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় তো এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"

"যে বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণশক্তি ও সংযম থাকা সমালোচকের একান্ত কর্তব্য, তাহা এই প্রবন্ধে আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না"—শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' রচনা সম্বন্ধে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার ('অভিভাষণ', চৈত্র ১৩৩১) সমালোচকের মন্তব্য। "তাঁহার মতো লোকের নিকট হইতে তাঁহার ও তৎপক্ষীয় তরুণ সাহিত্যিকদের ওকালতি আমরা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে শুনিতে চাহি নাই।" পক্ষপাতদুষ্ট শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সভাপতির আসন কলঙ্কিত করেছেন, এই ইঙ্গিতের সঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য, শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্য ও নীতি' এবং 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' রচনাদুটির মধ্যে আত্মখণ্ডন স্পষ্ট। যেমন, প্রথম প্রবন্ধে যে-শরৎচন্দ্র কলাকৈবলবাদ সমর্থক, সেই তিনি কিভাবে কয়েক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিখলেন—"আর্টের জন্যই আর্ট, একথা আমি পূর্বেও কখনো বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।" সমালোচকের প্রত্যুত্তর : "যদি কথাটার তাৎপর্য আজ পর্যন্ত তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে কয়েক মাস পূর্বে এসব কথা কি তিনি না বুঝিয়া তোতা পাখির মতো শোনা কথা বলিয়া গিয়াছেন?" বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গেও শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা আছে, "জিজ্ঞাসা করি, নবীন সাহিত্যিকদের ভিতর কয়জন বিধবার বিবাহ দিবার সাহস দেখাইয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন? 'চরিত্রহীনে' শরৎবাবু সাবিত্রী বা কিরণময়ীর বিবাহ দেন নাই।" সমালোচকের মতে, শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে 'সৎসাহস' দেখাতে পারেন নি। তাছাড়া সতীত্ব এবং একনিষ্ঠ প্রেমের পার্থক্য করা কিভাবে শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তাও সমালোচকের বোধগম্য হয়নি। "একনিষ্ঠ প্রেম যে সতীর

অন্যতম লক্ষণ, তাহাও দেখিতেছি তাঁহার নিকট নূতন জিনিস।" শরৎচন্দ্রের সমালোচক ভূমিকাকে নস্যাৎ ক'রে 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার এই আলোচক বলেছেন : "দায়িত্ববিহীন সমালোচকের দলে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টা তাঁহার না করাই ভালো।"

কয়েক বছর পরে 'শনিবারের চিঠি' ('কেন ফিরাইলাম', কার্ত্তিক ১৩৩৫) শরৎচন্দ্রকে চিমটি কাটার চেষ্টা করেছিল—শরৎচন্দ্র, সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার ধার ধারেন না, আধুনিক সাহিত্যিকগোষ্ঠীকেও ঐ কাজ করতে তিনি প্ররোচিত করেন। "শরৎচন্দ্রের বাণী এ যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের 'বন্দেমাতরম'। এ বাণী বাংলার সাহিত্যে স্বাধীনতার বাণী। এ বাণী অমর।"

'শনিবারের চিঠি' আক্রমণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬-এর 'নরেশ-নিকষ' রচনাটি পড়লে বোঝা যায়, সমালোচকের হঠাৎ মনে পড়েছিল ১৩৩৪-এ শরৎচন্দ্রের লেখা 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধটি। সুনীতির হাতিয়ার নিয়ে 'নরেশ-নিকষে'র লেখক ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শরৎচন্দ্রের উপর। একাধিক চরিত্র খাড়া ক'রে আদালতের সওয়াল-জবাবের ভঙ্গিতে নরেশচন্দ্রের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ যেমন এখানে আছে, তেমনি দেখানো হয়েছে নরেশচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের রচনায় নীতিহীনতার নানা উদাহরণ। সঙ্গে ব্যঙ্গের ঝাঁঝালো মশলাও ছিল। শরৎচন্দ্রের স্ববিরোধিতা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, "তিনি [শরৎচন্দ্র] তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস-গল্পের বহুস্থলে 'চুম্বন-আলিঙ্গন' ব্যবহার করিয়াছেন, ['সাহিত্যের. রীতি ও নীতি'] প্রবন্ধ লিখিবার সময় সেকথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই।" শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের রচনার নীতিহীনতার পরিচয়ও তুলে ধরেছেন সমালোচক : "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বড়দিদি' গল্পে একজন বিধবা যুবতীকে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর গৃহ-শিক্ষকের সহিত প্রেমে পড়াইয়াছেন,...[নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত] পাঁচটি সন্তানের জননী একটি ভদ্রমহিলাকে তাঁহার ধর্মপুত্রের সহিত প্রেমে পড়াইতে কুণ্ঠিত হন নাই।"

এই তীব্র খোঁচা খেয়েও শরৎচন্দ্র রা কাড়েন নি।

নীতিবাদী সমালোচকদের বিরুদ্ধে কলম উঁচিয়ে দাঁড়ালেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। শরৎচন্দ্র নীতিহীন? সুবোধচন্দ্র সজোরে বললেন, "প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র একজন সম্ভোগবিরোধী নীতিবিদ্, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Puritan। তাঁহার অধিকাংশ নায়ক-নায়িকারা সব সময়েই যৌনমিলন হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছে।" নানা চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে সুবোধচন্দ্র দেখালেন, শরৎচন্দ্রের কাছে ভোগ এবং ঐশ্বর্যের থেকে ত্যাগের মূল্য বেশি। কেবল দুটি চরিত্র সজ্ঞানে ভোগকে বরণ করেছে—কিরণময়ী এবং সুরেশ। "তাহাদের জীবন হইয়াছে সর্বাপেক্ষা উষর।" তবে শরৎচন্দ্র রিরংসাবিরোধী হয়েও প্রণয়ের গৌরব ঘোষণাকারী। তাই রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'অন্যায়ে'র বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার।[৩৬]

মৃত্যুর পরেও শরৎচন্দ্রের নীতি-দুর্নীতির বিতর্কের ইতি ঘটেনি। এ যাত্রায় বিতর্কের গোড়াপত্তন করেছিলেন 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যদিও তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য অত্যন্ত সতর্কতায় লিখিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬-এ 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

উপন্যাসাদির সমালোচনা' ('বিবিধ প্রসঙ্গ', 'প্রবাসী') শিরোনামে রামানন্দ জানিয়েছিলেন, 'জনৈক ভদ্রলোক' (যিনি হিন্দুসমাজভুক্ত বলে তাঁর ধারণা) শরৎচন্দ্রের 'পাপসাহিত্যের পাপরহস্যগুলি উদঘাটনের' জন্য 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক সমালোচনা লিখতে ইচ্ছুক। আগ্রহী সমালোচককে সরাসরি জবাব না দিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের রামানন্দ জানিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থের 'প্রতিকূল সমালোচনা' পত্রিকা দপ্তরে এলেও তা ছাপার উপযুক্ত বলে রামানন্দ বিবেচনা করেন নি। যেহেতু "ছাপিলে আমরা সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার নিন্দা রটাইতেছি এই অপবাদ রটিত, এবং সমালোচনার সত্যতা-অসত্যতা নির্ধারণে তাহাতে বাধা জন্মিত।" তাছাড়া "তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] যে-যে বহির নিন্দা আমরা শুনিয়াছি সে বইগুলি বাস্তবিক নিন্দনীয় কিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাহা বলিতে পারিনা, কারণ সেগুলি আমরা পড়ি নাই।" এই আলোচনার শেষাংশে রামানন্দ লিখেছেন, শরৎচন্দ্র বা তাঁর প্রকাশক কোনো বই পাঠালে তা 'প্রবাসী'তে 'সমালোচিত হইত'।

সমালোচনা করার জন্য রামানন্দকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। সরাসরি শরৎসাহিত্যের না হলেও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে লেখা নরেন্দ্র দেবের 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য হয়। ঐ বইযেব একটি বিতর্কিত অনুচ্ছেদ পড়ার জন্য বইটির 'দ্বিতীয় সংস্করণেব একখানি...[কপি] কিনাইয়া আনাইয়া' রামানন্দ পড়েছেন, তারপর প্রবেশ করেছেন শরৎ-বিতর্কক্ষেত্রে।

নরেন্দ্র দেব তাঁর 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'প্রবাসী' কর্তৃপক্ষের অসম্মানজনক ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। ঐ পত্রিকার পক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পত্রে' শরৎচন্দ্রকে জানানো হয়েছিল, তাঁর রচনার 'চুম্বক' পড়ে পত্রিকাকর্তৃপক্ষ তার প্রকাশযোগ্যতা বিচার ক'রে তবে ছাপবেন। এতে শরৎচন্দ্র তো বটেই, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে শরৎচন্দ্রকে লেখা দিতে চিঠিতে নিষেধ করেছেন। নরেন্দ্র দেবের লেখায় অন্য ইঙ্গিতও ছিল—ব্রাহ্মবিদ্বেষী শরৎচন্দ্রের দুর্নীতিগ্রস্ত লেখা 'প্রবাসী'-সম্পাদক ছাপতে চাননি। তাঁর এই ধারণার সমর্থন আছে সজনীকান্ত দাসের স্মৃতিকথাতে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রামানন্দের মনোভাব 'প্রবাসী' পত্রিকার কর্মী সজনীকান্তের জানা ছিল। পরিষ্কারভাবে সজনীকান্ত লিখেছেন :

"আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে। আমরা, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ (রামানন্দবাবুর জামাতা) ও আমি ঘনঘন ট্রেনযোগে ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পানিত্রাস ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং **যে-শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা একদা নৈতিক কারণে প্রবাসী-পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই,** তাঁহারই গল্পের অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজি অনুবাদ সাদরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন।" [৩৭]

নরেন্দ্র দেবের অভিযোগ মেনে নিতে রামানন্দ রাজি ছিলেন না। 'প্রবাসী'র শ্রাবণ ১৩৪৬ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশে তাঁর কোনো আগ্রহ কোনোদিন ছিলনা। তাঁর পত্রিকার পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে লেখার অনুরোধ জানিয়ে কোনো চিঠি কোনোদিন যায়নি। কাজেই অপমানিত শরৎচন্দ্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁকে

রবীন্দ্রনাথের চিঠি লেখার প্রশ্নই ওঠেনা। রামানন্দ তাঁর পক্ষে সাক্ষী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিও উপস্থিত করলেন যেখানে রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কোনো মত বিনিময় হয়নি।

অতঃপর পুরোদমে চাপান-উতোর। নাছোড় নরেন্দ্র দেব যুক্তি সাজিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন 'প্রবাসীব পক্ষ হইতে লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করা এবং রচনার চুম্বক চাওয়া' শবৎচন্দ্রের নিজের মুখে তিনি শুনেছেন। কবিকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি, শরৎচন্দ্রকে লেখা কবির চিঠি, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের চোখে দেখেছেন। সে ঘটনা এতদিন পরে 'বহু কার্যে ব্যাপৃত' কবির পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। পুরনো কথা পুনরায় তুলে নরেন্দ্র দেব বললেন, শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত আগ্রহ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল 'প্রবাসী কর্তৃপক্ষের জন্য।' ('শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী', নরেন্দ্র দেব, 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৬)।

নরেন্দ্র দেবের এই অভিযোগ হজম করা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ১৩৪৬-র ঐ সংখ্যাতে তাঁর প্রতিবাদে ক্ষোভ যথেষ্ট, এমন কি নরেন্দ্র দেবের অভিযোগ অনুযায়ী নিজেকে 'আসামী' পর্যন্ত মনে করেছেন। যুক্তি পরম্পরায় লিখেছেন, চারুচন্দ্র রামানন্দের অজ্ঞাতে নিজ 'দায়িত্বে' শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর লেখার 'চুম্বক' হয়তো চেয়েছিলেন, যদিও "কাহাকেও নিজেই লিখিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকেই আবার চুম্বক পাঠাইতে বলা খুব শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া মনে করিবার মানুষ চারুবাবু ছিলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ।" দ্বিতীয়ত, নরেন্দ্র দেবের কথা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ কি সত্যই অ-'নির্ভরযোগ্য' স্মৃতিশক্তির অধিকারী, যে-তিনি 'জড়বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণবহি লিখিতেছেন'? তৃতীয়ত, 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হওয়ার প্রতিবাদ, শরৎ-প্রয়াণ সংবাদ, তাঁব বিষয়ে চারুচন্দ্রের সঙ্গে শরৎসাহিত্য বিষয়ে রোমা রোঁলার আলাপ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪-এর 'প্রবাসী'তে) মুদ্রিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্রের বিষয়ে রামানন্দ অবহেলা দেখিয়েছেন, একথা কি বলা যায়?

এই বিতর্ক রামানন্দ আর অগ্রসর হতে দেননি। জানিয়েছিলেন, "প্রবাসীর নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে আর কোনো বাদপ্রতিবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইবে না।"

· নীতি-দুর্নীতি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধের শক্তিশালী প্রতিবাদ দেখা গেছে। এবারে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে দেশবাসী-প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ 'মনের কথা' ১৩৩৫ আশ্বিনের 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে নিজ সাহিত্যের কালবদ্ধতা, সাধারণভাবে সাহিত্যের অনিত্যতা এবং তরুণ বয়সে স্বতঃস্ফূর্ত রসসৃষ্টির ক্ষমতার কথা ছিল। তৃতীয় কথাটি শরৎচন্দ্র চিঠিতেও দিলীপকুমার রায়কে লিখেছেন :

"আমি অনেক সময়ে দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায়, তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে দেখা যায়না।...মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিকও থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লেখক যখন [গল্প-উপন্যাস] লিখতে চায়, ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে।...মানুষের

একটা বয়স আছেই যাব পবে কাব্য বলো উপন্যাস বলো আর লেখা উচিত নয়।" ৩৮

শরৎচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধ পড়ে 'দূর প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের একজন দীন সেবক' মোহিতলাল মজুমদার ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়েছিলেন। তরুণ দলের হাত থেকে সংবর্ধনা পাওয়ার আবেগে শরৎচন্দ্রেব এ কোন অধঃপতন? সাহিত্যের মৌল সত্যেব এমন অবমাননা তিনি করলেন কিভাবে? মোহিতলাল প্রশ্ন যেমন তুলেছেন, তেমনি শরৎচন্দ্রের মুখের উপর কঠিন বাক্যবর্ষণও করেছেন 'শরচ্চন্দ্র-মরীচি' রচনায় ('শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৩৫), যেটি পরে 'সাহিত্যবিচার ও সাহিত্যের আয়ুষ্কাল' নামে 'সাহিত্যকথা' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের মত মানতে অপারগ মোহিতলাল বিদ্রূপের কাঁটা বিঁধিয়ে লিখেছেন : "সাহিত্য সম্পর্কে যে রসসৃষ্টি ও রসবিচারের কথা উঠে, তাহা যদি এই যৌবনেরই যৌনধর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হয়, তবে শুধু মানুষ কেন, প্রাণীমাত্রেরই যৌবনে এই রসজ্ঞান হওয়া সম্ভব।...যুবকমাত্রেই রসসৃষ্টির অধিকারী, একথা যেমন যুক্তিহীন, তেমনই রসের 'বিচারে' যৌবনই শ্রেষ্ঠ সহায়, এমন উক্তিও সর্বৈব মিথ্যা। সৃষ্টিপ্রেরণাব রহস্য, যাহাকে genius বা দৈবীশক্তি বলে, তাহা এখনো দুরবগাহ।"

শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ সত্য-লিখিত 'মনেব কথা' প্রবন্ধ তরুণ দলেব মধ্যে কোন 'হোলি-উৎসবের' সূচনা করবে, তা মোহিতলালের রীতিমতো শঙ্কাব কাবণ। "তরুণদের লেখার সমালোচনা করিতে যাঁহার সাহস হয়না, ভদ্র ও শিক্ষিত অ-তরুণ বিদ্বন্মণ্ডলীকে শুনাইয়া তরুণদের সাহিত্য ও সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে এত বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি কবিবার দুঃসাহস তাঁহার হইল কেমন করিয়া?" প্রাজ্ঞ সমালোচক মোহিতলাল অসম্মানিত বোধ করেছেন কেবল তরুণদল শরৎচন্দ্রের ভবসার পাত্র হওয়াতে। "যাহাদের কিঞ্চিৎ বয়স হইয়াছে, যেমন মৎসদৃশ ব্যক্তি, তাঁহাদের সাহিত্যবিচারে অধিকার নাই, কারণ তাঁহাদের ওজন নিক্তির ওজন, তাতে মাপের বড় কড়াকড়ি, একটুও ছাপাছাপি নাই? অথবা সাহিত্যবিচারে প্রবীণেরা যে মাপকাঠি ব্যবহার করেন, তাহা বড় পুরানো ; তরুণেরাই আধুনিক রুচিসম্পন্ন, তাহাদের বিচারই সত্যবিচার?...[শরৎচন্দ্রের] এই অতিশয় অকিঞ্চিৎকর উক্তির আলোচনা করিতেও প্রবৃত্তি হয়না।"

এমনকি নিজ 'স্বল্পায়ু' সাহিত্যের প্রসঙ্গে সবিনয়ে যেকথা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, তাও মোহিতলালের তীব্র কটাক্ষের লক্ষ্য। তাঁর মতে, শরৎচন্দ্র সাহিত্যের অনিত্যের দিকটাই দেখেছেন, নিত্যের দিকটা দেখেন নি। "যে জীবন এই আর্টের প্রাণবস্তু, যাহার লীলাই সাহিত্যের লীলা, তাহার মৃত্যু নাই।...অতএব শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যকে অল্পায়ু বলিয়া শোক করিয়াছেন, তার জন্য শোক কবা নিরর্থক।"

শরৎচন্দ্রের এই নিদারুণ আত্মঅবমাননায় মোহিতলালের দুঃখ 'শরচ্চন্দ্র-মরীচি' প্রবন্ধের সম্পূর্ণাংশে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মোহিতলালকে খণ্ডন করার কোনো চেষ্টা শরৎচন্দ্র করেন নি।

॥ ৫ ॥

কবির চোখে ঔপন্যাসিক

জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে নানা কবিতা রচিত হয়েছিল। বিখ্যাত অখ্যাত থেকে কবির সেইসব কবিতায় ছিল শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রণাম, শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন, এবং শরৎ-প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন। নিদর্শন হিসাবে 'কালিকলম' এবং 'বাতায়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাবলীর উল্লেখ করতে পারি।

'কালিকলম' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদারের 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' কবিতায় (পরে 'স্মরগরল' কাব্যে 'শরৎচন্দ্র') শরৎ-চন্দ্র-দর্শনে মোহিত যুবকের গদগদ ভাষণ :

সেইকালে—অবারিত ছিল যবে আশিস বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে!
সে কি চিত্ত-চমৎকার!

বিরাজ বৌ তাঁর প্রাণমন লুট ক'রে নিয়েছিল :

পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সামান্যা সে রমণীর অসামান্যা প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে।
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি!

বিরাজের পাশে 'সতী-শোকে' স্তব্ধ 'ধ্যানী মহেশ্বর' নীলাম্বরকেও দেখেছেন কবি মোহিতলাল।

কবিতার দ্বিতীয়, তৃতীয় অংশে শরৎসাহিত্য সম্পর্কে মোহিতলালের সাধারণ ধারণার প্রকাশ, যা তাঁর 'শরৎপরিচয়' প্রবন্ধেও আছে—শরৎসাহিত্যে 'মানবতার একান্ত স্নায়ুশিরা-শোণিতময় অনুভূতি' বর্তমান, 'সেইজন্যই তাঁহার সাধনাকে তান্ত্রিক সাধনা বলিয়াছি।'

শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে!
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায়!

'কালিকলম' পত্রিকার ভাদ্র ১৩৩৫ সংখ্যাটি শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে নিবেদিত। ফলে কবিতাগুচ্ছে ঐ ভাবটি ধ্রুবপদের মতো বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' কবিতার প্রথমার্ধে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে কবির ভাবময় উক্তি—'কে আসিল বর্ষাশেষে ভাদ্রের সংক্রান্তিলগ্নে' ইত্যাদি। কবিতার পরের অংশে শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন—

রিক্ততার বিত্ত লয়ে দাঁড়াইলে স্বল্প, শীর্ণ, সুমধুর হেসে,
তৃপ্তিকর করস্পর্শে সম্ভাষিলে বন্ধুর মতন ভালবেসে।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমারের অভিব্যক্তি বিশেষণ পরম্পরায় চোখে

পড়ে—'সুনির্ভয়া' অভয়া, 'ম্লান বিপাণ্ডুর' বিবাজ, 'কুলিশকঠোর ব্রতচারিণী' অপর্ণা, 'নিত্যকাল কাব্যলক্ষ্মী' রাজলক্ষ্মী, 'মলিনা মমতাময়ী' সাবিত্রী।

কল্লোল-কালিকলমের দল রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে থাকার যে-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, অচিন্ত্যকুমারের কবিতায় তার প্রতিফলন—

যিনি ভানু, অমর্ত্য কৃশানু, তিনি থাকুন সোনার সিংহাসনে
কীর্তিমান। তুমি এস গঙ্গার মাঙ্গল্যপূত বঙ্গের অঙ্গনে
সন্ধ্যামল্লিকার গন্ধে, ঘনবেতসের নিভৃত ছায়ায়,
নম্রমুখী তুলসীর শ্যামশ্রীতে—এসেছ নদীর গেরুয়ায়।

ভাদ্র ১৩৩৫-এর 'কালিকলমে' শশাঙ্কমোহন চৌধুরীর 'শরৎচন্দ্র' কবিতাতেও 'জন্মদিনে' শরৎপ্রণাম—

আজি তব জন্মতিথি! হে সাজাহাঁ, বন্দি তোমা আজ!

এই কবিতা পড়ে মনে হতেই পারে প্রায় এক বছর আগে মোহিতলালেব 'শরৎচন্দ্রের প্রতি' (আশ্বিন ১৩৩৪) কবিতার ভাব ও শশাঙ্কমোহন বড় বেশি প্রভাবিত। যে একলা পথিকের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা শশাঙ্কমোহন বলেছেন ('ধরার পথেব পান্থ, পথমাঝে দেখা তব সনে')। সেই তাকেই কি মোহিতলালের কবিতায় 'শ্মশানে মশানে' দেখা যায়নি ('শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিছে মহা বীরাচারী')? দ্বিতীয়ত, শরৎসাহিত্যে সামান্যের মধ্যে অসামান্যের প্রকাশ বোঝাতে গিয়ে মোহিতলাল পঙ্কজাত পঙ্কজ এবং তৃণের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন ('ঘাসেও ফুটিছে ফুল—গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে কাশ,/স্বচ্ছ সরসীর তলে পঙ্ক হতে উঠিয়া মৃণালে/ফুটিছে পূজার পদ্ম। /—তার মর্ম তুমিই শিখালে।'/'তব করে লভিয়াছে জয়/তুচ্ছ তৃণ, অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ।')। সেই ছবি ফিরে এসেছে শশাঙ্কমোহনের কবিতায়—

তুচ্ছ তৃণ, কাশগুচ্ছ, লজ্জাবতী পরশ-কাতর,
বর্ষার বর্ষণ লাগি কাঁদিল যে কদম্ব-কেশর,
পাঁকের পঙ্কজ আর—যাদেরে চাহিনি কভু ভুলে
তাদের সবাই যেন চলিল আঁখি তুলে।

ইতিমধ্যে মোহিতলালের 'আমি' কথিকার ছায়াপাত নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় থাকলেও নজরুল তার স্বীকৃতি দেননি বলে মোহিতলাল রুষ্ট হয়েছেন। ফলে গুরুশিষ্যের দ্বন্দ্ব বেঁধেছিল, অনুঘটক ছিলেন সজনীকান্ত দাস। এবার শশাঙ্কমোহনের কবিতায় পুনরায় তাঁর ছায়াপাত দেখে মোহিতলাল কোন অগ্নিবর্ষণ করেছিলেন, তার লিখিত কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি।

শরৎচন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসী সাধুখাঁর 'নৈবেদ্য' নামক শ্রদ্ধানিবেদন ('কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫) সাতটি কবিতার সংকলন। ঐ কবিতাগুলিতে কবি দেখিয়েছেন স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর প্রীতি-প্রণাম নিবেদন। কবির নিজের কথাও এখানে আছে। সাবিত্রী নিজের মধ্যে 'বাণীর মহিমা', 'তাপসী নারীর ত্যাগের মহিমা' দেখে কৃতজ্ঞচিত্তে স্রষ্টার প্রতি উচ্চারণ করেছে : "মূক হৃদয়ের প্রীতি নিবেদি গো দেব তোমার কাছে।" গভীর বনে বাঁশি বাজানো, নিশীথ রাতে নদীর স্রোতে উধাও হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি

ঘটনা 'তুমি নাকি ছাপায়েছ সব জীবনকাহিনীতে?'—এই প্রশ্ন ইন্দ্রনাথের, 'ছুটে এলাম নিতে সেই সমাচার।' 'অরক্ষণীয়া'র 'অশ্রুর মালা' নিবেদিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের 'পদে'। 'ক্ষোভে অনাদরে ক্লিষ্ট জীবন' যাপনে অভ্যস্ত পতিতা নারীরা সমবেত প্রণাম জানিয়েছে —'প্রণমি হে দেব! আমরা সকলে/চরণে তোমার প্রণাম করি।' 'দেবদাস'-এরও একইভাবে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। অতিরিক্ত এইটুকু—রবীন্দ্রনাথের 'মাতাল' কবিতার একটি পংক্তি পুরোপুরি এখানে বসিয়ে দেওয়া—'মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া।' অবশ্য কবি, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ 'মাতাল' শব্দটির ভাবগত অর্থ গ্রহণ না ক'রে আক্ষরিক অর্থে 'মাতাল' দেবদাসের মুখে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের দেহত্যাগের পরে 'বাতায়ন' পত্রিকায় (২৮ জানুআরি ১৯৩৮) প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ মূলত শোকগাথা। বেদনার ছন্দে গাঁথা এইসব কবিতা বহু মানুষের সম্মিলিত শোকাবেগ প্রকাশ করেছে। শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসার নম্র আলোয় আলোকিত কবিতাগুচ্ছের অংশবিশেষ উদ্ধার করব :

চলে যাও আজি তাপস শ্রেষ্ঠ, পোহয়েছে তব সাধনা রাতি
নিখিল মনের অগ্নিশিখায় স্বর্গে জ্বলিল অগ্নি বাতি!
('শরৎচন্দ্র', অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

তুমি চলে গেলে সুরভি তোমার পারোনি বন্ধু
নিয়ে যেতে নিঃশেষে,
ছড়ায়ে রয়েছে মোদের মাঝারে, আমাদের যে গো
গেছ তুমি ভালবেসে।
('শরৎচন্দ্র', বিভাস রায়চৌধুরী)

শরৎ সেথায় আলোক তোমার জ্বলিবে নির্নিমেষ,
তারালোক জুড়ি উঠিবে আজিকে নব সঙ্গীতরেশ।
('শরৎচন্দ্র', সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)

পাখি যেন উড়ে গেছে পড়ে আছে নীড়।
('কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র', দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি)

স্বর্গে রহিয়া স্বস্তি বচনে বাঙালিরে তুমি আশিস দিও।
('শরৎ-প্রয়াণে', সৌম্যেন্দ্র সান্যাল)

গেলে কি শরৎচন্দ্র চিরতরে অস্তাচলে?
হে শিল্পী অপরাজেয়, কে তোমারে মৃত বলে?
('শরৎ-বিয়োগে', নটবরচন্দ্র দত্ত)

তুমি আজ গেছ চলে দেবতার দেশে,
যশোময় কীর্ত্তিময় জীবনের শেষে,
তোমার যে স্নেহ আমি হৃদে ধরিলাম,
স্মরি তাহা, নতশিরে জানাই প্রণাম।
('প্রণাম', তমাললতা বসু)

মরিতে পারো না তুমি, গেছ লোকান্তরে—
উদ্দেশে পাঠানু সেথা ভালবাসা মোর,
স্বর্গে মর্তে এক যেন চিরদিন তরে
করে তব আশ্লেষের নিত্য পুষ্পডোর।
('শরৎ-স্মরণে', গিরিজাকুমার বসু)

শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে এইসব কবিতা শেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তী প্রজন্ম শরৎচন্দ্রের কাছে কোন সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার পেয়েছে, তা বলার সময় শরৎসৃষ্টির নানা প্রান্ত কবিরা ছুঁয়ে গেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব 'শরৎপ্রয়াণ' কবিতার দু'এক লাইন উদ্ধার করা যাক—

রেখে গেলে বীর্যবন্ত কল্পনার বীজ,
তারা কভু হবে না বিফল।
মহারণ্য সম্ভাবনা
যুগান্তরে সঙ্গোপনে করিতে বহন
ধরণী শ্যামলতর করিবার লাগি।
দুঃসাহসী স্বপ্ন আর আশা
অনাগত ভবিষ্যেরে দিবে নব ভাষা।

মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'শরৎস্মৃতি' কবিতায় বিশ্লেষণ বাহুল্য চোখে পড়ে— 'সত্যাশ্রয়ী হে দরদী', 'বাঙালির মোপাসাঁ'। শরৎসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার তাত্ত্বিক প্রতিফলনও দেখিয়েছেন এই কবি—

পড়িয়া বৈষ্ণব গ্রন্থ রূপে ছন্দে ভাষা সুরে
গাহিলে চারণ তুমি মানুষের জয়!

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুবোধ রায় শরৎসাহিত্যের নানা দিক তুলে ধরেছেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ন্যায়ের পক্ষ রাখিতে দাঁড়ালে দুই বাহু বাড়াইয়া,
পাতিয়া বক্ষ কঠিন কঠোর অপমান শিরে নিয়া।

বিমলচন্দ্র ঘোষ 'ডুবে গেছে চাঁদ' কবিতায় ব্রহ্মদেশের ইরাবতী তীরে ভ্রাম্যমাণ 'শ্রান্ত, ক্লান্ত' শরৎচন্দ্রকে দেখেছেন যাঁর কলমে আঁকা হয়েছে ঐ দেশের 'আর্ত অশ্রুধারা'র ছবি। আবার শরৎচন্দ্র 'ভয়লেশহীন সর্প-বিবরে ইন্দ্রনাথের সাথী'। তীব্র ভাষায় আভিজাত্যকে 'কশাঘাত' তিনিই করেছেন। বিমলচন্দ্রের কবিতার একটি চিত্রকল্প—

হে কবি তোমার কাব্য-আকাশে আহত মনের পাখি
কত না ব্যথার সরিৎ সিন্ধু নদী গিরি কান্তার,
পার হয়ে গেছে উধাও পক্ষ পালকে রক্ত মাখি'
শুনিয়া তোমার প্রেমের সেতারে অনাহত ঝঙ্কার।

'প্রেমাস্পদ প্রীতিআশে' যারা নিজেদের নিঃশেষ ক'রে সমাজের তীব্র অপমান, অমর্যাদা সহ্য করেছে, শরৎচন্দ্র তাদের বেদনার লেখক। নরেন্দ্র দেব তাঁর 'গেয়েছ তাদেরি বন্ধু বেদনার গান' কবিতায় স্তবকের পর স্তবকে দেখিয়েছেন যারা প্রবঞ্চিত, পথহারা, সাথীহীন—শরৎচন্দ্র তাদের সহমর্মী। যাদের চোখের সামনে থেকে জীবনের সব আলো নিঃশেষিত, আছে 'আত্ম-অবমানের' কামনা, শরৎচন্দ্র তাদের বেদনার গান গেয়েছেন।

শরৎসাহিত্যের এসব বিচার মূল্যবান। কিন্তু তা শরৎচন্দ্রের একান্ত ভালবাসার মানুষকে এই চিরবিচ্ছেদের দিনে কোন সান্ত্বনা দেবে? কবি গিরিজাকুমার বসুর কাছে সত্যই কোনো সান্ত্বনা ছিলনা। শরৎপ্রয়াণের পর বক্তৃতা, কবিতা, সঙ্গীত, প্রবন্ধে শোকপ্রকাশের চেষ্টাকে আনুষ্ঠানিকতার বেশি তিনি ভাবতে পারেন নি। ওখানে বলা কিছু কথাকেও (শরৎচন্দ্র পতিতার দরদী বন্ধু, শ্রেণীবিশেষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যে মূর্ত) 'মিথ্যা' বলতে তাঁর দ্বিধা ছিলনা। তাঁর 'মৃত্যুজিৎ' অগ্রজ শরৎচন্দ্রের 'অন্তরের অনবদ্য প্রেম-স্পর্শমণি' মানব জীবনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে—গিরিজাকুমারের এটাই চরম অনুভব-সত্য।

॥ ৬ ॥

চরিত্রহীন ও শেষ প্রশ্ন প্রসঙ্গে সমালোচকদের মতদ্বন্দ্ব

'চরিত্রহীন' এবং 'শেষ প্রশ্ন' শরৎচন্দ্রের প্রীতিলালিত। রেঙ্গুনে থাকার সময় 'চরিত্রহীনের' প্রথম পাণ্ডুলিপি গৃহদাহে ভস্মীভূত হয়। শরৎচন্দ্র আবার এটি লেখেন। প্রকাশের ব্যাপারে কেউ কেউ প্রাথমিক আগ্রহ দেখালেও পরে উপন্যাসের নাম এবং বিষয়ের জন্য তাঁদের যথোচিত উৎসাহ ছিলনা। এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র চিঠির পর চিঠিতে 'চরিত্রহীন'কে এথিক্যাল নভেল বলেছেন, তুলনা করেছেন বিদেশী উপন্যাস কিংবা সমকালীন বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে। 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কেও একইভাবে তাঁর আত্মসমর্থন। মনে করেছেন যে, অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত এখানে আছে। সে প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। বর্তমান অধ্যায়ে থাকবে এই দুই উপন্যাস সম্পর্কে যুযুধান শরৎসমালোচকদের কথা।

'চরিত্রহীন' এবং 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে শরৎসমালোচকেরা দুই শিবিরে বিভক্ত। উপন্যাসদুটির প্রশংসামুখর আলোচকদের প্রায় সকলেই শরৎচন্দ্রের অনুগত। বিপক্ষে ছিলেন নবীন সাহিত্যিকদের দল যাঁদের কেউ কেউ একদা আনুগত্য দেখিয়েছেন। আবার দুই শিবিরের বহির্বর্তী নিরপেক্ষ সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন।

গ্রন্থাকারে 'চরিত্রহীন' এবং 'শেষ প্রশ্নে'র প্রকাশকালের মধ্যে প্রায় পনেরো বছরের

পার্থক্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে আলোচকদের অভিযোগ ছিল— উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্রের যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি নেই। আর দ্বিতীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারে রচনাভিত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অভিযোগকারীদের ধারণা হয়েছিল শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তন তাঁর স্রষ্টা-জীবনকেও বেশি মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। পরিণতিতে 'শেষ প্রশ্ন' নামক ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাসের জন্ম। আবার কারো কারোর কাছে উপন্যাসটি আধুনিক সাহিত্যের খাঁটি নিদর্শন যা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির থেকেও শ্রেষ্ঠ। উল্লেখ্য সমালোচকেরা কেবল নিজস্ব মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, অন্যের মত ভ্রান্ত প্রমাণেও সচেষ্ট।

চরিত্রহীন

আগেই বলেছি 'চরিত্রহীন' লেখার সূত্রপাত রেঙ্গুনে। প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্তি ওখানেই। মুগ্ধ পাঠক যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন : "একদিন রবিবার ছবি আঁকা দেখিতে দেখিতে যে জিনিসটি আমি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, সেটি হইতেছে শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন'। একখানা মোটা মলাটের খাতায় মুক্তার পাঁতির ন্যায় সরু সরু সুন্দর অক্ষরে কতকগুলি অধ্যায় লেখা হইয়াছে।...পড়িতে এত সুন্দর লাগিল যে, তা আর বলিতে পারি না।...'গোরা'র পরে এমন সুন্দর লেখা আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়না।...যেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা তেমনি সুন্দরভাবে সাজানো আখ্যানগুলি। পড়িবামাত্র প্রত্যেকটি দৃশ্য চোখেব সামনে উজ্জ্বল রঙে ফুটিয়া ওঠে।" [৩১]

যোগেন্দ্রনাথের অনুরূপ মত দীনেশচন্দ্র সেনের। 'যমুনা' পত্রিকায় 'চরিত্রহীনে'র প্রকাশিত অংশ পড়ে যে উচ্ছ্বাস তিনি দেখিয়েছেন, তা ঔপন্যাসিকের পক্ষে পুরস্কার মনে করা যেতে পারে। মাঘ ১৩২৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'শরৎপ্রতিভা' রচনায় সাবিত্রী চরিত্রের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ দেখা গেছে। "সাবিত্রীর মতো চরিত্র বঙ্গসাহিত্যের একটা অপূর্ব নূতন নকশা বলিয়া মনে হইয়াছে।...সাবিত্রী চরিত্রে ভোগের স্পৃহা নাই ; প্রেমিককে ত্যাগ করিয়া সাবিত্রী প্রেমের মহিমা অতুলনীয় করিয়া দেখাইতেছে। এই প্রেমে অপর কোনো সাধ নাই, সুখ নাই, প্রিয়ের শ্রেয়ই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। ইহা সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সকল দুঃখ বুক পাতিয়া লয়।" সাবিত্রীকে কেবল আয়েষা, কুন্দনন্দিনী, বিনোদিনী (এমন কি শরৎচন্দ্রের কুসুমের) তুলনায় উচ্চ চরিত্র মনে করেন নি দীনেশচন্দ্র, বৈষ্ণব সাহিত্যের আত্মনিবেদনের ভাবও তার মধ্যে পুরো মাত্রায় দেখেছেন। "আশ্চর্য আত্মসংবরণ শক্তি তাহাকে অতুলনীয় গৌরবশ্রী দান করিয়াছে। চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদনের কথায় তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝানো যাইতে পারে।" আবেগে উথালপাথাল দীনেশচন্দ্র সাবিত্রীর প্রেমমুগ্ধ সমালোচক।

দীনেশচন্দ্রের কলমে সাবিত্রী যে-প্রশংসাই লাভ করুক, আধুনিক সমালোচক তা দিতে রাজি ছিলেন না। ভাদ্র ১৩৩৫-এর 'কালিকলম' পত্রিকায় 'মনে মনে' আলোচনায় অন্নদাশংকর রায় সাবিত্রীর যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি নেই মনে করেছেন। অম্লরসাক্ত ভাষায় লিখেছেন, "শরৎবাবুর মেসের ঝি তাঁর নিজের স্তরের মেয়ে, দৈবক্রমে অস্থানে পড়েছে।

নিজের আত্মীয়ার মন বুঝে শরৎবাবু তার মন কল্পনা করতে পারেন। তাই 'সাবিত্রী'কে এত জীবন্ত মনে হয়। অচিন্ত্যবাবুর [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত] 'পুতলি' কি এমন জীবন্ত?"

বিদ্রূপের বাঁকানো বাক্যে 'চরিত্রহীনে'র কড়া সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। দিলীপকুমার রায়কে চিঠিতে লিখেছেন, "আই অ্যাম অল ফর রিয়েলিজম্।...শরৎবাবুর আঁকা বেশ্যার চরিত্র আমি একেবারে সহ্য করতে পারিনা। এমন প্রকাণ্ড মিথ্যা আর কিছুই হতে পারেনা। কলকাতার কোনো মেসে সাবিত্রীর মতো ঝি যদি থাকত, তবে আমরা সবাই বাড়ি ভুলে মেসে পড়ে থাকতুম। মেসের ঝি-রা যে-ভাষায় কথা কয়, তার একটা লাইন তুলে দিলে আপনি কানে আঙুল দেবেন।" [৪০]

এই লেখার জবাব দিলেন দিলীপকুমার রায়। 'বুদ্ধদেব বসু, বাস্তবতা ও প্রসঙ্গত' ('পুষ্পপাত্র', বৈশাখ ১৩৪০) রচনায় উল্টো যুক্তি দেখিয়ে তিনি বললেন, বুদ্ধদেবের নায়কেরা মেয়েদের সুন্দর প্রবৃত্তিকে নানাভাবে আঘাত করে শুধুমাত্র "নিজেদের নিষ্ঠুরতার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য।" [৪১]

সাবিত্রীর পর কিরণময়ী। কিরণময়ীর সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপের মাধ্যমে 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন, চরিত্রটি অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে গেছে : "কিরণময়ীর সঙ্গে আমার আরাকানে আলাপ হয়েছিল। মেয়েটির বুকে জোর (হায় কালিদাস! সঃ শঃ চিঃ!) আছে বটে! আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। দেখলুম তার বুদ্ধির দীপ্তি ও বিদ্যার মহিমা তার অনিন্দ্যসুন্দর মখখানিতে উদ্ভাসিত—যেন ইরান দেশের গোলাপ ফুল—যেমন রাঙা তেমনি সুগন্ধময়। সতীশ তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য আরাকানে আসেনি। ওটা সম্পূর্ণ মিছে কথা। দিবাকরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে সে এক মারওয়াড়ীর সঙ্গে কিছুদিন থাকে। তারপর জনৈক ধনী মুসলমানের আশ্রয়ে ছিল। বলছিল ওখানেও নাকি তার বেশিদিন থাকবার ইচ্ছে নেই।" ('কেন ফিরাইলাম', 'শনিবারের চিঠি', কার্ত্তিক ১৩৩৫)।

কিরণময়ীর সত্যকার আলোচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী। রসজ্ঞ আলোচকের দৃষ্টিতে এই চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন : "কিরণময়ীর প্রথম দর্শন লাভ ক'রে আমি চমৎকৃত হই। দোতলায় মুমূর্ষু স্বামী পড়ে আছেন, আর স্ত্রী নটী সাজে সজ্জিত হয়ে স্বামীর বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে নীচে নেমে এলেন। এ ব্যাপার দেখে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়—কিরণময়ীর রূপ দেখে নয়—তার psychology-র পরিচয় পেয়ে। এরকম ছবি সাধারণ লেখকরা আঁকতে পারেন না।" ('শরৎচন্দ্র', প্রমথ চৌধুরী, 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, প্রমথ চৌধুরীর এই শংসাপত্র জীবনকালে তিনি পাননি।

শেষ প্রশ্ন

অশেষ সমালোচনাযুক্ত উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন'। নিন্দালিপি সমাকীর্ণ হওয়াই যেন তার ললাটলিখন। প্রশংসাও ছিল। কিন্তু তা নিন্দাস্রোতকে প্রতিহত করবার জন্যই

লিখিত। নীরেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশংকর রায় (লীলাময় রায় ছদ্মনামে), মোহিতলাল মজুমদার, এবং 'শনিবারের চিঠি'র আলোচনায় বলা হয়েছে, এই উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের অবসিত প্রতিভার পরিচয়। প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন আশালতা সিংহ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে রাখা দরকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের ভক্তগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। অপ্রত্যাশিত প্রশংসা এসেছিল রাজনীতিবিদ্-লেখক এম. এন. রায়ের কলমে। নিরপেক্ষ মন্তব্য করেছেন মনস্বী লেখক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

'পরিচয়' পত্রিকার সূচনা সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৩৮-এ নীরেন্দ্রনাথ রায় 'শেষ প্রশ্নে'র নিষ্ঠুর সমালোচনা করেছেন ('শেষ প্রশ্ন : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়')। নীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য : শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় নয়, দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুরবস্থা 'শেষ প্রশ্ন' রচনায় শরৎচন্দ্রকে উদ্বোধিত করেছে। শরৎপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংযম এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। "চারি শত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গল্পটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল—শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন শিল্পসৃষ্টি হয় শুধু সৃজনেরই তাড়নায়, অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য সৃজনের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়!...'শেষ প্রশ্নে' তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয়না।" চরিত্র হিসাবে কমল কথার সমষ্টি এবং সে "'শেষ প্রশ্নে'র মুকুটিত কীর্তি অথবা অপকীর্তি।" এই উপন্যাসটিকে নীরেন্দ্রনাথ চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসও ভাবতে পারেন নি। অ্যারিস্টটলীয় সিদ্ধান্তানুযায়ী এখানে কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত্য থাকলেও ঘটনাগ্রন্থন সুসংবদ্ধ ও চরিত্রচিত্রণ সুসংহত হয়নি। সুতরাং "শিব গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ না দিয়া চলে কি?" 'শেষ প্রশ্নে' 'গোরা'র প্রভাবও দেখেছেন নীরেন্দ্রনাথ। তবে 'গোরা'র বিতর্কগুলি "কাঁটার মতো উঁচাইয়া নাই, লতা-পাতা-ফুলের সহিত মিশিয়া একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে।" অন্যদিকে 'শেষ প্রশ্ন'র চরিত্ররা কথা বলেছে শুধু কমলকে সর্বাধিক কথা বলার সুযোগ ক'রে দেবার জন্য, তার 'বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশীলতার প্রাখর্যকে জাহির করিবার জন্য।' জাহির করার এই অশোভনতাই ঐ উপন্যাসের 'প্রধান কলঙ্ক।' যে-সমস্ত তথ্য শরৎচন্দ্র এখানে 'বড় গলায়' প্রচার করেছেন, তা "ইউরোপীয় সাহিত্যের হাটে বাসি মাল, প্রায় বস্তাপচা হইতে চলিল।" সামগ্রিক বিচারে 'শেষ প্রশ্নে'র মধ্যে গুণের পরিমাণ কিছুই দেখতে পাননি নীরেন্দ্রনাথ।

অন্নদাশংকর রায়কে ইতিমধ্যে শরৎ-অনুগতরূপে পেয়েছি 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের আলোচনায়। ঐ সমালোচনা লেখার সময়ে তিনি বিশ বৎসরের নব্য যুবক। এর সাত বছর পরে ১৯৩১-এ যখন 'শেষ প্রশ্নে'র সমালোচনা লেখেন, তখন বিলাতবাস সমাপ্ত, তরুণ সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ এবং উচ্চ প্রশাসনিক কর্ম-সম্পাদন—এই তিন গুরুতর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। সেইসঙ্গে জীবনদৃষ্টিতেও বদল ঘটেছে। ফলে আশ্বিন ১৩৩৮-এর 'স্বদেশ' পত্রিকায় 'শেষ প্রশ্নের সমালোচনা' এবং অনতিবিলম্বে ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮-এর 'নবশক্তি' পত্রে 'শেষ প্রশ্নের কথায়' রচনাদুটি নিয়ে শরৎ-বিরোধী অন্নদাশংকরের আবির্ভাব। 'লীলাময় রায়' ছদ্মনামে লেখা প্রথম প্রবন্ধে সমালোচকের বক্তব্য কমল চরিত্রকে আঘাত ক'রে। "সে যেন বিলেত থেকে আমদানি করা এক বাণ্ডিল তর্ক। সে চিন্তা ক'রে না, প্রশ্ন ক'রে না, কামনা ক'রে না, দৌড়য় না, ঝাঁপায় না, কলরব

ক'রে না। সে বিলাতি উপন্যাসের অনুকৃত।" শুধু কমলই নয়, "নীলিমা, রাজেন ও সতীশকে শরৎবাবুর ঝুলিতে অনেকবার দেখা গেছে।" প্রসঙ্গত গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যচরিত্রগুলির সঙ্গে 'শেষ প্রশ্নে'র চরিত্রদের তুলনাও অন্নদাশংকর করেছেন। "গিরিশচন্দ্রের নাটকে যেমন একটি মাতাল, একটি বেশ্যা ও একটি সন্ন্যাসী থাকবেই, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও তেমনি সেবাপরায়ণা বিধবা, একটি সৃষ্টিছাড়া খেয়ালী অথচ পরোপকারসর্বস্ব যুবক এবং একটি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী কোনো-না-কোনো ছদ্মবেশে থাকতে বাধ্য।" অন্নদাশংকরের দ্বিতীয় আলোচনা দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্রপ্রবন্ধ এবং তা ছদ্মনামে প্রকাশিত। এখানে তাঁর বক্তব্য অধিকতর মারাত্মক। "শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা যথেষ্ট আধুনিক নয়।" কমল তার উদাহরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় 'আধুনিক চিন্তা' কমলের মধ্যে শরৎচন্দ্র ভরে দিয়েছেন। ঐ গ্রন্থ 'আধুনিক ও আন্তর্জাতিক পাঠক-পাঠিকা'দের কাছে আদৃত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও এদেশের কয়েক শ্রেণীর মানুষের কাছে তার মূল্য আছেই। যেমন "অন্তঃপুরে বিশেষ সমাদর পাবে। চায়ের আড্ডায়। নারীবর্জিত মেসে কিংবা মাঠে। যাদের সুযোগ এবং সাহস অল্প অথচ সাধ এবং সখ বেশি, তাদের কাছে 'শেষ প্রশ্ন' নির্বিচার শ্রদ্ধা লাভ করবে।" অন্নদাশংকরের আরো খোঁচা : "রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রেরও জনকতক বাঁধা ভক্ত আছেন, এঁরা লেখকের খাতিরে দর যাচাই করতে নারাজ। আবার একটি mutual admiration সংঘও আছে। যেহেতু শরৎচন্দ্র এঁদের সুখ্যাতি করেছেন, সেহেতু এঁরা শরৎচন্দ্রের সুখ্যাতি কববেনই।"[৪২]

অন্নদাশংকরের লেখা পড়ে শরৎ-ভক্তরা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। স্নেহধন্য অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং ঔপন্যাসিক আশালতা সিংহ প্রত্যুত্তরে দিতে আসরে নামলেন। 'শেষ প্রশ্ন ও লীলাময়' রচনায় ('নবশক্তি', ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অন্নদাশংকরকে প্রত্যাঘাত ক'রে বললেন, অন্নদাশংকর সমালোচনার 'ছলে' শরৎচন্দ্রকে 'কতকগুলো অর্থহীন শ্লেষ ও কটূক্তি' করেছেন। এই 'দুঃসাহস' দেখানোর ফল দাঁড়িয়েছে নিজের অপদস্থ হওয়া। "কমলের theory আর কমল...এক বস্তু নয়।" বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আরো জানিয়েছেন, 'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত হওয়ার আগে শরৎচন্দ্র তাঁকে জানিয়েছিলেন, এই বইটি লিখে মেয়েদের কাছে তাঁর 'পসার মাটি হলো।' এঁর অভিমত : "শুধু মেয়েদের কাছেই নয়, অনেক লেখাপড়া-জানা 'মডার্ন' পুরুষের কাছেও তাঁর পসার মাটি হচ্ছে।"[৪৩]

'তারুণ্য' প্রবন্ধে অন্নদাশংকরের শরৎ-প্রশংসার পর আকস্মিকভাবে 'শেষ প্রশ্ন' প্রসঙ্গে তাঁর মতের উল্টোপাক দেখে আশালতা সিংহ হতবুদ্ধি হওয়ার কথা দিলীপকুমারকে চিঠিতে লিখেছেন। তাঁর বিস্মিত উক্তি : "এর মধ্যে হঠাৎ হলো কি?" অন্নদাশংকরের ঐ রচনার মধ্যে 'এতটুকু সংযম নেই, শ্রদ্ধা নেই ;...অহেতুক আঘাত দেবার উগ্রতা পদে পদে বিরাজ করছে কেন?' আশালতা গভীর হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, অন্নদাশংকরের মতো আধুনিক লেখকেরাই একালের তরুণীদের বিকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। এই প্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্নে' সফল শিল্পী—আশালতার সিদ্ধান্ত।[৪৪]

কেবল আধুনিক লেখকদের তরফে 'শেষ প্রশ্নে'র বিরোধিতা ছিলনা, 'শনিবার চিঠি'

এবং মোহিতলাল মজুমদারও ঐ উপন্যাস ও তার স্রষ্টাকে ছেড়ে কথা বলেন নি। আশ্বিন ১৩৩৮-এ 'শেষ শ্রাদ্ধ' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত রচনাটি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে নানা ধরনের কার্টুনে পূর্ণ। ওখানে লেখা হয়েছিল, "শ্রীকান্ত, বিরাজ বৌ-র শরৎচন্দ্র...'শেষ প্রশ্ন' নামক আস্তাকুঁড়ের জন্মদাতা।"

শরৎপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মোহিতলাল করেন নি। তাঁর 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বইটি স্মরণে রেখেই 'শেষ প্রশ্ন' বিষয়ে তাঁর দুটি রচনার উল্লেখ করব। 'দুইখানি উপন্যাস' (১৩৩৮) এবং 'শরৎপরিচয়' (১৩৪৭) রচনার মধ্যে প্রায় দশ বছরের ব্যবধান হলেও সমালোচকের বক্তব্য একই। অবশ্য প্রথম রচনাটিতে কলমের ধার এবং বিদ্রূপের ঝাঁঝ যে-পরিমাণে ছিল, দ্বিতীয় রচনায় তা নেই, আছে—শান্ত স্থির সিদ্ধান্তবাক্য। মোহিতলাল মনে করেছিলেন, 'শেষ প্রশ্নে' 'কবি-প্রতিভার পরাজয়।' প্রথম প্রবন্ধে তাঁর খর মন্তব্যের কিছু অংশ : "উপন্যাস কই? এ যে নবধর্ম-প্রচারের প্রশ্নোত্তর মালা! এতো নরনারীর জীবনযাত্রার কাহিনী নয়—এ যে কড়া নেশার ধোঁয়ায় আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের বাগবিতণ্ডা!" চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সরস গদ্যে 'প্রবীণ সাহিত্যিক' শরৎচন্দ্র তাঁর সমাজচিন্তা এখানে হাজির করেছেন। মানুষের জীবন, চরিত্র ও নিয়তির চিরন্তন রহস্যসন্ধানের আভাসমাত্র এখানে নেই। বরং উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাক্য ও চিন্তার প্রহারে "মরজীবনের নিয়তিনিয়মকে ভূমিসাৎ করিতে চায়।" এই উপন্যাসের কমল কবি-বিধাতার চির-চমৎকার কল্পনার বিরুদ্ধে 'একজন চিন্তাভিমানী মানুষের বিকট দম্ভবিকাশ।' মোহিতলালের শর 'শেষ প্রশ্ন'-প্রেমিক কিছু বুদ্ধিজীবীর দিকেও ছুটেছিল। সেইসব 'তত্ত্ববিলাসী অরসিক' মানুষ কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় প্রচুর অবান্তর চিন্তা, তর্ক, মত-বিশ্লেষণ রসাল গদ্যে এই উপন্যাসে লাভ ক'রে আমোদিত। শরৎচন্দ্রের বিচিত্র পরিণতিতে চমকিত মোহিতলাল বললেন, 'কবি' থেকে 'দার্শনিক' পদবীতে শরৎচন্দ্র এত শীঘ্র 'ডবল প্রমোশন' পেলেন কিভাবে!! জীবনকে শরৎচন্দ্র কোনোদিনই সমগ্রভাবে দেখেন নি—নরনারীর হৃদয়রহস্যই তাঁর সাহিত্যরচনার প্রধান উপকরণ। সেই শক্তি যখন নিঃশেষিত, শরৎচন্দ্র 'তখন উপন্যাস রচনার ছলে, জীবন-রহস্যের পরিবর্তে, মানুষের মানস-ব্যধির ঔষধ সন্ধানে' নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তারই ফল 'শেষ প্রশ্ন'। এই শেষ কথাটি কিছু নরমভাবে মোহিতলাল পুনরায় উপস্থিত করলেন কয়েক বছর পরে লেখা 'শরৎ-পরিচয়' রচনায় যেখানে 'শেষ প্রশ্নে' প্রতিভার কিছু স্বাক্ষরও তিনি দেখেছেন : "তাঁহার সম্মুখে নারীশক্তির প্রতীক সেই অন্নদাদিদির চিরন্তনী জীবনরহস্যমূর্তি আর নাই; তাহার স্থানে সকল হৃদয়-রহস্যের প্রতিবাদস্বরূপিণী, কেতাবী বিদ্যার নির্যাসভাষিণী আধুনিক ছিন্নমস্তার রূপ বিরাজ করিতেছে। শরৎচন্দ্রের সেই লিপিকুশলতা তখনো আছে—এ সকল রচনাতেও প্রতিভার সেই স্বাক্ষর মুছিয়া যায় নাই; কিন্তু এ শরৎচন্দ্র সে শরৎচন্দ্র নয়।"

'শেষ প্রশ্ন' বিরোধী এইসব ধারাবাহিক অভিযোগে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করা উচিত বিবেচনা করেছেন। তাঁর প্রতিপ্রশ্ন ছিল : কেন 'শেষ প্রশ্ন' পড়ার সময় পাঠক মনে রাখবে এটি 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহে'র স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের রচনা? কেন সে বুঝতে চেষ্টা করবে না, 'শেষ প্রশ্ন' সম্পূর্ণ অন্য জাতের লেখা? মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে লেখক হওয়াতে তাঁর কাছে দৃশ্যতই বিস্ময়কর ঠেকেছিল, "এত নাম ও প্রতিষ্ঠার বোঝা বয়ে নতুন লেখক হবার সাহস শরৎচন্দ্র পেলেন কোথায়? ...[শেষের] কবিতার মতো ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথ পেলেন প্রশংসা, আর একেবারে নতুন কিছু ক'রে শরৎচন্দ্র হলেন অপরাধী।" মানিক লিখেছেন : " 'শেষ প্রশ্ন'-র রস-সংযম থেকে রস সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।...তিনি [শরৎচন্দ্র] যে দরদসর্বস্ব লেখক নন, আর্টের মর্যাদাও যে তিনি বোঝেন, 'শেষ প্রশ্ন' তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে। 'শেষ প্রশ্ন'র রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ কলাসম্মত ও গভীর। উপন্যাসের চরিত্র পাঠকের ইচ্ছা ও ভাললাগাকেই সমীহ ক'রে পাঠকের দিকে চলবে না, তার গতির মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, এমন কি লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে পর্যন্ত এড়িয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবে।" ঐ বৈশিষ্ট্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যুট হামসুনের 'Growth of the Soil' ছাড়া অন্যত্র দেখেন নি। "বাংলা সাহিত্যে এ গুণ যদি উল্লেখযোগ্যভাবে কোনো বইয়ে থাকে, সে বই 'শেষ প্রশ্ন'। এদিক দিয়ে 'শেষ প্রশ্ন'র শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারের উপায় নেই।" [৪৫]

'শেষ প্রশ্নে'র অপ্রত্যাশিত প্রশংসা এসেছিল রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী এম. এন. রায়ের কলমে—একেবারে বাধাবন্ধহারা প্রশস্তি। তাঁর কাছে সাহিত্য সাহিত্যই নয় যদি না তাতে মুক্তজীবন ও মুক্তচিন্তার প্রবল প্রকাশ থাকে। 'শেষ প্রশ্নে' তা হয়েছিল বলে তিনি বইটিকে কেবল নোবেল পুরস্কারের যোগ্য মনে করেন নি—প্রথম ভারতীয় নোবেল পুরস্কারজয়ী রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির চেয়ে উচ্চাসনে বসিয়েছেন।[৪৬] বলা বাহুল্য ঈশ্বরমুখী গীতাঞ্জলি বস্তুবাদী এম. এন. রায়ের মনোজগতে সিংহাসন পেতে পারেনা।

১৬ জানুআরি ১৯৩৮-এ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৭ জানুআরি 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'Conflict Between Instinct and Ideal' লেখাটি বেরিয়েছিল। এই রচনার বৃহৎ অংশ অধিকার করেছে 'শেষ প্রশ্ন'। কমল চরিত্রের আলোকে অন্যান্য চরিত্রদের বিচার করেছেন সুবোধচন্দ্র। লেখাটিতে ঈষৎ পুনরুক্তি আছে। উপন্যাসটির প্রশংসাও যথেষ্ট। সুবোধচন্দ্র লিখেছেন :

"This is Kamal, a royal anarchist against all ideals of the past, she happened to come in touch with certain persons—Asu Babu, Akshaya, Abinas, Harendra, Satis, Ajit, Manorama and Nilima—all of whom had an inner affinity in this that they all accepted the social standards of good and evil and acclaimed the old Indian view of life. Kamal carried on the incessant controversy with these votaries of the traditional morality and everyone excepting Rajendra joined with keen verbal contests. This controversy could never have had any end, but it was effectively decided by the inner emotions of the personages. Those whose stood for the traditional ideals of chestity and lifelong fidelity were conquered not by kamal's arguments but by the call which came to them from the deepest recesses of their heart." [৪৭]

পরে 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঐ লেখার মূল ভাব বজায় রেখে উপন্যাসের ত্রুটির দিক নির্দেশ ক'রে বলেছেন, ভাবাতিশয্য উপন্যাসটির ক্ষতি করেছে। "বিশেষ করিয়া আশুবাবুর কমলকে 'কাকাবাবু' বলিয়া সম্বোধন করার অনুরোধ, কমলের

তাহাতে সম্মতি ও অসম্মতি, আশুবাবুর হাতে কমলের হাত দেওয়া, নীলিমা ও কমলের সম্ভাষণ ও অ্যাপায়ন—এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে ন্যাকামির গন্ধ রহিয়াছে।" আর্টের দিক দিয়ে দুর্বল অংশ নীলিমার কাহিনী। কমলের সঙ্গে তার গভীর সৌহার্দ্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মূল গল্পের সঙ্গে নীলিমার বিশেষ সম্পর্ক না থাকলেও "তাহাকে খুব বড়ো একটা স্থান দেওয়া হইয়াছে। গল্পের এই অংশকে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার [যথা অবিনাশবাবুর হঠাৎ বিবাহ ইত্যাদি] সংঘটন করানো হইয়াছে।" উপন্যাসের শেষে নীতিবাগীশ অক্ষয়ের বিপুল পরিবর্তনও একই জাতীয়। "তাহার পরিবর্তন (অধোগতি?) শুধু আকস্মিক তাহা নহে, ইহা সম্ভাব্যতারও সীমা অতিক্রম করিয়াছে।" [৪৮]

'চরিত্রহীন', 'শেষ প্রশ্ন' বিষয়ে এইসব সমালোচনা শরৎচন্দ্রের মনে বিপুল রেখাপাত করেছিল। তাঁর উত্তেজিত মনের সেই ছবি ধরা আছে সহমর্মী কিছু মানুষকে তাঁর লেখা চিঠিতে, ঘরোয়া আলোচনায়। নিজের অন্যান্য সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর ধারণা কি ছিল, তাও ঐখানে পেয়েছি, সেইসঙ্গে সাহিত্যের রূপরীতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাও। এইসব জড়িয়ে গড়ে উঠেছে সাহিত্যচিন্তক শরৎচন্দ্রের মননের জগৎ। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করব।

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'শনিবারের চিঠি'র উপর শরৎচন্দ্র কি পরিমাণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তা অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল লিখেছেন : "তিনি [শরৎচন্দ্র] প্রায় অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন : যে এটা করতে পেরেচে তার চেয়ে নীচ মানুষ আর থাকতে পারে নাকি?...তোমাকে নিশ্চয় ওরা কাগজ পাঠায়। আমি বলচি, আজই লিখে দিও যেন কাগজ আব তোমাকে না পাঠায়। ওটাকে ['শনিবারের চিঠি'কে] ছোঁয়াও তোমার পাপ, জেনো।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৬২-৬৩)।

২. দিলীপকুমার রায়, রাধারানী দেবী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিছুটা আশালতা সিংহ শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ছিলেন। এঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ শরৎচন্দ্রকে বিনা বিচারে মেনে নেননি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর 'প্রায় বিশ বৎসরের' পরিচয়, তাঁর প্রায় সব লেখা ধূর্জটিপ্রসাদ পড়েছেন এবং তা নিয়ে 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব ও তর্ক' করেছেন। তর্কের ভাষা যথেষ্ট 'রূঢ়' ছিল। শরৎচন্দ্র তা সহ্য করেছেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অসীম ক্ষমাশীলতার কথা স্মরণ ক'রে ধূর্জটিপ্রসাদ 'সর্বান্তঃকরণে' ক্ষমা চেয়েছেন। ('আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

৩. "শরৎচন্দ্রের জীবনে যদি কোনো স্থায়ীভাব থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সহানুভূতি। কি সুদূরপ্রসারী, সুগহনচারী ছিল তাঁর এই সহানুভূতি।...মনস্বিতা ও হৃদয়বত্তার অমিত ঐশ্বর্যদীপ্ত, নরনারীচিত্তের অতি গহনতলে অবতরণ করিয়া খুঁজিতেন তিনি অন্তরের সুখদুঃখ, স্নেহপ্রীতি, ঘাতপ্রতিঘাতের সবটুকু রহস্য। আবার অবজ্ঞাত, অনভিজাত অথবা

সমাজের প্রত্যন্তচর ক্ষুদ্রজীবনের সবটুকু রসমাধুর্যের তিনি ছিলেন বিলাসী ভোক্তা ও সুনিপুণ পরিবেষ্টা।" ('শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত', জনার্দন চক্রবর্তী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর এই আলোচনা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

৪. মোহিতলাল লিখেছেন : "মানুষকে—কোনো তত্ত্ব, ধর্ম বা নীতিসংস্কারের দ্বারা নয় —কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার প্রাণের আকৃতিকেই আর সকল সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া ঘোষণা করার যে মানবতা, বাংলা সাহিত্যে তাহাই শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই মানবতার সাধনা তাঁহার জীবনেই হইয়াছিল—ভাব বা কল্পনাযোগে নয় ; সেইজন্যই তাঁহার সাধনাকে তান্ত্রিক সাধনা বলিয়াছি।" ('শরৎপরিচয়', মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ৯৮, আকর : 'সাহিত্য বিতান', বিদ্যোদয় লাইব্রেরী লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৬৮)।

৫. "Saratchandra's great message was Love of Man as Man, with all his weaknesses and imperfections, and this message in these days of rampant communalism and a sense of caste-pride and exclusiveness which is so hard to kill, both of which are stalking the land like spectres and making a hall of this fair land of Bengal, we require most as a guiding principle in our lives." ('Saratchandra's Great Message', Suniti Kumar Chatterji, Source : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 392).

৬. 'শরৎপ্রতিভা', দীনেশচন্দ্র সেন, 'ভারতবর্ষ', মাঘ ১৩২৩ (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 358).

৭. 'শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', রমেশচন্দ্র মজুমদার (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 304).

৮. ঐ, পৃ. ৩০৬।

৯. 'শবৎপ্রতিভা', দীনেশচন্দ্র সেন (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 359)।

১০. 'শরৎচন্দ্র', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৬২-১৬৩ (আকর : 'শরৎপ্রসঙ্গ', অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত, ভাব ও লেখা, কলকাতা-৭০০০১২, জুন ১৯৭৫)।

১১ 'শরৎচন্দ্র', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, ১৩৯৯, পৃ. ১৪৫-১৫৩।

১২. 'Saratchandra's Great Message', Suniti Kumar Chatterji (Source : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 391-392.

১৩ক. 'শরৎপরিচয়', মোহিতলাল মজুমদাব, পৃ. ১১০-১১১।

১৩খ. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১২৪।

১৪. ১৯২৮ সালে লিখিত বিপিনচন্দ্র পালের 'যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যায় মুদ্রিত।

১৫. 'বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও শরৎচন্দ্র', নরেন্দ্র দেব, পৃ. ১৫২-১৫৬, (আকর : 'শরৎপ্রসঙ্গ', অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত)।

১৬. 'শরৎ-রবি', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সংকলিত, 'দেশ' শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৭।

১৭. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৫৮। রেঙ্গুনপ্রবাসে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার চমকপ্রদ নানা বিবরণ যোগেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। এই অহংবোধ তাঁর ছিল যে, " 'বড়দিদি যে তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] প্রথম বয়সের লেখা সে কথাটা তিনি আমারই কাছে হঠাৎ একদিন

বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।" এও জানাতে যোগেন্দ্রনাথ ভোলেন নি, 'বড়দিদি' গ্রন্থটির এক কপি তাঁকে শরৎচন্দ্র স্বহস্তে উপহার দিয়েছিলেন। উপহার-লিপিতে লেখা ছিল : "পবম কল্যাণীয় শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ সরকার করকমলেষু। এ ছেলেবেলার হিজিবিজি—কেন যে প্রকাশ করেছেন তা প্রকাশক বলতে পারেন। এর দোষগুণ তোমার চক্ষে নিশ্চয়ই পড়বে। ইতি—তোমার শরৎদা।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৫৭-৫৮)।

১৮. 'রামের সুমতি' রচনার ইতিহাস যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন। 'বড়দিদি' প্রকাশেব বছর পাঁচেকের মধ্যে 'যমুনা' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে 'রামের সুমতি' প্রকাশিত। 'বডদিদি' প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে আকস্মিক খ্যাতি অর্জন এবং কিছুদিন পর এক মাসের ছুটিতে কলকাতা ভ্রমণ। ঐকালে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সম্পাদক এবং শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের "সনির্বন্ধ অনুরোধে উক্ত পত্রিকায় লিখিতে স্বীকৃত" হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। রেঙ্গুনে ফিরে 'রামের সুমতি' গল্প লেখায় তিনি 'জোর' দিলেন। "রোজ যতটুকু করিয়া লেখেন, অফিসে আসিয়া আমাকে [যোগেন্দ্রনাথ] দেখান, আমি অফিসের সকল কাজকর্ম ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহাব গল্প পড়ি। এইরূপ করিয়া ৮/১০ দিনে যখন উক্ত গল্পের অর্ধেকখানি লেখা হইল, তখন প্রথম সংখ্যাব উপযুক্ত মনে করিযা তিনি 'যমুনা' সম্পাদককে ঐ লেখাটুকুই পাঠাইযা দিয়া অবশিষ্টখানি আগামী মাসে পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন | সে প্রতিশ্রুতি শরৎচন্দ্র রক্ষা করেছিলেন।], (ঐ, পৃ. ৬৮)। সৃষ্টিক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পুনরাবির্ভাবের বহির্গত বিববণ যোগেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। অন্তর্গত কারণও ছিল। ইতিমধ্যে 'নিঃশব্দ প্রেম : দারুণ দহন' অধ্যায়ে (তৃতীয় অধ্যায়ে) দেখেছি, নিরুপমার উপব দারুণ অভিমানবশত শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চলে যান। সাহিত্যচর্চার সূত্রে নিরুপমার সঙ্গে তাঁর যোগ হযেছিল বলে গভীর বিতৃষ্ণায় ঐ বস্তুটিকে ত্যাগ করেছিলেন। প্রায় আট দশ বছর ধরে সেই ক্ষতে ধীরে ধীরে প্রলেপ পড়েছিল। 'বড়দিদি'র খ্যাতিও হয়তো তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। অর্থাৎ অন্তর্গহনে তিনি সাহিত্যমুখী হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছিল। এই সময়েই তাঁর কলকাতা গমন এবং 'যমুনা' পত্রিকায় লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হওয়া। শরৎচন্দ্র নিজেও অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছিলেন : "আমার সত্যকার সাহিত্যিক জীবন বলতে যা বোঝায়, তা আরম্ভ হয়েছে ঠিক ১৯১০ সাল থেকে।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ১৮)। কোনো ঈর্ষা কি শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যচর্চায় প্ররোচিত করেছিল? 'ভারতী' পত্রিকায় কোনো নবীন লেখকের লেখা পড়ে উৎসাহিত যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে তা জানালে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন : "ওঃ! ওমুক তো! ও বেশ লেখে।—কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমাকেই গুরু বলে পরিচয় দেয়।" যোগেন্দ্রনাথ তখন একটি বিদ্রূপ-বাণ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন : "দেখছি শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।" যোগেন্দ্রনাথ জানতেন না সেদিন আপন অজ্ঞাতে বাংলা সাহিত্যের কোন মহৎ উপকার-সাধন তিনি করেছেন। ম্লান মুখে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "আমিও নেহাৎ মন্দ লিখিনে। লিখলে অনেকের চেয়েই বোধহয় ভাল লিখতে পারি।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৬৩)। হয়তো এই আঘাত শরৎচন্দ্রকে ঠেলে দিয়েছিল সাহিত্যক্ষেত্রে গুরুর গৌরব বজায় রাখতে। যোগেন্দ্রনাথ প্রমুখের মনে হয়েছিল "এ সুমতিটা বোধহয় রামের সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুও ফিরিয়া পাইলেন।" (ঐ, পৃ. ৭১)।

১৯. ঐ, পৃ. ৭০-৭১।

২০. 'শরৎপ্রতিভা', দীনেশচন্দ্র সেন (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 355)।

২১. ঐ।

২২. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮১।

২৩. মুদ্রিত গল্পটির শেষাংশ পরিবর্তিত হয়েছে দেখে যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন তাঁর মূল্যবান পরামর্শের কথা। শরৎচন্দ্রের উত্তর : "সরকার, তুমি ঠিকই বলেছিলে। সত্যিই তো সব সময় নিজের বিচার ঠিক হয়না।...বাস্তবিকই তোমার কথামতো শেষটুকু বদলে দিয়ে ভালোই করা গেছে। এ প্রশংসার অর্ধেক ভাগ তোমার প্রাপ্য।" ঐ, পৃ. ৭৫)।

২৪ক. ঐ, পৃ. ৭৫।

২৪খ. সহজ সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা কিভাবে লেখককে বিভ্রান্ত করে, সে-বিষয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর ঐ পত্রে আরো লিখেছেন : "বর্তমান সময়ে যেরূপ অনেক বিষয়ে আমাদের প্রযত্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ব্যর্থ করিবার জন্যও অনেক নিরাশার কারণ উদ্ভূত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহার একটি এই যে, ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইলে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। আর একটি এই যে, বহু প্রয়াসে পূর্বে যাহা সাধিত হইয়াছিল, সফলতা আসিলে পরে সেগুলি অল্প আয়াসেই সম্পন্ন করিতে চাহি। যদি সফলতা আসিয়া থাকে, তবে তাহা তো দেবতারই করুণা, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে? —কেবল বলিবার কথা এই যে, যে করুণা আমাদের অনুপযুক্ত জীবনে প্রসারিত হইয়াছে, সেই দান যেন আমাদের জীবনকে আরো পূর্ণতর করিতে পারে। যে মহত্ত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা তখনই শক্তিবান হইবে, যখন লেখকের জীবন লেখা হইতেও মহত্তর হয়।" ('ভারতবর্ষ', মাঘ ১৩২৩)।

২৫. 'শরৎপ্রতিভা', দীনেশচন্দ্র সেন (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p 358)।

২৬. বর্তমান লেখকের 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা' (পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭) গ্রন্থের ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

২৭. 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের চূড়ান্ত নামকরণ নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কথা বলেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের পরামর্শ ছিল 'বিরাজ মোহিনী'। শরৎচন্দ্র তখন 'বিরাজ বৌ' নামকরণের পক্ষে কথা বলায়, যোগেন্দ্রনাথ একটু খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন : "প্রথম দফায় যোগেন চাটুজ্যের 'কনে বউ', দ্বিতীয় দফায় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ', তৃতীয় দফায় শরৎ চাটুজ্যের 'বিবাজ বৌ'—এই তো?" অখুশি শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : " 'ওই তো তোমাদের কেমন একটা রোগ। তাঁদের 'কনে বউ', 'মেজ বউ' যত খুশি থাকে থাক, তাতে আমার লোকসান আছে কিছু?' বলিয়াই নীল পেন্সিল দিয়া বড় বড় অক্ষরে 'বিরাজ বৌ' নাম পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় লিখিয়া দিলেন, নীচে লিখিলেন —ছোট ছোট অক্ষরে 'গল্প'। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'তা হবে না...লিখুন উপন্যাস।' লেখক এবারে আর কোনো আপত্তি করিলেন না—গল্প কাটিয়া স্পষ্ট করিয়া আরো বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন—উপন্যাস।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮৫-৮৬)। তাহলে 'বিরাজ বৌ' প্রকৃতিতে গল্পই ছিল—অন্যের আপত্তিতে তা উপন্যাসে দাঁড়িয়েছে?

২৮. অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন : " 'গৃহদাহ' সম্পর্কে যখনই কোনো প্রসঙ্গ উঠত, তখনি তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সে-সম্বন্ধে কথা কইতেন—আর কোনো বই সম্বন্ধে তাঁর এমনি

উৎসাহ দেখা যেত না।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৬-২৭)।

২৯. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৮। শরৎচন্দ্র কি 'গৃহদাহ' লিখে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছেন? হেমেন্দ্রকুমারের ধারণা তেমনই। ঘরোয়া আলাপে শরৎচন্দ্র তাঁদের বলেছিলেন—"এবারে 'ভারতবর্ষে' আমার যে-উপন্যাস বেরোবে, তোমরা নিক্তি ধরে দেখে নিও, তার ওজন 'ঘরে বাইরে'র চেয়ে এক তিল কম হবে না।' শরৎচন্দ্রের অহংকারও ছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের 'তুল্য' তাঁর ঐ উপন্যাস তখনো পর্যন্ত লেখাই হয়ে ওঠেনি। জন্মের আগেই জাতকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে শরৎচন্দ্রের এই দম্ভ হেমেন্দ্রকুমারের ভালো লাগেনি। বিরক্তির সঙ্গে তিনি বলেছেন, "উপন্যাস লিখতে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্র নিজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যে, তিনি 'ঘরে বাইরে'র সমকক্ষ কোনো কিছু রচনা করছেন না। আর সত্য কথা বলতে কি, 'গৃহদাহ' কেবল 'ঘরে বাইরে'র সঙ্গে তুলনীয় তো নয়ই, ঐ উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্রেব কথাসাহিত্যেব মধ্যেও উচ্চস্থান অধিকার ক'রে নেই।" ('যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৭-১৯৮)।

৩০. 'শরৎচন্দ্র', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ. ১৮৯-১৯৩।

৩১ক. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৩৮, ১৪১, ১৫০-১৫১।

৩১খ. নাবীর মাতৃমূর্তি 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, 'শবৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প' গ্রন্থে রাধারানী দেবী তা লিখেছেন। শবৎচন্দ্রের তিরোধানের বছরখানেক আগে একটি ঘরোয়া সভায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সামনেই অনুযোগ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র অন্য পত্রিকায় অন্য লেখা লিখলেও কিছুতেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শেষের পবিচয়' উপন্যাসটি শেষ করছেন না। রাধাবানী তখন হঠাৎ বলে উঠেছিলেন : "আসল কথা, হালে পানি পাচ্ছেন না এখন বড়দা। সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে তো বই শুরু করেচেন—এখন টেনে তুলবেন কি ক'রে ভেবে পাচ্চেন না।" তাতে শরৎচন্দ্র দপ ক'রে জ্বলে উঠেছিলেন। হাতের গড়গড়ার নল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারে খাড়া বসে কঠোর স্বরে বলেছেন : "মেয়ে মানুষের শেষের পরিচয় কী—উত্তর দাও।" শরৎচন্দ্রেব 'জ্বলন্ত মূর্তি' দেখে সকলেই স্তম্ভিত। নরেন্দ্র দেব তাঁকে ঠাণ্ডা করার জন্য 'শান্ত নরম গলায়' অনুনয় ক'রে উত্তর তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। "শরৎচন্দ্র ঠাণ্ডা পাথরের মতন গলায় বললেন—মা। মাতৃত্বের বাৎসল্য মেয়েজাতের শেষের পরিচয়।" ('শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৩১-১৩২)।

৩২. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৫২-৫৩।

৩৩. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১২৪।

৩৪. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮২। শরৎচন্দ্র 'মূল্য' সিরিজ করবার কথা ভেবেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পিঠ-চাপড়ানি 'মূল্য' সিরিজ রচনায় শরৎচন্দ্রকে কি পরিমাণ উৎসাহিত করেছিল, তা পাওয়া গেছে তাঁর একাধিক চিঠিতে এবং ঘরোয়া আলাপে। কখনো বলেছেন : "আমি মনে করিয়াছি, ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তারপরে ক্রমশ ধর্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৯-১২০)। এমন কি 'বেশ্যার মূল্য' লেখারও বিশেষ ইচ্ছা তাঁর ছিল ("ওটা বোধকরি সবচেয়ে 'ইন্টারেস্টিং' হতো"), যদিচ তাঁর 'বন্ধুবান্ধবের ভীষণ আপত্তি'তে তা লেখা হয়ে ওঠেনি (ঐ, পৃ. ৭৪)। তবে ভগবানের

মূল্য এবং বিধবার মূল্য যে 'পূর্ণ তেজে অগ্রসর হইতেছে', তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০)।

অন্তরঙ্গ মহলেও মূল্য-সিরিজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের উৎসাহী মনোভাব। এমন কি 'যমুনা' পত্রিকায় 'নারীর মূল্যে'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই তিনি পরবর্তী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। রেঙ্গুনের এক চায়ের দোকানে বসে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য অনুরাগী কয়েকজনকে বলেছেন, "এরপরে জীবনের মূল্য, প্রেমের মূল্য, ধর্মের মূল্য নাম দিয়ে পরপর বারোটি প্রবন্ধ লিখে তার নাম দেব দ্বাদশ মূল্য।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮২-৮৩)। ঐ ইচ্ছা 'নারীর মূল্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়েও শরৎচন্দ্রেব ছিল। কিন্তু না-লেখার দায়ভার নিজের কাঁধে না টেনে প্রকাশকের উপর চাপিয়েছেন : "আমার 'নারীর মূল্য' বইখানা কেন যে ওরা [প্রকাশক এম. সি. সরকার] প্রকাশ করেছে, তা আমি জানিনা। ভেবেছিলুম, অমনি ধরনের আরো খানকতক বই লিখে 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে ছাপাব—ওবা তা হতে দিলে না। অথচ লেখা যে দরকার হয়ে পড়েছে, তাও বুঝছি।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৫২)।

৩৫. শরৎচন্দ্র কতখানি উত্তেজিত হয়েছিলেন, তা নিজের প্রসঙ্গ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে যতীন্দ্রমোহন সিংহের অপমান করার উল্লেখে বোঝা যায়। "ইনি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত রেহাই দেননি। আমি না হয় অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কি ক'রে যে এঁরা অসম্মান করেন, তা আমি বুঝতে পারিনে।" (ঐ, পৃ. ১৪)।

৩৬. 'শরৎচন্দ্র' সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ. ১৩৫-১৪৪।

৩৭. 'আত্মস্মৃতি' (১ম খণ্ড), সজনীকান্ত দাস, ডি. এম. লাইব্রেরী, অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ. ২৪৯-২৫০।

৩৮. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩২৬।

৩৯. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৫৯, ৬২।

৪০. দিলীপকুমার রায়কে বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, 'শরৎচন্দ্র', (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৫১।

৪১. ঐ, পৃ. ৩৫০-৩৫১। নারী সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাবকে দিলীপকুমার রায় যেভাবে আঘাত করেছেন, তার সমর্থক শরৎচন্দ্র নিজেই। 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে দিলীপকুমারকে তিনি চিঠিতে লিখেছেন : "যারা নির্বিচারে স্ত্রীজাতিব গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়েলিজম ভাবে তাদের আইডিয়েলিজম্ তো নেই-ই রিয়েলিজম্ও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয়না।" (ঐ, পৃ. ৩৫০)।

৪২. ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ১৮-২৬।

৪৩. ঐ।

৪৪. দিলীপকুমার রায়কে আশালতা সিংহের চিঠি, ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ. ২৬-২৯।

৪৫. 'শেষ প্রশ্ন', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (রচনাটি প্রথমে নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত 'শরৎবন্দনা' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে 'The Golden Book of Saratchandra' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৩৬৯-৩৭০)।

৪৬. 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে এম. এন. রায়ের মন্তব্য : "Whoever will be responsible for the debut of Sarat Chatterjee's Dyanisian girl [i.e. Kamal] in the Western World, will surely pave the way for the **Nobel Prize for literature going to an Indian for the second time**. And believe me, for the second time, the receiver will be no less deserving than the first. Personally, I would place *Sesh*

Prasna above *Gitanjali*. My ability to appreceiate good literature may be questionable. But it is a matter of taste. *Sesh Prasna* is really a land-mark in Indian Renaissance...He [Saratchandra] advanced stage by stage—until producing the Dyonisian girl as a bold standard-bearer—no longer of revolt, but of revolution." (M. N. Roy, Fragments of A Prisoner's Diary, Vol. Three, 'Letters from Jail', Renaissance Publishers Pvt Limited, Calcutta 700 012, 1965, p. 6).

৪৭. 'Conflict between instinct and ideal', Subodh Chandra Sengupta (Source : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 386-387).

৪৮. 'শরৎচন্দ্র', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

দশম অধ্যায়

শরৎচন্দ্রের নন্দনচিন্তা

"পেশা আমার সাহিত্য; ...আমার বইগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারাই জানে আমি কোনোদিন কোনো ছলেই নিজেব ব্যক্তিগত অভিমত জোর করে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যায় আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্যরচনার সীমাবেখা। স্ত্রানত কোথাও একে লঙ্ঘন করতে আমি নিজেকে দিইনি। সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যিকের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ; বর্তমান কালে কোন্ পরিবর্তন উপযোগী এবং কোন্‌টার সময় আজো আসেনি, সে বিবেচনার ভার আমি সংস্কারকের উপরে রেখেই নিশ্চিন্তমনে বিদায় নিয়েছি।" ('তরুণের বিদ্রোহ')।

॥ ১ ॥

রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের নান্দনিক বোধ অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই বোধকে সুগ্রথিত আকারে চিন্তাঋদ্ধভাবে উপস্থিত করায় তিনি যত্নবান হননি। তাঁর জীবনের বড় অংশ কেটেছে ভারতের পথে-প্রান্তরে, ভারতবর্ষের বাইরে রেঙ্গুনে, সে সময়ে এক টুকরো ভেলায় জীবনসাগরে ভেসেছেন—উঠেছেন—পড়েছেন। নিজ জীবনেরই মতো সাহিত্যবিষয়ক মতের ক্ষেত্রেও তিনি অস্থির। তার একটি কারণ—শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ বিতর্কমুখে লেখা। এর মধ্যে সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে কোনো একটি মতকে সমর্থনের প্রয়াসও লক্ষণীয়। ফলে ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি এবং তিনি অচিরে নিজ মতের বিপরীত কথা বলেছেন, তা ইতিমধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে ('বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র') দেখিয়েছি। তাছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ তত্ত্ব রচনার ভূমিকাও শরৎচন্দ্র গ্রহণ করেন নি। এইসব কারণে 'শরৎচন্দ্রের নন্দনতত্ত্ব' —এই কথাগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিপরীতদিকে দেখা যায় তাঁর কিছু মত অপরিবর্তিত ছিল। বর্তমান আলোচনায় নানা দিক বিচার ক'রে শরৎচন্দ্রের নন্দনচিন্তার চরিত্রবিচারের চেষ্টা করব।

চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে (এমন কি উপন্যাসে), ঘরোয়া আলাপে সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে শরৎচন্দ্র যা বলেছেন তার পরিমাণ কিন্তু বেশি নয়। এর মধ্যে সাহিত্যের রূপরীতির প্রসঙ্গ এসেছে। একটু বেশি ক'রে আছে আপন সাহিত্যের আলোচনা। তাকে আত্মজের

সৌন্দর্যবিচার বলতে পারি। কখনো তার পক্ষে শরৎচন্দ্রের উত্তেজিত সমর্থন, কখনো তা কঠিন বাক্যে ক্ষতবিক্ষত। শরৎচন্দ্রের নন্দনচিন্তার আলোচনায় প্রথমে উপস্থিত করব দর্পণে শরৎপ্রতিবিম্ব।

॥ ২ ॥

শরৎসাহিত্যের আলোচনায় শরৎচন্দ্র

রেঙ্গুনে থাকাকালে মূলত চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্র মত প্রকাশ করেছেন। কলকাতায় পাকাপাকিভাবে আসার পর তার পরিমাণ কমেছে। তখন ঘরোয়া আলাপেই উৎসাহ বেশি। অবশ্য 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে তাঁকে আবার চিঠি লিখতে দেখা গেছে। এও লক্ষণীয়, পাঠকমহলে কম সমাদৃত রচনাগুলির প্রতি তাঁর ঈষৎ পক্ষপাত, এ যেন দুর্বল সন্তানের প্রতি পিতার অতিরিক্ত অপত্য স্নেহ।

শ্রীকান্ত

শ্রীকান্ত সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব সময়ান্তরে বদলেছে। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রকাশকালে এটিকে নিজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখতে আগ্রহী ছিলেন, পরে আবার তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। ১৫.১১.১৫ তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন : "শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে [আমার] কতকটা সম্বন্ধ তো থাকবেই।" এও বলেছেন, ঐ উপন্যাসের সম্পর্কে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া না জানা পর্যন্ত "শ্রীকান্ত আর একটি ছত্রও লিখবে না।" [১] কয়েক বছরের ব্যবধানে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে ঐ তথ্যের অস্বীকৃতি : " 'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বই তো নয়। ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।" [২] শরৎচন্দ্রের আত্মখণ্ডন আরো পরিষ্কার অন্য একটি চিঠিতে : "রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই। থাকলেও তাকে আবার দিদি বলা কিসের জন্যে, সে কি তোমার [লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়] কাছে এ সম্মান পাবার যোগ্য?" [৩]

'শ্রীকান্ত' দীর্ঘদিন ধরে শরৎচন্দ্রের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল। এই উপন্যাসের ৪র্থ পর্ব বিষয়ে দিলীপকুমার রায়কে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায়, নিজ মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা যেমন সেখানে আছে, তেমনি আছে দিলীপকুমারের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা : "উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ ব্যাপারটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য।...কিন্তু তোমার অভিমত চাই।" [৪] সেই কাঙ্ক্ষিত বাক্য শোনার পর উৎফুল্ল তিনি : "শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই। তোমার মতো একটি পাঠকও শ্রীকান্তর ভাগ্যে

জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাইনে।"[৫]

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধাবাবাহিকভাবে 'শ্রীকান্ত' প্রকাশকালে রচনার অংশবিশেষ পাঠকসম্প্রদায়ের একাংশের বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ : শরৎচন্দ্র এখানে 'পোদ' জাতি সম্পর্কে বর্ণহিন্দুদের গোঁড়ামির সমর্থক। '১২/১৪ খানি [প্রতিবাদ] পত্র' পাবার পর একটির উত্তর দেবার সময় শরৎচন্দ্র আত্মসমর্থন করেছেন : "কোনো জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করিনা এবং কাহারও হাতে জল খাইতে আমার বাধে না। বরঞ্চ, লোকের যখন বাধে সেইটাই আমার সব চাইতে বাধে।" লেখকের তরফে উক্ত জাতিভুক্ত মানুষদের এই আশ্বাস ছিল : "বই ছাপাইবার সময় এই ছত্রটা...আমি তুলিয়া দিব।" সেইসঙ্গে তাঁর গভীর অভিমানও চোখেও পড়ে : "আমার সকল লেখার সহিত আপনার [মহেন্দ্রনাথ করণ] পরিচয় থাকিলে এ সন্দেহ আপনার হইত না যে, উঁচু জাতকে সত্য সত্যই 'উঁচু' জাত মনে করিয়া তাহাদিগকে 'বড়' করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে বা 'নীচু' জাতিকে মনোবেদনা দিয়া হিউমার সৃষ্টি করিবার জন্য একথা লিখি নাই। বরঞ্চ উলটা।"[৬]

কাশীনাথ-বড়দিদি-চন্দ্রনাথ-দেবদাস

তরুণ বয়সের রচনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বহুল পরিমাণে নির্মোহ। অপরিমার্জিত অবস্থায় রচনাগুলি প্রকাশিত হোক, তা তিনি একেবারে চাননি। তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত সাহিত্যিক খ্যাতি ঐ লেখাগুলির জন্য ধূলিসাৎ হবে, এই আশঙ্কা শরৎচন্দ্রের ছিলই।[৭]

যেমন, 'কাশীনাথ' 'সাহিত্য' পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ার পর সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উপর শরৎচন্দ্র বেশ ক্ষুব্ধ। সেকথা প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠিতে লেখার সময় প্রমথনাথকে দলে টেনে ("তোমারও [প্রমথনাথের] ['কাশীনাথ'] ভালো লাগেনি") নির্দ্বিধায় নিজের রচনাকে তিনি ছিন্নভিন্ন করেছেন : "আমার তো অতি বিশ্রি লেগেছে। ধন্য সমাজপতি মহাশয়। এও প্রকাশ করেছেন!"[৮ক] "ওটা ছেলেবেলার হাত পাকানোর গল্প। ছাপানো তো দূরের কথা, লোককে দেখানোও উচিত নয়।"[৮খ]

'বড়দিদি' সম্পর্কেও শরৎচন্দ্রের একই মনোভাব (সেই 'বড়দিদি'—যা পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত!)। 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের মন্তব্য : "ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলে বোধকরি ভালো হইত।"[৯] ইতিমধ্যে নবম অধ্যায় 'শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা'য় উল্লেখ করেছি, যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে 'বড়দিদি' বইটির এক কপি উপহার দিয়ে শরৎচন্দ্র উপহার-লিপিতে বইটিকে 'ছেলেবেলার হিজিবিজি' বলেছেন।

'গল্প (প্লট) ঠিক' রেখে 'চন্দ্রনাথ'কে শৈল্পিক গুণঋদ্ধ করার জন্য 'একেবারে নূতন ছাঁচে' ঢালতে শরৎচন্দ্র ইচ্ছুক।[১০] প্রমথ ভট্টাচার্য অবশ্য এই পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি গল্পটির পুরনো আকারের প্রশংসাকারী। সুতরাং প্রমথনাথকে বেশ বিদ্রূপ ক'রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "চন্দ্রনাথ তোমার ভাল লাগবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় নাই, কেননা, ওটা আমার ভালো লাগেনি। একে তো ছেলেবেলার লেখায় স্বভাবতই

অপূর্ণতা বেশি, তাতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস রয়ে গেছে। এই উচ্ছ্বাস বস্তুটিতে আমার ভীষণ ভয়।" অবশ্য লেখাটির ভাষার প্রশংসা তিনি করেছেন : "ভাষাটা খুবই সরল —বোধকবি আশ্চর্য সরল এবং 'ডিরেক্ট', এটা অস্বীকার করা যায়না।" [১১] নিতান্ত অনিচ্ছুক মনে 'চন্দ্রনাথ' প্রকাশের অনুমতি দিলেও পাঠকের মত তাঁর অনুকূলে যাবে এমন কোনো আশা শরৎচন্দ্র করেন নি : "আমার ছেলেবেলার 'চন্দ্রনাথ'টা কি জানি কেউ পড়েছে কিনা! ওটা আমার দেবার ইচ্ছেই ছিলনা। ঐ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ক্রমশ হলে লোকের 'পেসেন্স' থাকেনা। তা যতই শেষে ভালো হোক।" [১২] অন্য অর্থে 'চন্দ্রনাথে'র প্রশংসাও শরৎচন্দ্র করেছেন, যখন তিনি 'চরিত্রহীনে'র ইমমরালিটি নিয়ে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের অভিযোগে ব্যতিব্যস্ত (প্রসঙ্গটি বর্তমান অধ্যায়ে ঈষৎ পরে উল্লিখিত)। শরৎচন্দ্রের মত : "চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে।...এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনোরূপ 'ইমমরালিটি'র সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। চরিত্রহীন আর্ট-এর হিসাবে এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু এরকম ধরনের নয়।" [১৩]

'দেবদাস' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য বেশ কঠোর। অন্তত তিনটি চিঠিতে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি লিখেছেন, "দেবদাস ভালো নয় প্রমথ।" [১৪] 'ভাবতবর্ষ' পত্রিকায় 'দেবদাস' প্রকাশের ব্যাপারে প্রমথনাথের উৎসাহ থাকলেও শরৎচন্দ্র তা চাননি। কারণ "বইটা একেবাবে মাতাল হইয়া বোতল বোতল [মদ] খাইয়া লেখা। [হাতের] লেখাগুলো পর্যন্ত আঁকাবাঁকা। যা মনে আসিয়াছিল তাই লিখিয়াছি।" [১৫] এমন কি 'দেবদাস'কে 'ইমমরাল' পর্যন্ত তিনি বলেছেন : "ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ...বেশ্যা চরিত্র তো আছেই, তাছাড়া আরো কি কি আছে বলে মনে হয় যেন।" [১৬]

রামের সুমতি

'রামের সুমতি' সম্পর্কে পাঠকদের মতামত শরৎচন্দ্রকে কিছুটা বিচলিত করেছিল। তিনি কখনো শুনেছেন 'রামের সুমতি'র তুলনায় 'বিন্দুর ছেলে' শ্রেষ্ঠ। 'রামের সুমতি' ও 'পথনির্দেশে'র তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিয়ে ভাগলপুর ও রেঙ্গুনের পাঠকদের মতভেদ হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে বিচারক স্থির ক'রে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছেন : "দ্বিজুবাবুকে আমার প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিও তো কোনটা শ্রেষ্ঠ! তাঁর কথাটাই ফাইন্যাল হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে।" [১৭] শরৎচন্দ্র নিজে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিলেন, " 'ইক্যুয়ালি ইন্টালিজেন্ট' লোকেদের মধ্যে এ রকম মতভেদ হয় কেন?" [১৮] শরৎচন্দ্র নিজে অবশ্য 'রামের সুমতি'র উপরে 'পথনির্দেশ'কে স্থান দিয়েছেন : "পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে, 'পথনির্দেশে'র কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে, অনেক নীচে।" [১৯] তাঁর কাছে 'রামের সুমতি'র মূল্য কতখানি, তাও শরৎচন্দ্র বলেছেন। বাঙালির 'আইডিয়েল অন্তঃপুরে'র ছবি এই গল্পে ফুটেছে। 'রামের সুমতি'র অনুসরণে 'প্রেমবর্জিত আমাদের বাঙালির ঘরের কথা' ('সিরিজ অব স্টোরিজ') তিনি লিখতে আগ্রহী 'যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়।' [২০] 'রামের

সুমতি' পড়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে শরৎচন্দ্র যথার্থ আনন্দিত হয়েছেন। হরিদাস লিখেছিলেন, "রামের সুমতির নারায়ণীর মতো একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে।" [২১]

বিন্দুর ছেলে

'রামের সুমতি' ধরনের বাঙালি ঘরের কথা 'বিন্দুর ছেলে।' 'সিরিজ অব স্টোরিজ' লেখায় শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা এই রচনাটির মধ্যে যে প্রকাশিত, তা নিজেই খোলসা ক'রে লিখেছেন : "['বিন্দুর ছেলে'তে] একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙালির ঘরের কথা। অনেকটা মেয়েদের জন্য—তারা যেন একটু শিক্ষালাভ করে—এই ইচ্ছায় লেখা। ঐ রামের সুমতির ধরনের, তবে বেশি 'ক্যারেকটার' আছে—তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে।" [২২] শরৎচন্দ্রের মনে হয়েছিল, 'বিন্দুর ছেলে' প্রমথনাথের ভালো লাগবে না। পরে পত্রোত্তরে প্রমথনাথের ভালো লাগার কথা শুনে তিনি যথার্থ আনন্দিত : " 'বিন্দুর ছেলে' তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশি হইলাম। বোধহয় ওটা মন্দ হয়নি, কেননা অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে 'রামের সুমতি'র চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি। প্রায় 'পথনির্দেশে'র কাছাকাছি।" [২৩] পরেও প্রমথনাথকে এবিষয়ে লিখেছেন : " 'বিন্দুর ছেলে' গল্পটার অত্যন্ত সুনাম হয়েছে। অনেকের মত এইটাই 'বেস্ট'।" [২৪]

পথনির্দেশ

'পথনির্দেশ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের কিছু অংশ একটু আগে দেখেছি। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চারটি চিঠিতে 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'র তুলনায় 'পথনির্দেশ'কে তিনি উচ্চ শিল্প বলেছেন। প্রমথনাথকে উপন্যাসটি পড়তে অনুরোধ ক'রে গর্বিত লেখকের মন্তব্য : "শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভালো লেগেছে। (যদিও একটু শক্ত গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার)।" [২৫] কিন্তু গল্পটির কটাক্ষপূর্ণ সমালোচনা যখন প্রমথনাথের কাছ থেকে এসেছিল, তখন শরৎচন্দ্র নিজেকে আর সামলাতে পারেন নি : "লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া?)। হয়তো তোমার কথাই সত্য।...তুমি আমার 'পথনির্দেশ'কেই কটাক্ষ করিয়া বোধকরি বলিয়াছ। বুঝিতেছি ওটা তোমার ভালো লাগে নাই। তাই যদি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, আর গল্প উপন্যাস প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা তো নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও উচিত হইবে না। এক একটা 'পেন্টার' যেমন 'কালার ব্লাইণ্ড' থাকেন, তুমিও তাই।" [২৬] 'পথনির্দেশ' সম্পর্কে সমালোচকমহলের মনোভাব শরৎচন্দ্রের আনন্দ-বেদনার কারণ। "দ্বিজবাবু [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] বলেন, ['পথনির্দেশ'] গল্পের আদর্শ।" [২৭] আবার শরৎচন্দ্র শুনেছেন : " 'পথনির্দেশ'টা 'ইম্‌মরাল্‌'!!" [২৮] যদিও শরৎচন্দ্রের এই বিশ্বাস ছিলই 'পথনির্দেশ' লেখা যে-কোনো লেখকের কর্ম নয়, "ও রকম গোলযোগ 'সারকামস্‌টেনস্‌'-

এর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-য-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়তো ধৈর্যের অভাবে শেষ হবার পূর্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে।"[২৯] শরৎচন্দ্রের হাতে তা যে হয়নি, সে বিষয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর প্রশংসাযুক্ত চিঠির উল্লেখ নবম অধ্যায়ে করেছি।

চরিত্রহীন

'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহ পেয়েছিল, তা নবম অধ্যায় 'শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা'য় উল্লেখ করেছি। এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র একাধিক মানুষকে চিঠি লিখেছেন। সর্বাধিক প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে। অন্য প্রাপকদের মধ্যে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়ও আছেন। দেখা গেছে, 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ত্রিস্তর ধারণা। প্রথমত, উপন্যাসটি সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া অনুমান ক'রে তাঁর আশঙ্কা ; দ্বিতীয়ত, 'চরিত্রহীনে'র 'সচ্চরিত্রতা' প্রমাণে বিদেশী এবং সমকালীন কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের নৈতিক চরিত্র বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন ; তৃতীয়ত, 'চরিত্রহীনে'র পক্ষে তাঁর জোরালো সওয়াল।

'চরিত্রহীনে'র রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই একাধিক পত্রিকা-সম্পাদক উপন্যাসটিকে দখলে আনতে চেয়েছেন (যেমন 'যমুনা', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ'), যদিও লেখাটি আংশিকভাবে 'যমুনা' ছাড়া অন্যত্র ছাপা হয়নি। ঐ দড়ি টানাটানি খেলার ইতিবৃত্ত জানা গেছে আগ্রহী ব্যক্তি এবং শরৎচন্দ্রের পারস্পরিক পত্র বিনিময় থেকে।[৩০]

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন।[৩১] কিন্তু লেখকের তরফে সাড়াশব্দ না থাকায় তাঁর উৎকণ্ঠিত মনোভাব এইরকম : "চরিত্রহীনের জন্য আমরা যতই ব্যস্ত হইতেছি, তুমি ততই আমাদের সম্বন্ধে নির্দয়রূপে উদাসীন হইয়া বসিয়া আছ। ...তোমার চরিত্রহীন চাই-ই চাই।...চরিত্রহীন পাঠাতে এত বিলম্ব কচ্ছ কেন? খোলসা ক'রে লিখবে কি? আমাদের অবস্থা তো বুঝলে, [চরিত্রহীন] নইলেই চলবে না।"[৩২] প্রমথনাথ তখনো পর্যন্ত 'চরিত্রহীন' পড়েন নি, এবং প্রমথনাথের রসবোধের উপর শরৎচন্দ্রের বিশেষ আস্থা ছিল কিনা সন্দেহ। শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "চরিত্রহীন তোমাকে পড়তে দিতে পারি, কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। এটা **চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন**—তোমাদের সুরুচির দলে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে।"[৩৩] "এ লেখার ধরন তোমাদের কিছুতেই ভালো লাগিবে না। 'অ্যাপ্রিসিয়েট' করিবে কিনা সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ।...শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চরিত্রহীন মনে করিও না।...ওটা বটতলার বই নয়। রাঁড়ের বাড়ির গল্পও নয়।" ভালো না লাগা সত্ত্বেও প্রমথনাথ যদি 'চরিত্রহীন' প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন, তখন লেখাটি সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা শরৎচন্দ্র প্রকাশ করেছেন : "তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয়, এই চেষ্টা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাইনা।...যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহার কিছুতেই হইতে পারিবে না, উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না।"[৩৪]

শরৎচন্দ্রের আশঙ্কা অবিলম্বে সত্যে পরিণত হয়। 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি পড়ার পরে প্রমথনাথের চিঠিতে 'চরিত্রহীনে'র বিরূপ সমালোচনা পড়ে শরৎচন্দ্রের ক্ষুব্ধ উক্তি : "প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই!...আর কেউ এ রকম করিয়া বাংলায় লিখিযাছে বলিয়া জানিনা। এইতেই ভয় পেলে ভাই?" [৩৫] সেইসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে 'ভাবতবর্ষ' পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মতও জেনেছেন শরৎচন্দ্র যা তাঁর পক্ষে যায়নি। হরিদাস বলেছিলেন : "ওটা এত 'ইমমরাল' যে কোনো কাগজেই বাহির হইতে পারে না।" [৩৬] এই বই না ছাপিয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা কোন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে, তা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "বোধকরি ম্যানাসক্রিপ্ট পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কিভাবে শেষ হয়, কোন কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মানিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়তো একদিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে।" [৩৭]

পাঠকের রসবোধের উপর লেখকের হাত নেই বলেই পাঠকের গায়ে-পড়া উপদেশও সহ্য করা তাঁর পক্ষে শক্ত। প্রমথনাথের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া : "তুমি যে লিখিয়াছ চরিত্রহীন অপরের নামে প্রকাশ করিতে, এইটাতেই [আমার] সবচেয়ে বেশি [ব্যথা]। আমি কি এতই হীন?" [৩৮]

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি কাকুতিমিনতি ক'রে চেয়ে নিয়েও তা ছাপেনি, এ দুঃখ শরৎচন্দ্র পরবর্তী জীবনেও ভুলতে পারেন নি। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন : "আমার 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি সাধ্যসাধনা ক'রে যে-কাগজ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তা ছাপা হলো না কেন? অবশ্য আমি তাঁদের দোষ দিইনা, কারণ চরিত্রহীন তো সত্যিসত্যিই একদল পাঠক গ্রহণ করতে পারেন নি। এমন কি এমন কথাও আমার কানে গেছে, কোনো এক সম্পাদক-মশাই অশ্লীলতার অপরাধে একে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আমাদের দেশে বঙ্কিমবাবু সাহিত্যের যে-পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার বাইরে যে আর পথ থাকতে পারে, দেশের লোকের অনেকেরই সেই বোধ ছিলনা। মানুষ যে জড়পদার্থ নয়, তার মন বলে যে একটা বস্তু আছে, এ বোধটা অনেকেরই তখন জাগেনি। আমি কিন্তু মনের বল হারাই নি।" [৩৯] 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আচরণে শরৎচন্দ্র কি পরিমাণ আহত হয়েছিলেন, তার উল্লেখ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখায় পাওয়া যায় : " 'চরিত্রহীনে'র বিরুদ্ধে চারিদিকে যখন নিন্দার ঝড় উঠেছে, তখনো তিনি [শরৎচন্দ্র] অটল ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো ধুরন্ধর সাহিত্যিক যখন 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তিনি মনে মনে অল্প আহত হননি।" [৪০]

'চরিত্রহীন' প্রকাশের জন্য 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের আগ্রহের ইঙ্গিত আছে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের চিঠিতে : "যমুনা এত ছোট (আকারে) কাগজ যে তাতে তোমার 'চরিত্রহীন' বার হতে পারে না।" [৪১] 'চরিত্রহীন' ছাপানোয় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আগ্রহে উদ্বিগ্ন ফণীন্দ্রনাথকে আশ্বস্ত ক'রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "আমার এবং আপনার

মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়।...কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন।" [৪২] ত্রস্ত ফণীন্দ্রনাথও 'চরিত্রহীন' না পড়েই তার লেখককে বইটি সম্পর্কে শংসাপত্র পাঠিয়েছেন, তা জেনেছি শরৎচন্দ্রের চিঠিতে : "তাহার [ফণীন্দ্রনাথের] বিশ্বাস আমি এমন কিছুতেই লিখিতেই পারিনা, যাহা 'ইম্‌মরাল'।...সে...বিশ্বাস ক'রে চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" [৪৩] তারপর 'যমুনা'য় 'চরিত্রহীনে'র পাঠকদের প্রতিক্রিয়া দেখে শরৎচন্দ্রকে শশব্যস্ত ফণীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম : "চরিত্রহীন ক্রিয়েটিং অ্যালার্মিং সেনসেশন।" [৪৪] এইবার সম্পাদককে লেখকের আশ্বাস দেবার পালা : "লোকে যতই নিন্দা করুক, যারা যত বেশি নিন্দা করিবে, তারা তত বেশি পড়িবে। ওটা ভালো হোক মন্দ হোক, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে ['যমুনা'র ব্যবসা মার খাবার ভয় নেই]।" [৪৫] "ইহার শেষ কয়েক চ্যাপ্‌টার যথার্থই গ্র্যাণ্ড করিব। লোকে যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্তিত হইবেই।...আর মরাল হৌক, ইমমরাল হৌক, লোকে যেন বলে, 'হ্যাঁ একটা লেখা বটে।' আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি? বদনাম হয় তো আমার [হবে]। তাছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? চরিত্রহীন এর নাম।—তখন পাঠককে তো পূর্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়।" [৪৬]

মুখ বাঁকিয়ে অন্যের সমালোচনা শুরু করলেন শরৎচন্দ্র। তুলে তুলে দেখাতে লাগলেন অন্য উপন্যাসে অনুরূপ চরিত্র আছে কিনা! প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখলেন : "কাউন্ট টলস্টয়ের 'রিসারেকশন' পড়েছ কি? 'হিজ বেস্ট বুক' একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া।" [৪৭] "রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! ('কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়] এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন! সোনার হরিণ কত কী কীর্তিই শুরু করিয়া দিয়াছে! (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত! 'ডিটেকটিভ স্টোরি' ছাড়া তিনি প্রায় কিছুই লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠানদি'-গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা, তেমনি এও)। কোনো দোষ নাই কেননা নাম 'রত্নদীপ'! (এবং লেখক প্রভাতবাবু) আর আমার চরিত্রহীন যত অপরাধে অপরাধী!" [৪৮]

নিজ গ্রন্থের চরিত্রবিচার ক'রে শরৎচন্দ্র আত্মসমর্থন করেছেন : তিনি এথিকসের ছাত্র এবং বিষয়টি "কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করিনা।...আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখিনা, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি—এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায়না।" [৪৯] সুতরাং 'চরিত্রহীন' "ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল 'এথিকস্' আর 'সাইকোলজি'! ধর্ম নয়।" [৫০] "আমি এখনো স্বীকার করিনা,...চরিত্রহীনে এক বর্ণও ইম্‌মরালিটি আছে।" [৫১] চিঠির পর চিঠিতে লিখেছেন : "এ একটা 'সায়েন্টিফিক সাইকো : অ্যাণ্ড এথিক্যাল নভেল'।" [৫২] স্ফীত অহংকারের প্রকাশও আছে : "সাবিত্রীকে আর নিতান্ত মেসের ঝি রাখিনি। প্রথম থেকেই মানুষে তাকে যেন অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে উপায় করেছি। বড় মন্দ হয়নি প্রমথ!" [৫৩] "যে লোকে এক মেসের ঝি-কে আরম্ভেই টানিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা

জানিয়াই করে।"[৫৪] " 'চরিত্রহীন'কে আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সায়েন্টিফিক পথে চালিয়ে নিয়ে গেছি।"[৫৫] "আমার সাবিত্রী মেসের ঝি ছিল—বেশ্যা ছিলনা। সে ছোট কাজ করত, কিন্তু সতীত্বের দিক থেকে কারুর চেয়ে ছোট ছিলনা।"[৫৬] আবার হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মতো পাঠকের অভিনন্দন পেয়ে স্পষ্টই তিনি খুশি : "আমার লেখার উপর আপনার অনুগ্রহ দেখে সত্যই বড় সুখী হয়েছি।"[৫৭] 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে এই শেষ সিদ্ধান্ত শরৎচন্দ্রের ছিল : " 'কাল' আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দুইই করিবে, সেজন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।"[৫৮]

১৯১৩-এ হেমেন্দ্রকুমার রায়কে উপরিউক্ত চিঠি লেখার কুড়ি বছর পরে 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে পুনশ্চ বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। এবারে বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন (প্রসঙ্গটি নবম অধ্যায় 'শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা'য় উল্লেখ করেছি)। তা পড়ে অতিশয় ক্রুদ্ধ শরৎচন্দ্র সমব্যথী দিলীপকুমার রায়কে চিঠিতে লিখলেন : "বুদ্ধদেব বসু লিখেছে সাবিত্রীর মতো মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসেই পড়ে থাকতুম। কিন্তু মেসে পড়ে থাকলেই হয়না—সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায়না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তাছাড়া ছেলেটি [বুদ্ধদেব] একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি শ্রেণীর মেয়ে নয়।" শরৎচন্দ্রের খোঁচা—বুদ্ধদেব কি সতীশের মতো হৃদয়বান নাকি? তাঁর আলোচনা ক্রমে আরো প্রখর এবং বুদ্ধদেবের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার উপর কঠিন আঘাত : "সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে।...হয় নিজের অনেক টাকা কিংবা কোনো রাজপুত্র-বন্ধুর বহু টাকা খরচ না-হলে উপবের স্তরে প্রবেশাধিকার মেলে না। শুধু রাস্তা থেকে যারা লোক ধরে নিয়ে খোলার ঘবে গিয়ে ঢোকে তাদের পরিচয় [অল্প পয়সায়] মেলে। গবীবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও [বুদ্ধদেব] শ্রীকান্তের টগর ও বাড়িউলিকেই চেনে।"[৫৯]

বিরাজ বৌ

'বিরাজ বৌ' তাঁর অন্যান্য রচনার সমান মানে পৌঁছতে পেরেছে কিনা, উপন্যাসটির রচনাকালেই তা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সংশয় ছিল। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লঘু চালে লিখেছেন : "গল্পটা ['বিরাজ বৌ'] খানিক লিখেছিলাম—কিন্তু তোমার এমনি নামের মহিমা যে সেটা একেবারেই কদাকার হয়ে উঠেছিল ; শেষ না হলে কোনোমতেই বলা চলেনা ছাপার উপযুক্ত কিনা।"[৬০] 'বিরাজ বৌ' সমাপ্তির পরে স্বস্তির শ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র বলেছেন : "তোমার জন্যে যেটা লিখতে লিখতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা শেষ হলো। ['বিরাজ বৌ'] নিতান্ত মন্দ হয়নিই বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মস্ত বড় হয়ে গেল।"[৬১] পূর্ববর্তী নবম অধ্যায়ে দেখেছি যোগেন্দ্রনাথ সরকারের পরামর্শে 'বিরাজ বৌ'-র শেষাংশ শরৎচন্দ্র পরিবর্তন করেছিলেন। সেকথা প্রমথনাথকে না জানিয়ে, যোগেন্দ্রনাথ প্রমুখ রেঙ্গুনবাসীদের যে এই উপন্যাসটি ভালো লেগেছে, তা শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছেন : "এখানে [রেঙ্গুনে] আমার গুটিকতক সমঝদার সাহিত্যিক বন্ধু

আছেন, তাঁদের মতে আমার অপরাপর গল্পের চেয়ে—আর্ট প্রভৃতি হিসাবে, এবং লেখার হিসাবেও 'ফার মোর এক্সেলেন্ট'—তবে আমি নিজে ঠিক সেকথা বলিতে পারিব না, [সবিনয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন] আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে নিজে ঠিক 'জাজ' নই। তোমরা ভাল বলিলেই এখন সার্থক হয়। একটু মন দিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিও [এবার বিনয়ের পর্দা সরিয়ে আত্মশ্লাঘার প্রকাশ] — তবে এটা অবশ্য বলিতে পারি, তোমাদের কাগজে এ পর্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার চেয়ে কোনোমতেই নিকৃষ্ট হইবে না।" [৬২] ঈষৎ ভয়ও তাঁর ছিল পাছে 'বিরাজ বৌ'-কে 'ইমমরাল' দাগা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং প্রমথনাথকে অনুরোধ : "গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িও এবং 'ইমমরাল' ইত্যাদি ছুতা করিয়া রিজেক্ট করিও না।" [৬৩] শরৎচন্দ্র ধরে নিয়েছিলেন 'বিরাজ বৌ' প্রমথনাথের ভালো লাগবে না। সুতরাং কাতর উক্তি : "তোমার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আমার ভয় ঘুচিবে না, এ গল্পটা তোমাদের কাছে 'ইমমরাল' বলিয়া মনে হইয়াছে কিনা। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি রেজিস্টার্ড ফিরাইয়া পাঠাবে। কাহাকেও জানিতে দিবে না, তোমাকে কোনো কিছু পাঠাইয়াছিলাম কিনা।" [৬৪] তবে পাঠকদের তরফে তীক্ষ্ণ সমালোচনা যে ছিল এবং শরৎচন্দ্রের চিঠিতে তার উল্লেখও আছে : "বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা গ্লান জন্মেছে।...বিরাজ বৌ নিয়ে...মানুষ ঐটুকু খুত পেয়েই হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে...।" [৬৫]

বৈকুণ্ঠের উইল

'বৈকুণ্ঠের উইল' সম্পর্কে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্রের অগ্রিম সোৎসাহ ঘোষণা : "ভালোই হবে। কমেডি হবে, ট্রাজেডি নয়। ...আমার মনে তো বড উৎসাহ হয়েচে যে চমৎকার হবে।" সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র প্রভাব এখানে পড়েছে, তাও জানাতে তিনি ভোলেন নি : "এ গল্পটা গোরার পরেশবাবুর ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের [মধ্যে] বলতে [গেলে] অনুকরণ। তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প।...[এরপর নিজেকে একটু বাঁচিয়ে লিখেছেন] তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার জো নেই।" [৬৬]

পল্লীসমাজ

'পল্লীসমাজ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণায় স্তরভেদ আছে। কখনো তাঁর মনে হয়েছে, "এ সকল বস্তু প্রবন্ধ হইলেও হইতে পারিত।" [৬৭] কখনো তাঁর সুনিশ্চিত প্রত্যয় : "পল্লীসমাজ সম্বন্ধে কোনো কথাই [আর] আমার বলবার নেই। [বইটা] নির্ভুল হয়েছে।" [৬৮] আবার পাঠকের সমালোচনায় উৎপীড়িত শরৎচন্দ্র লিখেছেন শারীরিক অসুস্থতার জন্যই পল্লীসমাজকে সুগঠিত শিল্পকর্ম করতে পারেন নি। [৬৯] "পল্লীসমাজ আমার নিজের খেয়ালমতো যাহোক একটা কিছু লিখেছিলাম।" [৭০] অন্যদিকে কোনো পাঠকের ভাললাগার খবর পেয়ে চিঠিতে তাঁর খুশি মন—পল্লীসমাজের দুরবস্থার প্রতি

মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই বইটা লেখা। রেঙ্গুনের পাঠকের কাছে 'পল্লীসমাজ' প্রশংসিত হওয়ায় শরৎচন্দ্র আনন্দিত : "এখানে [রেঙ্গুনে] পল্লীসমাজ সম্বন্ধে লোকে নিন্দা অখ্যাতি করে নাই—সেই আমার লাভ।" [৭১] তিনি বলেছেন এ বিষয়ে তাঁর গভীর চিন্তা ঐ উপন্যাসে আছে : "[পল্লীগ্রামের অবনতির] প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে।" প্রতিকারেচ্ছু মানুষগুলিতে বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জন ক'রে মুক্ত দৃষ্টি হয়ে পল্লীগ্রামে ফিরতে হবে। তবেই পল্লীর সার্থক উন্নয়ন সম্ভব। [৭২]

'পল্লীসমাজ' রচনার কারণ শরৎচন্দ্র চিঠিতেই ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রাম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত কিছু শহুরে মানুষের অলীক কল্পনাস্ফীত গোলককে বায়ুশূন্য করার উদ্যোগ ঐ উপন্যাসের মধ্যে তিনি গ্রহণ করেছেন। "শহুরে লোকেরা কল্পনা করিয়া পল্লীগ্রামের যে-সকল সুখ্যাতি প্রচার করেন, অনেক সময়েই যে তাহা যথার্থ নয়, বরঞ্চ পল্লীসমাজ ক্রমশ অধঃপতনেই যাইতেছে, এই সত্য কথাটা এই পল্লীসমাজ বইটাতে বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।" [৭৩] অন্যত্র দেখেছি, 'পল্লীসমাজে'র রমার সঙ্গে 'শেষ প্রশ্নে'র কমলের তুলনা তিনি করতে চাননি, কারণ সুখে দুঃখে রমার মতো মানুষদের কাছে পাওয়া যায়, কমলকে নয়। [৭৪]

রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ষোড়শী' নাটকের বাস্তব ভিত্তি সমর্থন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ'কে 'ষোড়শী'র সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য 'পল্লীসমাজ' 'সত্য মিথ্যেয় জড়ানো।' 'ষোড়শী'র ভিত্তি 'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনা।' [৭৫] এই দুই ক্ষেত্রে পাঠকের সমাদর প্রচুর হলেও লেখকের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যের কাছে কল্পনা পরাস্ত হয়েছে—তাঁর বিশ্বাস। কেননা "জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না।" [৭৬] তথ্যের ভিত্তিতে কল্পনাশ্রিত সাহিত্যের জন্ম। কল্পনার মিশেল না থাকলে সাহিত্য নিছক বস্তুপিণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। কথাশিল্পী হিসাবে শরৎচন্দ্রের তা বিলক্ষণ জানা ছিল।

গৃহদাহ

'বিরাজ বৌ'-এর বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠিতে লিখেছেন, এবার তিনি 'শিক্ষা' গ্রহণ ক'রে 'আটঘাট বেঁধে' 'গৃহদাহ' লিখবেন। কোনো 'ফাঁদে' আর পা দেবেন না। "আমি হরিনাম গাইব। দেখি এতে কি হয়!" [৭৭] 'হরিনাম' শব্দটি যদি 'ব্রাহ্মনাম' অর্থে শরৎচন্দ্র বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে 'গৃহদাহ' পড়ে হিন্দুসমাজে তোলপাড় ওঠার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু ব্রাহ্মরা যে অত্যন্ত কুপিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ('শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা') শরৎচন্দ্রের পক্ষে রমা নিয়োগী অথবা বিপক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট।

শেষ প্রশ্ন

ঔপন্যাসিক জীবনের শেষ পর্বে লিখিত 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে ইণ্টেলেকচুয়াল হতে সচেষ্ট শরৎচন্দ্রকে যেভাবে আধুনিক সাহিত্যিকগোষ্ঠী আক্রমণ করেছিলেন, তা নবম অধ্যায় 'শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা'য় দেখেছি। প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত শরৎচন্দ্রকে তাঁর নানা চিঠিতে পাওয়া যায়। সেসব চিঠিতে একাধিক স্বর। যথা, তাঁর গভীর মর্মপীড়া; অনুরাগী পাঠকের মন্তব্যে সেই ক্ষতে শীতল প্রলেপ; স্বমুখে উপন্যাসটির গুণকীর্তন; অন্যের শংসাপত্র সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ; 'শেষ প্রশ্ন' বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ।

'শেষ প্রশ্ন'কে লক্ষ্য ক'রে সমালোচকদের নিক্ষিপ্ত শরগুলি শরৎচন্দ্রের মর্মবিদ্ধ করেছিল। বিশেষত, নিন্দাত্মক রচনাগুলি যাতে তাঁর নজরে পড়ে, সেজন্য তাঁর বন্ধুদের প্রয়াসের অবধি ছিলনা, সেটা আরো বেশি বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় : " 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌচেছে। অন্তত যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু, সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যারা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে লাল-নীল-সবুজ-বেগনী নানা রঙের পেনসিলে দাগ দিয়ে, তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌছল কিনা।" ('সুমন্দ ভবনে'র শ্রীমতী...সেনকে লেখা পত্র, 'বিজলী' ষষ্ঠ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা)।

আবার অন্তরঙ্গ মানুষরা 'শেষ প্রশ্নে'র প্রশংসা করলে তিনি কত না খুশি। দিলীপকুমার রাযকে লিখেছেন : "শেষ প্রশ্ন পড়ে খুশি হয়েছ শুনে ভারি আনন্দ পেলাম।" [৭৮] রাধারানী দেবীকে লিখেছেন : " 'শেষ প্রশ্ন' তোমার ভালো লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাংলাদেশে হয়তো পাবো না; শুধু গালিগালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু দেখছি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কয়েকখানি চিঠি পড়লাম, একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মতো বিতরণ করতেন।" [৭৯] ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে প্রায় একই কথা শরৎচন্দ্র লিখেছেন : " 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটা যে তোমার এতখানি ভালো লেগেছে, এতে ভারি আনন্দ পেলাম।...এ বই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোনো আনন্দই পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হু হু ক'রে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মতো নিশ্চিন্ত আরামে অর্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলেনা।...তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে কেউ কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে।" [৮০]

এইসব সহমর্মী মানুষদের কাছে শরৎচন্দ্র মন খুলে 'শেষ প্রশ্নে'র চরিত্রবৈশিষ্ট্য কী, জানিয়েছেন। যেমন,

"শেষ প্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। 'খুব করব, গর্জন ক'রে নোংরা কথাই লিখব' এই মনোভাবটাই

অতি-আধুনিক সাহিত্যের সেণ্ট্রাল পিভট নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।"[৮১]

"অতি-আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত,...বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেল—সময় হলো না দিয়ে যাবার—তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষ প্রশ্নে করেছি।"[৮২]

"এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা আছে,...আরো একটা কথা মনে ছিল, সে অতি-আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম এইদিকে একটা ইশারা রেখে যাব।...এই আভাসটুকু হয়তো পাবে যে নোংরা না করেও অতি-আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, ইন্টেলেকটের বলকারক আহার্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রসসাহিত্যের একটা বড় কাজ।"[৮৩]

শরৎচন্দ্রের আত্মখণ্ডন এখানে চোখে পড়ে। ২৪ ভাদ্র ১৩৪০-এ ইন্টেলেকচুয়াল গল্প সম্পর্কে গভীর বিতৃষ্ণায় লিখেছেন : "ইন্টেলেকচুয়াল গল্প বলে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখিনি কিংবা দেখেও যদি থাকি চিনতে পারিনি। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ ক'রে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে।"[৮৪] হেমেন্দ্রকুমার রায়কে একাধিকবার তিনি বলেছেন : "ইন্টেলেকচুয়াল গল্প কাকে বলে হেমেন্দ্র? ও-বস্তুটি তো আমি জানিনা। অভিজাত সাহিত্যিক বলে কাদের? যাঁরা লোককে ধাপ্পা দিয়ে, ধাক্কা মেরে চমকে দেন?"[৮৫]

'শেষ প্রশ্ন' শরৎচন্দ্রের কাছে যেমন ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস, তেমনি প্রচারধর্মী সাহিত্য। জোর গলায় বলেছেন, তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার পরে অন্যদের মতো তাকে অস্বীকারের প্রবৃত্তি তাঁর নেই (" 'প্রচার করলে প্রচার করলে, দুয়ো দুয়ো' রব তুলে দিলেই যারা লজ্জায় অধোবদন হয় এবং 'না না' বলে তারস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে আমি তাদের দলে নই।" 'সুমন্দ ভবনে'র শ্রীমতী...সেনকে লেখা পত্র, 'বিজলী' ষষ্ঠ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা)।

বাংলাদেশের ইন্টেলেকচুয়াল মহল থেকে 'শেষ প্রশ্নে'র সমাদর হবার সম্ভাবনা কম বুঝে পণ্ডিচেরীতে দিলীপকুমার রায়কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "অরবিন্দ কি বাংলা পড়তে পারেন? শেষ প্রশ্ন পড়তে দিলে কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন? জানি এসব পড়ার সময় তাঁর নেই—কিন্তু পড়তে বলায় কি অপমান বোধ করবেন?...তাঁর মতো গভীর পণ্ডিত মানুষের মতামত জানতে পারলে আমার লেখার ধারাটা হয়তো আর একটা পথ খোঁজে। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে মানুষকে অনেক কথা শুনতে বাধ্য করা যায়, একথা কি শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না? যাকে হালকা সাহিত্য বলে তার প্রতি কি তাঁর অত্যন্ত বিরাগ?"[৮৬]

'শেষ প্রশ্ন' বিরোধী সমালোচকদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করার সময় শরৎচন্দ্র ভাষার শালীনতা পর্যন্ত রক্ষা করেন নি (সে মন্তব্য অবশ্য ব্যক্তিগত চিঠিতে)। দিলীপকুমার রায়কে লিখেছেন : "তোমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় শেষ প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন।...তাঁর 'মোদ্দা' কথাটা এই যে যেহেতু গোরা সাহেবের ছেলে, সেই হেতু 'কমল' চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর কিছু নয়।...দুঃখ এই যে এরাও কলম ধরে এবং তাও ছাপা হয়। কারণ

নিজেদের কাগজ ['পরিচয়'] রয়েছে। অহংকার এই যে ফরাসী জানি জার্মান জানি। আবার শেষের দিকে অনুপ্রাসের ঝংকারে প্রার্থনাটুকু আছে—হে ভগবান! রূপকার না হইয়া উপকার করেন—না এমনিই কি একটা!" এ চিঠি ব্যক্তিগত বলে সাহিত্যিক শালীনতার দায়রক্ষার প্রয়োজন তাঁর হয়নি : "যেহেতু নীরেনের চোখ দুটো কটা, সেই হেতু, তার বুদ্ধিটা ঠিক বেড়ালের মতো।[৮৭] অন্নদাশংকর প্রসঙ্গেও শরৎচন্দ্রের মন্তব্য একই প্রকার : "আর ঐ যে লীলাময় রায়,...বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েও আমার নামেব সঙ্গে ওর নাম সংযুক্ত হবে মনে হলেও সমস্ত মন যেন লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এর বেশি আমি ও লোকটার সম্বন্ধে আর বলতে চাইনে। হয়তো একদিন তোমরাও দেখতে পাবে যে, বিদেশী শাসকের হাতে যেসব স্বদেশী মুগুর দেশের কল্যাণে সবচেয়ে বড় আঘাত করে এই ছোকরাটি সেই জাতের।"[৮৮]

নারীর মূল্য

'নারীর মূল্য' শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছিল। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অন্নদাশংকর বায়ের প্রশস্তির রূপ নবম অধ্যায়ে ('শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা') দেখেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রকে অবহিত করেছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য : "ডি..এল. রায় 'ওয়াজ ইন একসট্যাসি ওভার ইট।' তিনি বলিলেন যে, আমি লিখলেও উহা ছাড়া আর কিছু লিখিতে পারিতাম না। বরং অত রেফারেন্স দিতে পারিতাম না। আর তোমার 'এরিউডিশান'-এর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"[৮৯] আনন্দে উৎফুল্ল শরৎচন্দ্র সে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে : "প্রমথ লিখিতেছে,...ডি. এল. রায় এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায়না। দিদির নারীর মূল্য নাকি 'অমূল্য' হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন,...[এমন] প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় আর কখনো পড়েন নাই।"[৯০] শুধু বিখ্যাত মানুষের প্রশংসা নয়, অনেক 'অপরিচিত' মানুষের চিঠিও শরৎচন্দ্র পেয়েছেন। কেবল মধু নয়, হুলের খোঁচাও খেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে 'নারীর লেখা' প্রবন্ধে নিরূপমা দেবীর লেখা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র কটাক্ষ করেছিলেন। তাতে ক্রুদ্ধ নিরুপমা-ভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট 'নারীর মূল্য' পড়ে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন, "শরৎদার 'নারীর মূল্য' জ্বালাতন করিয়াছে। [অন্যদিকে] নিজেই 'নারীর লেখা'য় মেয়েমানুষের পাণ্ডিত্যের চেষ্টাকে খুবই গালাগালি করিয়াছেন।...আমি বুড়িকে এই স্ত্রী-নামধারী উদ্ধত মহাপুরুষের অথবা স্ত্রীলোকের স্বত্বরক্ষাকারী 'ডন কুইক্সোটোর' কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছি।"[৯১] সৌরীন্দ্রমোহনেব মারফত এই সংবাদ পেয়ে বিচলিত শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' পরবর্তী কিস্তি আর লিখতে চাননি (" 'নারীর মূল্য' আর লিখিব না।") (যদিও পরে তা লিখেছেন)। ঘরের মানুষের (বিশেষত তিনি যদি নিরুপমা হন) আঘাত কতখানি অসহনীয়, শরৎচন্দ্র তা চিঠিতে প্রকাশ করেছেন।—"পুটুকে [বিভূতিভূষণ] লিখিয়া দিলাম, বুড়ি [নিরুপমা] যেন এ সম্বন্ধে কিছু না লেখে। লেখার প্রতিবাদ আমার সহ্য হয়না।"[৯২] ঐ প্রবন্ধের জন্য আত্মীয়দের ব্যবহারও শরৎচন্দ্রকে বিশেষ দুঃখ দিয়েছিল : "আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন,

তাহা লিখিয়া জানানো যায় না। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছিলেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন —ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দুধর্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই, ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র।...আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন, আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু।"[৯৩]

'নারীর মূল্য' প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মর্তব্য। 'শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা' নামক নবম অধ্যায়ে দেখেছি, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন, 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য তিনি 'নানা প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে' লিখবেন। সে সত্য যে তিনি রক্ষা করেছেন, তা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীর সংলাপে দেখা যায়। 'নারীর মূল্যে' পুরুষের চোখে নারীর রূপের মূল্য বিষয়ে শরৎচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি কিরণময়ীব উক্তিতে : "সন্তান-ধারণের জন্য যে-সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী, তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতেব সাহিত্যে, কাব্যে এই [লক্ষণের] বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা।" যেদিন নারীর সন্তানধারণের ক্ষমতা শেষ হয়, রূপ যায় ঝরে, পুরুষের কাছেও নারী হয়ে পড়ে মূল্যহীন। "ততক্ষণই তার রূপ, যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তাব রূপযৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।" ('চরিত্রহীন', একত্রিশ পরিচ্ছেদ)।

'শেষ প্রশ্নে'র কমলেব মধ্যেও 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের কিছু চিন্তার প্রতিধ্বনি পেয়েছি। যথা, 'নারীর মূল্যে' লিখেছেন—অতিথির যথাযোগ্য সেবার জন্য 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে "সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বণিক লম্বা-চওডা বক্তৃতা দিয়া নিজের সহধর্মিণীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে।...স্বামীর কাছে পতিব্রতা স্ত্রীর সম্মান এই! অপরিচিত পাপিষ্ঠ অতিথির সেবার তুলনায় স্ত্রীর মূল্য এই!" 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে স্ত্রীর সতীত্বের এই প্রবল অসম্মানের প্রতিচ্ছায়া পাওয়া গেছে 'শেষ প্রশ্নে' কমলের কথায় : "আতিথেয়তা আমাদের দেশে বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে।" তার পরেই কমলের তীব্র শ্লেষ : "সতী স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিলনা, কিন্তু আজ সেকথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে।" ('শেষ প্রশ্ন', একাদশ পরিচ্ছেদ)।

পৃথিবীব্যাপী নারীর উপর পুরুষের এই বর্বর অত্যাচার শরৎচন্দ্রকে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ রচনায় প্ররোচিত করেছিল : "কিছুকাল পূর্বে 'নারীর মূল্য' বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি। সেই সময় মনে হয়, আচ্ছা, আমার দেশের অবস্থা তো আমি জানি, কিন্তু আরো তো ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? বিস্তর পুঁথিপত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায় এবং অবিচার সর্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কমবেশি প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন।...পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই।" ('স্বরাজ সাধনায় নারী', ১৩২৮-এ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রদের সভায় পঠিত।)।

॥ ৩ ॥

শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও চেতনায় সাহিত্যের নানা রূপ

সাহিত্যের নানা রূপ শরৎচন্দ্রের সৌন্দর্যবোধ নানা তরঙ্গ তুলেছে। তাঁব ধারণার পরিচয় অল্পাকারে প্রধানত তাঁর চিঠিপত্রে পেয়েছি। গল্প, কবিতা, নাটক, ভ্রমণসাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা-সহ বাংলা সাহিত্যে পৃথক মুসলিম সাহিত্যধারা সৃষ্টির ঔচিত্য-অনৌচিত্য, চলমান সাহিত্যের ধারক সাহিত্যপত্রিকা সম্বন্ধে মন্তব্য তিনি করেছেন। এসব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রকে নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে পাওয়া যায়নি। সাহিত্যে সদাপ্রবিষ্ট সৌন্দর্যবোধযুক্ত শিল্পীর অন্তরঙ্গ ভাবনা ঐসব ক্ষেত্রে পেয়ে যাই।

গল্প

গল্পের রসপরিণাম আনন্দদানে—এই ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র 'আনন্দবাদী'। "গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ!' তবে আবার গল্প কি!" [১৪] "পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি!" [১৫] কিভাবে গল্প লিখতে হয়, তাও জানিয়েছেন : প্রথমত, "গল্প অন্তত ১২/১৪ পাতা হওয়া চাই এবং 'কনক্লুশন' বেশ স্পষ্ট করা চাই।" [১৬] দ্বিতীয়ত, কোনো 'কুৎসিত ভাব' গল্পে আমদানি করা চলবে না। এমন কি "গল্প পারতপক্ষে 'ট্রাজেডি' করতে নেই।" [১৭] শরৎচন্দ্রের এই শেষ কথাটি তর্কযোগ্য। ট্রাজেডি থেকেই তো গভীর আনন্দের উদ্ভাস। সেই অনুভব ছিল বলেই শরৎচন্দ্রের অনেক রচনা হালকা মিলনান্তক না হয়ে সকরুণ বেদনায় সমাপ্ত। ট্রাজিক মন্তব্যের বিপক্ষে ঢালাও মন্তব্য করার সময়ে শরৎচন্দ্র কি নিজের সাহিত্যের কথা ভুলে গিয়েছিলেন!

কবিতা

সাহিত্যচর্চার আদিপর্বে কবিযশঃপ্রার্থী শরৎচন্দ্রের পরিচয় পাই নিরুপমা দেবীর 'আমাদের শরৎদাদা' ('ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪) রচনায়। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় 'নিঃশব্দ প্রেম : দারুণ দহন'-এ তা উপস্থিত করেছি। নিজের কাব্যরচনা বিষয়ে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি : "কবিতা এককালে লেখার বাই আমারও ছিল। আমি গাথা লিখতে জানতাম।" [১৮] পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র নিতান্ত গদ্যের মানুষ কিন্তু কবিতাবিমুখ নন। বৈষ্ণব পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাঁর নিত্য আকর্ষণ। কবিতা কি—এই প্রশ্নটি যেমন তাঁর সৌন্দর্যবোধে নাড়া দিয়েছিল, তেমনি কবিতা না-লেখার দুঃখও তাঁর কম নয়।

যথার্থ অনুভূতি সমিল কবিতাতেই মাত্র প্রকাশ পেতে পারে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বস্তুমুখী গদ্যকবিতাকে 'সোনার পাথরবাটি'র বেশি মনে করেন নি। বলেছেন : "কবিতার বড় গুণ তার মাধুর্য—সেটাই যদি না থাকে তবে আর কবিতার রইল কি!"

এক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতার উল্লেখ শরৎচন্দ্র করেছেন, সেখানে "ভাব যেন উপচে পড়ছে।" [৯৯] গভীর হৃদয়ানুভূতি থেকেই কবিতার জন্ম, তা কলমের মুখে বুদ্ধির চতুরালি নয়—এই প্রত্যয়ে তিনি দৃঢ়। "হালকাভাবে যা তা লিখলে, বা একটা উদ্ভট কিছু কল্পনা করলেই কবিতার সাধন হলো না, মর্ম দিয়ে সত্যের স্বরূপটি উপলব্ধি করা চাই...। তারপর তার প্রকাশ, নিজের হৃদয়ে যতটা সহানুভূতি আছে তাই দিয়ে...।" [১০০]

অনুভূতি ব্যাপারটি কিন্তু কল্পনার ফানুস নয়—জীবনের গভীর থেকে তা যেন উঠে আসে। কবিতায় চাই উপলব্ধির স্পন্দন। যেখানে তা নেই শরৎচন্দ্র সেখানে কঠোর সমালোচক, এমন-কি কবি তাঁর অন্তরঙ্গ হলেও। রাধারানী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্য পড়ে লিখেছেন : "এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা নয়।...যে-বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয়, কল্পনার সাহায্যে যাকে তুমি আয়ত্ত করেছ, তাকে এমন ক'রে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরি যতই থাক, আমি বলব তোমার নিজের বাহাদুরি নেই।" [১০১]

কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য থাকেনা। কবিতার তত্ত্বরূপ শরৎচন্দ্র ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী কবিতা লিখতে পারেন না। বলেছেন, "সাহিত্যের সব কিছুর মধ্যে কবিতা লেখাই হলো সবচেয়ে শক্ত কাজ। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই একটা পুরো কবিতা লিখতে পারিনি।" সেই সাধ তিনি মিটিয়েছিলেন রাধারানী দেবীকে লেখা চিঠির গদ্যকে কবিতার মতো লাইন ভেঙে সাজিয়ে। ছদ্ম দুঃখে বলেছেন : "মাঝে মাঝে আমার কবিতা লেখার এমনি সাধ হয় যে, না লিখতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আসচে জন্মে কি ক'রে কবি হয়ে জন্মাতে পারি তার একটা উপায় ভাবতে হবে।" [১০২]

কবিতা শরৎচন্দ্রের ঠাট্টারও বিষয়। মাঝে মাঝে কবিতাকে তিনি 'পদ্য' বলতেন। কবিতাপ্রেমিক যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে খোঁচা দিয়ে মজা দেখার ইচ্ছায় বলেছেন, "আমি যতক্ষণ 'কবিতা' 'পদ্য' এ দুটো কথার তফাত নিজে বুঝতে পারব, ততক্ষণ আমি পদ্যই বলব। এতে তোমাদের কারও কবিপ্রাণে আঘাত লাগে তো আমি নাচার।" যোগেন্দ্রনাথ চটে গিয়ে কবিতা ও পদ্যের পার্থক্য দেখানোর পর ("মিল দেওয়া রচনামাত্রকেই পদ্য বলে। কিন্তু তাকে কবিতা সব সময় বলা চলেনা। কেননা কবিতাতে কল্পনা চাই, কবিত্ব চাই।") শরৎচন্দ্র সানন্দে হার মেনেছেন। [১০৩]

নাটক

অল্প বয়সে মঞ্চে নেমে স্ত্রীভূমিকায় শরৎচন্দ্র অভিনয় করেছেন, তা বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'বিচিত্র জীবনের আরো কিছু দিক'-এ উল্লিখিত। নাটক এক বিচিত্র জগৎ যার প্রতি মানুষের যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে আকর্ষণের কারণ, নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা। ঈষৎ অহংকারে বলেছেন : "অভিনয়টা...সত্যিই বুঝি।" [১০৪] রেঙ্গুন থেকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠিতে লিখেছেন : "আমিও একটা নাটক

লিখব বলে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় (হবেই!) কোনো থিয়েটারে প্লে করিয়ে দিতে পারো?" [১০৫] আবার নিজ অসামর্থ্যের স্বীকারোক্তিও আছে। 'পল্লীসমাজে'র প্রশংসকারী জনৈক পাঠক উপন্যাসটিকে নাট্যাকারে দেখতে চাওয়ায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "আমার নিজের তো সে ক্ষমতা নাই।...আমার দ্বারা হয়তো শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। এবং কোনো থিয়েটারই তাহাদের সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যয় করিয়া তাহাকে স্টেজ করিতে চাহিবে না। তবে আপনার উপদেশটিও মনে রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি কিছু করিতে পারি চেষ্টা করিব।" [১০৬]

সে চেষ্টা তিনি করেছিলেন। পরবর্তীকালে নাট্যরূপ দিয়েছেন—'পল্লীসমাজে'র (নাট্যরূপ 'রমা'), 'দেনাপাওনা'র (নাট্যরূপ 'ষোড়শী') 'দত্তা'র (নাট্যরূপ 'বিজয়া')। [১০৭] স্বরচিত নাটক মঞ্চে অভিনীত আকারে দেখে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট খুশি। 'ষোড়শী' নাটক দেখার পর একাধিক চিঠিতে লিখেছেন : "কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির [ভাদুড়ী]! আর চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।...অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে। তারই বাহাদুরি।" [১০৮] এমন কি মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখার আগ্রহ তাঁর যথেষ্ট। অমল হোমকে লিখেছেন : "রবিবাবুর অভিনয় দেখিনি কখনো। ...অতএব ও বস্তু ['বিসর্জন' নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ] না দেখে মরছি না।" [১০৯]

নাটকের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিকর্ষণও ছিল। রঙ্গমঞ্চে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে না—এই ছিল তাঁর ধারণা : "আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা না বোকা-দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানেনা।" [১১০] এক্ষেত্রে শিশির ভাদুড়ীর মতো শক্তিমান অভিনেতার উপরেও শরৎচন্দ্র পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন নি। 'ষোড়শী' নাটকের শেষ দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য শিশির ভাদুড়ীর একান্ত অনুরোধ তাঁকে যথেষ্ট অস্থির করেছে : "কাল শিশির এমনি মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে যে, রাত্রে ভালো ঘুমই হলোনা। ওর মাথায় ঢুকেছে জীবানন্দকে শেষ দৃশ্যে মেরে না ফেললে 'ড্রামাটিক এফেক্ট' হবেনা। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে জীবানন্দকে মারার কোনো সার্থকতা নেই।...ও [শিশির ভাদুড়ী] প্রায় আমার হাতে ধরে ওর এই অনুরোধটা রাখতে বলেছে।...থিয়েটারের লোকগুলো সবাই সমান। ওরা শুধু বোঝে সস্তার 'ড্রামাটিক এফেক্ট'।" [১১১]

শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ীর অনুরোধ মেনে নিয়ে শরৎচন্দ্র 'ষোড়শী' নাটকের শেষে জীবানন্দের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। তার ফল যে ভালোই দাঁড়িয়েছিল তা 'ষোড়শী'র অভিনয় দর্শনের পর শিশির ভাদুড়ী সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। খুশি শরৎচন্দ্র একাই হননি, অজস্র দর্শকও হয়েছেন। তাঁদেরই কেউ কেউ আগ্রহী হয়ে মূল উৎসে পৌঁছে 'দেনাপাওনা' উপন্যাস (সেইসঙ্গে হয়তো অন্য উপন্যাসও) পড়ে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। তার উল্লেখ ক'রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "I know many people who took to reading him over again after having seen the very successful series of Saratchandra's dramas on the Bengali stage. It was quite an intellectual pleasure to see such fine translation into flesh and blood of

Saratchandra's creations whom we all know to be living characters." [১১২]

এসব সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র মৌলিক নাটক লেখেন নি। তবে রাধারানী দেবী জানিয়েছেন, ১৯৩৭-র দিকে মৃত্যুর কিছু আগে তিনি নাটক লেখার কথায় 'বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন।' এমন কি তাঁর নাটকের 'কাটাছেঁড়া' না ক'রে তাকে অবিকৃত আকারে মঞ্চস্থ করা হবে—তাঁর এই শর্তে শিশির ভাদুড়ী নাকি রাজিও হয়েছিলেন। তাতে স্পষ্টই খুশি শরৎচন্দ্র রাধারানীকে বলেছেন : "নাটকে কিন্তু তোমাদের [মেয়েদের] পাত্তা দেব না জেনে রাখ। গল্প উপন্যাসে যেমন দিয়েছি এখানে তা হবে না। ছেলেদেরই জয়জয়কার হবে।" [১১৩] সেই নাটকের উৎকর্ষ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের গভীর আত্মবিশ্বাস : "নাটকের...অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু...ডায়ালগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের উপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানি।"

নাট্যশিল্প বিষয়ে শরৎচন্দ্রের ধারণা বেশ পরিষ্কার। তিনি জানিয়েছেন—নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশন সৃষ্টি করা হয় নাট্যচরিত্রের বিকাশের জন্য। চরিত্রের বিকাশও এক জাতীয় নয়। "চরিত্র সৃষ্টি দু-রকমের হতে পারে : এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকদের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে —চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে।" কিন্তু সেই পরিবর্তনকে দর্শক বা পাঠকের কাছে 'সত্যি' ক'রে তুলতে হবে। "এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্য দিয়ে এ পরিবর্তনের হেতু খুঁজে মেলে না।" নাটক বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঠিক চিন্তার একটি প্রকাশ : "উপন্যাসের মতো নাটকের ইলাস্‌টিসিটি নেই ; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না।"

নাটক নিছক পঠিত হবার বস্তু নয়—মঞ্চে প্রয়োগরূপের উপরে তার সাফল্য নির্ভরশীল। সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই হতাশা ছিলই "নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেত্রী কই?" [১১৪] উল্টোদিকে প্রতিভাবান অভিনেতা শিশির ভাদুড়ীও শরৎচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, শরৎচন্দ্র তাঁর নাটকে যেন 'অদৃষ্টপূর্ব নারী' বা 'অনন্যা' নারী "একটিও সাপ্লাই না করেন...। ইউনিক কিরণময়ী বাংলাদেশে মিলবে না। ওরকম আশ্চর্য চরিত্র বইতে টেঁকতে পারে—স্টেজে ওকে খাড়া করতে আমি খুঁজে পাবনা ঐ চরিত্র করবার মতন মেয়ে।" [১১৫]

এই কারণেই কি শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মৌলিক নাটক লেখায় অগ্রসর হননি?

ভ্রমণসাহিত্য

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। সেজন্য মাঘ ১৩২২-এর প্রথম কিস্তিতেই ভ্রমণসাহিত্যের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে তাঁকে বেশ কিছু কথা লিখতে হয়েছিল, অন্তত যে-ধরনের ভ্রমণসাহিত্য তিনি রচনা করতে যাচ্ছেন। এই সূত্রে তিনি সেকালের

ভ্রমণসাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিরক্তি এবং কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ্য মন্তব্য করেছেন। যেমন—

"দেখি, সবাই লেখে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—মেয়ে পুরুষ ইহার আর অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই। যে-কোনো একখানা মাসিকপত্র খুলিলেই চোখে পড়ে—আছে রে, আছে আছে। ঐ যে! কে গিয়াছে কাশী, কে গিয়াছে খুলনা, কে গিয়াছে সিমলা-পাহাড়—অমনি ভ্রমণ-কাহিনী। যে পাহাড়ে পর্বতে উঠিয়াছে, তাহার তো কথা নাই। আর যে জলজাহাজে চড়িয়া সমুদ্র দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তো একেবারে অসাধ্য!...হঠাৎ সেদিন বড় একটা ফন্দী মাথায় ঢুকিয়াছে! আচ্ছা, এক কাজ করিনা কেন? বড় বড় লোকের ভ্রমণকাহিনীগুলো পড়িয়া লই না কেন?...কিন্তু একি নিদারুণ ব্যবধান!...বড়লোক ক্রমাগত বলিতেছেন—'আমি! আমি! আমি! ওগো তোমরা দেশের হতভাগা পাঁচজন চোখ চাহিয়া ইহার প্রতি অক্ষরটি পড়, হাঁ করিয়া আমার প্রতি শব্দটি শোন—আমি বিদেশে গিয়াছিলাম।' "

চিঠিতেও ঐ জাতীয় ভ্রমণকাহিনীকে শরৎচন্দ্র ঠুকেছেন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'য়ুরোপে তিন মাস' সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন : " 'তিন মাস' যে ত্রিশ বছরের ধাক্কা লইবার উপক্রম করিল। অথচ কী নীরস! কী কটু! আপনি দুঃখিত হবেন না—এইটা শুধু আমার নয়, অনেকেরই মত।" [১১৬]

শরৎচন্দ্রের বলা ঐসব নানা কথার মধ্য দিয়ে এই সত্য বেরিয়ে আসে—ভ্রমণকাহিনীকে বস্তুধর্মী হতে হবে। বাধাবন্ধহারা বস্তুহীন কল্পনা যেন ঐ সাহিত্যের বিষয় না হয়। শরৎচন্দ্রের মধ্যে 'কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও' নেই ইত্যাদি আত্ম-সমালোচনার মূল লক্ষ্য আসলে অন্যের ভ্রমণসাহিত্য। ভ্রমণকাহিনীর ভিত্তি হবে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু এবং মনুষ্য।

পরে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' আত্মজৈবনিক রূপ ধারণ করাতে প্রথমাংশ শরৎচন্দ্র বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ঐ বাদ দেওয়া অংশে ভ্রমণকাহিনীর চরিত্র বিষয়ে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ মনোভাব পেয়ে যাই। কথাগুলি ভ্রমণসাহিত্যালোচনায় অবশ্য-বিবেচ্য।

সাহিত্য-সমালোচনা

সাহিত্যবোদ্ধা হিসাবে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট অহঙ্কৃত : "আমার চেয়ে ভালো সমঝদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।" [১১৭] তা প্রমাণে তাঁর উদ্যোগও ছিল। একদিকে সাহিত্য-সমালোচনার তাত্ত্বিক আকার, অন্যদিকে তার ফলিত পরিচয় তাঁর লেখায় চোখে পড়ে।

আদর্শ সমালোচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সিদ্ধান্ত—"সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত।" [১১৮] সমালোচকের কাজ "বন্ধুর মতো শিক্ষকের মতো" লেখকের ত্রুটি নির্দেশ করা [১১৯] যাতে লেখকের "চৈতন্য হয়, জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়।...গালাগালি দিয়া [লেখককে] অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব, এ মতলব ভালো নয়।" [১২০] সমালোচনা তেমনভাবে করতে হবে যাতে "সেই সমালোচনাটাই একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়।" [১২১] এবং "এই সমালোচনাই...শ্রেষ্ঠ সমালোচনা।" [১২২] এই তাত্ত্বিক ভিত্তি তাঁর ছিল বলে

শরৎচন্দ্র মাতৃভাষার সাহিত্য-সমালোচনার উৎকর্ষ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন : "বাঙলা ভাষায় সমালোচনার বইও নেই, সে শেখবার বালাইও নেই। এও যে রীতিমতো সাকরেদি ক'রে শিখতে হয়, এ ধারণাও নেই।" [১২৩]

এখানেই শরৎচন্দ্র ক্ষান্ত হননি, গল্প-উপন্যাস ছাড়াও সাহিত্য-সমালোচনা যে তিনি লেখেন এবং ভালোই লেখেন, সেটি স্পষ্ট ক'রেই 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে একাধিক চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর সমালোচনা "লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে...এবং বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়।" ঐ আলোড়নকারী সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাঁর আত্মশ্লাঘা : "আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভালো কথা।" [১২৪] বাঁকা হাসির সঙ্গে তাঁকে বলতে শুনেছি, "আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই।" [১২৫] এবং "আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধকরি গল্পের মতো সরস এবং সুপাঠ্য করেই।...সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়তো সব্যসাচী বলে ঠাট্টা করবে।" [১২৬] তাহলেও বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতে সাধ" তো তাঁরও হয়। এখন "গল্প-টল্প" লেখার ভার নিরুপমা দেবী প্রমুখের হাতে ছেড়ে দিয়ে "শুধু প্রবন্ধ নিয়েই" থাকতে চান। ওতে "মনে জোর থাকে।" [১২৭]

সমালোচনার লক্ষ্য বিষয়ে শরৎচন্দ্র যে-মন্তব্য করেছেন, অন্যের সাহিত্য সমালোচনাকালে সেই উদারতা তিনি সর্বত্র বজায় রাখতে পারেন নি। চাঁচাছোলা ভাষায় ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠিতে লিখেছেন : "আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয়, তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয়না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার।...কোনোটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই—আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির 'প্যাথস' ; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা, অথবা করুণা জাগে, এইসব লেখকদের এইসব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনের মধ্যে এমনিধারা একটি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই 'হেল্‌দি' নয়। ছোটগল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।" [১২৮] বিশেষত বিরোধী সাহিত্যিকদের (যথা অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ) কঠোর এবং তিক্ত সমালোচনা তিনি করেছেন। অন্যদিকে অন্তরঙ্গ সাহিত্যিকদের দোষত্রুটির প্রতি তিনি স্নেহে কোমল। নরম গলায় উচ্চারিত তাঁর সেইসব কথা ইতিমধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে ('বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র') দেখেছি। সব মিলিয়ে বলতে পারি নিরপেক্ষতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার গতিনির্ণয় করেছে।

মুসলমান সাহিত্যপ্রসঙ্গে

প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে কাজী আবদুল ওদুদ এবং জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা দুটি চিঠিতে, এবং একটি প্রবন্ধে ('মুসলিম সাহিত্য-সমাজ') শরৎচন্দ্র মুসলমান সাহিত্য

প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে তাঁর চিন্তার মধ্যে ছিল। শরৎচন্দ্র জানতেন মুসলমান সমাজের একাংশ বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু-সাহিত্য ভাবতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে সামাজিক এবং আর্থিক কারণে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যও যথেষ্ট। এই পার্থক্য দূর হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সাহিত্য নামক ভূমিতে মিলিত হোক—শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত বাংলা সৃষ্টি ক'রে মুসলমানী সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষেও তিনি। ১৯১৮-এ কাজী আবদুল ওদুদকে চিঠিতে লিখেছেন : "আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনোই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়।" একইসঙ্গে জানিয়েছেন, সাহিত্যে "গ্রন্থকার কোনো বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী—সমস্তই।"[১২৯] জাহান-আরা চৌধুরীকেও শরৎচন্দ্র একই কথা লিখেছেন : "সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে—অন্তরে তাঁরা এক।"[১৩০]

সাহিত্যিকের জাতিবিচারের কুসংস্কার শরৎচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি। ঢাকায় ডি. লিট. গ্রহণপর্বে মুসলমান সাহিত্যসমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে তা তিনি নানা যুক্তিবিস্তারে বলেছেন। ইতিমধ্যে জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা তাঁর পত্রটি প্রথমে 'বর্ষবাণী' পত্রিকায়, পরে 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' শিরোনামে 'মাসিক বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। 'লীলাময় রায়' ছদ্মনামে অন্নদাশংকর রায় 'ক্ষোভে' 'ক্রোধে' 'নৈরাশ্যে' লিখেছেন : "হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙালি হয়না, ভারতীয় হয়না।...হিন্দু মুসলমানে আপস ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবেনা, আত্মীয়তাও না।" দ্বিতীয় সমালোচক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলিও হিন্দু-মুসলমানের অবাঞ্ছিত ব্যবধান থেকে যাবার কথা বলেছেন। এসব নেতিবাচক উক্তি শরৎচন্দ্রের মনে নিরতিশয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। তিনি বলেছেন, এর ফলে "নৈরাশ্যে যে সমস্ত দিক কালো হয়ে উঠবে।" মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির একটি কথার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েও (ওয়াজেদ আলি বলেছিলেন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসীকে বাংলায় স্থান দিতে হবে) শরৎচন্দ্র বলেছেন, ঐ ধরনের সাহিত্য রচনা সেই সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব "যিনি যথার্থ সাহিত্যরসিক,...ভাষাকে যিনি ভালবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন।"

জাহান-আরা চৌধুরীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি পুনশ্চ স্মরণ করছি। ঐ চিঠির প্রসঙ্গে মীজানুর রহমানের অভিযোগের (শরৎচন্দ্র মুসলমানসমাজের নিম্নস্তরের মানুষকে কেবল তাঁর গল্পে-উপন্যাসে এনেছেন) তীব্র উত্তর দিয়েছেন শরৎচন্দ্র : "উঁচু-নীচু স্তরের পাত্রপাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভাল-মন্দ বিচার করে?" ('মুসলিম সাহিত্য-সমাজ')। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, মীজানুর রহমানের এসব অভিযোগের পাশে উদার-পণ্ডিত-সাহিত্যসেবী-অধ্যাপক মুসলমান বন্ধুও শরৎচন্দ্রের ছিলেন যিনি চেয়েছেন, হিন্দুর মতো মুসলমানেরও দোষ-গুণ দেখিয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনা করুন। এই প্রস্তাব

শরৎচন্দ্রের আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। ও কাজ তিনি করলে মুসলমানসমাজ "হয়তো [তাঁর] এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে।"[১৩১]

সাময়িক পত্রিকা প্রসঙ্গে

সাহিত্যপত্রিকার রূপরীতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নানা সময়ে মন্তব্য করেছেন। পত্রিকার ভালোমন্দ তার অবলম্বিত রীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সেইসঙ্গে পত্রিকার নানাবিধ রচনা বিষয়ে তাঁর নিন্দাপ্রশংসাযুক্ত মন্তব্যও পেয়েছি।

প্রকাশলগ্ন থেকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। সুবিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সম্পাদক ক'রে পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় অনেকদিন ধরে হচ্ছিল। ঐ পত্রিকার সঙ্গে সবিশেষ সংশ্লিষ্ট প্রমথনাথ ভট্টাচার্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'চরিত্রহীন' প্রকাশের ব্যাপারে কোন্ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ইতিমধ্যে বর্তমান অধ্যায়ে দেখেছি। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়াত হওয়ায় পত্রিকার শুভাশুভ বিষয়ে শরৎচন্দ্র চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর পত্রিকার সম্পাদক কে হবেন, সে বিষয়ে প্রমথনাথকে তিনি লিখেছেন, জজ সারদাচরণ মিত্র সাহিত্য-পরিষদের 'মোড়ল' হতে পারেন, কিন্তু 'মাসিক কাগজের সম্পাদক' হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই।[১৩২] এক্ষেত্রে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা আর না করাই ভালো।[১৩৩] তাছাড়া বিভিন্ন লেখকদের টেনে এনে পত্রিকায় লেখানোর যে-ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল, তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে তাঁর সেই "অসাধারণ 'ইনফ্লুয়েন্স' " পর্যন্ত গেছে। প্রতি মাসে ভালো লেখা সাজিয়ে পত্রিকা প্রকাশ যে কি দুরূহ ব্যাপার, তা 'প্রবাসী'র উল্লেখে শরৎচন্দ্র বুঝিয়েছেন—"প্রবাসী এতদিনের কাগজ—এতটা স্থায়ীত্ব লাভ করেছে, তবু তাকে অনুবাদ ক'রে, পাঁচটা খবরের কাগজের বাজে খবর তুলে [জায়গা] ভরাতে হয়। ওর অর্ধেকের উপর তো অপাঠ্য।"[১৩৪] অন্যদিকে বিপুল আয়োজনে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ শুনে অন্য পত্রিকা-সম্পাদকেরা কিরূপ আশঙ্কিত হয়েছিলেন, তাও শরৎচন্দ্র বলেছেন। ঐসব পত্রিকা-সম্পাদকেরা শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন : "আমাদের সংহার করার জন্য ভারতবর্ষের উদয় হচ্ছে।" শরৎচন্দ্রের অতঃপর মন্তব্য : "তাদের [উক্ত সম্পাদকদের] শাপ-সম্পাতেই দ্বিজুদাদা মারা গেলেন—অত দীর্ঘশ্বাস হা-হুতাশ তাঁর সইল না। এখন সেই সম্পাদকেরাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।"[১৩৫]

এত বিবাদ অতিক্রম ক'রে এবং এত আয়োজনের পর প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব মোটেও প্রশংসার ছিলনা : "ওর মধ্যে যেটুকু দ্বিজুবাবুর লেখা, সাহিত্য হিসাবে সেটুকু ভালো। তারপরে তাম্রলিপি আর বেদের তর্জমা। কি করব আমরা বেদের তর্জমা ক'রে? আর অতবড়ো কাগজ এতে কি চলে? অন্তত এমন একটা জিনিস 'কণ্টিনিউয়াসলি' থাকা চাই যার জন্য গ্রাহকদের মনে আশা জেগে থাকবে—সে কোথায়? একটা 'বোল্ড রিভিউ' থাকা প্রয়োজন—কই তা?...গল্প অতি বদ। এই কি তোমাদের সিলেকশন?"[১৩৬] সেইসঙ্গে, 'চরিত্রহীন' নীতিহীন

সাহিত্য—এই অজুহাতে তাঁর পাণ্ডুলিপি ফেরত আসায় ক্রুদ্ধ শরৎচন্দ্র উদাহরণ তুলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন—ও বস্তু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কিছু কম নেই। তাছাড়া ঐ পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ' বিভাগে 'রামের সুমতি' ছাড়া 'পথনির্দেশ', 'নারীর মূল্য' রচনার কোনো উল্লেখ না থাকায়, 'দুঃখ করছি নে' বলেও শরৎচন্দ্র যথেষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। "দোকানদারি দেখতে দেখতে আর অসহ্য খোশামোদ ভণ্ডামি শুনতে শুনতে হাড় কালি হয়ে গেল। সব কাগজই কি এক সুরে বাঁধা? যদি তাই হয়, প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজুদার নামটা 'ভারতবর্ষ' থেকে তুলে দাও—তারপরে এইরকম অবিচার আর মানুষকে 'মিস্‌লিড' করো।" স্থির করেছেন, আরো একটু মন দিয়ে 'ভারতবর্ষ' পড়ে আশ্বিনের 'সাহিত্য' পত্রিকায় "একটি বিরাট সমালোচনা লিখব।" [১৩৭]

কিন্তু সত্য স্বীকারেও তিনি দ্বিধাহীন। পরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার উন্নতি দেখে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন: "তোমাদের [প্রমথনাথ ভট্টাচার্য] ভারতবর্ষ যে রকম উন্নতি করছে বাস্তবিক বড় সুখের বিষয়। কিন্তু আমি তো সত্যিই ভেবে পাইনা এত উন্নতির হেতু কি? ইন্দ্রজাল তোমরা জানো বলতে পারিনা।" [১৩৮] পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও তাঁর ঢালাও প্রশংসা: "এবারকার ভারতবর্ষ [পৌষ ১৩২২] চমৎকার হইয়াছে। আমি নিজে তো পড়িবার জিনিস অনেক পাইলাম।" [১৩৯]

'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের দুটি চিঠিতে পত্রিকার আদর্শ বিষয়ে তাঁর মতামত পাই। প্রথমত, 'ক্যাচওয়ার্ড-এর মোহ' যেন সম্পাদককে পেয়ে না বসে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক সাহিত্যিকদের মতো 'নরনারীর যৌনসমস্যাকে সকল বেদনার পুরোভাগে' 'বেণু' পত্রিকা যে স্থাপন করেনি, এতে শরৎচন্দ্র যৎপরোনাস্তি খুশি। সমাজের মধ্যে যে 'আবর্জনা' দীর্ঘকাল ধরে জমেছে, তা দূর করার জন্য "তোমরা [ভূপেন্দ্রকিশোর প্রমুখ] ...কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র ক'রে একসঙ্গে মিলেছ।...পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির ব্যতিক্রম যেন না হয়।" [১৪০ক]

সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা 'বাতায়ন'-এর সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে দুটি চিঠিতে পত্রিকার লক্ষ্য বিষয়ে শরৎচন্দ্র পথনির্দেশ করেছেন। যেমন, অন্যের লেখা সমালোচনার কালে সমালোচকের রচনায় যেন অকারণ নীচতা, ক্রূরতা, অসত্য অপবাদ দেবার প্রবৃত্তি না দেখা যায়। ও-ধরনের কাজের ফলে "কাগজের মর্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম।...কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয়না।" এসব ব্যাপারে সম্পাদককে সর্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। "অসৌজন্য ও কুকথায় তোমার মুখের বক্তব্য যেন কোনোদিন কলুষিত না হয়। কাহাকেও ছোট করার জন্য নয়, বড় করার উদ্যমেই তোমার প্রবুদ্ধ শক্তি অনুক্ষণ নিয়োজিত থাক, এই প্রার্থনা করি।" [১৪০খ]

॥ ৪ ॥

নিজ সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক প্রসঙ্গে

সাহিত্যের বিষয় এবং আঙ্গিক সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ বক্তব্য তাঁর নিজের রচনাপ্রসঙ্গে এসেছে। তবে তিনি আদর্শ আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল ধরে নিয়ে বলতে পারি, এসব ক্ষেত্রে সাহিত্যের শ্রেয় নীতির কথাই শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছেন। এও লক্ষণীয়, সাহিত্যরচনা কালে তিনি যে অত্যন্ত সতর্ক লেখক, তা একাধিকবার চিঠিতে এবং মৌখিক আলাপে বলেছেন। "এটা ঠিক ক'রে রাখি যেন মনের সঙ্গে লেখার ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি।" [১৪১] এই কথা রেঙ্গুনে থাকার সময় হেমেন্দ্রকুমার রায়কে চিঠিতে লিখেছেন, যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে মুখে বলেছেন। [১৪২] পরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে এবং মৃত্যুর বৎসরাধিক আগে কালিদাস রায়কে মৌখিকভাবে একই কথা বলেছেন। [১৪৩] অর্থাৎ নিজ অবলম্বিত রীতি বিষয়ে শরৎচন্দ্র অটল ছিলেন।

সাহিত্যের বিষয় এবং আঙ্গিকের মেলবন্ধন শরৎচন্দ্র কিভাবে করেছিলেন, অতি সংক্ষেপে তা লিখেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : "...there was no mistake that he was very much interested in the plot, in the characters and in the problems. This gave a certain warmth to all his writings, which could not but bring him close to his readers." [১৪৪]

সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন নির্ভর ক'রে "লেখকের রুচি এবং বিচার বুদ্ধির পরে।" [১৪৫] ঐখানে ফাঁকি থাকলে শক্ত বনেদের উপর সাহিত্য রচিত হতে পারেনা। কেননা "মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মতো *এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উত্তরকালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে।*" [১৪৬] সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যোগ্য বিষয়ের অভাব দেখেছেন শরৎচন্দ্র। নিজ সাহিত্য 'শ্রীকান্ত' থেকে অভয়া চরিত্রের উদাহরণ তুলে বলেছেন, এ জাতীয় চরিত্র বাস্তব জীবনে দেখা গেলেও সমাজ তাকে সাহিত্যে স্বীকৃতি দিতে চায়না। "আমাদের সমাজ সংকীর্ণ, সমাজের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। তা নিয়ে উপন্যাস লেখা চলে না।" ('শরৎচন্দ্র', গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। বিষয় নির্দিষ্ট হওয়ার পর কিভাবে তার ভিত্তিতে সাহিত্যরচনা করতে হয়, তারও ধ্রুবনির্দেশ করেছেন শরৎচন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি বলেছেন :

"ধরে নেও একটি ছোটগল্প লিখচ ; প্রথমে গল্পের বিষয়বস্তুটি কি হবে মনে দৃঢ় ধারণা ক'রে নিতে হয়। সেটা এমন বদ্ধমূল হওয়া চাই যে গল্পের মধ্যে একটি কথা, একটি লাইন, কি একটি প্যারাও যেন ঐ বিষয়বস্তুর বিরোধী কি অবান্তর না হয়। এই সব বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক না হলে কিছুতেই লেখা জমাতে পারা যায়না।...আমি ঐ জিনিসটা শিখেছিলুম হারবার্ট স্পেনসার পড়ার সময়—এমন অতিরিক্ত সাবধান, অ্যাকুরেট।...মাথা নুয়ে আসে আমার গোর্কীর লেখা পড়ে।...বিষয়বস্তুর...খেই হারিয়ে

গেলে চলবে না,...তারপর ওজন ক'রে কথা বসাতে হবে। কথার মোহ আছে, বেশ ভালো কথা মনে পড়ে গেল, আর সামলাতে না পেরে সেই কথাটা ধাঁ ক'রে বসিয়ে দিয়ে গেলাম। এই কারণে লেখা আলগা হয়ে যায়। ও আমি কিছুতেই করিনে।...একটা কথা, কি ভাব মনে এলে হয়তো টুকে রাখি ; কিন্তু যতক্ষণ না তার সত্যিকারের সময় আসে ততক্ষণ আমি সেটাকে কিছুতেই ব্যবহার করিনে, আর করলেই দেখেছি যে রসভঙ্গ হবেই। ছোটগল্পের কথা বলছিলুম। ধরে নেওয়া যাক বিষয়বস্তুটা পিতৃভক্তি, এর সম্বন্ধে কারুর কোনোকিছু আপত্তি করার নেই। পিতৃভক্তি আঁকতে হলে পিতা কেমন হওয়া উচিত ঠিক ক'রে নেওয়া যেতে পারে—ধরে নেও রামের কথা। রামের পিতৃভক্তি আদর্শ ; কিন্তু দশরথ একজন আদর্শ পিতা ছিলেন না। তাই রামের নিষ্ঠাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমনি ক'রে হিসেব, ওজন, নিষ্ঠা, সাধনা দিয়ে যে লেখা লেখা যায় তা ভাল হবেই।" ('শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-লিখন-পদ্ধতি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ১৩৩৫)।

বিষয় এবং আঙ্গিকের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে প্লট বা কাহিনীর প্রসঙ্গ। কাহিনীর 'বাঁধা কাঠামো'র ভিত্তিতে শরৎচন্দ্র উপন্যাস লেখেন না, তা জানিয়েছেন কালিদাস রায়। ('শরৎসাহিত্য', কালিদাস রায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। তার অর্থ এই নয় যে, প্লটকে শরৎচন্দ্র কোনো গুরুত্বই দেননি। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন : "চরিত্রটা তো তুমি সংজ্ঞা দিয়ে বোঝাবে না—সেটা তোমার গল্পের মানুষের কাজে কর্মে চিন্তায় ভাষায় প্রকাশ হবে। সুসঙ্গতির সঙ্গে বিষয়বস্তু আর চরিত্রকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারো তো প্লট আপনি ফুটবে।" ('শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-লিখন-পদ্ধতি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ১৩৩৫)। কিভাবে শরৎচন্দ্র প্লট তৈরি করেন, তা জেনেছি যোগেন্দ্রনাথ সরকারের লেখায়। যোগেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন, প্লট নির্মাণ করতে তাঁকে কোনো মেহনত করতে হয়না। "এই তো রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে চলেছি, এরই মধ্যে পাঁচ, সাত, দশ মিনিটে আমি একটা প্লট মনে মনে গড়ে ফেলি। লিখতে গিয়ে হয়তো আকার ও গঠন দুটোই তার অনেকটা বদলে যায় ; কিন্তু মূল প্লট প্রায়ই ঠিক থাকে।" [১৪৭]

তবে শরৎচন্দ্রের কাছে প্লটের অপেক্ষা চরিত্রের মূল্য বেশি। "গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দিবার দরকার নাই। যে যে লোক...বইয়ে থাকিবেন প্রথমে তাঁহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।...প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয়না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।" [১৪৮] চরিত্রনির্মাণ-কৌশল প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র কিছু গভীর কথা বলেছেন। তার মধ্যে আছে : "চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ঠিক লেখা হয়না।" একটি বাস্তব চরিত্রকে গভীরভাবে 'স্টাডি' ক'রে তার অন্তর্গহনের রূপরেখাঙ্কন লেখক করবেন। ব্যাপারটি ব্যাখ্যার জন্য 'চরিত্রহীনে'র প্রসঙ্গ তুলেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর মতে 'চরিত্রহীনে'র গল্পাংশের থেকেও মূল্যবান ওর চরিত্র। "চরিত্রগুলিকে কি ক'রে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা যে [উপন্যাসটি] অভিনিবেশের সঙ্গে পড়বে সেই কিছু না কিছু পাবে।" 'চরিত্রহীনে'র প্রথমাংশ লেখার আগেই শেষাংশ তিনি

লিখেছেন—অন্যের মুখে একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে 'বলো কি শরৎ' বললেও শরৎচন্দ্রের কাছে ব্যাপারটি আশ্চর্যের ছিলনা। "চরিত্র অবলম্বন ক'রে লিখতে আরম্ভ ক'রে অমন ওলটপালট খুবই করা চলে।" ('শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-লিখন-পদ্ধতি', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ১৩৩৫')।

চরিত্র নির্মাণ কিভাবে করতে হয়, এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য যেমন পেয়েছি, তেমনি তাঁর নির্মিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অন্যের আলোচনা দেখেছি। কালিদাস রায় লিখেছেন : "কয়েকটি চরিত্রকে আমন্ত্রণ ক'রে তাদের অপরিণত অস্ফুটরূপে জীবন সঞ্চার ক'রে পরিকল্পিত জীবনযাত্রার পথে [শরৎচন্দ্র] ছেড়ে দেন ; তারা আপন চরিত্রের বৃত্তি প্রবৃত্তির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয়ে অগ্রসর হয়—শরৎচন্দ্র তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। [পথ] কোথায় শেষ হবে তিনি তা আগে হতে নিজেই জানেন না। তাদের চলাব পথে যতদূর সঙ্গে গেলে লাভ আছে ততদূর পর্যন্ত গিয়ে থামেন। চরিত্রগুলির কিন্তু চলা শেষ হয়না।" ('শরৎসাহিত্য', কালিদাস রায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। কালিদাস রায় অধিকন্তু বলেছেন শরৎসাহিত্যের চরিত্ররা বহির্গতভাবে যতটা সক্রিয়, তার থেকে অনেক বেশি মনোজগতে ক্রিয়াশীল। "চরিত্রগুলি জীবন্ত—জীবন্তের মনটা দেহ হতে ঢের বড়। শরৎচন্দ্রের রচনায় তাই মনোজগতের লীলাবৈচিত্র্য ফুটেছে অদ্ভুত রকমের।" (ঐ)। একইসঙ্গে চরিত্রগুলি স্বাভাবিকও বটে।"শবৎচন্দ্র ঠিক মানুষেরই চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।" (ঐ)।

চরিত্রের ভাববিনিময়ের মাধ্যম সংলাপ। সেই সংলাপ কিভাবে লিখতে হয়, শরৎচন্দ্র তা সবিস্তারে দিলীপকুমার রায়কে বুঝিয়েছেন। "ডায়ালগ ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয়, এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি বলেছে। এই হলো আর্টিস্টিক ফর্ম-এর ভিতরের রহস্য।" [১৪৯] কখনো এর অতিরিক্ত বলেছেন : "কথোপকথন (ডায়ালগ) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার কোরো। তর্কবিতর্ক যেন ছোট হয় অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকখানি নয়। এক অধ্যায়ে একটু, পরের অধ্যায়ে বাকি অংশটুকু—এমনি।" উপমা, উদাহরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দিলীপকুমারকে সতর্ক ক'রে, রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষসহ শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "উপমা উদাহরণ—কোনোটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ না হয়। এখানে লজিক যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলংকার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলংকার দিয়ে শো-কেস সাজানোর রুচি এক নয়। একথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলংকৃত বাক্যের বাহুল্যভার যে কত পীড়াদায়ক সেকথা শুধু পাঠকই বোঝে।" [১৫০]

রচনারীতির পক্ষে শরৎচন্দ্রের আরো বক্তব্য—সংযমহীন সাহিত্য উচ্চাঙ্গের হতে পারেনা। এ বিষয়ে স্নেহভাজন সাহিত্যিকদের তিনি সতর্ক যেমন করেছেন (দিলীপকুমার রায়, আশালতা সিংহ, লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ), তেমনি খোঁচা দিয়েছেন অপছন্দের লেখকদের প্রতি (অন্নদাশংকর রায়, অনুরূপা দেবী প্রমুখ) (বিষয়টি কিছু পরিমাণে অষ্টম অধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র' উল্লেখ করেছি)। 'কি লিখব'-র থেকে 'কতটুকু লিখব'-র বিষয়ে শরৎচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে চমৎকার পাওয়া গেছে : "রচনার...শিল্প বলো, কৌশল বলো,

টেকনিক বলো—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই তো নয়,...না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়।"[১৫১] "ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি [অর্থাৎ লেখক] নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না।"[১৫২]

সাহিত্যের কারুকৃতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ঐ বক্তব্য তাঁর সাহিত্যেই মূর্ত হয়েছে —এই বোধে পৌঁছেছিলেন কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষ। জলের মতো তরতরে গতির সেই সাহিত্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের কাহিনী-সাহিত্য ভাষাতে ও ভঙ্গিতে অচ্ছোদ-সরসী-নীরের মতো নিগূঢ় অথচ স্বচ্ছতায় প্রাঞ্জল। তিনি টেকনিকের বৈভব প্রদর্শিত করবার জন্য চেষ্টাকৃত কোনো সাধনা স্বীকার করেছিলেন বলে মনে হয়না। এমন বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়, যারা নিতান্ত ভঙ্গি তথা টেকনিকের বৈভব সম্ভব করবার ইচ্ছাকৃত অধ্যবসায়ের বড় নমুনা। সন্দেহ করতে হয়, খ্যাতির সম্বল থাকলেও এ ধরনের কারিগরী কারুতায় সমৃদ্ধ কাহিনীগুলির ভাগ্য বড়ই নশ্বর। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদেরই ঘরের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঘরোয়া হৃদয়ের সহস্র বর্ণসুষমা দিয়ে সরল ও প্রাঞ্জল যে কাহিনী-সাহিত্য রচনা করেছেন, সেটা ভারতীয় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নগর নির্মাণের আদর্শোচিত স্থাপত্যের মতো রূপে ও গুণে সর্বতোভদ্র, বাংলার সমাজজীবনের সুখ দুঃখ প্রতিচ্ছবিত করেও বিশ্বজনীন আবেদনে চিরপ্রসন্ন।"[১৫৩]

শরৎচন্দ্রের রচনারীতির উৎকৃষ্ট ভাষ্য সুবোধ ঘোষের বচনায় মিলেছে।

॥ ৫ ॥
নন্দনচিন্তার ধারা

শরৎচন্দ্রের নন্দনচিন্তাকে সুগ্রথিত সুবিন্যস্ত আকারে পাইনি, একথা আগেই বলেছি। লক্ষ্য করেছি, সে চিন্তার মধ্যে ধারাবাহিকতার সঙ্গে কিছু পরিমাণে স্ববিবোধিতাও আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল একই চিন্তানিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা, নীতি-দুর্নীতি, সাহিত্যে অধিকারী-অনধিকারীভেদ, কলাকৈবল্যবাদ, প্রকাশতত্ত্ব, প্রয়োজনের সীমালঙ্ঘী সাহিত্য ইত্যাকার চিন্তা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, কখনো উপন্যাসে, এমন কি মৌখিক আলাপে পেয়েছি। এইসব সূত্রের সমবায়ে শবৎচন্দ্রের নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয় অনেকটা স্পষ্ট।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতো মনস্বী পণ্ডিত শরৎচন্দ্রের সৌন্দর্যভাবনাকে মূল্যহীন মনে করেন নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার নানা মাত্রাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য : "সাহিত্যবিচারে তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] শ্রেষ্ঠ দান এই যে তিনি সাহিত্যিককে যথাসম্ভব ভারমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি, এই অনুভূতি বাস্তবের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং বাহিরের ঘটনার মধ্য দিয়া আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাস্তবকে বাদ দিয়া সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর হইবে না। আদর্শের জন্য

মানবের আকাঙ্ক্ষা তাহার অনুভূতির অঙ্গীভূত হইতে পারে এবং সেই হিসাবে আদর্শও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে। কিন্তু বাহিরের কোনো আদর্শের মাপকাঠিতে সাহিত্যের বিচার হইবে না, বাহিরের আদর্শের দ্বারা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলা হইবে। আবার যে বাস্তব শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যেই তাহা একের ভোগের বস্তু, তাহা বিশ্বমানবের ঐশ্বর্য হইতে পারে না।...এই ঐশ্বর্য অনুভূতির ঐশ্বর্য, দৈনন্দিন প্রয়োজন ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ইহার যোগ থাকিলেও, ইহা তাহাদের অতীত, ইহা বিশ্বমানবের সম্পদ। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সমন্বয় হইয়াছে বলিয়া শরৎচন্দ্র নিছক আদর্শবাদী নহেন, নিছক বস্তুতান্ত্রিকও নহেন। তিনি সাহিত্যকে প্রশস্ত, বন্ধনমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, রসতত্ত্ব বিচারে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কোনো আদর্শের খাতিরেই তিনি সাহিত্যের দাবিকে খাটো করিতে চাহেন নাই।...স্বীকার করিয়াছেন যে সাহিত্যের চরম মূল্য সামাজিক লাভ-ক্ষতি ও রাজনৈতিক কলহমিলনের অনেক ঊর্ধ্বে। সাহিত্যবিচারে তিনি চিন্তার বিস্তৃতি ও মতের ঔদার্যের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল ; শুধু রসসৃষ্টিতে নহে, রসবিচারেও তিনি অনন্যসাধারণ।" [১৫৪]

শরৎসাহিত্যের অপর বিশেষজ্ঞ অজিতকুমার ঘোষ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার ভিত্তি সম্পর্কে যে সব প্রসঙ্গ এনেছেন তার মধ্যে উল্লিখিত : শরৎচন্দ্রের 'বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি', 'শিল্পের সংযম, পরিমিতি ও সৌন্দর্য' সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা, সামাজিক নীতি লঙ্ঘন ক'রে 'বৃহত্তর মানবনীতি'র প্রতি তাঁর সমর্থন, কলাকৈবল্যবাদের প্রতি তাঁর অনাস্থা ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের এই পরিচয় সম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষ ইঙ্গিতে বলেছেন : "অলংকৃত বাক্যে বিকশিত হইতে গেলে সাহিত্যকে বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্যবস্তু ও সৌন্দর্যপ্রকাশের রীতি অবলম্বন করিতে হইবে। পরিচিত শব্দের সঙ্গে অপরিচিত সৌন্দর্যময় শব্দ এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ভাব মিশাইতে পারিলেই সাহিত্য সত্য হয়, আবার সুন্দরও হয়।" [১৫৫] কোনো সন্দেহ না রেখে বলা যায়, সার্থক এই উক্তি।

সাহিত্যে উপাদান—অভিজ্ঞতা

শরৎসাহিত্যে লেখকের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জীবনবোধের কোন প্রতিফলন পড়েছে, তা ইতিমধ্যে সপ্তম অধ্যায় 'জীবন, প্রত্যক্ষ জীবন—শরৎসাহিত্যের ভিত্তি'-তে দেখেছি। এ বিষয়ে ৪ ফাল্গুন ১৩৩৭-এ রাধারানী দেবীকে যেকথা শরৎচন্দ্র লিখেছেন, তার পুনরাবৃত্তি কয়েক মাস পরে ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮-এ ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে লেখা চিঠির মধ্যে : "বহুর সাহচর্যে বহু মানবকে যেন চিনতে পারো। মানুষের স্বরূপের জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মালমশলা। এই সত্যটি কোনোদিন ভুলো না।" [১৫৬] কেবল বৃহৎ মাপের চিত্রাঙ্কনেই নয়, ডিটেলের কাজেও অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য। সেকথা অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে স্মরণ করিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন : "সাহিত্যের ব্যাপারে কোনো কিছুই তুচ্ছ নয় জেনো—চরিত্রসৃষ্টিতে এগুলোই মালমশলার মতো কাজে লাগে।" সেইসঙ্গে এও বলেছেন, "স্থূল জিনিসকে সূক্ষ্ম ক'রে গড়ে তোলবার শক্তি থাকা চাই—নইলে স্থূল স্থূলই

থেকে যায়—যেমন দেহসর্বস্ব প্রেম।"[১৫৭] সে 'শক্তি' 'চরিত্রহীনে'র দিবাকরের ছিলনা। কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই দিবাকর বিরহের গল্প লেখায়—কিরণময়ী সেই অনভিজ্ঞ সাহিত্যচর্চাকে যথেষ্ট ঠাট্টা করেছে : "নভেল-লেখা এত ছোট জিনিস নয়।...একে সাহিত্যচর্চা বলে? একে বলে অনধিকারচর্চা।" ('চরিত্রহীন', ত্রিশ পরিচ্ছেদ)।

অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি সাহিত্যের শক্তি ও বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন। সংকুচিত জীবনসীমায় আবদ্ধ বাঙালি সাহিত্যিকদের তা ছিলনা। সে সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায়ের কাছে শরৎচন্দ্রের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছি সপ্তম অধ্যায়ে ('জীবন, প্রত্যক্ষ জীবন —শরৎসাহিত্যের ভিত্তি')। তাঁর 'ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধের অংশবিশেষ পুনশ্চ উদ্ধার করতে পারি : "সমস্ত দেশের সাহিত্যে কত অসত্য, কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে।...সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে, Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার যো নেই, কোনোদিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে। তারই মধ্যে যে একটু-আধটু পারে, সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।" ('ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য')।

ঐ 'একটু আধটু' চেষ্টা শরৎচন্দ্র করেছিলেন। তার রূপ দেখা গেছে 'শ্রীকান্ত' এবং 'পথের দাবী'তে বর্মার প্রসঙ্গ উত্থাপনে। সেখানে পাই, পেটের দায়ে হাজির হওয়া কারখানার মানুষদের, তাদের সমাজবন্ধন শিথিল, যৌন সম্পর্কে বাঁধাবাঁধি নেই, কদর্য দারিদ্র্য, মালিকের অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে উত্থানে বিপ্লবীদের প্রেরণা, ব্রিটিশ শাসন উৎখাতে রক্তাক্ত বিপ্লবের চেষ্টা ইত্যাদি। 'শেষ প্রশ্নে'র কমলের জন্ম চা-বাগানে, সাহেব পিতা এবং দেশী আয়ার অবৈধ মিলনের সন্তান সে, শিক্ষিত পিতার কাছে বিবিধ শিক্ষা, মুক্ত জীবনের পক্ষে তার জোরালো চিন্তা ইত্যাদি। আগ্রার বাঙালি সমাজও কলোনি-বিশেষ, গ্রাম-বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের ঘোঁট পাকানো গ্রাম্য-রাজনীতি সেখানে সরাসরি নেই।

কিন্তু সাহিত্য অভিজ্ঞতার বস্তুপিণ্ডও নয়। অভিজ্ঞতার নির্বিচার সঞ্চয় সাহিত্যিকের কল্পনাকে দুর্বল করে। শরৎচন্দ্রের মত : "অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে।"[১৫৮] লেখকের চেতনায় বাস্তবের রূপান্তর না ঘটলে অভিজ্ঞতার আছোলা উপস্থাপন সার্থক সাহিত্য হয়না। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সিদ্ধান্ত : "বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি তো জানি।" ('সাহিত্য ও নীতি')।

সাহিত্যে বাস্তবতা

অভিজ্ঞতার নিখাদ উপস্থাপনের বিরোধী শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ আধুনিক সাহিত্যিকদের (কল্লোল-কালিকলম-প্রগতিপন্থীদের) ব্রিফ নিয়ে সাহিত্যে নগ্ন বাস্তবের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। তখন তিনি ঐ সাহিত্যের গুণকীর্তনীয়া : "ভালমন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়তো চিরদিনই আছে। হয়তো চিরদিনই থাকিবে। ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ সেও [আধুনিক সাহিত্যিক] বলে। মন্দের ওকালতি করিতে কোনো সাহিত্যিকই

কোনোদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপন কর্তব্য জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।" ('আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত')। মানুষ তার সমস্ত কামনাবাসনা-সহ আধুনিক উপস্থিত এবং তা সঙ্গত—শরৎচন্দ্রের তখনকার মত।

মোহভঙ্গ হতে বিলম্ব হয়নি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের একেবারে বিপরীত কথা অষ্টম অধ্যায়ে ('বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র') দেখেছি। বর্তমান অধ্যায়েও 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে শরৎচন্দ্রের ঠোঁট বাঁকিয়ে লেখা চিঠিতে দেখা গেছে যে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে ভারসাম্য না রেখে 'নরনারীর যৌনসমস্যাকে পুরোভাগে' স্থাপন করা হয়েছে। এই কথাই কিছু অন্যভাবে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে চিঠিতে লিখেছেন : "গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যতই চমকপ্রদই হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য—সে টিকবে না।" [১০৯] অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর নির্বাচন প্রয়োজন। "যা ঘটেছে বা ঘটছে তাও সব সাহিত্যের পক্ষে সত্য নয়, যদিও তা প্রত্যক্ষ সত্য। অথচ এমন সব জিনিস আছে যা ঘটেনি, কিন্তু ঘটা উচিত, সাহিত্যের পক্ষে হয়তো সেইটাই সত্য।...রাম না হতেই রামায়ণ হয়েছিল, কিন্তু তা বলে রামায়ণ তো সত্যে কারো চেয়ে খাটো নয়।" ('শরৎচন্দ্র', গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)।

এই যাঁর বিশ্বাস তিনি কিভাবে নিজেকে বিশুদ্ধ রিয়ালিস্টিক মনে করবেন? সাহিত্যের কোনো কোনো মহলের সেই প্রয়াস সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বেশ উষ্মা : "গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশি। অথচ কি ক'রে যে এই দুটোকে ভাগ ক'রে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত।" ('সাহিত্য ও নীতি')। আইডিয়ালিজম্‌কে বাদ দিয়ে নিছক রিয়ালিজম্ সাহিত্যে আসতে পারেনা, "অন্তত উপন্যাস যাকে বলে সে হয়না।" ('সাহিত্য আর্ট ও দুর্নীতি')। এই কারণে সাহিত্যে বিজ্ঞানের অবাধ প্রবেশেরও তিনি বিরোধী। বেশ কড়া ভাষায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "বিজ্ঞান তো কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্যকারণের সত্যকার সম্বন্ধ-বিচার।...[কিন্তু] গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলিনা, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলিনা।" ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি')।

শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র এই ধারণায় স্থির—সাহিত্যে কুৎসিত বস্তুসমূহের কোনো স্থান নেই। বরং ভীষণকে তিনি সাহিত্যপদবাচ্য ভেবেছেন কিন্তু কুৎসিতকে নয়। 'শ্রীকান্তে' মহাশ্মশান এবং ঝড়ের বর্ণনায় দেখেছি ভীষণের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে। "ভীষণও সুন্দর হতে পারে। শুধু কুৎসিত সুন্দর হয়না, সে সত্য হলেও সাহিত্যের পক্ষে সুন্দর নয়।" ('শরৎচন্দ্র', গিরীন্দ্রনাথ সরকার, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। বিদ্রূপের হুল বিঁধিয়ে চিঠিতে লিখেছেন : "রাস্তায় কুকুর ঠেঙানো দেখলেও তো কান্না পায়—সেইটাই

কি দেখাতে হবে? না সেটা সাহিত্য?...কুৎসিত ভাবগুলো দেখাতে নেই—ওসব সবাই জানে।" [১৬০] প্রবন্ধে লিখেছেন : "Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে—এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে?" ('সাহিত্য ও নীতি')। কখনো বলেছেন : "সত্যমাত্রই সাহিত্য হয়না, জগতে এমন অনেক নোংরা সত্য ঘটনা আছে যে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনোমতেই সাহিত্য রচনা করা চলেনা।" ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি')।

শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্য ঈষৎ বদল ঘটিয়ে 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর মুখে উচ্চারিত : "কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতই সুন্দর, তাকে যেমন আরো সুন্দর ক'রে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই একটা কাজ।" ('চরিত্রহীন', একত্রিশ পরিচ্ছেদ)। অর্থাৎ অসুন্দরের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে কবি তাঁর সাহিত্যে স্থান দেবেন। ঐখানে কাব্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের ভেদ। নিয়মবাঁধা কথাসাহিত্যে নানা সুন্দর বস্তুসমূহের আয়োজন—চন্দ্র, চন্দন, কোকিলের কলাপ, ভ্রমরের ঝংকার ইত্যাদি। উল্টোপক্ষে কথাসাহিত্য অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক।" 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে, 'চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে, বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তরের মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের চলেনা। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িবার সুবিধা হয়না।" ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি')। কিন্তু সেই বাস্তবকে যেমন দেখেছি তেমন লিখেছি—এও যেন না হয়। শরৎচন্দ্র পুনশ্চ স্মরণ করিয়েছেন : "নোংরামি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়...। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়।" (ঐ)।

নীতি-দুর্নীতির প্রসঙ্গে

শরৎসাহিত্য, দুর্নীতিগ্রস্ত—প্রসঙ্গটি ইতিমধ্যে নবম অধ্যায় 'শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনায় উল্লিখিত। শরৎচন্দ্র নিজে এই প্রত্যয়ে দৃঢ় ছিলেন যে, সত্যকার নীতিহীন সাহিত্য তিনি কদাপি রচনা করেন নি। "পুরুষেরা বলে আমি সমাজ ধ্বংস ক'রে দিলাম ; আবার মেয়েরা বলে ঠিক তার উল্টো।...তারা অসঙ্কোচে বলে যে আমার লেখা থেকে তারা অধঃপথে তো যায়ই না, বরঞ্চ সৎ পথ পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে তো তারই খোঁজ পায়।...আমার লেখায় সত্যিকার দুর্নীতি কোথাও নেই।" [১৬১]—শরৎচন্দ্র নিজেই আত্মপক্ষে সাফাই গেয়েছেন। আসলে তাঁর মনের মধ্যে কোথাও একটা খাঁটি নীতিবাদী মানুষের বাস ছিল। সমাজ গ্রহণ করেনি, সুতরাং বিধবা-বিবাহ তিনি দিতে পারেন নি —এই যুক্তি যেমন তীক্ষ্ণ ভাষায় 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে দিয়েছেন (সপ্তম অধ্যায়ের ৪২খ পাদটীকা দ্রষ্টব্য), তেমনি অন্তর্গত নীতিবোধের কারণে বিধবা-বিবাহ না হওয়াই সঙ্গত বলে তাঁর ধারণা (ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩২খ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

'চরিত্রহীন' সম্পর্কে দুর্নীতির প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি উঠেছে। শরৎচন্দ্র মূলগতভাবে নীতিবাদী লেখক হলেও চলমান জীবনচিত্র আঁকার সময় তাঁকে নীতিহীনতায় নিমজ্জিত মানুষকে দেখাতে হয়েছে। অন্যদিকে তার মধ্য দিয়ে সামগ্রিক মানবজীবনীতিই প্রকাশিত। বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে 'চরিত্রহীন' রচিত। সুতরাং এর সত্যভিত্তি বর্তমান। সেই সত্যই মৌল নীতির ভিত্তি। সেজন্যই শরৎচন্দ্রের মতে 'চরিত্রহীন' শেষ পর্যন্ত 'এথিক্যাল' উপন্যাস। সাহিত্যের নীতির সঙ্গে সামাজিক নীতির সংঘর্ষ ঘটলে সাহিত্যের নীতিই তাঁর কাছে গ্রাহ্য, যা সৃষ্টির আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিণতিতে লভ্য। "উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলেনা। ...ভালমন্দ সংসারে চিরদিনই আছে—ভালোকে ভালো মন্দকে মন্দ বলায় কোনো art-ই কোনোদিন আপত্তি করেনা। কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয়না। অর্থাৎ যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটেনা, অথচ সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক থেকে ঘটলে ভালো হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশি বিড়ম্বনা ঘটে।" ('সাহিত্য ও নীতি') এর অর্থ—সাহিত্যিক সমাজসংস্কারক নন। সমাজসমস্যার নানা রূপ তিনি সাহিত্যে তুলে ধরবেন ঠিকই, কিন্তু সমাধানের দায়িত্ব তাঁর নয়। বর্তমান অধ্যায়ের শীর্ষে উল্লিখিত 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের সেই মত জেনেছি। আসলে শরৎচন্দ্র সমাজকে স্বীকার করলেও তাকে 'দেবতা' বলে মানেন না। "মানুষের-খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')।

ভালবাসা শব্দটি কেবল সতীত্বের সঙ্গে যুক্ত—এমন মত শরৎচন্দ্রের নয়। জীবনের বিচিত্র এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় দৈহিক শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, এমন নারীর জীবনেও ভালবাসা থাকতে পারে। সে প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন "একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় তো এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')। "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারীজীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।" ('স্বরাজসাধনায় নারী')।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই, এত জোরালো ঘোষণার পরেও সতীত্ব সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সমুচ্চ শ্রদ্ধা ছিলই। এর চূড়ান্ত উদাহরণ 'শ্রীকান্তে'র অন্নদাদিদি। খুনী, ব্যভিচারী, লম্পট, কদাচারী, বিচিত্র জীবনযাপনকারী, ধর্মত্যাগী স্বামীর জন্য অন্নদাদিদি ধর্ম, পরিবার, সমাজ ত্যাগ করেছেন—শরৎচন্দ্রের চোখে সেই হলো সতীত্বের চূড়ান্ত উদাহরণ। "ভগবান! এ তোমার কি বিচার!...কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে—সমাজ, সংসার সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি তো আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করিনা জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই; তাঁকে তাঁর বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন,

শত্রুমিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া!" ('শ্রীকান্ত', প্রথম পর্ব, সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

এবং "সর্বাঙ্গীণ সতীধর্মের একটা অপূর্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য ধারণা করাই যায়না...।" ('শ্রীকান্ত', দ্বিতীয় পর্ব, অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

অন্যদিকে মুক্ত প্রেমের প্রকৃতি অভয়ার মধ্যে। আহা মরি সতীত্ব তার নয়—সে অত্যাচারী একাধিক বিবাহিত স্বামীকে ত্যাগ ক'রে নতুন ঘর বেঁধেছে রোহিণীর সঙ্গে। প্রসঙ্গটি ইতিমধ্যে সপ্তম অধ্যায়ে ('জীবন, প্রত্যক্ষ জীবন—শরৎসাহিত্যের ভিত্তি') দেখেছি। অর্থাৎ একই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্নদাদিদি এবং অভয়ার মতো দুই বিরোধী চরিত্রকে সম মর্যাদায় তুলে এনেছেন শরৎচন্দ্র। সাহিত্যে কোনো কথাই শেষ কথা নয়। সেখানে দেখার সত্য এবং আঁকার সত্য।

কিন্তু ছবিও শেষ পর্যন্ত পটবদ্ধ, যতই বর্ণক্ষেপের সাহায্যে তাকে বহুমাত্রিক করা যাক না কেন। বাধাবন্ধহারা স্বেচ্ছাচারী জীবনমুখী সাহিত্যচর্চার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যে স্বাধীনতার মানে অরাজকতা, anarchy নয়।" ('ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য')। অন্যদিকে রাজনৈতিক চাপে স্বদেশীয় সাহিত্যের অর্গলবদ্ধ রূপ দেখেও তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ : "...রাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা-গুটনো আর থাকবে না, সেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার আনন্দের দিন ফিরে আসবে।" (ঐ)। শরৎচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—উচ্চাঙ্গের সাহিত্য স্বাধীন "মনের সৃষ্টি।"[১৬২]

সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে

সাহিত্যিকের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে কি? এই প্রশ্নে শরৎচন্দ্র স্পষ্টই দ্বিধাবিভক্ত। সাহিত্যিককে বিশেষ মত প্রচারকের আসনে তিনি যে দেখতে রাজি ছিলেন না, তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে তাঁর তিক্ত-কষায় বক্তব্যের মধ্যেই পরিষ্কার। "'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র।" (৫৫তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতিতে পঠিত অভিভাষণ)। সাহিত্যিক সমাজের নিয়ন্তা নন, সেকথা 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর মুখেও শুনেছি : "একথা কোনোদিন ভুলো না যে, কবি বিচারক নয়।" ('চরিত্রহীন', একত্রিশ পরিচ্ছেদ)। অর্থাৎ সাহিত্য কোনো মত প্রচারের মঞ্চ নয়।

এই যাঁর বিশ্বাস সেই শরৎচন্দ্র একেবারে বিপরীত মেরুতেও আছেন তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রায় প্রথম পর্ব থেকে। কখনো চিঠিতে, কখনো প্রবন্ধে সাহিত্যিকের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি তাঁর কোনো কোনো সৃষ্টিতে ঐ মতের রূপায়ণও ঘটেছে।

"টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে

পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে?...একদিন এই সংকল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম।"[১৬৩] ১৪.০৯.১৯১৩-এ এই চিঠি লেখার প্রায় দেড় দশক পরে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩৩৪) পুনরায় তাঁর ঐ কথা : "সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে, জাতি গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে. উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষা ও জাতির কল্যাণকর কিনা।" 'রামের সুমতি' জাতীয় গল্প বচনার উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির উন্নতিবিধান—স্বয়ং শরৎচন্দ্রেরই স্বীকারোক্তি : " 'রামের সুমতি'ব মতো প্রেমবর্জিত আমাদের বাঙালির ঘরের কথা (যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) 'সিরিজ অব স্টোরিজ' লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙালির 'আইডিয়েল' অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।"[১৬৪] তাঁর শেষজীবনে লেখা 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসও কি বিশেষ বক্তব্য প্রচারের বাহন নয়? শরৎচন্দ্র তা স্বীকার ক'রে একটি চিঠিতে লিখেছেন : "জগতের যা চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোনো না কোনো রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীতে আছে, [তাহলে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী চিরস্মরণীয় সাহিত্য!!!] ইবসেন-মেটারলিংক-টলস্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েলসে আছে।" ('সুনন্দ ভবনে'র শ্রীমতী...সেনকে লিখিত পত্র, 'বিজলী', ষষ্ঠ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা)। 'শেষ প্রশ্নে' যদি ও-বস্তু থাকে, তাকে দোষযুক্ত সাহিত্য বলা যায় কি—এই শরৎচন্দ্রের যুক্তি। এবং 'আনন্দমঠে'র প্রচারধর্মের সমালোচক 'পথের দাবী'তে কোন ভূমিকা নিয়েছিলেন?

সাহিত্যে অধিকারী-অনধিকারী ভেদ

কে কবি? 'শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,/সেই কি সে যমদমী?' মধুসূদন বলেছিলেন। জীবনানন্দের ভাষায় : 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি।' শরৎচন্দ্রের বিশ্বাসও তদ্রূপ। একই কথা সত্য পাঠক, সমালোচক সম্বন্ধে। সবাই পাঠক নয়, যোগ্য সমালোচক নয় সকল সমালোচক। শরৎচন্দ্র বলেছেন : "সকল প্রকার রস সকলের জন্য নয়। [সাহিত্যে] অধিকারী ভেদটা আমি মানি।"[১৬৫]

হাতে কলম নিলেই লেখক হওয়া যায়—শরৎচন্দ্র মানতে রাজি ছিলেন না। বাস্তব সাহিত্য রচনার নামে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে এমিল জোলার নগ্ন বাস্তবতার আমদানি করছেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের সাহিত্যিক বলতে দ্বিধাগ্রস্ত। দুঃখের সঙ্গে অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে তিনি বলেছেন : "কাল একখানা ছোট মাসিকপত্র ডাকে এল,...কাগজখানার পাতা উল্টাতে উল্টাতে একটা গল্পই পড়ে ফেললুম। হ্যাঁ বাস্তব গল্পই বটে—পরনোগ্রাফিও বলতে পারো।...সাহিত্য বলতে যদি এই পর্যন্ত ওদের বোধ হয়ে থাকে, তাহলে বাংলা সাহিত্য শেষ পর্যন্ত যে কোথায় নেমে যাবে তার তল খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[১৬৬]

লেখক থেকে পাঠক। সহৃদয় পাঠক হওয়ার জন্যও গুণের প্রয়োজন। ভারতীয় অলংকারতত্ত্বে বর্ণিত সহৃদয় পাঠকের লক্ষণাবলী শরৎচন্দ্র পরিহার করতে পারেন নি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত সে প্রসঙ্গে লিখেছেন : "সহৃদয় লোকের অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে...দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তম্ময়তা প্রাপ্ত হয়।" ('যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদবিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তম্ময়ভবনযোগ্যতাতে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।' অভিনবগুপ্ত ১/১)। শরৎচন্দ্র প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী' কথার আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন : "এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। তারা বুঝবেই না। ইংরিজিতে যে একটা কথা আছে 'আর্ট টু হাইড আর্ট' সেটা তারা না ধরতে পেরে মনে করবে এর চাঁচাছোলা সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্যই নেই।...পাঠকের ইনটেলিজেন্স এবং কালচার একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছন পর্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হতেই পারেনা।...সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই।" এমন কি সমাজমান্য প্রাজ্ঞ বিচারপতি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিকেও শরৎচন্দ্র যোগ্য পাঠক বলতে পারেন নি। "রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' পড়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন, এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্বে তিনি দেখেন নাই।...কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ হতে বার হয়েছে বলেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও তো নয়।" [১৬৭] সব পাঠক পাঠক নয়।

বিরোধী সমালোচনায় শরাহত শরৎচন্দ্র কখনো কখনো কড়া প্রত্যুত্তর দিয়েছেন —'শেষ প্রশ্ন' এবং 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করেছি। সাহিত্য-সমালোচনার তাত্ত্বিক আকার সম্পর্কে তাঁর মতও বর্তমান অধ্যায়ে দেখেছি। এসব থেকে এটুকু পরিষ্কার— সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে অধিকারী-অনধিকারী ভেদ শরৎচন্দ্র বিলক্ষণ মানতেন। তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠে শোনা গেছে : "সাহিত্যের সমালোচনা কি শুধু গালিগালাজ?...আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এরা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত রেহাই দেয়না।" [১৬৮] বাংলাদেশে যোগ্য সাহিত্য-সমালোচকের অভাব লক্ষ্য ক'রে শরৎচন্দ্র সখেদে বলেছেন : "আমাদের দেশে সমালোচনা যা হয় তা গালিগালাজেই শেষ হয়ে যায়। আমি এটা লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও উচ্চাঙ্গের সমালোচনার মধ্যে একটা নিবিড় যোগসূত্র আছে। ইংরিজি সাহিত্যের মধ্যে এই সম্পর্কটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।" [১৬৯] বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার এই ঘন তমসার মধ্যে শরৎচন্দ্রের কাছে দীপবর্তিকা হয়ে উপস্থিত হয়েছেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাই না বলে পারেন নি : "সত্যিই ওর [মোহিতলালের] সমালোচনা লেখবার শক্তি আছে।...একটু prejudiced বটে, কিন্তু সমালোচনার বোধ আছে।" [১৭০]

কলাকৈবল্যবাদ

রূপসৃষ্টিতেই সাহিত্যেব চরম সিদ্ধি যা ভাবান্তরে কলাকৈবল্য। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কথা আসবে। তিনি সত্য-শিব-সুন্দরবাদী, বিশেষত সুন্দরের প্রতি তাঁর অধিক আকর্ষণ। তাঁর স্বাভাবিক রূপজ্ঞান এক্ষেত্রে সক্রিয়। বিশ্বাস করেছেন, "রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়।" প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উদাহরণ চোখের সামনে ছিল যেখানে "রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই, আর সে রূপবর্ণনাও আসলে

দেহের, বিশেষত রমণী-দেহের বর্ণনা।" এর উল্টোদিকে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকেরা রূপকে সাহিত্য থেকে বিসর্জন দিতে আগ্রহী। কেননা নিছক সৌন্দর্যবর্ণনা সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে তাঁরা মনে করেন নি। ঐ মতে প্রমথ চৌধুরীর একান্ত অনাস্থা। তাঁর রূপমুগ্ধ মনের শিক্ষা এই : "রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি।...রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। [তাই] রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ।" অতএব ঐ মতে বিশ্বাসীরা প্রমথ চৌধুরীর কাছে 'নাস্তিকে'র বেশি কিছু নন। ('রূপের কথা')।

প্রমথ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরৎচন্দ্র নিছক রূপের পূজারী ছিলেন না। বস্তুত Art for art's sake বা কলাকৈবল্যবাদের বিরোধী ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে। একাধিকবার সেকথা সজোরে বলেছেন। শরৎ-আলোচক অজিতকুমার ঘোষের মতে তা কার্যত 'অসহিষ্ণু তাত্ত্বিকতায়' পর্যবসিত হয়েছিল।[১১১] শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি :

"আর্ট-এর জন্যই আর্ট, একথা আমি পূর্বেও কখনো বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')।

"আমি ঐ বুলিগুলো মানিনে। যেমন আর্ট ফর আর্টস্ সেক, ধর্ম ফর ধর্মের সেক, ট্রুথ ফর ট্রুথস্ সেক ইত্যাদি। আর্ট-এর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, ওর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যাওয়া এবং তার পরেই এক ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ।"[১১২]

একথা স্পষ্ট, শরৎচন্দ্র সমাজ অসম্পৃক্তভাবে সাহিত্যকে বিচার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেদিক থেকে তিনি অস্কার ওয়াইল্ড কথিত মতটিকে গ্রহণ করেন নি। অস্কার ওয়াইল্ড-এর বিখ্যাত উক্তি—

"সকল আর্টই রসবস্তুর স্রষ্টা। শিল্পকে প্রকাশ ক'রে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রাখাই আর্টের লক্ষ্য।

যিনি নূতন ধারায় বা ভিন্ন ভঙ্গিতে রূপবস্তুকে রূপান্তরিত করেন, তিনি সমালোচক।...

শ্লীল বা অশ্লীল বলে কিছুই নেই। গ্রন্থ হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত। এই পর্যন্ত।" ('A Preface to Dorian Gray', 'Fortnightly Review', March 1891).

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাক : "Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারেনা ; এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতেই সত্য নয়।" ('সাহিত্য ও নীতি')।

অসংলগ্ন এই উক্তি। নীতিদুর্নীতির ব্যাপারে কতকগুলি প্রশ্ন উঠবেই। নীতি বলতে সমাজ-নির্ধারিত নীতি বুঝতে হবে। তাদের মধ্যে কয়েকটিকে বলা যায় সাময়িক নীতি, কতকগুলি চিরন্তন নীতি। সমাজ তার বিশেষ প্রয়োজনে আত্মসংস্থিতির জন্য কিছু নিয়ম প্রবর্তন করে, যেগুলি কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়, যদিচ

ধারাবাহিকতার প্রতি মানুষের এমন মোহ যে, পরিহার্য বস্তুকেও তারা আঁকড়ে থাকে পূর্বপুরুষের বিধান বলে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সংগ্রাম এই ধরনের কালক্লিষ্ট কিছু সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে। এদিক থেকে তিনি বলেছেন, চিরন্তন সাহিত্য বলে কিছু নেই, বড় জোর কিছু সাহিত্য আয়ুদীর্ঘ, তাব বেশি নয়। যথা ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণে বলেছেন : "কোনো দেশের সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকেনা। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মতো তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানবচিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে ওঠে। মানবচিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পায়না।" এক্ষেত্রে তাঁর কথা বোধগম্য। কিন্তু 'ন্যায়' 'সত্য' ইত্যাদি সম্বন্ধে কি সেকথা বলা যাবে? শরৎচন্দ্র এখানেও তাত্ত্বিক ভূমিকা নিয়ে বলতে পারেন (বলেছেন কি?) 'ন্যায়' বা 'সত্য' বা 'মাতৃবাৎসল্যে'র ধারণাও আপেক্ষিক। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে (যেমন একান্নবর্তী পরিবারের বিলোপ, কৃষিভিত্তি থেকে শ্রমভিত্তি সমাজ, রাষ্ট্রবিপ্লব, হিন্দুসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সর্বত্রগামী মিডিযাব আগ্রাসন, জনমানসে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রচণ্ড অভিঘাত ইত্যাদি) পূর্বতন সমাজসংগঠন বিপর্যস্ত হয়ে গেলে নূতন পরিস্থিতিতে ন্যায় বা সত্য সম্বন্ধে পূর্ব প্রচলিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটতে পারে। শরৎচন্দ্র এখানে কোন ভূমিকা নেবেন, বা নিতেন তার সুচিন্তিত রূপ তাঁর লেখায় দেখতে পাইনি। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়েছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য—রসসংবেদনা এবং সৌন্দর্য ও আনন্দসৃষ্টি এই তত্ত্বের উপরে। সুন্দরের সঙ্গে শিবতত্ত্বকেও তিনি বাদ দিতে পারেন নি। যেমন উপরের অনুচ্ছেদে প্রদত্ত তাঁর উক্তিতে পাই। অথচ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদীরা, যেমন কলাকৈবল্যবাদী কিংবা পূর্বতন আলংকারিক রসবাদীরা, মঙ্গলকে সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য করতে একেবারে রাজি নন। শরৎচন্দ্র অনুভূতিশীল সাহিত্যিক, তাঁর চিন্তাশীলতাও ছিল। সেকারণে নিছক অনুভূতি অথবা নিছক চিন্তার দ্বারা সুবিন্যস্ত কোনো তত্ত্বনির্মাণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। দেখা যায়, কখনো আবেগবশে তিনি যেকথা বলেছেন, অন্য চিন্তার প্রকোপে তার বিপরীত কথাও বলেছেন। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট। তাঁর কলমের তলার অংশ মাটির মধ্যে প্রোথিত ছিল বলে কখনোই কলমের নিবের দ্বারা আঁকা ফুলটির রূপসৌন্দর্য ও সৌরভে মগ্ন হয়ে মৃত্তিকাস্পর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কলাকৈবল্যবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইতি সেইখানে।

প্রকাশতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের মতো উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় ক'রে (আমি আছি, আমি জানি, আমি নিজেকে ব্যক্ত করি) মানুষের ব্যক্ত রূপের সর্বোচ্চ প্রকাশ সাহিত্যে—এইভাবে শরৎচন্দ্র প্রকাশতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নি। প্রকাশতত্ত্ব নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। তাঁর চিঠি ও মৌখিক আলাপের মধ্যে তা দেখা গেছে। কখনো-বা নিজ সাহিত্য থেকে উদাহরণ তুলে প্রকাশতত্ত্ব বুঝিয়েছেন।

'প্রকাশ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মূল কথা : "প্রকাশের ভেতর দিয়ে সত্যকার সৃষ্টিকৌশল ধরা পড়ে, নচেৎ স্রষ্টার যে রচনানৈপুণ্য আছে, তা বুঝব কেমন ক'রে?"[১৭৩] প্রকাশ অবশ্যই প্রতিভাসম্মিত। প্রতিভা না থাকলে সাহিত্য সৃষ্টি হয়না। প্রতিভার সঙ্গে ব্যক্তিত্বকে যুক্ত ক'রে বলেছেন : "ও [সাহিত্য] জিনিসটা ঘষে মেজে কিছুতেই ভালো হয়না। যে যেমন শুরু করলে,...তার চলল সেইরকম। একশো বছর লিখুক না, তবু তাই। রবিবাবুর লেখা—সে একেবারে গোড়া থেকেই রবিবাবুর।" ('শরৎচন্দ্র', গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', ভাদ্র ১৩৩৫)। কখনো বলেছেন : "যার গলায় সুর নেই, তার পক্ষে যেমন কণ্ঠসঙ্গীত আরম্ভ করা একরূপ পণ্ডশ্রম বলেই মনে হয়, তেমনি যার ভেতরে কখনো কবিত্ব বলতে কিছু নেই, তার পক্ষেও কবিতা রচনা করা ব্যর্থশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১৭৪]

সাহিত্যের যথার্থ প্রকাশ কিভাবে সম্ভব, শরৎচন্দ্র বস্তুত তা হাতে কলমে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে শেখানোর চেষ্টা করেছেন : "কেবল হৃদয়ে অনুভব করিলেই একটা জিনিস ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। সমস্ত জিনিসই কিছু-না-কিছু শিখিতে হয়।"[১৭৫] "সাহিত্য রচনার কৌশলটাও আয়ত্ত করা চাই..., নইলে শুধু শুধু তো নিজেরই অনুভূতিমাত্র সম্বল ক'রেই কাজ হবে না।"[১৭৬] নিজ অনুভূতিকে সাহিত্যে যথাযথ আকারে প্রকাশের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক লেখকের অসংযম। এই বস্তুটি রচনাকে কিভাবে বিনষ্ট করে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সতর্কবাণী বারবার দেখেছি। সৃষ্টিশীল লেখক অনুবাদ কর্মে অগ্রসর হলে অন্যের প্রকাশকৌশলের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন—এই আশঙ্কাও শরৎচন্দ্রের ছিল। রীতিমতো উদ্বেগের সঙ্গে ভাষান্তর ব্যাপারটিকে তিনি 'আত্মহত্যা' বলেছেন : "এ কাজে লেখকের সৃষ্টিশক্তিটা নষ্ট হয়ে যায়। পরের শক্তি কি কোনোদিন আত্মসাৎ করা যায়? এতে লেখকের নিজের শক্তি স্ফূর্তি পাবার অবসর পায়না।...'কপি' করার কি দুর্দশা তা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে—গাদা গাদা বই বার হচ্চে—কিন্তু সব নকল, সব বাজে, আসলের এক বিন্দুও নেই।" ('সাহিত্যে আত্মহত্যা', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', আষাঢ় ১৩৩৫)। হেমেন্দ্রকুমার রায়কেও এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র সচেতন করেছেন।[১৭৭]

বরং একনিষ্ঠা এবং একান্ত শ্রমকে তিনি সাহিত্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজ সাহিত্যচর্চার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "বনে গিয়ে, গায়ে ছাই মেখে তপ করিনি বটে,...তবে জীবনে কিছুর জন্যে যদি সত্যকার কষ্ট ক'রে থাকি তা সে সাহিত্যের জন্যেই।...আমি এখনো এই জানি আর বিশ্বাস করি যে আমার মধ্যে অসামান্য কি অমানুষিক কিছুই নেই—আর যা কিছু আমি পেয়েছি—সে কেবল ঐ কঠোর পরিশ্রম আর চেষ্টার ফলে...।" ('সাহিত্যে আত্মহত্যা', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'কালিকলম', আষাঢ় ১৩৩৫)। লেখকের কঠোর সাধনায় সাহিত্যের সুস্বাদু পক্ব ফলপ্রাপ্তি, শরৎচন্দ্র তা চিঠিতেও স্মরণ করিয়েছেন : "প্রথমে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয়না। এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য। অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু কোনো পরিশ্রমই কোনোদিন সত্য সত্যই নষ্ট হয়না--আর একভাবে ফিরিয়া আসে।"[১৭৮]

নিজ রচনার প্রসঙ্গ তুলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে প্রকাশরূপের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন : "আমার গল্প যে তোমার ভালো লাগে বলো, এর প্লট ভালো, না একস্‌প্রেশনই ভালো?" যোগেন্দ্রনাথের উত্তর : "একসপ্রেশনই ভালো।" [১৭৭] শরৎচন্দ্রের প্রকাশবৈশিষ্ট্য কিভাবে তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা জেনেছি নীরেন্দ্রনাথ রায়ের একটি লেখায়। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের অসংযমের তীব্র নিন্দা প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের লেখায় পূর্বদৃষ্ট আশ্চর্য সংযমের উল্লেখ করেছেন : "শিল্পীমাত্রই জানেন, বলার চেয়ে, এমন কি ভালো বলার চেয়েও না-বলা কত কঠিন।...একমাত্র শিল্পীই জানেন, কত প্রলোভনকে, কত অবান্তর আকর্ষণকে জোর করিয়া প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে করিতে হয়—এ বিষয়ে তাঁহার সংযম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সংযমের চেয়ে কম নয়। শরৎচন্দ্রের লেখায় এই সাধন-সুকঠিন সংযমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পদের সুমিত প্রয়োগে, বাক্যের সুবিন্যস্ত গতিতে, বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তায়, চিত্রিত চরিত্রের সুনির্দিষ্ট স্পষ্টতায় তাঁর রচনা বাংলা কথাসাহিত্যের একদিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছে।" ('শেষ প্রশ্ন : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৩৮)।

সাহিত্যে অপ্রয়োজনের আনন্দ-উৎসব

শরৎচন্দ্রের 'শিব'তত্ত্ব, 'সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং রসসংবাদী ভাবনার অল্প পরিচয় পেয়েছি। বিষয়টি গভীর। বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র মঙ্গল ছাড়া সৌন্দর্যকে স্বীকার করেন নি। সেজন্য কলাকৈবল্যবাদের তিনি সমর্থক নন। মঙ্গলবিযুক্ত সাহিত্যচর্চায় শরৎচন্দ্রের যে বিশ্বাস ছিলনা, তা ইতিমধ্যে বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতের বিস্ময়কর ঐক্য। মঙ্গল এবং সৌন্দর্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থির ধারণা : "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। ...সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ।" ('বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন')। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্র সর্বথা শ্রদ্ধাযুক্ত না হলেও এটুকু দেখা যায়, বঙ্কিমের ঐ সিদ্ধান্ত শরৎচন্দ্র শিরে ধারণ করেছেন।

মঙ্গল ও সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথাও স্মরণ করছি। মঙ্গল ও সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু গভীর মন্তব্যের অল্প অংশ এইরকম : "যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর ; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।...মঙ্গলমাত্রেই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকলের মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকেনা। করুণা সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রেম সুন্দর ;

শতদল পদ্মের সঙ্গে, পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তাহার তুলনা হয়; শতদল পদ্মের মতো, পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিজের মধ্যে এবং চারিদিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে; সে নিখিলের অনুকূল এবং নিখিল তাহার অনুকূল। আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।" ('সৌন্দর্যবোধ')।

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীও এসে যাবেন। একদিকে যেমন মঙ্গল-বিরহিত সৌন্দর্যকে তিনি মানেন, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্য যে উদ্দেশ্যবিহীন আনন্দ, তাও। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে লিখেছেন : "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়।...সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ...কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনেব বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।...তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত।...সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।...সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।" ('সাহিত্যে খেলা')।

রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর এই কথার পাশে শরৎচন্দ্রের উক্তি স্থাপন কবা যায় যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বে মূল্যবান : "সত্যকার কাব্য...চির-সুন্দর চির-কল্যাণকর।" ('সাহিত্য ও নীতি')।

সাহিত্যের এই কল্যাণময় রূপ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের গভীর প্রত্যয় তাঁর রচনার একাধিক স্থানে বর্তমান :

"সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরে কামনাবাসনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই তো সাহিত্যের কাজ।" ('ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য')।

"কলাসাধনার মূল সত্য হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ সাধনা যেন হয় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়।" [১৮০]

"ইহলোকের মানবের জীবনযাত্রা পথের যতদূরে দৃষ্টি চলে, বিশ্বমানব একটা বস্তু লক্ষ্য ক'রে নিরন্তর চলেছে—তার তিনটে অংশ—art, morality এবং ধর্ম—religion.... এই ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়—art, morality এবং ধর্মে। এ একলার নয়, এ ঐশ্বর্য বিশ্বমানবের জেনে এবং না জেনে, মানুষের চেষ্টা মানুষের উদ্যম এই ঐশ্বর্য আহরণের দিকেই অবিশ্রাম চলেছে—অতএব যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম নয়।" ('সাহিত্য ও নীতি')।

১৩৩১-এর ১০ আশ্বিন 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে ঐকথা বলার দশ বছর পরে ১৭ আশ্বিন ১৩৪১-এ লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্র দৃশ্যত বিভ্রান্ত। তিনি লক্ষ্য করেছেন বৈজ্ঞানিকের সাধনা সত্যের সাধনা। "সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনোটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হলেও অপরাধ নেই।" অথচ জগতের নানা ঘটনায় "সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায়

সত্য, সাহিত্যে হয়তো সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়তো সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি তাকে সাহিত্যে মূর্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও।" স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন : "সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনার ও সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে?" [১৮১]

সত্য ও সুন্দরের এই সংঘর্ষে শরৎচন্দ্র অস্থিরমন। সত্যকে তিনি বাদ দেবেন কিভাবে—এবং সুন্দরকে সত্যের খাতিরে প্রত্যাখ্যানই বা করবেন কি ক'রে? এখানে তিনি বলতে পারেন নি যে, অকুণ্ঠিত সত্য উপযুক্ত প্রকাশের দ্বারা সুন্দররূপ নিয়েই আসে—সেই ভয়ংকর সুন্দর—অন্তর্নিহিত শক্তিরই সৌন্দর্য—তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের উক্তি অনুযায়ী বলা যায়, তুমি তো সুন্দর নও, তুমি অনুপম। সে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উক্তি থেকে এটুকু পরিষ্কার—মঙ্গলকে বাদ দিয়ে সাহিত্যসাধনার কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর দীর্ঘপোষিত সাহিত্যচিন্তায় সত্য এবং সুন্দরের সঙ্গে 'শিব'-এর অনিবার্য উপস্থিতি।

মঙ্গল এবং সুন্দরের শেষ পরিণতি বাচ্য থেকে ব্যঞ্জনায়, রসের আস্বাদনে, অপ্রয়োজনের আনন্দ-উৎসবে। ভারতীয় আলংকারিকদের মতে, রস আত্মসম্বিতের চর্বণা। স্থূল প্রয়োজনেব সঙ্গে তা সম্পর্কহীন। শরৎচন্দ্রের কলমে ঐ উৎসারিত আনন্দধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছি :

"হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলংকৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্যপদবাচ্য হয়না।" ('সাহিত্যের রীতি ও নীতি')।

"সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলেনা একথা কোনোমতেই ভেলা চলেনা।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')।

"সত্যকার যা ঐশ্বর্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত।" ('সাহিত্য ও নীতি')।

শরৎচন্দ্রের ঐকথা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও পাই : "আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।" তবে আনন্দময়কে প্রকাশ করা সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় 'সুর', লাগে 'ভাবভঙ্গি'। উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ বললেন : "কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন ক'রে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন ক'রে সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসর ঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়।" শরৎচন্দ্রের কথার মধ্যে এরই মান্যতা বর্তমান : হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলংকৃত বাক্যে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের নন্দনভাবনার নানা দিককে উপস্থিত করেছি। বিভিন্ন উপ-শিরোনামায় সেগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যযোগে বিন্যস্ত হয়েছে। সর্বশেষ প্রসঙ্গ—কোন্ রসলোকে সাহিত্যের উত্তরণ। শরৎচন্দ্রের উত্তর—তা প্রয়োজনাতীত আনন্দলোক। যে-শরৎচন্দ্র সারা জীবন বাস্তব-অবাস্তব নিয়ে সংগ্রাম ক'রে গেলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন আনন্দসম্মিত রস-উপলব্ধিতে। সমগ্র সাঁহিত্যজীবনে কদাচিৎ যিনি মিলনাত্মক গল্প রচনা

করেছেন, মানবের ট্রাজিক পরিণতি যাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য, তাঁর শিল্প ভাবনায় যুগপৎ ভারতীয় অলংকারতত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের একটি সিদ্ধান্তের প্রতিরূপ পাই—করুণ রস আনন্দদায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটু স্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে।" রবীন্দ্রনাথের এই কথার পুনরাবৃত্তি শরৎচন্দ্র না করলেও তাঁর সাহিত্যসাধনায় অনিবার্যভাবে তা প্রমাণ ক'রে গেছেন। করুণরস আনন্দদায়ক না হলে সাহিত্যে করুণ রসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হতো না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৩২-১৩৩।
২. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ২১৬।
৩. ঐ, পৃ. ২২১।
৪. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৪৮।
৫. ঐ, পৃ. ৩৫৩।
৬. মহেন্দ্রনাথ করণকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৯২-১৯৩।
৭. নিজের অল্প বয়সের রচনাগুলিকে অবিকৃত অবস্থায় মুদ্রিত করতে শরৎচন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি ছিল। ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা চিঠিতে, সেইসঙ্গে মৌখিকভাবে যোগেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে সেকথা তিনি বলেছেন। শরৎচন্দ্রের যুক্তি—ঐ রচনাগুলিতে তাঁর কাঁচা হাতের ছাপ আছে। তাদের অবিকৃত আকারে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার ফলে পাঠকের এই ধারণা হবে—যেন পরিণত বয়সে "ওগুলো আমি লিখেছি।...আমার ভারি দুঃখ হয় যে, সেই বয়সের আমার লেখাগুলো হুবহু ছাপা হয়ে গেছে।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২২)। ফণীন্দ্রনাথ পালকে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছেন : "আমার একেবারে ইচ্ছা নয়, আমার পুরানো লেখা যেমন আছে তেমনই প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই তো ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯)। **ঐ লেখাগুলি যিনি বা যাঁরা পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন (গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, রেঙ্গুনে প্রথম যাওয়ার সময় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে যাওয়া ছেলেবেলার গল্পগুলোর মধ্যে 'কাশীনাথ' গল্পটি শরৎচন্দ্রের মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির হাতে তুলে দেন সুরেশচন্দ্রেরই আগ্রহাতিশয্যে। 'শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭)। শরৎচন্দ্র পরে অবশ্য জেনেছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'কাশীনাথ' গল্পটি পাঠিয়েছেন। তখন বিরক্ত শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া চিঠিতে : "তুমি 'কাশীনাথ' [সুরেশচন্দ্র] সমাজপতিকে দিয়ে ভালো করো নি।...আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৬)। ওঁদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট বিরক্ত : "'সাহিত্যে'র মতন পত্রিকায়...কে যে এই লেখাগুলো আমাকে না জানিয়ে ছাপাতে দিলে, তাও তো জানবার**

উপায় নেই।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৬৯)। পত্রিকা-সম্পাদকেরা শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনাগুলি পর্যন্ত ছাপবার জন্য কি পরিমাণে উদগ্রীব ছিলেন, তা লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় : "তাঁর [শরৎচন্দ্রের] রচনার জনপ্রিয়তা দেখে সম্পাদকেরা হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন—এমন কি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো উচ্চশ্রেণীর সম্পাদকও। তাই শরৎচন্দ্রের নূতন রচনা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা তাঁর প্রথম বয়সের অপরিপক্ক রচনাবলী নিয়েই কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এদের কতকগুলি আখ্যানবস্তু চলনসই হলেও রচনাভঙ্গির উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যামান এবং কতকগুলি লেখা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে প্রকাশ ক'রে লেখককে অপমান ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি।" ('যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৬-১৯৭)।

৮ক. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৪।
৮খ. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৮৬।
৯. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১২১।
১০. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৪।
১১. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৭৫।
১২. ঐ, পৃ. ৬১-৬২।
১৩. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৩।
১৪. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫।
১৫. ঐ, পৃ. ৫০।
১৬. ঐ, পৃ. ৫৫।
১৭. ঐ, পৃ. ২৯।
১৮. ঐ, পৃ. ৭৩।
১৯. ঐ, পৃ. ৩২।
২০. ঐ, পৃ. ৫৩।
২১. ঐ, পৃ. ৪৬।
২২. ঐ, পৃ. ৪৫।
২৩. ঐ, পৃ. ৫৮।
২৪. ঐ, পৃ. ৭২।
২৫. ঐ, পৃ. ২৩।
২৬. ঐ, পৃ. ৩২।
২৭. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৪।
২৮. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৭৩।
২৯. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৪।
৩০. 'চরিত্রহীন' প্রকাশের জন্য 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ, 'সাহিত্য' পত্রিকার মধ্যে কি পরিমাণে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছিল, তা শরৎচন্দ্র নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছেন : " 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ [নাথ ভট্টাচার্য] চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে চরিত্রহীন [আমি] দিবই এবং এই আশায় জলধর সেন প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস

অহংকার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই হইতেছে ভারতবর্ষের মোড়ল। এখন দ্বিজুবাবু প্রভৃতি (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও রেজেস্ট্রি চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোনদিকে যে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধুবান্ধব ক্লাব প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে।" (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯০-৯১)।

শরৎচন্দ্র নিজে অবশ্য 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'য় প্রকাশ করায় দৃঢ় ছিলেন। সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে আশ্বাস দিয়ে লিখেছেন : "আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকাব লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ বা দুই-ই, কেহ বা বন্ধুত্বের অনুবোধও কবিতেছেন [প্রমথনাথকে খোঁচা]। আমি কিছুই চাহিনা—আপনাকে [চবিত্রহীন দিব] বলিয়াছি, আপনাব মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।" (ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১০৯)।

৩১. 'ভাবতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায 'চরিত্রহীন' প্রকাশে প্রমথনাথেব উদ্যোগ, শরৎচন্দ্রকে লেখা তাঁব চিঠি থেকে স্পষ্ট : "অনুষ্ঠানপত্র বুধবার প্রকাশিত হবে। আব প্রথম মাসেব জন্য লেখা ১৫ বৈশাখ প্রেসে যাবে। আর বিলম্ব কোবো না। দয়া ক'বে পত্রপাঠ তোমাব ['চরিত্রহীন'] উপন্যাসটি পাঠাও।" (শরৎচন্দ্রকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যেব চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৬)।

৩২. শবৎচন্দ্রকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের চিঠি, ঐ, প. ১১৫-১১৬।

৩৩. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে শরৎচন্দ্রের চিঠি, ঐ, পৃ. ১৫।

৩৪. ঐ, পৃ. ১৮-১৯। 'চবিত্রহীনে'র পক্ষে লড়াই করার সময় উপন্যাসটির কিছু ত্রুটি শরৎচন্দ্র স্বীকাব ক'বে লিখেছেন : "ইনটেলেকচুয়ালি' এ একেবারে নির্দোষ না হলেও নেহাৎ নীচু নয়—কিন্তু 'রুচির' কথা তুললে গোড়াটায় এর দোষ কিছু বেশি।" (ঐ, পৃ. ২১)।

৩৫. ঐ, পৃ. ৩০।

৩৬. ঐ, পৃ. ৩৮।

৩৭. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৩।

৩৮. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৫-৩৬।

৩৯. 'শবৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৪।

৪০. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৫।

৪১. শরৎচন্দ্রকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যেব চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৬।

৪২. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৩। ফণীন্দ্রনাথের আশংকিত মনোভাব শরৎ-মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জেনেছেন, সেকথা শরৎচন্দ্রকে চিঠিতে লেখার পর বিরক্ত শরৎচন্দ্রের প্রত্যুত্তর : "চরিত্রহীন তার কাগজে বার হবে না একথা কে বলিয়াছে?" (ঐ, পৃ. ৯২)।

'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের ওঠাপড়া ছিল, যার পরিণতি বিয়োগান্তক। বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর স্তাবকতা করব না, এই সংকল্প ক'রে শরৎচন্দ্র 'যমুনা' পত্রিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন 'বড়লোকের নির্লজ্জ

খোসামোদ' তিনি করতে চাননা। "তোমাদের কাগজে ভাল লেখার অভাব হবেনা, কেননা তোমরা টাকা দেবে। কিন্তু, আমি যদি এই সময়েই যমুনাকে ছাড়ি, তার আর কেউ থাকবে না। অথচ, আমি বলেছি, যদি 'মেরিট'-এর আদর থাকে—তবে যমুনা বড় হবেই।" "'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা' তেমনি আমার।" 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জেনেও তাঁকে 'যমুনা'র স্বার্থ দেখতে শরৎচন্দ্র অনুরোধ করেছেন : "যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেদিকে একটু নজর রেখো।" এমন কি সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন শরৎচন্দ্র 'যমুনা'কে সরাসরি সাহায্য করতে প্রমথনাথের কাছে আবেদন করেন।

একইসঙ্গে ফণীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র বারবার পরামর্শ দিয়েছেন কিভাবে 'যমুনা'র শ্রীবৃদ্ধি করা যায়। অনুরোধ করেছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে। এও জানিয়েছেন, তাঁর একার পক্ষে 'যমুনা'র উপযোগী সমস্ত ধরনের রচনা লেখা সম্ভব নয় বলে তাঁর 'সমস্ত [সাহিত্যিক] শিষ্যগুলিকে' কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আছেন নিরুপমা দেবী, বিভূতিভূষণ ভট্ট, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। শরৎচন্দ্রের তরফে ফণীন্দ্রনাথকে এই আশ্বাস অবশ্যই ছিল : "আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিংবা কোনো লোভে যাবার চেষ্টা করব, এমন কথা কোনোদিন মনেও করবেন না। আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।"

কিন্তু 'যমুনা'র জন্য সাধ্যমতো লেখা দেওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের উপর ফণীন্দ্রনাথের চাপ উত্তরোত্তর বাড়ছিল। তখন শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সঙ্গে মনোভেদ অনুভব করলেন। অন্য কারণও ছিল। সে সময়ে একদিকে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, অন্যদিকে পুস্তক প্রকাশনসংস্থা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনসের মারফত আর্থিক-প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছেন। বৃহৎ সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী আসনলাভের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে জাগ্রত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁকে আর্থিক নিরাপত্তার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্মা ত্যাগে ক্রমাগত প্ররোচনা দিয়েছেন। এর পাশে ফণীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কেবলই সংশয়ে, সন্দেহে ভুগেছেন। তার ছায়া শরৎচন্দ্রের উপরেও পড়েছিল। ফণীন্দ্রনাথকে 'ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি' বলেও তিক্ত স্বরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন : "আজকাল ['যমুনা'য় লেখার জন্য] এত বেশি অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও তো পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয়না।" ফণীন্দ্রনাথের সন্দেহবাতিকের জন্য তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ : "সে আমার ছোট ভাইয়ের মতো—একথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারেনা তা সে-ই জানে।" ফণীন্দ্রনাথ বাঁধন আরো শক্ত করার জন্য শরৎচন্দ্রকে 'যমুনা'র অন্যতম সম্পাদক ক'রে দিয়েছেন। তবু বাঁধন ছিঁড়ল।

শিবিরত্যাগী শরৎচন্দ্রকে 'যমুনা' পত্রিকা ক্ষমা করতে পারেনি। মৃত্যুর অল্প আগে শরৎচন্দ্র গভীর দুঃখের সঙ্গে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—তাঁর বিরুদ্ধে 'যমুনা' কুৎসা রটাচ্ছে। তা সত্ত্বেও নিজ সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে ফণীন্দ্রনাথ পালের পৃষ্ঠপোষকতা স্বীকার করার উদারতা শরৎচন্দ্রের ছিল। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন : "আমার সাহিত্যিক জীবনের জন্যে আমি যাঁর নিকটে সবচেয়ে ঋণী, তিনি হচ্ছেন যমুনা-সম্পাদক ফণীবাবু (ফণীন্দ্রনাথ পাল)। আমার লেখা ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোকের কি আগ্রহই ছিল।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৪) (ফণীন্দ্রনাথ পাল-

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের জন্য 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের (৩য় খণ্ড) ১৫, ২১-২২, ২৯, ৫১, ৬৭, ৯২, ৯৫, ৯৬, ১০০-১০৬, ৩১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৪৩. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৮।
৪৪. ঐ, পৃ. ৭৯।
৪৫. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৭।
৪৬. ঐ, পৃ. ১২০।
৪৭. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩০।
৪৮. ঐ, পৃ. ৭৯।
৪৯. ঐ, পৃ. ১৯।
৫০. ঐ, পৃ. ২৬।
৫১. ঐ, পৃ. ৭৯।
৫২. ঐ, পৃ. ৩০।
৫৩. ঐ, পৃ. ৬১।
৫৪. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৩।
৫৫. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৪।
৫৬. ঐ, পৃ. ২৯।
৫৭. হেমেন্দ্রকুমার বায়কে চিঠি, 'শবৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৫৩।
৫৮. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯।
৫৯. দিলীপকুমার বায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৪৯-৫০।
৬০. ঐ, পৃ. ৭৪।
৬১. ঐ, পৃ. ৭৬।
৬২. ঐ, পৃ. ৭৮।
৬৩. ঐ, পৃ. ৭৯।
৬৪. ঐ, পৃ. ৮০।
৬৫. ঐ, পৃ. ৮১।
৬৬. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৩৩।
৬৭. ঐ, পৃ. ১৩১।
৬৮. ঐ, পৃ. ১৪০।
৬৯. সুধীরচন্দ্র সরকারকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৫৭।
৭০. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৯৬।
৭১. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৪০।
৭২. সুবোধ রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৬০-১৬১। গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাকে শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের মধ্যে ধরে দিয়েছেন। সুবোধ রায়কে তিনি লিখেছেন : "প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালো মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভালো করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। এইটা বড় দরকারি জিনিস। এই ধরনের দুটা চারটা কথা ['পল্লীসমাজে' আছে]।" (ঐ)। কখনো বলেছেন : " 'পল্লীসমাজ'-এর জ্যাঠাইমার মধ্যে দিয়েই তো আমি পল্লীর মুক্তির সন্ধান দিয়েছি।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ১৯)।

৭৩. সুধীরচন্দ্র সরকারকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৫৮।

৭৪. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪০১।

৭৫. রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য খণ্ড), পৃ. ২৬০। 'ষোড়শী' নাটকের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলায়, শরৎচন্দ্র 'ষোড়শী'র তথ্যভিত্তি সমর্থন করার সময় পল্লীসমাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন: "এটা ['ষোড়শী'] লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে। সেই জানাই হলো আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা ক'রে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেযনি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার কল্পনার মেশাতে গেলেই বোধহয় এমনি ঘটে।...এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লীসমাজ, এর বিক্রিও যত খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিকবে না। কারণ এও সত্যে মিথ্যেয় জড়ানো। মিথ্যেও ববঞ্চ টিকে, কিন্তু তথ্যের বনেদের উপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয়না।" (ঐ)।

৭৬. 'শরৎচন্দ্র', রাধারানী দেবী, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪। বহু প্রসারিত অভিজ্ঞতা-পরিধির মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা দিকও ঢুকে পড়ে। সাহিত্যসৃষ্টির সময়ে ব্যক্তিজীবনের ঐ অনুপ্রবেশের বিষয়ে লেখককে যেমন সতর্ক থাকতে হবে, তেমনি লেখকের অন্দরমহলে উঁকি দেওয়ায় পাঠকের অহেতুক কৌতূহলও অবাঞ্ছিত। "মানুষ যখন সত্যিকার লেখা লেখে তখন সেই লেখার পিছনে লেখকের একটা প্রভাব অনুভব করা যায়।...লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের যেটুকু পরিচয় মেলে, এ নিয়েই পাঠকের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ১৯)।

৭৭. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৮১।

৭৮. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৩৫।

৭৯. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯৮।

৮০. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫৭।

৮১. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৩৫।

৮২. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৯৮।

৮৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫৭।

৮৪. কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৬৪।

৮৫. 'যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৮।

৮৬. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৩৬।

৮৭. ঐ, পৃ. ৩৪০।

৮৮. ঐ, পৃ. ৩৪২।

৮৯. শরৎচন্দ্রকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৬।

৯০. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্রের চিঠি, ঐ, পৃ. ৯২।

৯১. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে বিভূতিভূষণ ভট্টর চিঠি, ঐ, পৃ. ১২৫।

৯২. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১২৪।

৯৩. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৫১।

৯৪. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৬।

৯৫. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৭।

৯৬. ঐ, পৃ. ৯৫।

৯৭. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫।

৯৮. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৬৬।

৯৯. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৪৯।

১০০. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৬১। অধিকাংশ কবিতায় সত্যকার অনুভূতি থাকেনা, একথা যোগেন্দ্রনাথকে পরেও শরৎচন্দ্র বলেছেন : "এত যে সব কবিতা লেখ, বলতে পাবো, কজন সত্যিকার প্রাণ ঢেলে দিয়ে কবিতা লিখে থাকে? সত্যিকার প্রাণ থাকলে অতসব উদ্ভট কল্পনার জন্য মাথা খেলাতে হয়না।" (ঐ, পৃ. ৬৬)।

১০১. রাধারানী দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৯৬।

১০২. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৩।

১০৩. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৬১।

১০৪. অমল হোমকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৯১।

১০৫. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৭।

১০৬. জনৈক অজ্ঞাত পাঠককে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৫৯।

১০৭. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৮৩। একই কথা মণীন্দ্রনাথ রায়কেও শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "ষোড়শীর অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি,...দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির [শিশিরকুমার ভাদুড়ী] এবং চারুর [চারুশীলা দেবী] (জীবানন্দ-ষোড়শী) অভিনয় দেখবাব মতো বস্তু।" (ঐ, পৃ. ৪৩৪)। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের প্রাথমিক নাট্যরূপ শিবরাম চক্রবর্তী কৃত। শিবরাম লিখেছেন : "ইবসেনিকে কায়দায় সেই বিস্তৃত বইকে চার অঙ্কেব—প্রত্যেক অঙ্ক একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ—নাট্যাকারে ঘন সম্বন্ধরূপে দাঁড় করানো গেল।" ('ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা', সাতাশ পরিচ্ছেদ, 'দেশ' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭—পৌষ ১৩৭৯)। পরে শরৎচন্দ্র তা ঘষামাজা ক'রে দেন এবং মঞ্চে শিশিব ভাদুড়ী কর্তৃক 'ষোড়শী' নামে অভিনীত হয়। শিবরামের ঐ নাট্যরূপদানের কথা শরৎচন্দ্র চিঠিতে স্বীকার করেছেন : "বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। আমি আবার জাট খোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের জন্যে তৈবি ক'রে দিয়েছি।" (মনীন্দ্রনাথ রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩)। শিবরাম আশা করেছিলেন 'ষোড়শী'র 'বেনিফিট নাইটে' অভিনয়সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ তিনি পাবেন। তখন তিনি খুবই অর্থকষ্টে ছিলেন। কিন্তু "অভিনয় শেষে গ্রীনরুমে গিয়ে জানলাম (শিশিরবাবু স্বমুখেই) সেদিনকার [টিকিট] বিক্রির সব টাকা একটা থলেয় ভরে রাখা হয়েছিল, সেই থলিটা নিয়ে শরৎচন্দ্র চলে গেছেন খানিক আগেই। শিশিরবাবু আমার অংশত দাবির কথাটা তাঁকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি...বলেছেন—'শিররাম টাকা নিয়ে কী করবে? বিয়ে করেনি—কিচ্ছুনা। তার ছেলে নেই পুলে নেই ঘর নেই সংসার নেই—টাকার তার কীসের দরকার?...আমার বেনিফিট নাইটের বখরা ওকে দিতে যাব কেন? এ রাত্তিরে টিকিট বিক্রি হয়েছে আমার নামে, আমার জন্য টাকা দিয়ে দেখতে এসেছে সবাই। এর ভেতরে সে আসছে কোত্থেকে?" ('ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা' উনসত্তর পরিচ্ছেদ)। শরৎচন্দ্রের এই ব্যবহারে শিবরাম মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছিলেন। "উপন্যাসের দরদী শরৎচন্দ্র জীবনের বাস্তববিন্যাসে এক নিমেষে কোথায় যে হারিয়ে গেলেন!" শোধ তোলার চেষ্টায় 'নবশক্তি', 'নাচঘর' ইত্যাদি পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে 'ঝাল' বাণও শিবরাম ছুঁড়েছিলেন।

১০৮. শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল অন্য কোনো নাট্যকারের পক্ষে 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য একই : "আমি 'দত্তা' বইটার একখানা নাটক অপরের কাছে

পেয়েছি। নিজেই কিছু অদলবদল ক'রে বিজয়া নাম দিয়ে স্টার থিয়েটারে দেব মতলব করেছি। আমার উপন্যাসগুলোর দোষ এই যে, নাটক তৈরি করতে গেলে বহু স্থানেই একেবারে নতুন ক'রে লিখতে হয়। বাইরের লোকের মুশকিল এই যে, তাঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারেন না। শুধু বইয়েতেই যে কথাগুলো আছে তাই নাড়াচাড়া ক'রেই যা হোক একটা কিছু খাড়া করতে বাধ্য হন। সেইজন্যে প্রায়ই দেখি ভালো হয়না।" (অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১)। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য পৃথক কিছু ছিলনা। (ঐ, পৃ. ৩০১)।

১০৯. অমল হোমকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৯১।
১১০. রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৬১।
১১১. 'শরৎচন্দ্রেব টুকবো কথা', পৃ. ৪৬-৪৭।
১১২. 'Saratchandra's Great Message', Suniti Kumar Chatterjee (Source : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 392).
১১৩. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১২৩-১২৪।
১১৪. পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।
১১৫. 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১২৩।
১১৬. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শবৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৩২।
১১৭. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৭।
১১৮. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৪।
১১৯. ঐ, পৃ. ৫০।
১২০. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৪।
১২১. ঐ, পৃ. ৫১।
১২২. ঐ, পৃ. ৪৩।
১২৩. প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৮৪।
১২৪. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১০৫।
১২৫. ঐ, পৃ. ১১২।
১২৬. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৯৪-৯৫।
১২৭. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১১৪। সাহিত্য-সমালোচনা তিনি ভালোই লেখেন —শরৎচন্দ্রের চিঠিতে এই আত্মপ্রত্যয় থাকলেও মৌখিক ভাষণে বাহ্য বিনয় দেখাতে কসুর করেন নি। ১৩৩১-এর ১০ আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি শরৎচন্দ্র বলেছেন : "সাহিত্য সেবাই আমার পেশা, কিন্তু ইহার যাচাই-বাছাই ঘষা-মাজার ব্যাপারে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ, একথা আমাব মুখে অদ্ভুত শুনালেও ইহা বাস্তবিক সত্য। কোন্ ধাতুর উত্তব কি প্রত্যয় ক'রে সাহিত্যপদ নিষ্পন্ন হয়েছে, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, রস বস্তুটি কি, কাকে বলে সত্যকার আর্ট, কাকে বলে মিথ্যাকার আর্ট, কি ইহার সংজ্ঞা, আমি কিছুই এসকলের জানিনা।" ('সাহিত্য ও নীতি')।
১২৮. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১২১।
১২৯. কাজী আবদুল ওদুদকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৯৫।
১৩০. জাহান-আরা চৌধুরীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৮২।
১৩১. ঐ, পৃ. ৪৮১।
১৩২. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৭।

১৩৩. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪২।

১৩৪. ঐ, পৃ. ৪৩।

১৩৫. ঐ, পৃ. ৪৭। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আসন্ন আবির্ভাবে যে-সম্পাদকেরা ভীত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালও আছেন। অনুমান করতে পারি তিনিই আগত বিপদ দেখে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকেও সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছেন : "দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া গ্র্যাণ্ড ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালোই, তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভালো লেখাও পাইবেন। তাছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম! এর জন্য [আপনার] চিন্তার প্রয়োজন দেখিনা।" (ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা চিঠি, ঐ, পৃ. ১১১)।

১৩৬. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৫৬।

১৩৭. ঐ, পৃ. ৬০।

১৩৮. ঐ, পৃ. ৭৬।

১৩৯. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৩৯।

১৪০ক. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫৫।

১৪০খ. অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪২৯-৪৩০।

১৪১. হেমেন্দ্রকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ১৫৩।

১৪২. তিনি কতখানি সতর্ক লেখক, তা যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে শরৎচন্দ্র মুখে বলেছেন : "আমি যা লিখি তার প্রতিটি কথা ওজন ক'রেই লিখি। অনেকে যেমন যা মনে এল তাই কলমের মুখ দিয়ে বার ক'রে দিলে, আমার কিন্তু সেটি হবার জো নেই।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৭৮)।

১৪৩. হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে নিজের রচনারীতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "আমি তো অনেক ভেবেচিন্তেই গল্প লিখি।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫)। এই প্রসঙ্গে মৃত্যুর 'দেড় বৎসর' আগে কালিদাস রায়কে তাঁর বলা কথা একই : "আমি বড় ঢিমে লেখক, প্রত্যেক লাইনটা ওজন ক'রে ক'রে কেটে কেটে লিখি, মনে প্রফুল্লতা না থাকলে, inspiration না এলে কলম একেবারে এগোয় না।" ('মৃত্যুপথে শরৎচন্দ্র', কালিদাস রায়, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

১৪৪. Saratchandra's Great Messages, Suniti Kumar Chatterjee (Source : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 391).

১৪৫. রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৬১।

১৪৬. ঐ, পৃ. ২৬০।

১৪৭. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮৯।

১৪৮. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২১৯।

১৪৯. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৩৬।

১৫০. ঐ, পৃ. ৩৬০।

১৫১. ঐ, পৃ. ৩২২।

১৫২. ঐ, পৃ. ৩৩০।

১৫৩. 'সর্বতোভদ্র কথাশিল্পের স্রষ্টা', সুবোধ ঘোষ (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p. 297)।

১৫৪. 'শরৎচন্দ্র', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

১৫৫. 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, জানুআরি ২০০০, পৃ. ৩৮৭-৩৯৪।
১৫৬. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৫৮।
১৫৭. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৯১-৯২।
১৫৮. রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৫৯। পরে দিলীপকুমার রায়কে শরৎচন্দ্র একই কথা বলেছেন : "অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তিই দেয়না, শক্তি হরণও করে।" (দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩২৫)।
১৫৯. কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৬৪।
১৬০. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫।
১৬১. রাধারানী দেবীকে চিঠি, ঐ, পৃ. ২৫২।
১৬২. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৩৩।
১৬৩. ফণীন্দ্রনাথ পালকে চিঠি, ঐ, পৃ. ১২০।
১৬৪. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে চিঠি, ঐ, পৃ. ৫৩।
১৬৫. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, ঐ, পৃ. ৪৫৭।
১৬৬. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৮৭।
১৬৭. প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ১৮০-১৮১।
১৬৮. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২২। বাঙালি সাহিত্য-সমালোচকদের মন্দ রুচি সম্পর্কে পরেও শরৎচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন : "কেউ যদি শুধু হিংসের বশে বা বাহাদুরি করবাব জন্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, সেটাই অসহ্য হয়। আমাদের দেশের সমালোচনায় 'ছোট মুখে বড় কথা'র ভাবটাই বেশি।" (ঐ, পৃ. ৭০)।
১৬৯. ঐ, পৃ. ৮৭।
১৭০. ঐ, পৃ. ৯২।
১৭১. 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', অজিতকুমার ঘোষ, পৃ. ৩৯২।
১৭২. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৪১।
১৭৩. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৭৯।
১৭৪. ঐ, পৃ. ৯০।
১৭৫. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২০৯।
১৭৬. ঐ, পৃ. ২১২-২১৩।
১৭৭. অনুবাদের বিরোধিতা ক'রে হেমেন্দ্রকুমার রায়কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : "হেমেন্দ্র, কখনো অনুবাদ কোরো না, ওটা হচ্ছে পণ্ডশ্রম।" হেমেন্দ্রকুমার অবশ্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারেন নি। ('যাঁদের দেখেছি', পৃ. ১৯৯)।
অনুবাদের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের আপত্তির মূল কারণ—অনুবাদ প্রায়শ অক্ষম অনুকরণে দাঁড়ায়। যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে বলেছেন : "এমন অনেকে আছেন, যাঁদের ভেতরের শক্তি বিন্দুমাত্রও থাকে তো কি বলি ভায়া, অথচ তাঁদের লেখক হবার এমন শখ যে তা আর তোমাকে কি বলব ভায়া! পরের লেখা হুবহু চুরি ক'রে এক আধটি নাম মাত্র বদলিয়ে ফেলে লেখক-নাম জাহির করবার জন্যে এমন ক'রে উঠে পড়ে লাগেন যে, তা দেখে হাসিও আসে দুঃখও পায়।" ('ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৯০)।
১৭৮. লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২১০।
১৭৯. 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র', পৃ. ৮৯-৯০।
১৮০. মতিলাল রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৬৮।

১৮১. মতিলাল রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৬৮।

১৮২. বর্তমান গ্রন্থটি যখন মুদ্রণের শেষ পর্যায়ে তখন প্রতিষ্ঠিত নন্দনতাত্ত্বিক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যচিন্তা : শরৎচন্দ্র' নামক রচনাটি ('শরৎচন্দ্র : দেশ কাল সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, সোনার তরী, কলকাতা-৭০০ ০৫৭, এপ্রিল ২০০০) হাতে আসে। সেই প্রবন্ধ থেকে তাঁর চিন্তাঋদ্ধ কয়েকটি বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রবন্ধটির প্রধান অংশে সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মতদ্বন্দ্ব—রিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম, আইডিয়ালিজম, কলাকৈবল্যবাদ ইত্যাদি সূত্রে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় অসংযত ইন্দ্রিয়-বিলাসের সমালোচনা কবেছিলেন। উল্টোপক্ষে শরৎচন্দ্র সেকালের আধুনিক সাহিত্যিকদের চড়া বাস্তবতাব পক্ষে কলম ধরেছিলেন। পরে অবশ্য শরৎচন্দ্র তাঁর মত পরিবর্তন ক'রে রবীন্দ্রনাথের ধারণারই সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মত ভিন্ন প্রান্তিক থেকে গেছে। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "এ বিশ্বাস একান্তই শবৎচন্দ্রের নিজস্ব ছিল যে 'ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওযাই তো সাহিত্যের কাজ।' রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্বে এই মন্তব্যের সমতুল উক্তি আমাদের চোখে পড়েনি।...রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তনের ভিতর থেকেও তাঁর বিশ্বাসের একটি ঐক্যমূর্তি খুঁজে পাওযা সম্ভব। সাহিত্যের উপাদান, গঠন ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বক্তব্য একটি সুগঠিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে শিল্পী হিসেবে বিচার করতে আমাদের যত সুবিধা, শিল্পতাত্ত্বিক হিসেবে বিচার করার অসুবিধা তার চেয়ে অনেক বেশি। যুক্তি বুদ্ধিশাসিত তত্ত্বগর্ভ বাক্য উচ্চারণে তাঁর দক্ষতা স্বীকৃত সত্য নয়। অথচ যেহেতু নিজে ছিলেন অক্লান্ত সাহিত্যসেবী, তাই সাহিত্যের উপাদান, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলির একটা সমাধান গড়তে পেরেছিলেন নিজের মতো ক'রে।" প্রচলিত নীতি এবং শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের পার্থক্য অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ডঃ মুখোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন : "শিল্পের লক্ষ্য নীতি প্রচার এবং শিল্পের সার্থকতা শিল্পেই, এই দুই মতবাদের আপাত বিরোধিতা শরৎচন্দ্র মানলেন না, যেমন মানেন নি ভাববাদের সঙ্গে বাস্তববাদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে।...সনাতনীরা নীতিপ্রচারকে সাহিত্যের লক্ষ্য বলতেন, তাঁদের কাছে 'নীতি' শব্দের যে তাৎপর্য ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে 'নীতি' শব্দের মর্মার্থ ছিল তার থেকে পৃথক। সুতরাং প্রচলিত অর্থে নীতিবাদী যাঁরা তাঁদের সঙ্গে কলাকৈবল্যবাদীদের যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক ছিল 'নীতি' শব্দের অর্থের ভিন্নতার (ব্যাপকতাও বলা চলে) ফলে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যভাবনায় সে দ্বন্দ্ব দূর হলো। মোটকথা, সাহিত্যতত্ত্বের জগতের দুটি প্রধান সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর সমাধান ক'রেছিলেন শরৎচন্দ্র। একটি ভাববাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব, অন্যটি কলাকৈবল্যবাদ ও নীতিবাদের দ্বন্দ্ব।" শবৎচন্দ্রীয় সত্য সম্বন্ধেও তাঁর মত প্রণিধানযোগ্য : "শরৎচন্দ্র বিশেষ ধরনের 'সত্য'-কে কামনা করেছেন, যে-সত্য 'কল্পনা'র বিরোধী নয়। বস্তুত এই সত্যই সাহিত্যের সত্য বা 'poetic truth' বলে কথিত। কিন্তু 'ন্যাচারালিস্ট'দের আপত্তি ছিল এই 'poetic truth'-এর বিরুদ্ধে এবং তাঁদের অনুরাগ ছিল 'scientific truth' সম্পর্কে। একদা 'scientific truth' বা নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি অনুরাগ থেকেই 'কল্লোলে' রবীন্দ্রনাথের উর্ধ্বে শরৎচন্দ্রকে স্থাপন করা হয়েছিল। 'কল্লোলে'র ধারণা ছিল এই scientific truth, যাঁকে তাঁরা বলছেন জীবনের 'পাপের দিকটা' তার চিত্রণে শরৎচন্দ্র অসাধারণ বিস্ময়কর শক্তির অধিকারী।"

একাদশ অধ্যায়

শরৎচন্দ্র : রাজনীতি ও রাজনৈতিক সাহিত্যে

॥ ১ ॥

রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গমধ্যে শরৎচন্দ্র
মহাত্মা গান্ধী-দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র

অনেকের বিবেচনায় সাহিত্যিকের পক্ষে একটি অনুচিত কাজ শরৎচন্দ্র ক'রে ফেলেছিলেন—স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে। কোথায় সাহিত্যিক মিষ্টি-মধুর প্রেমকাহিনী লিখবেন (যা তাঁরা চিরকাল ক'রে আসছেন), কিংবা বিদেশী সাহিত্যের আদলে আনবেন রগরগে বাস্তব জীবন (যা করতে বিশের দশকের তরুণ সাহিত্যিকেরা অভ্যস্ত ছিলেন), যেখানে সমাজচেতনা সৃষ্টির অল্পস্বল্প প্রয়াস থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমরে? সাহিত্যিকের পক্ষে একাজ নৈব নৈব চ। শরৎচন্দ্র অবশ্যই এত চিন্তা ক'রে রাজনীতিতে নামেন নি। চোখের সামনে দেখেছেন, উত্তাল স্বাধীনতাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বালক-যুবা-বৃদ্ধ এমন কি নারীরাও। সাহিত্যিকেরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে "জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার" সাহিত্যিকেরাই মাথায় তুলে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে জেলের দানাপানি খাবার ভয় থাকেই। কিন্তু সে ভয় থাকলে "রাজনীতিটা করবে কারা শুনি?" [১] প্রশ্নটা শরৎচন্দ্র ছুঁড়ে দিয়েছেন এবং ভ্রূক্ষেপও করেন নি কোথায় তা আঘাত করেছে!

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের মেয়াদ কমবেশি পনেরো বছর। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তার সূত্রপাত এবং ১৯৩৬-এ শারীরিক ও অন্যান্য কারণে সে পথ ত্যাগ। এর মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য কিছু অধ্যায় সৃষ্টি হয়ে গেছে, যথা অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ছিলই। এ সকলের সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের গোপন বা প্রকাশ্য সংযোগ। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর উত্থানও ঘটেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রের একান্ত আগ্রহে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য, বেশ কিছু বছরের জন্য হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। একবার আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ বি এও করেছিলেন। [২]

অসহযোগ : রবীন্দ্র-শরৎ মতভেদ

শরৎচন্দ্রের জীবন-অভিজ্ঞতা বিপুল—এটা জ্ঞাত সত্য। ইংরেজ শাসনেব ভয়াবহ এবং আক্ষরিক অর্থে অকথ্য অত্যাচারে কিভাবে জাতীয় অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ এবং সম্ভ্রম ধ্বংস হয়েছে—তা দেখার মতো চোখ তাঁর ছিল, আর ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি। তাঁর স্পর্শকাতর রক্তাক্ত মন একদিকে চেয়েছে জগদ্দল দেশীয় সমাজশাসনের হাত থেকে মুক্তি, অন্যদিকে বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল মোচন। দেখা গেল, শরৎচন্দ্র খোলা কলম হাতে রণাঙ্গনে আবির্ভূত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় আগেই ছিল—'নারায়ণ' পত্রিকায় 'স্বামী' গল্প প্রকাশের. সূত্রে। তা গভীর হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের কালে। অসহযোগী দেশবন্ধু-দলভুক্ত শরৎচন্দ্র অসহযোগে 'অ-সহযোগী' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলমের শরক্ষেপ করলেন।

নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ-চিত্তরঞ্জনের পূর্বের ঘনিষ্ঠতা তখন আর ছিলনা। মতপার্থক্য পৌঁছেছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত। ১৯১৬ সালে আমেরিকায় ন্যাশনালিজম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্য ভাষণে কবির মতের সমালোচনা করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকে জেনেছি : "তিনি [চিত্তরঞ্জন] কবির আমেরিকা বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতিকে বারে বারে ধিকৃত করিলেন।" [৩] পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনকালে চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ বিরোধ তীব্রতর। গান্ধীজী ইংরেজ-সৃষ্ট এবং পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। ইংরেজের গোলামখানা ছেড়ে যেসব ছাত্র বেরিয়ে আসবে, তাদের জন্য চিত্তরঞ্জন স্থাপন করেছিলেন গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন। "গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ছিল সারা বাংলায় গজিয়ে-ওঠা অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান।...ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ ও বি-এ'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছিল—আদ্য, মধ্য ও উপাধি। প্রিন্সিপ্যাল—আচার্য; চ্যান্সেল্যার—মহামাণ্ডলিক ; ভাইস-চ্যান্সেল্যার—উপ-মাণ্ডলিক ; কাউন্সিল—সংসদ। নামকরণগুলি করেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ও বিদ্যায়তনের সম্পাদক হয়েছিলেন অধ্যাপক ও বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এল. ব্যানার্জী) ; ব্যবস্থাপক—প্রাক্তন বিপ্লবী মাখনলাল সেন, তাঁর সহযোগী—শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী ও অমূল্যচন্দ্র সেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিই অধ্যাপনা করতেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন বাংলার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বিদ্যাপীঠে এসেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। **প্রায়ই আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**" [৪]

বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদে সুভাষচন্দ্র পরে বৃত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথেব অবশ্যই আস্থা ছিলনা চিত্তরঞ্জনের জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর। স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তিনি সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সুখকর হয়নি। ব্রতী হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায়, যা প্রথমদিকে যথেষ্ট পরিমাণে 'জাতীয়' থাকলেও পরে কবির ইচ্ছানুযায়ী আন্তর্জাতিক হতে থাকে। এ হেন মানুষের কাছে সুভাষচন্দ্র একদিন

গিয়েছিলেন গৌড়ীয় বিদ্যায়তন সম্বন্ধে তাঁর মত জানার জন্য। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বেশ অস্বস্তিকর সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় :

"একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমি [সাবিত্রীপ্রসন্ন] ও সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'কি সুভাষ, তোমরা কলেজের নাম বিদ্যাপীঠ দিয়েছ কেন? বিদ্যা কি ওখান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন?' সুভাষচন্দ্র এই বিদ্রূপে লাল হয়ে উঠলেন। আমি বললাম, অনেকেরই সেই ধারণা, কিন্তু জাতীয় শিক্ষার গোড়াপত্তনের জন্যই এর প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছাসেবকদের এক জায়গায় জমা ক'রে রাখার জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথ পরে কথার মোড় বদলালেন এবং তিনি সুভাষবাবুর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক অনেক কথার আলোচনা করলেন।" [৫]

কিন্তু কবির অসহযোগ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় নি। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : "ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] অসহযোগ আন্দোলনেব বিরোধী একদল লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন, যাঁরা কেবল ঐ আন্দোলনের দোষত্রুটির দিকটিই তাঁব কাছে তুলে ধরতে লাগলেন। সেইসঙ্গে তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক ঔষধাদি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত মতামতের কথা শোনাতে লাগলেন, যার সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মনীতির কোনো সম্পর্ক ছিলনা।" [৬] অতএব অসহযোগ আন্দোলনের অর্থ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতিব সঙ্গে বিচ্ছেদ—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন ভাদ্র ১৩২৮-এর 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। সেখানে তাঁর বক্তব্য, পশ্চিম বিশ্বজয় করেছে বিদ্যার জোরে। "সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে।" তাঁর মতে, "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনে প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতির সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।" এজন্য ভারতে শিক্ষার মিলন ঘটানো দরকার। "আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক।"

কবির এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের অসহযোগীরা যথেষ্ট বিব্রতবোধ করেছিলেন। ও হেন পরিস্থিতিতে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা সুভাষচন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে : "কংগ্রেস মহলের পক্ষে এই আক্রমণকে মাথা পেতে গ্রহণ করা সম্ভব ছিলনা—অথচ কবির [রবীন্দ্রনাথের] মাপের কোনো সাহিত্যিককে পাওয়াও সম্ভব ছিলনা—যিনি উপযুক্ত উত্তর দিতে পারেন। অগত্যা বাংলার প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষার বিরোধ' নামক রচনায় উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁর লেখার মূল কথা—সংস্কৃতির সার্বজনীন ভিত্তি আছে, একথা সত্য, কিন্তু প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যা তার নিজের জাতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। ভারতবর্ষকে তার নিজ সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের চেষ্টা করতে হবে—এবং সেই প্রয়াসে যদি ব্রিটিশ-প্রভাবে সৃষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বয়কট করতে হয় তো করতে হবে—তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।" [৭]

শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ রবীন্দ্র-স্নেহধন্য 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ

চৌধুরী এবং রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে বেশ নাড়া দিয়েছিল, যদিও সে-বিষয়ে এঁদের বক্তব্যের মধ্যে কিছু বিরোধিতা লক্ষ্য করেছি। প্রমথ চৌধুরী অসহযোগীদের খোঁচা দিয়ে 'সবুজপত্রে' 'টিপ্পনী' কেটেছেন :

"রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি কলকাতায় যে-কটি বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে সেরা দুটি হচ্ছে 'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান'। এ দুটি বক্তৃতায় তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা শুনে নামলেখানো অসহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁরা 'শিক্ষার মিলনে'র প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্ত করেছেন। 'শিক্ষার মিলন' নাকি কবির কবিত্ব, অতএব তার খণ্ডনের জন্য অবশ্য চাই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস। এ রকম ব্যবস্থা এক বাংলা ছাড়া আর কোথাও আর কারো মনে আসত না। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে 'শিক্ষার মিলনে'ব উপর আক্রমণ করবেন এমন তো মনে হয়না। তাঁর প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের উতোর গাইবেন না। 'শিক্ষার মিলনে'র পালটা জবাব 'শিক্ষার বিরোধ' নয়, তা হচ্ছে 'অশিক্ষার মিলন'। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন 'শিক্ষার বিরোধে'র বিষয় বলবেন তখন তিনি সে বিরোধের যা হয় একটা সমন্বয় করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। শিক্ষার আসল বিরোধটা হচ্ছে অশিক্ষার সঙ্গে, অপর শিক্ষার সঙ্গে নয়। কেননা শিক্ষার অর্থই হচ্ছে পরের কাছে শিক্ষা।" ('সবুজপত্র', ৮ম বর্ষ ১৩২৮-২৯, তৃতীয় সংখ্যা)।

শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ কিভাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে চঞ্চল করেছিল, তার উল্লেখ পাওয়া গেছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতে :

" 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ইহার প্রতিবাদে লেখেন 'শিক্ষার বিরোধ' নামে প্রবন্ধ। শরৎচন্দ্র সেই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। তাঁহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইলে কবির পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হইল না ; তিনি 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধে অসহযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো সমালোচনা করেন নাই, 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধে তাহা স্পষ্টতর করিলেন।"[৮] গান্ধীজীর সমালোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "তিনি [মহাত্মা] ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, তিনি বললেন কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।...এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?" রবীন্দ্রনাথের এই রচনা স্বভাবতই জনমানসে বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ২৯ অগস্ট ১৯২১-এ 'সত্যের আহ্বান' রচনার কয়েকদিন পরে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ গান্ধীজী জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'সত্যের আহ্বান'-এর প্রতিক্রিয়া জনমানসে যথেষ্ট বিরূপ হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর আলোচনাকালে "বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন বিপুল জনতার কোলাহলে মুখর। জনতার মধ্যে যাহারা অতিভক্ত অহিংসাবাদী তাহারা জানে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগনীতির পূর্ণ সমর্থক নহেন এবং বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের বিরোধী। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধিতার সমুচিত উত্তরদানকল্পে এই বুদ্ধিমান লোকেরা কবির গৃহপ্রাঙ্গণে বিলাতীবস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাণ্ডব উৎসব নিষ্পন্ন করিল।"[৯]

অসহযোগ আন্দোলনে শরৎচন্দ্র

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে অসহযোগ আন্দোলনকালে শরৎচন্দ্র গান্ধীভক্ত। বিপুল শ্রদ্ধায় প্রণাম জানিয়েছেন গান্ধীজী এবং তাঁর কর্মপদ্ধতিকে। বৈশাখ ১৩২৯-এ 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'মহাত্মাজী' প্রবন্ধের অংশত এইরকম :

"দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি [মহাত্মা] সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন, যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ-চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের সার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া-নেওয়া তো সংসারে অনেকদিন হইয়া গেছে, কিন্তু সে তো স্থায়ী হইতে পারে নাই—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার তো কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে, কোথাও তো একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তো তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন—মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।" ('মহাত্মাজী', 'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২৯)।

গান্ধীজী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা বেশিদিন বজায় ছিলনা। গান্ধীপন্থা, বিশেষত চরকার বাস্তব সাফল্য সম্বন্ধে এবং খিলাফত আন্দোলনের সময়ে খিলাফতিদের গান্ধীজী কর্তৃক সমর্থনের যৌক্তিকতা নিয়ে চাচাছোলা ভাষায় শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছিলেন। অসহযোগে মুসলমানদের সমর্থন পাবার জন্য হিন্দুরা খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করবে—এই জোড়াতালি দেওয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের মূলে 'ঘুষ' দেওয়া ব্যাপারটা রয়ে গেছে—শরৎচন্দ্র তা দেখাতে দ্বিধা করেন নি। রাজনৈতিক সাধুতা এবং শুচিতা বিষয়ে অতিশয় স্পর্শকাতর গান্ধীজীর এই 'রাজনৈতিক অসাধুতা' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ মর্মভেদী। ('বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', ১৯ আশ্বিন ১৩৩৩)।

চরকা নিয়েও শরৎচন্দ্র কম বিদ্রূপ করেন নি। 'শ্রীপরশুরাম' ছদ্মনামে 'নূতন প্রোগ্রাম' প্রবন্ধে বাঙালির চরকা-সাধনার কথা তিনি খুলে বলেছেন যেখানে চরকা সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গিও হাজির। "আমরা ভাবি শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলাদেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এদেশের লোকের। খামকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তো এই বছর-আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিটাই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে যে সেই ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজীর দোহাই, বন্দেমাতরমের দিব্যি, কোনো কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেলনা।" ('নূতন প্রোগ্রাম', 'বেণু', আশ্বিন ১৩৩৬)।

চরকা সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির বড় অংশের মনোভাব শরৎচন্দ্রের লেখায় নিঃসন্দেহে ফুটেছে। প্রসঙ্গত বরিশালে যাওয়ার সময় রাত্রে স্টীমারের ডেকে বসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপের বিবরণ শরৎচন্দ্রের লেখাতেই পেয়েছি যেখানে চরকা এসে গেছে :

"[চিত্তরঞ্জন] হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন. সে বিশ্বাস করিনে।

কেন করেন না?

বোধহয় অনেকদিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকও যদি সুতো কাটে তো ষাট কোটি টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম, পারে। দশলক্ষ লোক মিলে এক বাড়ি তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হতে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস কবেন?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারি ইচ্ছা হয যে চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোনোরকম হাতেব কাজেই আমার পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন।" ('স্মৃতিকথা', মাসিক 'বসুমতী', আষাঢ ১৩৩২)।

'স্বরাজী' শরৎচন্দ্র

অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে (যখন চৌবিচৌরাব ঘটনা ঘটে গেছে এবং জেলে আটক চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে) গান্ধী-মোহজাল ছিন্ন করেছেন শরৎচন্দ্র। চিত্তবঞ্জনেব স্ববাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তিনি চিত্তরঞ্জন-অনুগামী স্ববাজী। কোন পরিস্থিতিতে স্বরাজ্য দল গঠিত হয়েছিল, কি হিমালয়প্রমাণ বাধা সামনে ঠেলে চিত্তরঞ্জন না-কে হাঁ করেছেন. সেই রাজনৈতিক ইতিহাস অল্পাকারে এই বকম—

দেশবন্ধু জেলে বসে স্থির করেছিলেন কাউন্সিলে প্রবেশ ক'রে এবার নতুন অসহযোগ শুরু করতে হবে, আইনসভা অধিকার ক'রে অচল ক'রে দিতে হবে শাসনযন্ত্রকে। স্বভাবতই গান্ধীপন্থীরা এর বিবোধী—তাঁরা নো-চেঞ্জার। আর দেশবন্ধুপন্থীরা প্রো-চেঞ্জার। কলকাতায় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় দেশবন্ধুর এই প্রস্তাব পাস হয়নি। ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসেও (যার নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু) তিনি হেরে গেলেন। ১ জানুআরি ১৯২৩ কলকাতায ফিলে দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠন করলেন। সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, সহ-সভাপতি মোতিলাল নেহরু, সাধাবণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। কার্যকরী সমিতিতে নানা প্রদেশের প্রতিনিধি। কলকাতায় স্বরাজ্যদলে প্রথম নাম লেখান সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুকুমাররঞ্জন দাশ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাবিত্রীপ্রসন্ন-প্রদত্ত এই তালিকা ছাড়াও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রথমদিকে আরো কয়েকজন অনুবর্তীর নাম করেছেন যদিও এঁরা কোন সময়ে দলভুক্ত হন তা জানা যায়নি—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সাতকড়িপতি রায়, মনোমোহন নিয়োগী, বসন্তকুমার মজুমদার, হেমপ্রভা মজুমদার।

অতঃপর দেশবন্ধুর দেশের নানা স্থানে সফর শুরু। নয়মাস দীর্ঘ লড়াইয়ের পর যখন স্বরাজ্য দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে, তখন কারারুদ্ধ গান্ধীজীর নির্দেশে কংগ্রেসের

দিল্লী অধিবেশনে স্থির হয়—কংগ্রসীরা আইনসভার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস জয়পরাজয়ের কোনো দায়িত্ব নেবে না। এই আইনসভার নির্বাচনে বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্যদল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। স্বরাজীরা কলকাতা কর্পোরেশন অধিকার করলেন। দেশবন্ধু তার মেয়র, ডেপুটি মেয়র শহীদ সুরাবর্দি এবং সুভাষচন্দ্র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসাব হন।[১০]

স্বরাজ্য দল গঠন করার সময় দেশবন্ধু কোন অসাধ্যসাধন করেছিলেন, তাব প্রত্যক্ষ সাক্ষী শরৎচন্দ্র নিজে। একাধিক লেখায় ('দিন-কয়েকের ভ্রমণকাহিনী', 'বিজলী', ২৩ কার্ত্তিক ১৩৩০; 'স্মৃতিকথা', মাসিক 'বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২) দেশবন্ধুর ঐ ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি উন্মোচন ক'রে গেছেন। তার কিয়দংশ এই রকম :

"মনে হয়, পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশি লড়াই করিতে হয়।...গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদেব মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাংলাদেশে ইংরাজী বাংলা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান শুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধকবি তাহার আর তুলনা নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোনো বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারেনা? তিনি একটুখানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা হলে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতাব যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশি জ্বলছে, সে তো এক মুহূর্তে আমাকে ভস্মসাৎ ক'রে দিত।

"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা। অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশেব লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে ওঠে তো তবে থাক।

"মন্তব্য শুনিয়া বোধহয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙালি ভাবুকের জাত, বাঙালি কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে। এইসকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাংলাদেশ ও এই বাংলাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন, কি বিশ্বাসই করিতেন। কিছুতেই যেন আর তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।" ('স্মৃতিকথা', মাসিক 'বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২)

১৫ জুন ১৯২৫-এ সহসা দেশবন্ধুর দেহান্ত। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে। দেশবন্ধুর মৃত্যুকে সুভাষচন্দ্র 'দৈব দুর্বিপাকে'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে দেশবন্ধুর স্বল্প কয়েক বছরের রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখকালে মানুষ এবং বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা চিত্তরঞ্জনের মূল্যায়ন তিনি করেছেন। মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্রের অশান্ত মনে কিছুটা সান্ত্বনাব প্রলেপ পড়েছিল মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় (১৩৩২ আষাঢ় 'দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা') প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের দেশবন্ধু 'স্মৃতিকথা' পড়ে। মান্দালয থেকে শরৎচন্দ্রকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন (১২. ০৮. ১৯২৫) সুদীর্ঘ চিঠিতে।[১১]

দেশবন্ধুব মৃত্যু শরৎচন্দ্রের কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি। তাঁর বুকভাঙা কান্নাস্রোতের ছবি এঁকেছেন শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থে: "শরৎচন্দ্র শুয়ে শুযে শোকের আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন। অকস্মাৎ কেঁদে উঠলেন, 'হাঁ, সব শেষ।' খানিক বাদে আবার কেঁদে উঠলেন, 'আমরাই শেষ করলুম তাঁকে। এত মার কি সহ্য হয়?' আবার কিছুক্ষণ নীবব থেকে সহসা হু হু ক'রে কেঁদে উঠে বললেন, 'বিদায় কবেছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!' হঠাৎ অধীর উত্তেজনায় উঠে বসলেন, চিৎকার ক'রে বললেন, 'বেশ করেছেন। কাঁদতে কাঁদতে সেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন তো তার সঙ্গে আমরা কাঁদিনি—হাত ধরে বলিনি তো তাঁকে, ওগো আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি, আমবা তোমাকে চাই, আমরা শুধু তোমারই। তাই তো তিনি শোধ নিয়েছেন। তাঁকে আমরা কাঁদিয়েছি—তিনি আমাদের কাঁদালেন। সুদে আসলে শোধ নিয়েছেন। বেশ করেছেন। We didn't deserve him! We didn't deserve him!' কান্নার ভারে আবার ইজিচেয়ারে লুটিয়ে পড়লেন।"[১২] আশ্রয়দানকারী পর্বতের আড়াল অকস্মাৎ সরে গেছে। দেশবন্ধুর উদ্দেশে লেখায় অজস্র চোখের জল ঝরিয়ে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু-তর্পণ করেন নি। সংযম সেখানে ছিল এবং ছিল দেশবন্ধুর প্রতি উজাড়করা ভালবাসাময় কিছু কথা। সেসব মর্মভেদী কথা দেশবন্ধুর জীবিতকালেও শরৎচন্দ্র লিখতে পেরেছিলেন যখন স্বরাজ্য দল গঠন-পর্বে ঘরে-বাইরে তীরবিদ্ধ চিত্তরঞ্জনকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও দিল্লীতে উপস্থিত। সেই বিরাট হট্টগোলের মধ্যে বসে তাঁর মনে হয়েছিল, ভারত-জনসমুদ্রে চিত্তরঞ্জনের মতো "এত বড়ো মানুষ বোধকরি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ-করা জীবন আর কই?" এরপরে দেশবন্ধু সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যা বলেছিলেন, সেই কথাই তিনি পুনশ্চ বলেছেন দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর—তাঁর কাছে দেশবন্ধু অর্থে বাংলাদেশ। দিল্লী অধিবেশনের পর শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

"অনেকদিন পূর্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকরা প্রায় তুল্য কথা। কথাটা যে কতবড় সত্য, এই সভার একান্তে বসিয়া আমার বহুবারই মনে পড়িয়াছে। অথচ, এই বাংলাদেশেরই কাগজে কাগজে যে তাঁহাকে ছোট বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, পরের চক্ষে

হীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার অবিশ্রাম চেষ্টা চলিয়াছে, এত বড়ো ক্ষোভের বিষয় কি আর আছে? তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাংলাদেশটাই যে অপরের চক্ষে ক্ষুদ্র হইয়া আসিবে, এমন সহজ কথাটাও যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া দেশের কোন শুভকার্য সম্পন্ন হইবে? একের সঙ্গে অপরের মত ষোল-আনা মিলিতে না পারে, হয়তো মিলেও না, কিন্তু মতামতের চাইতেও এই মানুষটি যে কত বড়ো একথা লোকে এত সহজে ভুলিয়া যায় কি করিয়া? তাহার প্রতি চাহিয়া বিভিন্ন জনতার এই বিপুল হট্টগোলের মাঝখানে বসিয়াও একথা আমার বারবার মনে হইয়াছে যে, এই সাধারণ মানুষটি তাঁহার জীবদ্দশায় কতখানি দেশোদ্ধার করিয়া যাইবেন, তাহা ঠিক জানিনা, কিন্তু যে অসাধারণ চরিত্রখানি তিনি দেশবাসীর অনাগত বংশধরদের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহা তার চেযেও সহস্রগুণে বড়।" ('দিনকযেকের ভ্রমণকাহিনী', 'বিজলী', ২৩ কার্ত্তিক ১৩৩০)।

আর দেশবন্ধু স্মৃতিকথায় শরৎচন্দ্র লিখলেন :

"...আমরা, যাহারা তাহাবা আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগেনা। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমবা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিযা? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় বে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে।" ('স্মৃতিকথা', মাসিক 'বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২)।

সুমহান একটি মানুষের ছবি ঔপন্যাসিকের কলমে আঁকা হয়েছিল। এ সবের উপরে ভাসমান দেশবন্ধুর প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধানত প্রণাম। দেশবন্ধু যখন কারান্তরালে, তখন কয়েকজন মানুষ একদিন কারা "প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার জো নাই, আমরা তাই জেলের প্রাচীরে তাঁকে প্রণাম করিতেছি।" ('স্মৃতিকথা', মাসিক 'বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২)।

শরৎচন্দ্রের বুকের মধ্যে দেশবন্ধুর অম্লান একটি ছবি আঁকা ছিল।

দেশবন্ধুর পরে সুভাষচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের ভালবাসা অনর্গলভাবে ধাবমান সুভাষচন্দ্রের প্রতি। সেই ভালবাসার চরিত্র এইরকম :

"সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মধ্যে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং স্নেহ—একপাত্রে বিগলিত। লেখক তিনি—মানুষের সন্ধানী। বহু বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় বহু মানুষকেই দেখেছেন, তাঁদের কথা গল্প উপন্যাসে লিখেছেনও। শেষ পর্যন্ত ত্যাগ ও সংগ্রামই বড়ো মানুষের লক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। তেমন মানুষের সামনে তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভার ঐশ্বর্য নিয়ে নত হতে প্রস্তুত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে সেই মানুষ পেয়েছিলেন। আর পেলেন সুভাষচন্দ্রকে। দেশবন্ধু তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর জন্য অনিঃশেষ প্রণাম। সুভাষ বয়সে অনেক ছোট। তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহ—এক ধরনের পিতৃস্নেহ।"[১০]

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের নিছক আলংকারিক সভাপতি শরৎচন্দ্র ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র তাঁকে কংগ্রেসের কাজে বিশেষভাবে যুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত ছিলেন শক্তিশালী সংগঠক এবং বিপ্লবী চরিত্রের মানুষ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যিনি সুভাষচন্দ্রেরও ঘনিষ্ঠ। এই রাজনৈতিক জীবন একইসঙ্গে অভিনন্দন এবং অসম্মান এনে দিয়েছিল শরৎচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্রের টানে ১৯২৬-র জুন মাসে কাছাড়ের শিলচরে অনুষ্ঠিত সুরমা ভ্যালি স্টুডেন্টস কনফারেন্সে শরৎচন্দ্র সভাপতি (সুভাষচন্দ্র তখন জেলে) ; ১৯২৯-র ৩০ মার্চ রংপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র, আর যুব সম্মিলনীর সভাপতি শরৎচন্দ্র ; ১৯৩১-র মে মাসে কুমিল্লা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ছাত্রসম্মেলনের সভাপতি। এইকালে বাংলা কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত সুভাষপন্থী এবং যতীন্দ্রমোহনপন্থী। সুভাষপন্থী শরৎচন্দ্রের নানা ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার ব্যাপারটি বিপক্ষ দলের অপছন্দের। যেমন অমৃতবাজার পত্রিকা সুরমা ভ্যালি স্টুডেন্টস কনফারেন্সের বিবরণ দেওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় ধরে নিয়ে রিপোর্টে সভাপতি শরৎচন্দ্রের নামটাই বাদ দিয়েছিল। কুমিল্লা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার সময় যতীন্দ্রমোহনের দল কিভাবে সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্রসহ অন্যান্যদের লাঞ্ছিত করেছিল তার উল্লেখ শরৎচন্দ্রেরই চিঠিতে অম্লরসাক্ত ভাষায় :

"দেশোদ্ধার করবার জন্য সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান ক'রে দিয়েছিল। পথে একদল শেম-শেম বললে, গাড়ির জানলার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে।"

তাই বলে অভিনন্দন তো আটকে থাকতে পারেনা! সুতরাং শরৎচন্দ্র লিখলেন : "আবার একদল বারো-ঘোড়ার-গাড়ি চাপিয়ে দেড়মাইল লম্বা শোভাযাত্রা ক'রে জানিয়ে দিলে—কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়—ও মায়া।" [১৪]

শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র নামক একজন মানষকে কেন্দ্র ক'রে কিভাবে জনতা উদ্বেল হতে পারে।

ঐ শোভাযাত্রা এবং পরবর্তী সভার দীর্ঘ বিবরণ লিবার্টি পত্রিকার ৭ মে এবং ৮ মে ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয়। স্টিমারঘাট এবং রেল স্টেশনের সেই বিবরণের অংশবিশেষ এইরকম :

"স্টিমার পৌঁছবার অনেক আগে থেকে চাঁদপুর স্টেশনে কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ সমবেত। উচ্ছ্বসিত বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয় শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, বিমলপ্রতিভা দেবী, হরিকুমার চক্রবর্তী, অশ্বিনী গাঙ্গুলি, গোবরবাবু, কিরণ দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের। চাঁদপুরের মানুষ এর তুল্য দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি। এই সংবর্ধনার বৈশিষ্ট্য—সর্বশ্রেণীর মুসলমানগণ বৃহৎ সংখ্যায় স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।"

কুমিল্লা রেল স্টেশনের বর্ণরঙিন ছবিও এঁকেছে লিবার্টি পত্রিকা :

"কুমিল্লায় স্টেশন-প্রাঙ্গন থেকে এক মাইল পথ উৎসাহী জনতার দ্বারা পূর্ণ ছিল —যাঁরা নেতাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। ট্রেন পৌঁছবার আগেই

স্টেশন জনসমুদ্র।...সুভাষ বসু এবং তাঁর দলকে প্রথম অভ্যর্থনা জানান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও অন্য সদস্যগণ। পৌঁছবার পরে [স্টেশন থেকে] বেরিয়ে আসার জন্য অতিথিদলকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, উৎসুক জনতার চাপ এমনই। তারপরে এই দলকে কানফাটানো 'বন্দেমাতরম' ও 'সুভাষবাবু কি জয়' ধ্বনির মধ্যে ১২ ঘোড়াটানা ল্যাণ্ডো গাড়িতে তোলা হয়। স্টেশনে ট্রেন প্রবেশকালে ৫১টি বোমা ফাটানো হয়েছিল। শোভাযাত্রার আগে ছিল ৬টি সুসজ্জিত হাতি, অশ্বপৃষ্ঠে স্বেচ্ছাসেবক ও দুশো স্বেচ্ছাসেবিকা। তার পিছনে সামরিক পোশাকে এক হাজার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, পাঁচ হাজার কিষাণ, দু'হাজার শ্রমিক—তাদের হাতে ফেস্টুন ও পতাকা। সারা রাস্তার ধারে ধারে সমুৎসুক জনতা।" [১৫]

শরৎচন্দ্র অসুস্থ থাকায় ছাত্রসম্মেলনের উদ্বোধন মাত্র করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে হরিকুমার চক্রবর্তী সম্মেলনের সভাপতি হন।

সুভাষ-যতীন্দ্রমোহন দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত বাংলা কংগ্রেসে সুভাষপন্থী শরৎচন্দ্র—একথা আগেই বলেছি। ঐ দ্বন্দ্বের প্রভাব ভালোরকম পড়েছিল জেলা কমিটির নির্বাচনে। অন্তত হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনের উত্তপ্ত সংবাদ শরৎচন্দ্র নিজেই চিঠিতে লিখেছেন। ১৯৩১-এর ১৮ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেনগুপ্তপন্থীরা অহিংসবাদী সদস্যদের জেতাতে নির্বাচনের আগেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন লাঠিহাতে। আর সুভাষপন্থীরা তার প্রতিরোধে প্রস্তুত ছিলেনই। ১৮ জুন বিকাল ৬টায় ১৪৩ মধুসূদন পালচৌধুরী লেনের নির্বাচনসভার ফল বেরিয়েছিল পরেরদিন ১৯জুন সুভাষ-সমর্থক লিবার্টি পত্রিকায় : সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ হাজরা, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, যুগ্ম-সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র দত্ত, সহ-সম্পাদক জ্ঞানভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, কোষাধ্যক্ষ গৌরবমোহন রায়।

শরৎচন্দ্র তপ্ত কৌতুকে সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন :

"কাল আমাদের হাওড়া জেলা কংগ্রেস ইলেকশন হয়ে গেল। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালিগালাজ ও লাঠি-ঠকঠকি দেখে ভেবেছিলাম, হয়তো বিনা রক্তপাতে শেষ হবেনা। আমি প্রেসিডেন্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয়—এ আমার ভারি ভয়। তাই কাঁটাতারের বেড়া, মায় ইলেকট্রিফিকেশন—সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। বছর দশেক প্রেসিডেন্ট আছি, ভেসটেড ইন্টারেস্ট জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলেনা। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে, গলদ যতই থাক, তোমরা বলবার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেওনা। কিন্তু ওরা সম্মত হয়না বলেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী দলের, মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো।" [১৬]

অন্যদিকে ১৯ জুন যতীন্দ্রমোহনপন্থী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঐ দলের সদস্যরা কিভাবে অফিসিয়াল নির্বাচনকে এড়িয়ে নিজেদের পছন্দমতো কমিটি গড়ে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেখানে শরৎচন্দ্রের ছায়াপর্যন্ত ছিলনা।

ব্যাপারটি রাজনীতি থেকে সাহিত্য পর্যন্ত এগিয়েছিল। মুখ্যত সুভাষপন্থীদের আয়োজিত শরৎচন্দ্রের ৫৭-তম জন্মোৎসব সভা ভণ্ডুল করতে সেনগুপ্তপন্থীরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন এবং প্রাথমিকভাবে সফলও হয়েছিলেন। ১৩৩৯-এর ৩১ ভাদ্র টাউন হলে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব সভার কথা জেনেই বিরুদ্ধপক্ষীয়রা ঐদিন একই স্থানে হিজলী জেলে মৃত দুজন রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যুদিবস পালনের আয়োজন করেছিলেন। গোপালচন্দ্র রায় তার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র সভার দ্বার পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। অবশেষে শরৎ-বন্দনা সভা সেদিন মুলতুবী রাখা হলো। সভা ভণ্ডুলকারী সাহিত্যিকদলের অন্যতম বা অন্যতম সমর্থক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত পরে অবশ্য তাঁর এই কৃতকর্মের জন্য তাঁর 'আত্ম-স্মৃতি'তে অনুশোচনা ক'রে গেছেন। শরৎ-জয়ন্তীর ঠিক কয়েকদিন আগে, মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই সংকল্প করায়, [শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ] কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক তখন শরৎ-জয়ন্তী বন্ধ ক'রে দেবার জন্য কাগজে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। এতে শরৎচন্দ্র এঁদের উপরেও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন।" [১৭]

রবীন্দ্রনাথ শিউরে উঠেছিলেন সাহিত্যিকের উপরে রাজনৈতিক আক্রমণে। ঐ আক্রমণ একইসঙ্গে তাঁকেও যেন বেজেছিল। শরৎচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছিলেন : "তোমার প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল তার বিববণ শুনে লজ্জাবোধ করেছি।...ভালবাসা পেয়েছ বলেই তোমাকে আঘাত সইতে হবে।...তোমার প্রতিষ্ঠা যতই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, ততই তার সঙ্গে তোমার দুঃখও বাড়বে। এজন্য মনকে শক্ত ক'রে নিও।" [১৮] এই কথাগুলি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। শরৎচন্দ্র নিজেও ফিরতি চিঠিতে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, ১৩৩০-এর রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের সময়ে ঐ একই সাহিত্যিকের দল (যাঁরা শরৎচন্দ্রের 'প্রায় সমবয়সী' এবং যাঁদের মধ্যে সজনীকান্ত দাসও আছেন) রবীন্দ্রনাথকেও কম দুঃখ দিতে চেষ্টা করেন নি, "হয়ত এটাই ইহারা ভালবাসে।" [১৯]

'বিপ্লবীদের...একান্ত আপনজন'

প্রকাশ্যে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত, আর গোপনে তাঁর মন ধাবিত বিপ্লবপন্থার প্রতি। স্বাধীনতাসংগ্রামের নানা পথ, তার নানা চরিত্র। কংগ্রেসী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গান্ধীজী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বারবার দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শরৎচন্দ্র সেকারণে চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামী। তেমনই তিনি ঘনিষ্ঠ বহু বিপ্লবীর সঙ্গে। তাঁর পরিবারের মধ্যেই বিপ্লবী ছিলেন—যথা তাঁর মামা বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। [২০] বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তিনি বহু সময়ে প্রকাশ্যে এবং নিভৃতে আলোচনা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। সে আলোচনার বিষয় কি ছিল, শরৎ-তিরোধানের কয়েক দশক পরে 'অতি বৃদ্ধ ও প্রাচীন' হেমচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন :

"দাদা [শরৎচন্দ্র] বাজেশিবপুরে থাকাকালে, আমি যখন জেলের বাইরে থাকতাম, তখনই তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতেও কয়েকবার গিয়েছি।

"দাদা একবার আমাকে বলেছিলেন : 'আমার রিভলবারটা তুমি নিয়ে যাও। ওটা তোমার কাছে থাক। তোমাদের কাজে লাগবে।'

"আমি উত্তরে বলেছিলাম : 'দাদা, আমাদের রিভলবার আছে। আমাদের অভাব হচ্ছে গুলির। কিছু গুলি দিন।'

"আমার এইকথা শুনে তিনি তখনই তাঁর বাড়িতে যত গুলি ছিল, সবই দিয়েছিলেন। এরপর তাঁর কাছ থেকে এমনি আরো কয়েকবার গুলি এনেছি। এনে, আমাদের বি ভি দলের কর্মীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। তাঁর দেওয়া গুলিতেও আমরা ইংরাজ মেরেছি।

"বিনয়, বাদল ও দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংসে যুদ্ধ এবং মেদিনীপুরের জেলাশাসক পেডিকে নিধনের পর দাদা একদিন আমাকে বলেছিলেন : 'হেম, তোমার দলকে আমি দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, নাও'।"

কিন্তু অর্থ কিংবা গুলির থেকে বিপ্লবীদের কাছে অনেক বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল মানুষের নৈতিক সমর্থন। গুপ্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁরা তখন "ধিক্কার ও অবজ্ঞার পাত্র। অবহেলিত, নিন্দিত, বিভীষণ বলে পরিগণিত।" ঐ নৈতিক সমর্থন তাঁরা প্রভূত পরিমাণে লাভ করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। হেমচন্দ্র পুনশ্চ লিখেছেন :

"ভারতবর্ষের বিপ্লবীপন্থার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য তার প্রেমভালবাসা, অহেতুকী করুণা এবং তাদের জন্য গভীর বেদনাবোধ ও দরদ—এর যেন আর সীমা ছিলনা।...এই সব দুঃসাহসী, ভয়-ভাবনাহীন, মৃত্যুপাগল, দুঃখ-তপস্যা-ব্রতধারী মানুষগুলি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত।...তিনি এদের সঙ্গে সত্যকার এক বিশেষ ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করতেন অন্তরে।...বিপ্লবীদলের প্রতি তাঁর মাতৃসুলভ মমতা ও ভালবাসার জন্য শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের এত প্রিয়, এত পূজনীয় ছিলেন।...আজীবন তিনি এই অজ্ঞাত অবহেলিত লক্ষ্মীছাড়া তরুণসমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।"

শরৎচন্দ্রের গভীর ভালবাসা পেয়েছিল বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় সম্পাদিত 'বেণু' পত্রিকাও। ঐ পত্রিকা যেন হয়ে উঠেছিল তাঁর "আপন অন্তরের এক নীরব নিভৃত সত্তার বিশেষ প্রকাশের বাহক,...'বেণু'র সুর যেন তাঁরই মনোবীণার সুর, 'বেণু'র ভাষা যেন তাঁরই ভাষা। 'বেণু'কে যেভাবে লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সর্বতোভাবে সাহায্য করে গিয়েছেন, সেই সন্ধিক্ষণে সেটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।"[২১]

সুভাষচন্দ্রের বড় আপশোষ ছিল শরৎচন্দ্র কেন জেলে আটক হননি। সব অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল—ঐ একটি বাদে। ওটি হলেই শরৎচন্দ্রের কারাগার-সাহিত্য হৈ হৈ ক'রে রচিত হতো। বিপ্লবীদের সংস্পর্শের কারণে শরৎচন্দ্র অবশ্য জেলখানা থেকে খুব দূরে ছিলেন না। সরকারের তীক্ষ্ণ নজর তাঁর উপরে ছিল। সে-বিষয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন, রিভলবারের লাইসেন্স নবীকরণ করতে গিয়ে তাঁকে একবার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়। "তাঁর

[টেগার্টের] ধারণা, আমি যখন 'পথের দাবী লিখেছি, তখন বাংলার বিপ্লবীদের নাড়ির খবর আমি জানি।...আমি তাঁর এ ভুলটা ভাঙবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর মত বদলাতে রাজি হলেন না। তখন আমি বললুম, তাহলে আপনি আমায় ধরেন না কেন? সাহেব খুব হেসে উঠলেন।—দেখুন আপনাকে ওরা [পুলিশ] না ধরতে পারে, কিন্তু আপনার সব খবর যে ওরা জানেনা, এমন কখনোই হতে পারেনা।"[২২]

১৯৩৮-এর ১৬ জানুআরি শরৎচন্দ্রের মৃত্যু। হরিপুরা কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র দেশে ফেরার পথে করাচীতে এই দুঃসংবাদ শুনলেন। তা তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি বলেই মনে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের জীবনকালে এবং তার পরে সুভাষচন্দ্র শরৎ-জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা দেখেছি বিভিন্ন ছাত্রসম্মেলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে যুক্ত ক'রে দিতে সুভাষচন্দ্র পেরেছিলেন। সেকাজ করার সময় শরৎচন্দ্রের চিরসবুজ মনের কথাই সুভাষচন্দ্রের ধারণায় ছিল, তাঁর পক্ককেশের কথা নয়। ১৯২৯-এ হাওড়া জেলা যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণে এই কথাই রয়েছে যে, শরৎচন্দ্র কেবল 'মনস্তত্ত্বের ঋষি'ই নন, তিনি যুবসমাজেরই একজন : "বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা আপনার অনেক নীচে। তবুও আপনার ভিতরকার নবীনতা আপনাকে 'আমাদেরই একজন' বলবার অধিকার দিয়েছে। আর সেই অধিকারের জোরেই আমরা বলতে সাহস পাচ্ছি যে, আমরা হাওড়ার, তথা সারা বাংলার তরুণের দল, এতদিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচার, উৎপীড়নকে পদদলিত ক'রে, এগিয়ে যেতে পারব।"[২৩]

যুবসমাজের সামনে শরৎচন্দ্র কোন প্রেরণাপ্রদ ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন, সেকথা শরৎস্মৃতি সভায় সুভাষচন্দ্র কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। ২৭ জানুআরি ১৯৩৮-এ আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে আয়োজিত স্মরণ সভার সভাপতি সুভাষচন্দ্র। তিনি বলেছিলেন : "তরুণ কর্মীরা তাঁর কাছ থেকে সর্বদা অনুপ্রেরণা পেতেন। তাঁরা ভালোই জানতেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁদের সহানুভূতি জানাতে এবং সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। ...বাংলার তরুণদের বন্ধু তিনি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার শরিক।...শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্রোহী—তাঁর সেই বিদ্রোহচেতনাই নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করেছে যুবসমাজকে। সত্যের জন্য তাঁর আন্তরিক ভালবাসা—তারই প্রেরণায় তিনি সর্বদা সত্যের, একমাত্র সত্যেরই সন্ধান ক'রে গেছেন।"[২৪]

ঐ সভায় শরৎচন্দ্র বিষয়ে আরো অনেক কথা সুভাষচন্দ্র বলেছেন যার মধ্যে শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম, তাঁর বৈপ্লবিক সাহিত্য, এমন কি তাঁর হাস্যরসের প্রসঙ্গও ছিল। সব জড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে তিনি অবিস্মরণীয় চরিত্র।

দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের নাম চিরমুদ্রিত ক'রে দেওয়ার অভিপ্রায়ে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির আনুষ্ঠানিক ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন : "ড: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণে ভারতবর্ষের সাহিত্যগগন থেকে উজ্জ্বলতম একটি নক্ষত্র অপসৃত হয়ে গেছে। বহু বৎসর ধরে তাঁর নাম বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত—ভারতবর্ষের সাহিত্যসমাজেও তিনি কম পরিচিত নন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যদি সাহিত্যিক হিসাবে বিরাট

হন—তিনি বোধহয় দেশপ্রেমিক হিসাবে বিরাটতর। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল।"[২৫]

সুভাষচন্দ্র এখানে শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক সত্তার মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন : "[দেখা যাচ্ছে] এই ভাষণের মধ্যে সুভাষচন্দ্র শরৎসাহিত্যের সমাদরকারী।...স্বতই এই প্রশ্ন উঠবে—সত্যই কি দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর? উত্তরে বলা যাবে, সুভাষচন্দ্র এখানে দেশপ্রেমিকের অভ্যস্ত সীমায় আবদ্ধ ছিলেন—যদিনা তিনি দেশ বলতে দেশের মানুষ বোঝেন—যে-মানুষের হৃদয়-গভীরের আনন্দ ও বেদনার, বেদনারই অধিক, রূপকার শরৎচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র কি শরৎচন্দ্র বিষয়ে ওই কথাগুলি বলবার সময়ে তাঁর মর্মগত বিবেকানন্দের কথাগুলির দ্বারা চালিত ছিলেন, যা স্বামীজী মাতৃভূমি নামক দেবতার প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তুমি কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে—যে-দেবতাকে দেখিতেছ, কেন সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?'

"সুভাষচন্দ্র ভাবতেই পারেন—কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে জড়িত বলেই শরৎচন্দ্র দেশপ্রেমিক নন—ওই দেশরূপী বিরাটকে জীবনে সাহিত্যে অর্চনা ক'রেই শরৎচন্দ্র দেশপ্রেমিক।"[২৬]

সুভাষচন্দ্রের শরৎ-প্রণাম দেশভক্ত এবং সাহিত্যভক্ত বহু মানুষের শরৎ-প্রণাম হয়ে উঠেছে।

॥ ২ ॥

রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবী

১৩৩৮-এ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত মানপত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন : "কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" ঐ একই কথা ভিন্ন কারণে শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গেও লেখা যায়। তাঁর সম্বন্ধে বিস্ময়ের প্রথম কারণ এই—তিনিই পরাধীন দেশের একমাত্র অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক যিনি প্রকাশ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করেছেন। দ্বিতীয় কারণ—বিপ্লবের কথাসাহিত্য 'পথের দাবী' তাঁরই রচনা, যে-গ্রন্থ বহু বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস।

'পথের দাবী' সমকালে জনমানসে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পরাধীন দেশের সত্যচিত্র কোনো উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হবে, একথা চিন্তা করা সেকালের পক্ষে অভাবনীয়। সেকাজ শরৎচন্দ্র করেছিলেন এবং অনুমান ক'রে নিতে পারি তার প্রস্তুতিও দীর্ঘকালের। 'পথের দাবী'-র তথ্যগত দিক (যথা বর্মার বিভিন্ন স্থানের বিবরণ, তার রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি) শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। অন্যদিকে বিপ্লবপন্থার তাত্ত্বিক দিক, গুপ্ত সংগঠনের নীতিনিয়ম ইত্যাদি, শরৎচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বিপ্লবীদের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিপ্লবী

নিকুঞ্জ সেনের 'বন্যার পর দেউলি' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পথের দাবী'-র মালমশলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া।" সেকথা হেমচন্দ্র ঘোষ নিজেও সমর্থন করেছেন : "শরৎদা 'পথের দাবী' লেখার সময় আমার সঙ্গে এ নিয়ে অনেকদিন আলোচনা করেছেন।" [২৭]

আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বই লিখতে লিখতে একসময় শরৎচন্দ্র ফেলে রেখেছিলেন। বিষয়বস্তুর কারণে কোনো পত্রিকা-সম্পাদক তা প্রকাশ করবেন না এবং কোনো পুস্তক প্রকাশনালয় থেকেও তা বেরোবে না—শরৎচন্দ্রের এই ধারণা হয়েছিল। সে ধারণায় বদল ঘটালেন 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদক, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে যে অসমাপ্ত রচনাটি তিনি দেখতে পেলেন সেটা তাঁর চাইই। শরৎচন্দ্র নারাজ।

"শরৎচন্দ্র : ও লেখা তোমরা ছাপতে পারবে না। শুধু তোমরা কেন, কেউই ও-লেখা ছাপতে সাহস করবে না। তাই কেউ ছাপবে না ভেবেই লিখতে লিখতে ফেলে রেখেছি। অনেকদিন আর লিখিনি।

রমাপ্রসাদ : আপনার যে-লেখা কেউ ছাপতে সাহস করবে না, সেই লেখা আমি ছাপব। আমাকে দিন।

—ছাপবে? ছাপলে হয়তো জেলও হতে পারে।

—তা হয় হবে। দিন আমাকে, আমি বঙ্গবাণীতে ছাপি।

—আচ্ছা, তাহলে তোমাকেই দেব। ওটা একটা বড় উপন্যাস হবে। নাম দিয়েছি 'পথের দাবী'। তোমাদের কাগজে অনেকদিন ধরে বেরোবে।" [২৮ক]

কিছু বিরতি-সহ বৈশাখ ১৩৩০ থেকে বৈশাখ ১৩৩৩ পর্যন্ত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়েছে।

'পথের দাবী'র গ্রন্থাকারে প্রকাশ নির্বিঘ্ন হয়নি। সরকারপক্ষ ধারাবাহিক উপন্যাসটিকে বাজেয়াপ্ত না করায় শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'কে গ্রন্থাকারে দেখতে উৎসাহিত হলেন। এগিয়ে এলেন পুস্তক প্রকাশনসংস্থা এম. সি. সরকার। তাঁরাই 'পথের দাবী' প্রকাশ করবেন, এমন কি শরৎচন্দ্রকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিলেন। তারপর চুপচাপ। শরৎচন্দ্র গোলমাল আঁচ ক'রে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখলেন : "সুধীর সরকার আজও বই ছাপানো সম্বন্ধে তাহার অভিমত দিলনা। আমার বিশ্বাস যে সে ছাপাইবে না।" [২৮খ] অবশেষে "কিছুদিন পরে এম সি সরকারের এক মালিক [সুধীরচন্দ্র সরকার] পিছনে উকিল নিয়ে গুটিগুটি হাজির। মালিক বললেন, বই তো আমরা আনন্দে ছাপব, তবে এই উকিলবাবু বলছেন, কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে বা বদলাতে হবে। বাদ দেবার অংশ তিনি দাগিয়েও দিয়েছেন।" [২৯] শরৎচন্দ্র তাঁর লেখার এক বর্ণও বাদ দিতে বা বদলাতে রাজি হলেন না ('চরিত্রহীনে'ও অন্যের হস্তক্ষেপে তিনি যে রাজি ছিলেন না, তা ইতিমধ্যে দশম অধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের নন্দনচিন্তা'য় দেখেছি), এবং এম. সি. সরকারের মালিকও ছাপতে রাজি হলেন না। শরৎচন্দ্র অগ্রিম পাওয়া টাকা ফেরত দেবেন, তাও জানিয়ে দিলেন। এইসব কথাবার্তার সময় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুজ

উমাপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। 'পথের দাবী'র প্রকাশক তিনিই হবেন, সেকথা শরৎচন্দ্রকে উমাপ্রসাদ জানালেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এই প্রসঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা অনেক পরে ১৯৫৩-এ উমাপ্রসাদ লিখেছেন : "শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর যেসব প্রসিদ্ধ প্রকাশক ছিলেন, তাঁরা বইখানি প্রকাশ করতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত আমিই তার প্রকাশক হই। শরৎচন্দ্র সে সময়ে আমাকে বলেন, যদি জেল হয়, কি করবে? আমি তখনি বলি, হলে তো আর একা প্রকাশকের হবেনা, লেখকেরও হবে। দুজনে জেলে একসঙ্গে থাকব—আপনার সঙ্গে থাকা—সে তো মহাভাগ্যের কথা। শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, দেখো, আমার গড়গড়াটা যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।" ('শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', কার্তিক ১৩৬০)।

উমাপ্রসাদ বুঝেছিলেন এই বইয়ের বাজেয়াপ্তি ঠেকানো যাবেনা। কিন্তু তার আগেই পাঠকের হাতে তিনি বই তুলে দেবেন। তিনিও কৌশল অবলম্বন করলেন : "বইখানির শেষ অংশ বঙ্গবাণীর ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বার হয়। কিন্তু, সমাপ্ত হলেও লেখাটি সে মাসেও 'ক্রমশ' বলে প্রকাশিত হয়েছিল। তার কারণ, উপন্যাসটি বই হয়ে ছাপা হলেই বাজেয়াপ্ত হবে—এ-বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিলনা। তাই শেষ অংশ বঙ্গবাণীতে প্রকাশ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বইখানিও ছাপতে আরম্ভ করা হয়। অথচ বাইরে সবারই ধারণা থাকে, উপন্যাস তখনো শেষ হয়নি। ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে বইখানি ছাপা হয়ে প্রেস থেকে বার হয়।" (ঐ)।

গ্রন্থাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হইচই—দ্রুত বিক্রি—অবিলম্বে ঘটে গেল। উমাপ্রসাদের চেষ্টায় প্রকাশের একদিনেব মধ্যে 'পথের দাবী'র সমস্ত কপি "কলকাতা শহরের মধ্যে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়...কয়দিনের ভিতর সব বইগুলি বিক্রিও হয়ে গেল।" বিপ্লবীরা নিজেদের মত ও পথের যোগ্য সমর্থন এই বইয়ের মধ্যে পেয়ে এর প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। উমাপ্রসাদ লিখেছেন : "বাংলার বিপ্লবীদলের উৎসাহে ও উদ্যোগে অজ্ঞাত প্রেস থেকে নূতন সংস্করণ বার হয়ে বহু স্থানে বই ছড়িয়ে পড়ল। হাতে-লেখা সম্পূর্ণ বইয়ের কপিও আমি দেখেছি। বাংলার ঘরে ঘরে পথের দাবী পড়ার বা এক কপি পথের দাবী কাছে পাওয়ার জন্যে সে কি আকুল আগ্রহ।" (ঐ)

১৭ ভাদ্র ১৩৩৩-এ (৩১ অগস্ট ১৯২৬) গ্রন্থাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশের পাঁচ মাস পরে ১৩ জানুআরি ১৯২৭-এ সরকারি গেজেটে 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ করা হলো। তবে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর অব্যাহতি পেলেন। কেন?—সে বিষয়ে দুটি মত পাচ্ছি যাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে পরস্পর বিরোধিতা আছে। ড: শিশির কর তাঁর 'ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই' গ্রন্থে মহাফেজ-খানায় রক্ষিত গোপন সরকারি নথি থেকে উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকদের নানা বক্তব্য উদ্ধার ক'রে আমাদের গোচর করেছেন। ২৩ নভেম্বর ১৯২৬-এ কলকাতার পুলিশ কমিশনার চীফ সেক্রেটারিকে 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাব পাঠান। ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটরের এই মত—বইটি ফৌজদারি আইনের ৯৯-এ ধারানুযায়ী বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারানুযায়ী লেখক ও মুদ্রাকরকে অভিযুক্ত করা যেতে

পারে। গ্রন্থটিকে 'বিষাক্ত সৃষ্টি' বলে চিহ্নিত ক'রে এর বিরুদ্ধে অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা, চীফ সেক্রেটারি সে-বিষয়ে ২৫ নভেম্বরের চিঠিতে অ্যাডভোকেট-জেনারেলের কাছে জানতে চাইলেন। অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার বি এল মিত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখিয়ে ১১ডিসেম্বর বললেন—বইটিতে সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসসাধনই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। তিনি পাবলিক প্রসিকিউটরের সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মত জানার পর চীফ সেক্রেটারির সিদ্ধান্ত—বইটি বাজেয়াপ্ত হবে, কিন্তু লেখক-প্রকাশক-মুদ্রকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হবে না। চীফ সেক্রেটারির মনে হয়েছিল, ১২৪-এ ফৌজদারি ধারায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলে আদালতে তাঁরা সন্দেহের অজুহাতে কিংবা আইনের ফাঁকে হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবেন।[৩০]

গোপালচন্দ্র রায় পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধুর মত উদ্ধার ক'রে জানিয়েছেন, তারকনাথের জন্যই 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ করা হলেও লেখক-প্রকাশক-মুদ্রকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। তারকনাথ সরকারি পক্ষকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, অভিযোগ আনার ফল উল্টো হবে। কারণ লেখক বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক এবং প্রকাশক বাংলার এক শ্রেষ্ঠ মনীষী স্যার আশুতোষের পুত্র। এক্ষেত্রে বইটি বাজেয়াপ্ত করলেই কাজ চলে যাবে। তারকনাথ সাধু লেখালেখি করতেন। সেই সুবাদে শরৎচন্দ্রের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাপর। সরকারও তারকনাথের কথায় যুক্তি আছে দেখে কেবল বইটি নিষিদ্ধ করে।[৩১]

• তারকনাথ সাধুর এই সাধু-ভাষণ সম্বন্ধে শঙ্করীপ্রসাদ বসু সঙ্গত কারণে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁর মতে : "গোপালচন্দ্র [রায়] এইসব কথা নিশ্চয় কারো স্মৃতিকথার উপরে নির্ভর ক'রে লিখেছিলেন। কিন্তু ড: শিশির কর-প্রদত্ত সরকারি নথি থেকে দেখা যাচ্ছে—পাবলিক প্রসিকিউটর লেখক ও প্রকাশককে শাস্তিবিধির অন্তর্গত করার সুপারিশ করেছিলেন। এখানে সমাধান এই হতে পারে, তারক সাধু কাগজপত্রে লেখক ও প্রকাশককে শাস্তি দেওয়া হোক বলে নিজের চাকরি বাঁচিয়েছিলেন, তারপর সরকারকে মুখে তা না-করতে পরামর্শ দেন। কিংবা নিজের সাধুত্ব কিছু কমিয়ে, পিঠ বাঁচাবার জন্য বাইরে বলেছেন যে, আমার পরামর্শেই শরৎবাবুর জেলে যাওয়া বন্ধ হলো।"[৩২]

পথের দাবীর পক্ষে-বিপক্ষে নানা আলোচনা

রাজদ্রোহ ঘটাবার বিষয়বস্তু 'পথের দাবী'র মধ্যে আছে—এই অজুহাতে গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হবার পর সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে বেশ কিছু সমালোচনা সমকালে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট মানুষেরা অবশ্যই সরকারের পক্ষে ছিলেন, যাঁদের অন্তর্ভুক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাজেন্দ্রলাল আচার্য, আইনজীবী কেশবচন্দ্র গুপ্ত, বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় এবং বড়ই বিস্ময়ের কথা—তারুণ্যের ধ্বজাবাহী তরুণ আই সি এস অন্নদাশংকর রায়। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায়

রাজেন্দ্রলাল আচার্য লিখলেন—বইটির ছত্রে ছত্রে তিনি কেবল ঘোর রাজদ্রোহ দেখেন নি, চরম দুর্নীতির পরিচয়ও পেয়েছেন, যথা অশ্লীলতা, সোনাগাছি গোছের ইয়ারকি ইত্যাদি। 'অর্চনা' পত্রিকায় প্রকাশিত আইনজীবী কেশবচন্দ্র গুপ্তের লেখাতেও 'পথের দাবী'র 'কটু সমালোচনা' ছিল। মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় ১৬ জানুআরি ১৯২৭-এ সরকারকে চিঠি লিখে এক খণ্ড 'পথের দাবী' চেয়েছিলেন যাতে ঐ বই পড়ে সরকারি কাজের যৌক্তিকতা তিনি বিচার করতে পারেন (মহারাজা তো আর অন্যদের মতো কালোবাজার থেকে 'পথের দাবী' সংগ্রহ করতে পারেন না!)। বই পড়ে ক্ষৌণীশচন্দ্র শিউরে উঠেছেন—এ গ্রন্থ যে ভয়ানক রকম রাজদ্রোহে মাখামাখি—

"The author has made no secret...in preaching the doctrines of (1) Rank sedition, (2) Revolutionary ideals, (3) Labour strikes, (4) Hatred against the English people and Christianity, (5) Bolshevism and (6) Disaffection against the Government....His whole production is crude, and to be mild, non-moral...The preachings are loud and vehement in respect of a social upheaval and therefore very dangerous." [৩৩]

'পথের দাবী' পড়ে অন্নদাশংকর রায় যথেষ্ট বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ। ১৯২৭-এ বিলেত থেকে আই-সি-এস-এ প্রথম হয়ে তিনি ফিরেছেন, [১৯২৬-এ ভারতে আই-সি-এস পরীক্ষায় পঞ্চম হয়েছিলেন]—এখন স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর দু' চোখে বিলেতি সভ্যতার রঙিন স্বপ্নজাল। সেই স্বপ্নজাল ছিঁড়ে ফেলে রূঢ় বাস্তবকে দেখানোর জন্য শরৎচন্দ্রের এ কি অনধিকারচর্চা? ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট অন্নদাশংকর লিখলেন : "এর পরে তিনি [শরৎচন্দ্র] আরো দুঃসাহসিক হয়ে, আরেক ডিগ্রি অনধিকারচর্চা করলেন। লিখলেন পথের দাবী।...ভাগ্যক্রমে বইখানা বাজেয়াপ্ত হলো।" [৩৪]

উপেক্ষার হাসির সঙ্গে বিরক্তিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "আগে আগে অনেক গালাগাল খেয়েছি, এখন আর বড় একটা খাইনা। তবে সম্প্রতি পথের দাবী লিখে এক ডেপুটিবাবুর ধমক খেয়েছি। বইখানার কোথায় নাকি সোনাগাছির ইয়ারকি ছিল, অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ঠিক ধরা পড়ে গেছে।" [৩৫] আর অন্নদাশংকরকে 'বিদেশী শাসকে'র হাতে-ধরা 'স্বদেশী মুগুরের বেশি তিনি ভাবতে পারেন নি, যে-মুগুর "দেশের কল্যাণে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে, এই ছোকরাটি সেই জাতের।"

'পথের দাবী'-র পক্ষে বলার মতো মানুষও সেকালে ছিলেন। চরমপন্থী মতবাদী 'আত্মশক্তি' কিংবা 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা ছাড়াও কয়েকটি বিচক্ষণ পত্রিকা একই কথা বলেছে, যথা 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ', 'বেঙ্গলী', 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার'। ১৪ জানুআরি ১৯২৭-এ 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় লেখা হয়েছে :

"পথের দাবী দুই বৎসরের অধিককাল হইল বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তখন উহা পাঠে রাজদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা হয় নাই। তারপর আজ প্রায় পাঁচ মাস হইল উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—এতদিন রাজদ্রোহের সম্ভাবনা হয় নাই। আজ হঠাৎ পৌষের শীতার্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন প্রভাতে চা-পান করিতে করিতে ভারতে রাজদ্রোহ সংরোধের একমাত্র কর্তা শ্রীল শ্রীযুক্ত লাটসাহেব চিন্তা

করিয়া দেখিলেন, পথের দাবীতে রাজদ্রোহের বীজ রহিয়াছে।...শরৎচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, আমাদের এ পরাধীন দেশে সাহিত্যের সম্যক স্ফূর্তি ও প্রকাশ সম্ভব নহে। সরকারের হস্তে তাঁহার এই প্রথম পরাজয়ে—কিংবা বিজয়ে—আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার লেখনী হইতে আরো দাবী প্রকাশিত হউক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।"

'আত্মশক্তি'র তুলনায় 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ভাষা বেশি কঠোর :

"সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে নিখুঁত দর্পণ বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে পথের দাবী আমাদের সাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। এই বইটি নিষিদ্ধ হওয়ায় আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পর্যায়—আমরা বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের কথাই বলছি—এই উপন্যাসেই কেবল স্থান পেয়েছে। শিল্প হিসাবেও বাংলা উপন্যাসের মধ্যে পথের দাবীর স্থান উঁচুতে। বাংলার পাঠকেরা তাদের সবচেয়ে প্রিয় লেখকের এই মহান সৃষ্টি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।" (অনূদিত)।

১৪ জানুআরি ১৯২৭-এ 'আনন্দবাজার' পত্রিকা এই উপন্যাসের মধ্যে কোথাও 'রাজদ্রোহের জীবাণু' দেখতে পায়নি। বরং এই প্রশ্ন তুলেছে, নিষিদ্ধ করার আগে 'পথের দাবী' সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরকার পরামর্শ করেছেন অথবা কেবল গোয়েন্দা রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করেছেন! একূল-ওকূল রেখে পিঠ বাঁচানো কথা ঘোর মডারেট 'বেঙ্গলী' পত্রিকা বলেছে : "যদি এটি উন্নত শিল্পকর্ম হয় তাহলে এ বই চিরন্তন হবেই। তা না-হলে এই বইয়ের স্বাভাবিক বিনাশ ঘটবে।" (১৫ জানুআরি ১৯২৭)। ফেব্রুআরি ১৯২৭-র 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ফরাসী মনীষী-লেখক রোমা রোলাঁর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর সাক্ষাতের কালে 'পথের দাবী'-ব প্রসঙ্গ উঠেছিল বলে জানিয়েছেন : "...রোমা রোলাঁ আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ইংরেজি অনুবাদের ইতালীয় অনুবাদ পড়েছেন ; তার থেকে তাঁর মনে হয়েছে, এই লেখক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী।...কিন্তু বাংলা সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তি শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছেন। সুতরাং এটি এমন বই যা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। নাকি এটি আমলাতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক?" [৩৭]

পথের দাবী সম্বন্ধে বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে লেখা হয়েছিল : "The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European powers and the suspected political aims of the various Christian missions in Asia."

কথাগুলির প্রতিবাদে শ্রাবণ ১৩৩৫-র 'প্রবাসী'তে রামানন্দ ঐ রিপোর্টের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন : "ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্য জাতির ভূমি দখল করিবার প্রবৃত্তি অতি সত্য কথা, ইহা মিথ্যা আরোপিত ('alleged') দোষ নহে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। তদ্ভিন্ন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বলিতে শুধু ইংরেজ জাতিকে বুঝায় না। অন্য ইউরোপীয় জাতির দোষস্খালনে আলোচ্য রিপোর্টে এত উৎসাহ কেন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একটি বাংলা

প্রবাদবাক্য হইতে অনুমিত হইতে পারে [চোরে চোরে মাসতুতো ভাই]। খ্রীস্টিয়ান মিশন সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি প্রথম বলেন নাই ; বাইবেল, বোতলের ও ব্যাটেলিয়নের পরে পরে আবির্ভাব সম্বন্ধে ইংরেজিতেই উক্তি আছে।" ('বিবিধ প্রসঙ্গ', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩৫)।

এর ঠিক আগে আষাঢ় ১৩৩৫-এ 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানেন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি ভুল শুধরে নিতে চেয়েছিলেন। ১৩৩৪-র শিলচরে সুরমা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তিনি 'পথের দাবী'-র বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে দেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল : "আমি যে-যে কারণে প্রস্তাবটি সম্মেলনের নিকট উপস্থিত করতে দিই নাই, তাহা বলিতেছি। সম্মেলনটি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নহে। নানা রাজনৈতিক মতের লোক ইহার সভ্য ; সরকারী কর্মচারীরাও ইহার সভ্য।...সাহিত্যিক সম্মেলনে রাজনীতি ঢুকাইলে তাহা হইতে সরকারী কর্মচারীদিগকে পরোক্ষভাবে কার্যত তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লাভ নাই, ক্ষতি আছে।" ('সুরমা সাহিত্য-সম্মেলনে পথের দাবী', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৩৪)

অল্পদিনের মধ্যেই রামানন্দ নিজের 'ভ্রম' সংশোধন ক'রে আষাঢ় ১৩৩৫-র 'প্রবাসী'তে লিখেছেন : "কয়েকদিন হইল আমার বয়স আরো এক বৎসর বাড়িয়াছে, এবং মৃত্যুর দিকে আরো একটু অগ্রসর হইয়াছি।...হঠাৎ শিলচরে সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীতে যে-রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচনা হইতে দিই নাই, তাহার বিষয় মনে পড়িল। মনে হইল, সাহিত্য বিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক কোনো প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণত অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের 'পথের দাবী' রাজনৈতিক বহি বটে কিনা জানিনা, তাহা আলোচনারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু গভর্ণমেন্ট কর্তৃক উহা রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এবং বিনা প্রকাশ্য বিচারে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সাহিত্যের উপর গভর্ণমেন্টের এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রতিবাদটি আলোচনা হইতে দিই নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই।...এখন যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তখন তাহা মনে আসিলে এই মীমাংসা করিতাম যে, প্রতিবাদটির আলোচনা সম্মিলনীর সভায় হইতে পারিবে।...এখন আমি যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে আমার ভ্রম হইয়াছে মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু কর্তব্যবোধে আমার বর্তমান মত প্রকাশ করিলাম।" ('বিবিধ প্রসঙ্গ', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৩৫)।

স্বদেশী যুগের বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং চিন্তাশীল লেখক বিপিনচন্দ্র পাল 'যুগপ্রকাশক শরৎচন্দ্র' রচনায় ('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪, ১৯২৮-এ প্রবন্ধটি রচিত) শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সমাজচিত্র ও সমাজচরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন তার উল্লেখ আগেই করেছি ('শরৎসাহিত্য : আলোচনা-সমালোচনা' দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখার সময়ে বিপিনচন্দ্র আর পূর্বতন চরমপন্থী রাজনৈতিক নন। তার ছায়া আছে 'আনন্দমঠ'

ও 'পথের দাবী'র তুলনামূলক বিচারের সময়। তাৎপর্যপূর্ণ এই তুলনামূলক বিচারের অংশটি উদ্ধার করছি :

" 'আনন্দমঠ' এবং 'পথের দাবী' একদিক দিয়া দেখিলে হঠাৎ একই জাতীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ; 'আনন্দমঠ' একটা উচ্চ আদর্শ দিয়াছে। সে আদর্শ বিদ্রোহ নহে, সে আদর্শ বিপ্লব নহে, সে আদর্শ অরাজকতা নহে। বিদ্রোহ জাগাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে কহিয়াছেন—'বিদ্রোহী আত্মঘাতী' ; 'আনন্দমঠ' মুসলমানের অরাজকতাকে নষ্ট করিবার জন্য নামাবশিষ্টমাত্র রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু অরাজকতাকে লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করে নাই। 'আনন্দমঠ' স্বদেশপূজার শাস্ত্র, কিন্তু যে স্বদেশপ্রীতি পরজাতি বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাকে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কারণেই 'আনন্দমঠ' প্রকৃতপক্ষে মুমুক্ষুর তীব্র বন্ধনবেদনাপ্রসূত সান্নিপাতবিকাবের চিহ্নমাত্র। 'পথের দাবী' পথের মাঝখানেই শেষ হইয়াছে ; গন্তব্যে কেবল পৌঁছায় নাই তাহা নহে, গন্তব্যের সঙ্কেত পর্যন্ত দেয় নাই। শরৎচন্দ্র যদি একটা ফ্যাসি চিত্র আঁকিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই 'পথের দাবী'কে ঠেলিয়া নিয়া আপনার লক্ষ্যস্থলে তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অন্যদিকে যতই মনোহর বা সমীচীন হউক না কেন, যে কালের ও সমাজের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্র হইত না। আর এইজন্যই আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগস্রষ্টা, শরৎচন্দ্র হইয়াছেন যুগ-প্রকাশক।" ('যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র', বিপিনচন্দ্র পাল, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ, স্বয়ং অগ্রণী বামপন্থী রাজনৈতিক শরৎচন্দ্র বসু যে 'পথের দাবী'র রাজনৈতিক অংশটিকে আলোচনার লক্ষ্য করবেন তাতে সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসে তিনি 'গণমুক্তির আহ্বান', 'নবজাগ্রত জনতার পদধ্বনি' শুনেছেন।[৩৮]

হিজলীর বন্দীশালার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রহরীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মীরা। সেই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা অক্‌টোরলোনি মনুমেন্টের (শহীদ মিনার) নীচে প্রকাশ্য জনসভায় নিজ হৃদয়ের দারুণ দহনকে যন্ত্রণার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন :

"এত বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব ক'রে দিয়েছে।

"যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতে হবেই যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাঁহাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয়

রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারেনা।

"এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজা যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন সহ্য ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকাব নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাহাকে নিরস্ত কবতে পারে কোন শক্তি! একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

"আমি আজ উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্ক-লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উচ্চে ধরে আছে, তত ঊর্ধ্বে আমাদের নিন্দাবাক্য পূর্ণবেগে পৌছতে পারবে না।"[১৯]

হত্যাকাণ্ডের পূর্বদিন হিজলী জেলে শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী পালনেব উদ্যোগ নেওয়া হয়। বন্দীদের দ্বারা গঠিত সেই শরৎ-জন্মবার্ষিকী কমিটিব সম্পাদক ছিলেন 'অগ্নিযুগের বিপ্লবী' সুধী প্রধান। কিন্তু সেই উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। তখন সুধী প্রধান 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটি রচনা করেন। স্বভাবতই এতে শরৎচন্দ্রেব বিদ্রোহের সাহিত্যই আলোচনার বস্তু হয়েছিল। শরৎসাহিত্যকে সুধী প্রধান তিনটি পর্বে ভাগ করেন। প্রথম পর্বে শবৎসাহিত্যে কেবল নিপীড়িত মানুষের লাঞ্ছনা দুঃখের উন্মোচন। ক্রমে শরৎচন্দ্র সেই 'গুমরানো কান্না' অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় পর্বে পৌছেছেন যেখানে বিদ্রোহিনী অভয়াকে পাওয়া গেছে। তৃতীয় পর্বের রূপ, সুধী প্রধানেব ভাষায় : "এখন আর অক্ষম কান্নার সময় নাই। কান্না শেষ করিয়া চোখের জল এখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়াছে। আজন্ম নিষ্পেষিত মানুষ আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে বিদ্রোহ করিতে—এ বিদ্রোহ সামান্য নয় —কারণ বিদ্রোহী যে সেও আজ আর সামান্য মানুষ নাই। সে বাঙালি বটে, কিন্তু সে Burma Oil Company-র কারখানার boiler। শান্ত, নিরুপদ্রব, সুন্দর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অগ্নির প্লাবন বহিয়া যাইতেছে।...আজ আর কোনো সংশয় কোনো দ্বিধা নাই। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, নীতি—যেখানে যতকিছু অসুন্দর, মলিনতা, অত্যাচার—সব কিছুকে নির্মম হস্তে ধ্বংস করিতে হইবে। ইট-কাঠ খসিবে, চুন-বালি উড়িবে, চারিদিক অন্ধকার হইয়া অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবে -কিন্তু তা আসুক ;—অশান্তি মানে তো অকল্যাণ নয়। দুঃসহ অশান্তির পথে মানুষের চরমতম কল্যাণের বন্দনার গান রচিত হইবে।"

এই সূত্রে সুধী প্রধান বিপ্লবের অগ্নিহোত্রী স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন : "আজ এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আর একজনের কথা—যিনি বাংলার বিপ্লবমন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কথা এখানে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলিব যে বিবেকানন্দকে না বুঝিলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করিতে গেলে তাঁহাকে নিছক ঔপন্যাসিক বলিয়াই বুঝিব। কিন্তু ঔপন্যাসিক তিনি ঘটনাচক্রে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দের পরিপূরক। বিবেকানন্দ Theory,

শরৎচন্দ্র Practice, বিবেকানন্দ Philosophy-তত্ত্ব, শরৎচন্দ্র তার রূপকার, Pictorial interpretation."

সুধী প্রধানের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র সেই বিরল মানুষের একজন "যাঁহারা চারিদিকের মৃত্যু-নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেরা জাগ্রত ও জীবিত এবং সর্বোপরি তাঁহারা আত্মচেতনাবান।" 'বিপ্লবী' শরৎচন্দ্রকে 'প্রণাম' জানিয়ে সুধী প্রধান লিখেছেন : "শরৎচন্দ্র আনুষ্ঠানিক বিপ্লবী নহেন—তিনি ভাবজগতের বিপ্লবী এবং এই কারণেই তিনি বিপ্লবের যুগ প্রবর্তক। তিনি সব্যসাচী নহেন—সব্যসাচীর রথসারথী।" [৪০]

সামাজিক উপন্যাস হিসাবে পথের দাবী

যে-কোনো উপন্যাস, কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি মনস্তাত্ত্বিক, কি রাজনৈতিক—সবকিছুই মানুষ এবং তার জীবনজিজ্ঞাসা ও প্রয়োজন নিয়ে নির্মিত। কেবল উপন্যাসের চরিত্র অনুযায়ী বক্তব্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাত্রাভেদ ঘটে। 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস। স্বভাবতই সেখানে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রাধান্য থাকবে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনকে অগ্রাহ্য করার অভিপ্রায় শরৎচন্দ্রের ছিলনা। সেই ঈষৎ সংকীর্ণ অথচ অপবিহার্য বিষয়টি নিয়ে কোনো কোনো লেখক আলোচনা করেছেন। যেমন—

কুমুদচন্দ্র বায়চৌধুরী শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন : "আপনার পথের দাবী তো শেষ হলো, কিন্তু সাধারণ পাঠকেরা সন্তুষ্ট হয়নি। তারা বলছে—এ কেমন হলো? ভারতী অপূর্বর বিয়ে হলো না—এ ভাল হলো না।" শরৎচন্দ্রের উত্তর—বিধর্মী ভারতীকে বিয়ে করার অর্থ অপূর্বর মাতৃভক্তিতে আঘাত, যে-অপূর্ব তার মাকে বলেছিল : "একটা দিনের জন্যেও যদিও তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তাহলে সেখানে [স্বর্গে] বসেও কখনো এ ছেলের জন্যে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না।" শরৎচন্দ্র এও স্বীকার করেছেন তিনি "মনের কোণে গোঁড়া Conservative." ('শরৎচন্দ্র ও সমাজনীতি', কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মনোভাব অনুমান করতে পারি—দুই পৃথক ধর্মের মানুষের বিবাহ সমাজমানসে বিপুল আলোড়ন ঘটাত। ভারতী কি হিন্দু হতো? হলেই কি হিন্দু সমাজ তাকে গ্রহণ করত? নতুবা অপূর্বকে হতে হতো খ্রীস্টান। কোনো একটি সমাজে তাদের আশ্রয় নিতেই হতো। কেননা তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাবী সন্তানের কল্যাণ-অকল্যাণ। বিস্ময়ের কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর পরিণতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা ইতিবাচক না হলেও (শরৎচন্দ্রের 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), গৃহত্যাগের পর শৈবলিনী তার সখী সুন্দরীকে সমাজসত্য সম্বন্ধে কিছু গভীর কথা বলেছিল যা অপূর্বর বিবাহ-পরবর্তী জীবন সম্বন্ধেও সত্য হতে পারত :

"...পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙুল দেখাইয়া বলিবে কিনা যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনো আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ি খাইতে আসিবে? যদি কখনো কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে?"

'কালিকলম' সম্পাদক মুরলীধর বসুর লেখাতেও রাজনীতি বাদ দিয়ে সামাজিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছিল। এক্ষেত্রে কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য। সব্যসাচীর বৈপ্লবিক সত্তাকে সরিয়ে রেখে তাঁর 'জীবনকে চিনিবার, মানুষকে বুঝিবার গভীর সহজ পরমাশ্চর্য দৃষ্টি'র উল্লেখ করেছেন মুরলীধর। সমাজজীবনে 'ভালবাসা ও মানবতার নিষ্করুণ কদর্য অবমাননার মধ্যে'ও 'ভারতী-অপূর্বর মিলিত জীবনের আনন্দময় সার্থকতার কথা স্মরণ করিয়া' সব্যসাচী তার 'পরিপূর্ণ মর্যাদা' দিয়ে গেছেন। সব্যসাচীর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবাক বিস্ময়ে মুরলীধর ভেবেছেন : "অন্তরে যে সত্যের অস্তিত্ব মানুষ নিজেই জানেনা, অথবা জানিলেও প্রবলভাবে অস্বীকার করিতে চায়, তাহাকেই সুদূরের জ্যোতির্ময় সম্ভাবনা হইতে চিনিয়া চিনাইবার প্রয়াস বারে বারে সব্যসাচী কেমন করিয়া করেন তাহাই ভাবি।" ('সব্যসাচী', মুরলীধর বসু, 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪৪)।

বিপ্লবীদের চরিত্র বিপরীত গুণের সমন্বয়ে গঠিত। শরৎচন্দ্র তা ভালোভাবে জানতেন। সব্যসাচী সাধারণভাবে কঠিন, কঠোর, একমুখী লক্ষ্যে অবিচলিত দৃঢ়পদে অগ্রসর। ব্যক্তিজীবনে প্রেমকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। তাঁর প্রতি সুমিত্রার আকর্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু সুমিত্রাব প্রতি তাঁব মনে যদি কোনো আকর্ষণ থাকেও (হয়তো ছিল), নিজের দুঃসাধ্যসাধনার পথকে তার দ্বারা পিচ্ছিল হতে দেননি। কিন্তু সেই প্রেম সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি, কোমলতা যথেষ্টই প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব-ভারতীব প্রেমের ক্ষেত্রে, যা অপূর্বর বিশ্বাসঘাতকতাকে পর্যন্ত চরম শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। এই মনোভাবের উৎকৃষ্ট প্রকাশ কবি শশীর প্রেম সম্বন্ধে। সেই আত্মভোলা উদাসীন এলোমেলো কবি মানুষটির নয়নতারা সম্বন্ধে পাগল ভালবাসাকে সব্যসাচী কী না মমত্বের চোখে দেখেছেন! আবার বাইরে পরিহাসেব অট্টহাস্যে তাকে ডুবিয়ে দিতেও চেয়েছেন। নয়নতারার সঙ্গে শশীর বিবাহ স্থির হযেছিল। ভারতীকে নিয়ে সব্যসাচী বিবাহের দুর্গম জায়গায় পৌছবাব পথে ভারতী যখন প্রশ্ন করেছিল : "শশীবাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালোবাসো, না দাদা?" ডাক্তার বলেছিলেন, হ্যাঁ। কেন ভালবাসেন তার উত্তর ছিল : "বোধহয় এমনিই।" নানা কথার ফাঁকে সব্যসাচী একটু আড়ম্বর ক'রে বলেছিলেন : "দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হদিশ পেয়েছি, পেলাম না শুধু এই নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব।" ('পথের দাবী', ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)। সব্যসাচী হদিশ পাননি, কারণ তিনি পেতে চাননি। শশী ও নবতারার বিয়ে হয়নি। নবতারা শশীকে জানিয়ে, অম্লানবদনে তার দেওয়া টাকা নিয়ে, আর একজনকে বিয়ে ক'রে চলে গিয়েছিল। শশীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতীর চোখে অনর্গল জল ঝরেছে। আর সব্যসাচীর অট্টহাস্যে চতুর্দিক বিদীর্ণ হয়েছে। সে হাসির মধ্যে কান্নার সুর জড়িয়ে ছিল কিনা, দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের সব্যসাচী তা বুঝতে দেননি। কিন্তু নয়নতারার প্রতি শশীর অপরিমেয় ভালবাসাকে, ভালবাসার জন্য নিঃশেষ ত্যাগকে গভীর শ্রদ্ধা করেছিলেন। "ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধুলোক, সমস্ত অন্তরখানি যেন গঙ্গাজলের মতো শুদ্ধ, নির্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে, বোন, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম। ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবে না।" সব্যসাচী সেইসঙ্গে কবির হাতে তার

বেহালাখানি তু'লে দিতে চেয়েছিলেন যা দিয়ে সে বিপ্লবের গান গেয়ে বেড়াবে। বলেছিলেন : "বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়।...রাজনৈতিক বিপ্লব...—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু ক'রে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো, শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রে দাও।" (ঐ, সাতাশ পরিচ্ছেদ)।

'পথের দাবী' উপন্যাসের লেখক কেবল ভীম-ভীষণ বিপ্লবের নেতাকেই আঁকেন নি, বেহালা-হাতে একটি কবি-মানুষের চিত্রণে কোমল তুলিকাও ব্যবহার করেছেন।

সর্বনাশা বই—সরকারের চোখে

কেবল ইংরেজ নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার বীভৎস নগ্ন মূর্তি 'পথের দাবী'তে খোলাখুলি দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। রেঙ্গুনে অপূর্বর লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা, রামদাস তলোয়ারকরের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি, শ্রমিকসভায় তাঁর বক্তৃতা, ভারতীর সঙ্গে সব্যসাচীর বাক্যবিনিময় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নানা সময়ে রচনার অগ্নিস্রোতে পাশ্চাত্যের সভ্যতাহীন সভ্যজাতির আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একইসঙ্গে রয়েছে—আবেদন-নিবেদন নীতিতে বিশ্বাসী ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ, বাঙালির কাপুরুষতা-বিশ্বাসঘাতকতার রূপ, বিপ্লবীদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য, তাতে আন্দোলনের ক্ষতি, কলকারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্ররোচনা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সরাসরি রাজনীতিতে যোগদানের পরিবর্তে আপন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবৃদ্ধির ঔচিত্য ইত্যাদি। সব রাজনৈতিক চরিত্রের ভিত্তি এক নয়, সুতরাং তাঁদের কর্মপদ্ধতি পৃথক যদিচ লক্ষ্য একই—এই বক্তব্যের ঘোষণায় উপন্যাস সমাপ্ত। লক্ষণীয়, জাপান সম্পর্কে সব্যসাচীর বক্তব্য—যখন জাপান পরদেশগ্রাসী, তখন সেই দেশকে মর্যাদা দিতে তিনি প্রস্তুত নন। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নিজ চোখে দেখেছেন সব্যসাচী। পরিষ্কার বলেছেন : "ওদের আমি ঘৃণা করি।" কোরীয়দের বারবার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও জাপানীরা ১৯১০-এ কোরীয়া দখল ক'রে নেয়। সাংহাইতে উপস্থিত সব্যসাচী দেখেছেন কোরীয়দের উপর জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচার। কিন্তু জাপান যখন আগ্রাসী, ক্রিশ্চান ধর্ম-সাম্রাজ্যবাদীদের আইন ক'রে স্বদেশে আসা বন্ধ করেছিল তখন তিনি সেই জাপানের সমাদরকারী।

সব্যসাচীর বক্তব্য মোটামুটি এই :

প্রতীচ্য সভ্যতা এদেশে এসেছিল তিনটি জিনিস নিয়ে—বেয়নেট, বাইবেল এবং ব্র্যাণ্ডি। বাইবেল এবং ব্র্যাণ্ডিতে যখন কাজ হয়না, তখন উদ্যত বেয়নেট ব্যবহৃত হয় খুঁচিয়ে মারার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল ভিত্তি বাণিজ্যে। বণিকের বেশে তাদের প্রথম আগমন, তারপর সেখানকার নিরীহ্ জাতির দুর্বলতার সুযোগে বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত ক'রে নেওয়া—সে ইতিহাস দেখা গেছে বর্মা এবং চীনে। একইসঙ্গে কাজে নেমে পড়ে খ্রীস্ট ধর্ম। রামদাস তলওয়ারকরের কথায় সে ছবি এইরকম :

"...কেবল শোভা-সৌন্দর্যই নয়, প্রকৃতি-মাতার দেওয়া এত বড় সম্পদও [ব্রহ্মদেশের মতো] কম দেশে আছে। ইহার বন ও অরণ্য অপরিমেয়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখনির মূল্য নিরূপিত হয়না, আর ওই যে আকাশচুম্বী মহাদ্রুমের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়?... সংবাদ পাইয়া একদিন ইংরাজ বণিকের লুব্ধ দৃষ্টি ইহার প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক-কামান আসিল, সৈন্যসামন্ত আসিল, লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার রাণীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর, দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহার অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন।" ('পথের দাবী', সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

না, বন্দুক সর্বদাই প্রথমে নয়, নেশার দ্রব্যও আছে। ও-বস্তু দিয়ে একটা জাতকে নিশ্চেতন ক'রে ফেলার ব্যাপারেও ইংরেজরা জুড়িহীন। তাতে না পারলে অগত্যা বেয়নেট :

"আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশদূত লর্ড ম্যাকার্টনি এলেন চৈনিক দরবারে কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে ক'রে নিতে।...চীনের সম্রাট অত্যন্ত দয়ালু ; দূতের বিনীত আবেদনে খুশি হয়ে আশীর্বাদ ক'বে বললেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুরই নেই, কিন্তু তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ সয়ে। আচ্ছা, ক্যানটন শহরে ব্যবসা করো, স্থান দিচ্ছি, তোমাদের ভালো হবে। রাজ-আশীর্বাদ নিষ্ফল হলো না, ভালোই হলো। পঞ্চাশ বছর পেরুল না, চীনের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ বাধল। ...চীনেরই অন্যায়। বেয়াদপ হঠাৎ বলে বসল, আফিং খেয়ে খেয়ে চোখ কান আমাদের বুজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে ও-জিনিসটার আমদানি বন্ধ করো।... তার পরের ইতিহাস খুবই ছোট। বছর-দুয়েকের মধ্যে পুনশ্চ আফিং খেতে রাজি হয়ে, আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র শুল্কে বাণিজ্যের মঞ্জুরি-পরোয়ানা মাত্র দিয়ে, এবং অবশেষে হংকং বন্দর দক্ষিণা প্রদান ক'রে বেয়াল্লিশ সালে যজ্ঞ সমাধা হলো।" (ঐ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

কেবল ইংরেজরাই নয়, ফরাসী এবং জার্মানরাও থাবা বাড়িয়েছিল চীনের ওপরে —"ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা [ইংরেজদের দেখে] বললে, আমার তো আফিং নেই, কিন্তু খাসা মানুষ-মারা কল আছে। অতএব, যুদ্ধং দেহি। হলো যুদ্ধ। ফরাসী চীন-সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে, ট্রিটিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি।...জার্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এতো ভারি মজা! আমি যে ফাঁকে পড়ি। তিনি এক জাহাজ মিশনারি এনে লেলিয়ে দিলেন। ৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যিশুর মহিমা, শান্তি এবং ন্যায়ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত, তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্মিক জন-দুই প্রচারকের মুণ্ডু ফেললে কেটে। চীনেরই অন্যায়। অতএব, গেল শ্যানটঙ্ প্রদেশ জার্মানীর উদর-বিবরে।" (ঐ)।

চীনের বক্সার বিদ্রোহের ভয়ংকর পরিণাম সব্যসাচী একাধিকবার ভারতীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

"মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বক্সার-বিদ্রোহের গল্প? সুসভ্য ইউরোপীয়ান পাওয়ারের দল ঘর চড়াও হয়ে তাদের যে প্রতিহিংসা দিলে, কোথায় লাগে তার কাছে চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শা-র বীভৎসতার কাহিনী? সূর্যের কাছে দীপের মতো সে অকিঞ্চিৎকর। হেতু যত তুচ্ছ, এবং যত সামান্য অন্যায়ই হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ, শিশু, নারী—সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই—যে-পাপের সীমা হয়না, সেই বিষাক্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক বুদ্ধি এদের বাধা দেয়না।" (ঐ, ত্রিশ পরিচ্ছেদ)।

'পথের দাবী'-র ঘটনাকেন্দ্র বর্মা হলেও কখনো কখনো বাংলাদেশ এসে গেছে। শোষকেব নির্মম চরিত্র এবং শোষণের অর্থ-পরিমাণ ভারতীকে বলার সময় সব্যসাচী সংখ্যাতত্ত্ব উপস্থিত করেছেন :

"এ দেশের মালিক তারা—মালিকানার তারিখ মনে আছে তো? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয়না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত-সহস্র ইমারত। মানুষ মারার উপকরণ-আয়োজনের আর অন্ত নেই। তার সমস্ত অভাব, সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাংলাদেশের মেয়ে বলছিলে, না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক-একটা যুদ্ধজাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশলক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো একথা? দেখেছ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল— নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায়না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী?" (ঐ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

সব্যসাচী ঐসব কথা বলার সময় দেশমাতৃকা-মূর্তির শীর্ণ রিক্ত শৃঙ্খলিত রূপ তুলে ধরেছিলেন। এখানে আমাদের বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়ে যিনি বলেছিলেন— "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য কেবল দেশমাতৃকা তোমাদের আরাধ্য দেবী হউন।" আনুষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী সব্যসাচী রোষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেছেন :

"সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম, অহিংসা ও শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম ক'রে গেলে মরণ আসে। কোনো দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারেনা। ভারতবর্ষ হূনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী শিশুদের মশালের মতো ক'রে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হলো? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস হয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল—সে অক্ষমতার শাস্তি আজো আমাদের ফুরোয় নি।" (ঐ, ত্রিশ পরিচ্ছেদ)।

"মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস ক'রে দেবতাদের নাক-কান কেটে দিয়ে যেত, বাঙালি ছুটে পালাত, ধর্মের জন্য গলা দিতনা।...তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে

হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ? যে-ধর্ম তারা মানত না, যে-দেবতাদের পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিলনা, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদমস্তক যুক্তিহীন বিধিনিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে।"

"সমস্ত ধর্মই মিথ্যা—আদিম দিনের কুসংস্কার; বিশ্বমানবতার এত বড় পরম শত্রু আর নেই।" (ঐ, আটাশ পরিচ্ছেদ)।

আত্মবিশ্বাসহীন এই কাপুরুষের ধর্মে সব্যসাচী অবিশ্বাসী। মুখে ধর্মবাক্য উচ্চারণ, অথচ ধর্মের বিপদের দিনে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ—সব্যসাচী ঐ ধর্মে এবং ঐ ধর্মের মানুষগুলির উপরে আস্থা রাখতে পারেন নি। সেইসঙ্গে ক্রিশ্চান ধর্মের লোভী বর্বর চেহারা পাশ্চাত্যে প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে :

"ইউরোপের ক্রিশ্চান সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেয়েছিল।...লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশুশক্তির একান্ত প্রাধান্যই এর মূল মন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি।...দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে।...অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতাব চরম কর্তব্য—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারির ধর্মপ্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই...ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।" (ঐ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

খ্রীস্ট ধর্মের এই অভিযানে এবং বহিরাগত মুসলমান আক্রমণের সময়েও সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে বাঙালি নিজেই। সেকথা বলার সময়ে তীব্র ঘৃণায় বিকৃত সব্যসাচীর মুখ :

"বাঙালি কস্মিনকালেও বাংলাদেশকে ভালোবাসেনি। তার তিলার্ধ থাকলেও কি বাঙালি বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এই সাত কোটি ভাইবোনকে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারত? জননী জন্মভূমি ছিল শুধু কথার কথা। মুসলমান বাদশাহের পায়ের তলায় অঞ্জলি দেবার জন্য হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মতো ক'রে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ জুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালি। বর্গীরা দেশ লুঠ করতে আসত, বাঙালি লড়াই করত না, মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকত।" (ঐ, আটাশ পরিচ্ছেদ)।

বাঙালির এই জাতিচরিত্র আধুনিককালে আরো বেশি প্রকট। অপূর্ব নিজের পাঁচশ টাকা মাইনের চাকুরি বাঁচাতে পুলিশের কাছে পথের দাবী সংগঠন বিষয়ে তার জ্ঞাত তথ্য গলগল ক'রে উগরে দিয়েছে। গভীর দুঃখে মাথা নত ভারতীকে সান্ত্বনা দিয়ে সব্যসাচী বলেছেন :

"পরাধীন দেশেব সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি ক'রে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা তোমাকে প্রতি পদক্ষেপে ছুঁচের মতো বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মতো তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে।" (ঐ, একুশ পরিচ্ছেদ)।

তবু এই দেশকে প্রণাম—এদের জন্যই স্বাধীনতাসংগ্রাম। সব্যসাচীর সবচেয়ে বড় লজ্জা বোধহয় এখানেই—তিনি স্বয়ং বাঙালি।

একমাত্র পথ বিপ্লব। দেশের স্বাধীনতা আসবে ঐ পথে। কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট তার অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু ধর্মঘটের দ্বারা লক্ষ্য সহজে পূরণ হবেনা। কেননা "নিরুপদ্রব ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোনো ধর্মঘটই কখনো সফল হয়না যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে।" ধর্মঘট বিফল হওয়ার পর "সেইসব পীড়িত, পরাভূত ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।" এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? "এই তো আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হলো, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে, সে শক্তি সত্য নয়? সেই তো আমার মূলধন। কোথাও কোনো দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায়না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই।...যে-মূর্খ একথা জানেনা, শুধু মজুরির কম বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।" (ঐ, পঁচিশ পরিচ্ছেদ)।

সব্যসাচী এখানে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বিপ্লবের আদি কারণ নির্ণয় করেছেন। ঐ বৈষম্য সর্বাধিক প্রকট নিম্নতম মজুরীপ্রাপক শ্রমিকদের মধ্যে। শোষণের চরম পর্যায়ে পৌঁছে এরা বিপ্লব করবে শ্রেণী বৈষম্য দূর করার জন্য। সে কাজে শ্রমিকদের অগ্রসর করিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের চোখের সামনে লোভী মলিকদের শোষণের পরিমাণ, শ্রমিক জোট ভাঙায় পুলিশের ভূমিকা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে রামদাস তলওয়ারকরের ভাষণে :

"এই ডালকুত্তাদের [পুলিশ] যারা আমাদের বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায়না যে কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার। অথচ, তোমরাও যে তাদেরি মতো মানুষ, তেমনি পেট ভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ, এই সত্যটাই এরা সকল শক্তি, সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়।...এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ কোনো কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোম্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক! তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়।...তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশি তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোনোদিন দেবেনা—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন?" (ঐ, সতের পরিচ্ছেদ)।

স্পষ্টতই এখানে শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র কি পুরোপুরি শ্রেণী সংগ্রামের পক্ষপাতী? তিনি অন্তত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামকে এক ক'রে

দেখেন নি। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬-এ 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে লেখা চিঠিতে বলেছেন :

"বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে?...বিপ্লবের মাঝে আছে ক্লাস ওয়ার, বিপ্লবের মাঝে আছে সিভিল ওয়ার। আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবেনা। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।" [৪১]

তাহলে গোপনে যাঁরা সশস্ত্রপথ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কি বিপ্লবী বলা যাবে না? শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী। অন্যদিকে

"বিপ্লব ব্যাপকার্থ শব্দ। তার মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য সংগ্রাম থাকবেই। তাই তিনি বিপ্লবের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামকে মিশিয়ে ফেলার বিপদ সম্বন্ধে 'বিপ্লবী' ভূপেন্দ্রকিশোরকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। এই বিষয়টি সুভাষচন্দ্রও স্বীকার করতেন। সেইজন্য ১৯২৮-২৯ সালে যুব-সম্মেলনগুলিতে প্রদত্ত ভাষণগুলিতে যুব-আন্দোলন ও কংগ্রেস-আন্দোলনের মধ্যে আপেক্ষিক পার্থক্যের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলন করছে—তাকে সকল মত ও বৃত্তির মানুষকে নিয়ে চলতে হবে—শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের সহাবস্থান সেখানে। অথচ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি চাই—তাব জন্য সংগ্রাম কেবল ইংরেজ বণিকের সঙ্গে নয়, ভারতীয় বণিক ও ভারতীয় সামন্ত-জোতদার-জমিদারদের সঙ্গেও। যুব-আন্দোলন কংগ্রেসের সমঝোতামূলক কর্মপন্থায বাঁধা না থেকে ঐ সামগ্রিক মুক্তির জন্য সচেষ্ট হোক, যা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে সমঝোতার রাজনীতিকে বিতাড়িত করতে পারবে—এই ছিল সুভাষচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা বা শুভকল্পনা।

"পথের দাবীর সব্যসাচীর মধ্যে এইক্ষেত্রে চিন্তাগত অস্পষ্টতা থেকে গেছে। সব্যসাচী বারবার বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর চরম লক্ষ্য—আবার পাশ্চাত্যের বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিকতার ভাষায় সর্বাত্মক বিপ্লবের সমর্থন করেছেন। তিনি স্বাধীনতাব লড়াই করবেন—কিন্তু কেবল কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে—কিভাবে? কোথাও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। শরৎচন্দ্র কি ইচ্ছা ক'রে সব্যসাচীর মধ্যে 'বিপ্লব' কথাটির যথেচ্ছ ব্যবহারের অসংলগ্নতা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন?" [৪২]

'বিপ্লবী'দের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য, ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিস্বার্থের উঁকিঝুঁকি কিভাবে আন্দোলনের ক্ষতি করেছে, তা 'পথের দাবী' উপন্যাসে দেখা গেছে। বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত জীবনে যথাসম্ভব নারীসঙ্গ পরিহার ক'রে চলতেন—পাছে পিছুটান তাঁদের পথভ্রষ্ট করে। তবু চকিতে দুর্বল হয়ে পড়া মানুষ তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন। 'পথের দাবী'র ব্রজেন্দ্র আবার বিকট ভয়ংকর। তার চেহারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্বলতাও ভয়ংকর আকার নিয়েছে। "একজন ভীষণাকৃতি লোক...পরনে তাহার গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ি। মুখখানা বড় হাঁড়ির মতো গোলাকার এবং দেহ গণ্ডারের মতো স্থূল, মাংসল ও কর্কশ। ভাঁটার মতো চোখের উপর ভ্রূর চিহ্নমাত্র নাই, কঠিন শলার মতো গোঁফের রোম বোধকরি দূর হইতে গণিয়া বলা যায়, রঙ তামার

মতো, লোকটা যে অনার্য মোঙ্গল-জাতীয়, দৃষ্টিপাতমাত্রে তাহাতে সন্দেহ থাকেনা।" (ঐ, উনিশ পরিচ্ছেদ)। সুমিত্রার প্রতি ব্রজেন্দ্রের তীব্র যৌন-আকর্ষণ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা সব্যসাচীর কথাতেই স্পষ্ট। অথচ সুমিত্রা কখনো বুঝতে পারেন নি তাঁর উপরে নেমে আসা ব্রজেন্দ্রের কুৎসিত লোলুপ থাবা কিভাবে সব্যসাচী নিঃশব্দে বারবার ঠেকিয়েছেন। ভারতী এক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রের ক্ষুধাতুর কামনাকে ভালবাসা বলে ভুল করেছিলেন :

"ভারতী...জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে [সুমিত্রাকে] তোমার চেয়ে—আমি বলচি, এত বেশি ভালবাসেন?

"ডাক্তার...কহিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় তো মানুষের সমাজে তার তুলনা হয়না। লজ্জা নেই, শরম নেই, সম্ভ্রম নেই—হিতাহিতবোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয়ই পাবেনা। ভারতী, তোমার দাদার এই হাতদুটো বলে কোনো বস্তু যদি না থাকত, [ব্রজেন্দ্রের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য] সুমিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধহয় আর কোনো পথ খোলা থাকত না।" (ঐ, পঁচিশ পরিচ্ছেদ)।

সব্যসাচী শুধু জানিয়েছেন, ব্রজেন্দ্র তার কামনার প্রতিবন্ধক তাঁকে পথ থেকে সরাবার জন্য সুরাভায়া এবং অন্য এক জায়গায় তাঁর উপরে 'অ্যাটেমপ্ট' করেছে।

বিপ্লবীদলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ব্যাপারটি এসে গেছে 'পথের দাবী'তে। অফিসের বড়সাহেব এবং পুলিশ কমিশনারের কাছে পথের দাবী নামক গুপ্ত সংগঠন এবং তার প্রেসিডেন্ট সুমিত্রা, অন্যান্য কর্মী এমন কি সব্যসাচী সম্বন্ধেও জ্ঞাত সমস্ত তথ্য অপূর্ব জানিয়েছিল চাকুরি রক্ষার জন্য। অতঃপর সুমিত্রাসহ দলের সমস্ত কর্মী তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। সেই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হয়নি সব্যসাচীর জন্য। মূলত ভারতীর প্রতি স্নেহবশত, এবং এটা অপূর্বর প্রথম অপরাধ সেই বিবেচনায়, তাকে মুক্তি দিয়ে দেশে ফিরে যাবার আদেশ তিনি দিয়েছেন। তাতে দলের মধ্যে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর পিছনে ব্রজেন্দ্রের প্রধান ভূমিকা : "মুখে কাহার হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্বনাশা ঝড়ের পূর্বাহ্ণের মতো এই নিশীথ সম্মেলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।" পারস্পরিক স্বার্থসংঘাত দলের এবং সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের ক্ষতি করে। এক্ষেত্রে অপরাধী বলে যাকে ধরে নেওয়া হয়, তার থেকেও বেশি অপরাধ হয়তো অন্যজনের যে ক্রমাগত তুচ্ছ অভিযোগের দ্বারা অন্যান্য সহকর্মীদের মন বিষিয়ে তোলে। দলের ঐ ভাঙনরোধ করা এবং প্রকৃত অপরাধী কে—সেই সত্য নির্ধারণের ভার অতঃপর গুপ্তসমিতি সব্যসাচীর উপরে অর্পণ করেছিল। সেখানে এই সিদ্ধান্ত ছিল—সব্যসাচীর অবর্তমানে তাঁর কাজের আলোচনা করা চলবে না এবং দলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি মারাত্মক অপরাধ। অর্থাৎ দলনেতার আনুগত্য সর্বাবস্থায় মেনে চলতে হবে। ব্রজেন্দ্র কেবল সব্যসাচীর অবর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে অন্যদের উসকে দেয়নি (যা প্রশ্নহীন আনুগত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত), তীব্র যৌনঈর্ষায় ইতিমধ্যে দুবার সব্যসাচীর প্রাণহননের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, দলের অন্যদের দ্বারা সেই কাজ করিয়ে তৃতীয়বারে সফল হতে চেয়েছে। এই জাতীয় মানুষ বিপ্লব আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ শত্রু। সেকথা দৃঢ়ভাবে সব্যসাচী জানিয়েছেন :

"ডিসিপ্লিন ভেঙে গেলে তো আমার চলবে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উইশ ইউ গুড লাক। কিন্তু আমার পথ তুমি ছাড়।"

বজ্রের মতো কঠিন সব্যসাচীর কণ্ঠস্বর ব্রজেন্দ্রকে সতর্ক করেছে :

"সুরাভায়ায় একবার অ্যাটেমপ্ট করেছ, পবশু আর একবার করেছ, কিন্তু এর পবে ইফ উই মিট—ইউ নো!" (ঐ, পঁচিশ পরিচ্ছেদ)।

বিপ্লবের সময়ে কবি-শিল্পীদের ভূমিকা কি হবে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় শশীকে বলা সব্যসাচীব কথায় :

"কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু ক'রে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে যাক—আর কিছু না পাবো শশি, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রে দাও।" (ঐ, সাতাশ পরিচ্ছেদ)। পাঠক প্রশ্ন করবে শশীর বেহালায় কি সত্যই বিপ্লবের গান বাজবে? না কেবল বিচ্ছেদের করুণরাগিণী গুমরে গুমরে উঠবে? উপরের উদ্ধৃতির শেষের কথাগুলি বিপ্লবী সব্যসাচীর আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ যা শশীর ভবিষ্যৎ জীবনসত্য হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।

পুনশ্চ প্রশ্ন উঠবে, কবি-শিল্পীদের রচনা না হয় সংগ্রামীদের প্রেবণা দিল, তাঁরা না হয় সমাজ পবিবর্তনের পক্ষে প্রচার কবলেন—কিন্তু ভাঙন তো শেষ কথা নয়, গঠন ছাড়া কি বিপ্লব সফল হবে? ধর্ম, সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধ্বংস ক'রে ফেললে কোন সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হবে—যখন দেখা যায়, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন অধিকাংশ মানুষের মর্মগভীরে ধর্মসংস্কার নিহিত আছে! বিশেষ পবিস্থিতিতে ভাঙনের উৎসাহে সব্যসাচী গঠনের দিকটি তুলে ধরতে পারেন নি, অথচ সমকালে শবৎচন্দ্রেব স্নেহভাজন চিরসংগ্রামী সুভাষচন্দ্র ভাঙার সঙ্গে গড়ার প্রয়োজনেব কথা বলতে কখনো ক্লান্ত হননি।

কংগ্রেসী রাজনীতির আবেদন-নিবেদন নীতি সব্যসাচীর কাছে উপেক্ষার বস্তু। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশের 'ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধারকল্পে আইন' বাঁচিয়ে 'যে-সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশমতো' দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাদের অন্তঃসাবশূন্যতা সম্বন্ধে সব্যসাচী অসংশয়ে বলেছেন : "চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং আইনের বাইরে এইসব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা তো কোনোদিন কোনো কিছুই দাবি করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চু রাজাদের মতো এদেশেও যদি ইংরেজ আইন ক'রে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনোমতেই বে-আইনী প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েচে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব একে সওয়া দু' হাতে ক'রে দেওয়া হোক।" (ঐ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

ব্যঙ্গে শরৎচন্দ্র মুক্ত-লেখনী।

পথের দাবী ও চার অধ্যায় : বিপ্লব আন্দোলনের দুই প্রান্তচিত্র

সহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অসহিষ্ণু ছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে। ও-পথ তাঁর একেবারে অপছন্দ। ইংরেজ বিতাড়নের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি ক'রে অর্থসংগ্রহ, ইংরেজ রাজপুরুষ হত্যা ইত্যাদি তাঁর কাছে যুক্তিহীন 'বৈভীষিক রাষ্ট্রউদ্যম'। কবি তিনি। সুতরাং রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতালাভ তাঁর কাছে আশু উদ্দেশ্য নয়, গ্রাম সংগঠনের দ্বারা অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন ওঠেই—ইংরেজ এদেশের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংভর দেখতে যাবে কেন, যখন সে জানে, স্বদেশের স্বয়ংভরতা পরাধীন দেশের শোষণের উপর নির্ভরশীল?

স্বদেশী আন্দোলনের পর্ব কেটে যাওয়ার পর ঐ পর্বের সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছিলেন। তবু হিজলি জেলে বন্দী বিপ্লবীদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে ডাকা সভায় ভাষণ তিনি দিয়েছেন, অনশনে যতীন দাসের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে নাটকের মহড়া তিনি বন্ধ করেছেন। আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রতিবাদী ভূমিকা আমরা দেখেছি। সেই মানুষটির কি ধারণা ছিল বাজেয়াপ্ত 'পথের দাবী' সম্বন্ধে?

বাজেয়াপ্ত 'পথের দাবী'র এক কপি রবীন্দ্রনাথের কাছে শরৎচন্দ্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ইংরেজ সরকারের এই জাতীয় কার্যের যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি প্রশ্ন তুলবেন এবং তাঁর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে সাহিত্যের কণ্ঠরোধ বিষয়ে প্রতিবাদ এলে স্বভাবতই তা সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। নিষিদ্ধ বই মুক্ত না হোক ইংরেজ সরকারের কণ্ঠরোধী কর্মনীতি বিষয়ে ব্যাপক ধারণা জন্মাবে।

রবীন্দ্রনাথ 'পথের দাবী' পড়েছিলেন। তারপর এক দীর্ঘ চিঠি শরৎচন্দ্রকে লেখেন যার নির্গলিতার্থ—এক, সরকারি শাস্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্য কবির দোর ধরে শরৎচন্দ্র পার হতে চাইছেন। দুই, সহিষ্ণু ইংরেজ শাসনের অযথা দোষ দেখানো এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। অপর দেশের ভয়ংকর ঔপনিবেশিক শাসনের তুলনায় ইংরেজ শাসনের ভয়াবহতা কিছুই নয়।

"বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন ক'রে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ ক'রে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই।...কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার ক'রেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারেনা এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে। তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হতো—কিন্তু তোমার মতো লেখক গল্পচ্ছলে যেকথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই

থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধবা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ ক'রে না দিত, তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমাব প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবাব জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি ক'রে দেওয়া হয়।"[৪৩]

শরৎচন্দ্র কি কবির মারফতে নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন ইংরেজেব কাছে? অথচ কবি সেকথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন 'ক্ষমা' এবং 'বিলাপ' শব্দদুটি উচ্চারণ ক'রে। তার অর্থ এই দাঁড়ায়—লেখক, যদি রাজদ্রোহমূলক বই লিখে বিপদে পড়েন তাহলে সেই বিপদের দায় তাঁকে একাই বইতে হবে। দেশবাসী কিংবা দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবির কোনো ভূমিকাই নেই সেই লেখকের পক্ষ সমর্থন করার। "শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি জায়গায় ঘোর অবিচাব তিনি [রবীন্দ্রনাথ] করেছেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেব প্রতিবাদ চাইছিলেন তাঁর মাথার উপব ঝুলে-থাকা খাঁড়াটিকে সরিয়ে দেবাব জন্য নয় —সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করার বিষয়েই। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে মনে হয়, শরৎচন্দ্র বইটি লিখে ফেলার পরে ভয়ে কেঁচো হযে বাঁচবাব জন্য রবীন্দ্রনাথেব দ্বাবস্থ হযেছেন। অথচ বইটি বেশ কয়েক বছর ধরে সাময়িক পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যে সিডিশনের খড়গাঘাত হতে পারে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ইংরেজশাসন সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তা তথ্যসিদ্ধ (তা যে তথ্যসিদ্ধ তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়), সাহিত্যিকেরা উপন্যাসে তা লিখতেই পারেন, সামাজিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ইত্যাদির মতো রাজনৈতিক উপন্যাসের একটা বিশেষ জাত আছে, এবং সত্যভিত্তির উপরে সে-ধরনের উপন্যাস লেখার অধিকার লেখকের অবশ্যই আছে। সেই অধিকারহরণেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাব জন্যই তিনি দেশের সবচেয়ে বড় লেখককে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, জেলশাসন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের চিঠি শরৎচন্দ্রকে সেই ভীরু ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথের চিঠির অন্য অংশে ছিল ইংরেজরাজের অতি সহিষ্ণুতার কথা :

"আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম —একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গবর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেনা। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজরাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়—নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর —অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছে দাবি করি, নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই

বলি, নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তির প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হতো না।" [৪৫]

এ প্রশ্ন এখানে না উঠেই পারেনা, রবীন্দ্রনাথ কেন এহেন রূঢ় আঘাত করলেন শরৎচন্দ্রকে? 'পথের দাবী'-র পক্ষে তাঁর কিছু বলার যদি নাও থাকে, বিপক্ষে এত উত্তেজক কথা কেন তিনি বললেন? একটি কারণ অবশ্য ছিলই, বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক মনোভাব। আর অনুমানে বলা যায়, তাঁর স্বপ্ন এবং কল্পনার পীঠভূমি বিশ্বভারতীব অস্তিত্ব বিষয়ে তিনি অতি সতর্ক ছিলেন। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তখন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর নানা দেশে ভারতবর্ষের প্রধান সাংস্কৃতিক দূত পরিচয়ে তিনি উপস্থিত। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির আগে তাঁর কবিতা জাতীয় ভাবাপন্ন হলেও পরে তিনি মনে করেছিলেন, আন্তর্জাতিক নানা ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। তদনুযায়ী কবিতার চরিত্র বদলেছে। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ নয়, নির্বিশেষ থেকে বিশেষের দিকে যাত্রাই তখন তাঁর সাহিত্যেব লক্ষ্য। অন্তত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তেমনই মনে করেছিলেন। [৪৬] সঙ্গে সঙ্গে মানসসন্তান বিশ্বভারতীর ভালোমন্দের দায়ও তাঁর ছিল। জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ভাবারোপ কবতে গেলে প্রতিষ্ঠানকে তার স্রষ্টার মতোই হয়ে উঠতে হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর সদ্যলব্ধ পক্ষবিস্তার কর্তিত হতে পারে শাসক ইংরেজের তীক্ষ্ণ ছুরিকায়। কবি সেই অনুমানকে সত্যে পরিণত হতে দিতে চাননি। ঔপন্যাসিক হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়, তদনুযায়ী প্রভাবশালী শরৎচন্দ্রের লেখায় খোলাখুলি বিপ্লব আন্দোলনের ইতিবাচক সমর্থন তাঁর মনোভাবের বিপরীত, যা ইতিমধ্যে তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ও অন্যান্য রচনায় ('চার অধ্যায়' ১৯৩৪, 'তিন সঙ্গী' ১৯৪০) তিনি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তাঁর পরামর্শদাতাদের কেউ কেউ পরিষ্কারভাবে সরকার পক্ষীয়। তেমন কোনো পরামর্শদাতা কি তাঁর প্রণোদিত করতে সচেষ্ট ছিলেন? জানিনা ঠিক সত্য কোথায়।

রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র দারুণ মর্মযন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। প্রার্থনার উত্তরে এ কোন প্রাপ্তি? এমন কশাঘাত? মানুষটির তীব্র তিক্ত চিত্তক্ষোভের সাক্ষী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের উত্তর পেয়ে শরৎচন্দ্র অবিলম্বে চিঠি দিলেন উমাপ্রসাদকে :

"শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে ইংরাজের মতো ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল, এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।" [৪৭]

সামতাবেড়ে উপস্থিত হয়ে উমাপ্রসাদ দেখেছেন, "শরৎচন্দ্র বিশেষ উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। তিনি ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা উত্তরও লিখে রেখেছেন ; কিন্তু পাঠান নি। জবাবটি পাঠানো উচিত হবে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের কথা হয়।...রবীন্দ্রনাথের

চিঠিখানি কাছে রাখাও তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে বলেন, দেখো বারবার আমি এ চিঠিখানি পড়ছি, আর ভাবছি, রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও আমাকে লিখতে পারলেন।" ('শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩৬০)।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং শরৎচন্দ্রের প্রত্যুত্তর দুটিই উমাপ্রসাদ কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। দুদিন পরে দৃশ্যত 'অনেকটা শান্ত' [আসলে তা নয়] শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে নিষেধ করেছিলেন কবির ঐ চিঠির প্রচার করতে এবং কবিকে লেখা তাঁর চিঠি কবির কাছে না পাঠাতে। তাঁর স্পষ্ট বারণ ছিল, এ-বিষয়ে উমাপ্রসাদ যেন কবি ও তাঁর জীবনকালে কারোর সঙ্গে ঐ চিঠিদুটির বিষয়ে আলোচনা না করেন বা কাউকে যেন না দেখান। কিন্তু মাসখানেক পরে উমাপ্রসাদকে লেখা আরেকটি চিঠি থেকে দেখা যায় তখনো শরৎচন্দ্রের মন অশান্ত :

"রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছা হয়না। এমন কি ভয় হয়, আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়।...রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারিনি, কোনোদিন পারবো বলেও ভরসা হয়না।" [৪৮]

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালও অল্পকথায় শরৎচন্দ্রের ঐকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন :

"আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর পর, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসখানির মধ্য দিয়ে শরৎন্দ্র তাঁর নিজের রাজনৈতিক মতকেই প্রচার করেছেন। এদিক থেকে বইখানি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোলন'-এরই তীব্র প্রতিবাদ। এই বইখানি যে শরৎচন্দ্রের কি রকম প্রিয় ছিল তার প্রমাণ পেলুম...সে কি উত্তেজনা! কি বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' প'ড়ে ইংরেজদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন! এ বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে ব'লে তিনি মত প্রকাশ করেছেন!"

কবির সম্পর্কে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অবিনাশচন্দ্রের কাছে গোপন রাখেন নি শরৎচন্দ্র। তাঁর ভাঙা মন সনিশ্বাসে বলেছে :

"আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্যে আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে ক'রে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, যদি তুমি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা—কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না! কবির কাছে আমার 'পথের দাবী'র যে এতবড়ো লাঞ্ছনা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।" [৪৯]

শরৎচন্দ্রের যুক্তিবোধে আরো একটি গুরুতর জিনিস উঠেছিল : "এ চিঠি তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটস্ম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার ক'রে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচার জেলে বন্ধ

ক'রে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।" [৫০]

চিঠির জবাব শরৎচন্দ্র চিঠিতেই দিয়েছিলেন। কবির কাছে না-পাঠানো সেই চিঠিতে তাঁর মুখ্য বক্তব্য ছিল দুটি। এক, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সত্য ভাষণ তিনি করেছেন এবং তার ফল কি হবে তাও তাঁর জানা। দুই, তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করার অধিকার সকলেরই আছে বিশেষত এই গ্রন্থের পাঠকের। পাঠকেরা কোনো প্রতিবাদ না করলে লেখকই স্বয়ং এগিয়ে আসবেন। রবীন্দ্রনাথকে এসব কথা লেখার সময় কবির মন কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রশংসায় হাবুডুবু খেয়েছে তা দেখাতে শরৎচন্দ্র কসুর করেন নি। ইঙ্গিতে প্রশ্ন তুলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ইংরেজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিষয়ে কবি কেন আবৃত-চক্ষু? শরৎচন্দ্রের মন সবচেয়ে ধাক্কা খেয়েছিল—কবির এই অভিযোগে। যে-তিনি আকৈশোর উদ্দাম জীবনযাপন করেছেন, কোনো সমাজনীতির বালাই যাঁর ছিলনা, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছেন, বিপ্লবীদের অকাতরে সাহায্য করেছেন পিছুটান না রেখে, সেই তিনি জেলের ঠাণ্ডি গারদকে ভয় করবেন?

"আপনি লিখেছেন ['পথের দাবী' পড়ে] ইংরেজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।...কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানত তা আমি করিনি। ...নানা কারণে বাংলাভাষায় এ ধরনের বই কেউ লেখে না। আমি যখন [এই] বই লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান ক'রে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা ক'রে চলবেন, এ দুরাশা আমার ছিলনা। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না।...কিন্তু বাংলাদেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় তো করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত ক'রেই করি, কিন্তু তার প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদের দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।...

"যা বলা উচিত বলে মনে করি, তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরেজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোনো নির্ভরতা ছিলনা। আমার সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এই ধরনের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

"আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারো ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মতো সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করার জাসটিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেস্ট করার জাসটিফিকেশনও তেমনি আছে।

"আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ ক'রে নয়, আর একখানা বই লিখে।"[৫১]

'পথের দাবী'র বিরোধিতার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। অনুমান করা যায় তার শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' লেখা হয়েছিল 'পথের দাবী'র আঘাতে। অবশ্য 'পথের দাবী'র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যদি 'চার অধ্যায়ে'র জন্ম সম্ভব হয়ও তার প্রস্তুতিপর্ব বহুদিনের। বারুদের স্তূপ একটু একটু ক'রে বাড়ছিল। 'পথের দাবী' তাতে অগ্নিসংযোগ করেছে মাত্র।

রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার জানিয়েছেন, 'সাধনা' পত্রিকার যুগে 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধে (শ্রাবণ ১৩০১) রবীন্দ্রনাথ দুটি কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের আলোচনা করেছিলেন। উপন্যাস দুটির নাম 'আইজ লাইক দ্য সী' এবং 'দ্য জু'। লেখকদ্বয়ের নাম যথাক্রমে মৌরিযস যোকাই এবং জোসেফ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউসকি। উপন্যাস দুটির মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য আছে। হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন্ত দলিল এদের বলা যায়। জাতীয় চেতনার টগবগে চেহারা ধরা আছে এখানে। "শুধু গল্প-রসিকের জন্য দ্য জু লেখা নয়। এ উপন্যাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও জাতি-তাত্ত্বিক সমস্যাও জড়িয়ে আছে। আইজ লাইক দ্য সী ১৮৯০ সালের হাঙ্গেরীয় অ্যাকাডেমির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়েছিল। আর দ্য জু উপন্যাসটি উপস্থাপনার বলিষ্ঠতা ও সারল্যের জন্য তৎকালীন সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিল।"

অধ্যাপক মজুমদার অধিকন্তু জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক যোকাই এবং ক্রাসজিউসকি শুধু উপন্যাস লিখেই দেশের প্রতি কর্তব্য সমাধা হয়েছে মনে করেন নি। নিজেদের এঁরা জড়িয়ে ফেলেছিলেন প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামেও। "স্বাধীনতা বিপ্লবে দুই লেখকই প্রাণমন সমর্পণ করেছেন। এঁদের রচনার মধ্য দিয়েই হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষাকে ভালবেসেছে, শোকে সান্ত্বনা পেয়েছে, লজ্জায় ধিক্কার দিয়েছে, গৌরবে জয়ধ্বনি করেছে। দেশের মাতৃভাষাকে এঁরাই মুক্তি দিয়েছেন বিদেশী ভাষার আধিপত্য থেকে।" সুতরাং এঁদের 'রচনাবল্লের স্মরণোৎসব উপলক্ষে' কৃতজ্ঞ দেশবাসী এঁদের ভূষিত করেছে জাতীয় বীরের সম্মানে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে যোকাই এবং ক্রাসজিউসকির দুটি উপন্যাস কোন মাত্রায় উপস্থিত? ঐ গ্রন্থ দুটি পাঠে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকদের প্রাপ্ত সম্মানের কথা চিন্তা ক'রে সঘন দীর্ঘশ্বাসে তুলনারেখা টেনেছেন হতভাগ্য বঙ্গদেশের ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে। অধ্যাপক মজুমদারের মতে কেবল 'সাধনা' পত্রিকার পর্বে নয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবনে এই দুই বিদেশী ঔপন্যাসিক ছায়াবিস্তার করেছেন

"...'সাধনা' পর্বে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার যে আলোড়নের সঙ্গে নিজের শিল্পী-চেতনাকে একান্ত ক'রে দেখার জোরালো সমর্থন রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন

য়োকাই ও ক্রাসজাউসকির উপন্যাসে, তাকে নানাভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী ঔপন্যাসিক সাধনায়।...রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সাধনায় জাতীয় চেতনার প্রেক্ষাপটকে প্রসারিত করার স্পষ্ট প্রেরণা-উৎস য়োকাই ও ক্রাসজাউসকি।"[৫২]

তার ফল কি দাঁড়াল? বিদেশী বিপ্লবী সাহিত্য পড়ে স্বদেশী বিপ্লবের চূড়ান্ত অপমান করা নিজ সাহিত্যে? রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাস, বিশেষত 'চার অধ্যায়' যেখানে ইন্দ্রনাথের মতো বিপ্লবী নেতা "রূপসী মেয়েকে বিপ্লবের পথে ছোকরাদের আকর্ষণের জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধাহীন (ইন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাষায়, 'কেমন ক'রে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনেব ফোঁটা ছেলেদের মনে কি আগুন জ্বালিয়ে দেয়!')। রবীন্দ্রনাথের সর্বত্রগামী কল্পনা বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে এইরকম একটি নেতা আবিষ্কার করতে পেরেছিল বটে! (স্বদেশীযুগের সন্দীপও রবীন্দ্রনাথের এইরকম আবিষ্কার, যে-নেতার স্বদেশী-সাধনার লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল—অন্যের বউকে ফুসলানো।")।[৫৩]

আমরা জেনেছি 'চার অধ্যায়ে'র প্রথম সংস্করণে গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ একটি 'আভাস' যুক্ত করেছিলেন। সেখানে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে সেকালে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ হয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব রোম্যান ক্যাথলিক থেকে বৈদান্তিক হিন্দু সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তারপব অগ্নিময় রাজনৈতিক প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন—এবং রাজদ্রোহের মামলা চলাকালে সহসা মৃত্যুবরণ করেন। ইংরেজের কারাগারে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়নি। তাঁর নাম তখন যাদুমন্ত্রের তখন। এই পরিস্থিতিতে সকলের ধারণা হয়—ব্রহ্মবান্ধব যে-বিশ্বাস আমৃত্যু লালন ক'রে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই বিশ্বাসের বিরোধী কথা তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চূড়ান্ত অসম্মান করেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের কর্ম ও রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিবর্তন (শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গঠন ছেড়ে বাজনৈতিক আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়া) রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। সুতরাং 'চার অধ্যায়'-এর 'আভাস'-এ তিনি লিখলেন :

"একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিকপত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

"তিনি ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে ক'রে বিস্মিত হই।

"এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দুমুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হলো। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ

আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালি জাতিকে কৃশ করে দেবে, এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত ক'রে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেলনা। লর্ড মরলি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল, তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ এইখানে থামতে পারতেন। থামেন নি। সেক্ষেত্রে বিপ্লবপন্থায় আহুতিদানকারী ব্রহ্মবান্ধবেব 'পতন'(?) অকথিত থেকে যায় এবং অসম্পূর্ণ বয়ে যায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিষয়ে তীব্র রবীন্দ্র-অসন্তোষের প্রকাশ। সুতরাং তিনি লিখলেন :

"নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে একলা বসেছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্ত্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই ব'লেই আর অপেক্ষা কবলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিলনা।

"এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।"

বলাবাহুল্য সচেতন বাঙালির তীব্র ক্ষোভ রবীন্দ্রনাথকে এই 'শেষ কথা' প্রত্যাহাবে কার্যত বাধ্য কবেছিল। 'চার অধ্যায়ে'ব পববর্তী সংস্করণে ব্রহ্মবান্ধব সম্পর্কিত 'আভাস' ছিলনা।

'পথের দাবী'র সব্যসাচীর প্রায় ক্যারিকেচার ক'রে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন 'চার অধ্যায়ে'র ইন্দ্রনাথকে। দুই চরিত্রের এই আপাত মিল এবং গভীরে অশেষ অমিলের কথা (সব্যসাচীর কথা বেশি না বলে) জানিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় :

"বাংলাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবকাহিনীব পটভূমিতে ['চাব অধ্যায়ে'র] কাহিনীর পত্তন। ইন্দ্রনাথ ইহার কেন্দ্রে। কবি ইন্দ্রনাথকে করিয়াছেন খানিকটা সবজান্তা, সববিষয়ে পণ্ডিত, সর্বকর্মা—যেমন পথের দাবীর সব্যসাচী। ইন্দ্রনাথ দিগগজ বিজ্ঞানী, সমস্ত য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ব দুইই সমানভাবে জানেন, ফরাসী, জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত। আবার ডাক্তারী পাস, জুজুৎসু-বীর। গীতাও আওড়ান।...ইন্দ্রনাথ বিপ্লবের নেতা। স্বভাব দুর্দমনীয়, নির্মম হইতে তাহার বাধেনা। বিপ্লব সৃষ্টির জন্য উৎসুক কিশোর ও যুবকের দল তাহার পাশে জমা হয়, আটকা পড়ে তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। তাহাদের দিয়া 'রাজনৈতিক' ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি চালান। এসবের উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ —দলের কাজের জন্য। ইন্দ্রনাথ বলেন তাঁহার সমস্ত কাজ ইমপার্সোন্যাল অর্থাৎ

নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত নাই। তিনি বলেন, 'হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি...আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে চারিদিকে এসে জুটল।...গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও একটা সুযোগ।...যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধ মনে স্বীকার ক'রে নিতে পারি।...ডুবোজাহাজে ঝড়ের মুখে যে-কয়জনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমার জিত।' তারপরে গীতার কথা বলেন, 'কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'...উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভালো-মন্দের বিচার, লৌকিক ধর্মাধর্মের খুঁতখুঁতানি এই শ্রেণীর নেতাদের মতে দুর্বলতার চিহ্ন, অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়। অতএব রাজনীতির নামে unscrupulous হওয়ায় অধর্ম হয়না।" [৫৪]

কথার ফুলঝুরি ইন্দ্রনাথ—সব্যসাচীর চমৎকার বাঁকানো ছবি, তাতে সন্দেহ নেই।

'পথের দাবী' এবং 'চার অধ্যায়ে'র প্রসঙ্গ এইখানে শেষ হয়ে যায়নি। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বদান্যতায়। 'পথের দাবী'-র বিপুল জনপ্রিয়তার ঢেউ সামলাতে ব্যতিব্যস্ত ইংরেজ সরকার হাতে-গরম 'চার অধ্যায়'-কে লুফে নিয়েছেন। অবশেষে পাওয়া গেছে সেই উপন্যাস যা বিপ্লবী চরিত্রের বিকারে পূর্ণ এবং তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা!! সুতরাং 'পথের দাবী'র দিক থেকে পাঠকের মনকে ফেরাতে গেলে 'চার অধ্যায়'কে সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ ক'রে পাঠাতে হবে শিক্ষিত জেলবন্দীদের কাছে যাঁরা পাঠযোগ্য বই পেলেই পড়ে ফেলেন। 'চার অধ্যায়' কি বিপ্লবপন্থা সম্পর্কে তাঁদের মোহভঙ্গ করবে না? এবং নাটকের আকারেও ব্যাপারটিকে উপস্থিত করা দরকার। কলকাতার সেরা মঞ্চে, যথা নাট্যনিকেতন এবং রঙমহল, সেটির নিয়মিত অভিনয় করাতে হবে। এজন্য সরকারি শিক্ষাবিভাগের অপূর্ব চন্দ যেন রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন বইটির নাট্যরূপ দেবার জন্য।

এসব তথ্যের কিছু অংশ জানা গেছে স্বয়ং রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন জেলে আবদ্ধ রাজবন্দীদের কাছে সরকার কর্তৃক 'চার অধ্যায়' পৌঁছে দেওয়া যেমন হচ্ছে, তেমনি জনসাধারণের চোখের সামনে এই বইকে তুলে ধরা হচ্ছে 'বিপ্লবদমনের প্রচার-পুস্তকরূপে।' [৫৫] একইসঙ্গে সরকারি মহাফেজখানা ঢুঁড়ে গোপন নথি আবিষ্কার ক'রে ড: শিশির কর জানিয়েছেন সরকারি আমলা মেজর ব্রেনানের কথা, যিনি মগজ ধোলাইয়ের জন্য নাটকাকারে 'চার অধ্যায়'কে উপস্থিত করতে অতিশয় আগ্রহী :

"Arrangements have already been made for the staging of play to oppose the cult of terrorism and Civil Disobediance. Dr. Rabindranath Tagore has also recently been persuaded through the Assistant Director of Public Instruction, Bengal, to dramatise one of his books, *Char Adhayaya,* which delivers a powerful attack on the cult of terrorism. When ready, copies will be distributed to District Officer in the same manner as *Patha-Bhrasta,* and it is also proposed to make an attempt to make it staged in the first class theatres in Calcutta like Rangmohal and Natya Niketan."

ড: শিশির কর সরকারি আমলার নোট থেকে আরো জানিয়েছেন : "মিঃ [অপূর্ব]

চন্দ্রকে বলা হয়েছে, তিনি যেন রবীন্দ্রনাথকে চার অধ্যায় নাট্যরূপ দিতে অনুরোধ করেন। মিঃ চন্দ স্বীকৃত হয়েছেন।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন কিছু গোয়েন্দার বুদ্ধিহীন কাজ দেখে। যে-'চার অধ্যায়' বিপ্লবপন্থার বিরোধিতায় রচিত, তাকেই বাজেয়াপ্ত করার জন্য গোয়েন্দাদের একাংশ তৎপর? কাছাকাছি সময়ে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা দুটি চিঠিতে তাঁর উদ্বেগও ছিল—"একথা ওদের বোঝা উচিত ছিল সমস্ত গল্পটাই বৈভীষিক রাষ্ট্র উদ্যমের বিরুদ্ধে।" (১১ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। "বিশ্বাস করিনে সরকার ওটা ['চার অধ্যায়'] বন্ধ ক'রে দেবে—বন্ধ করার ন্যায্য কারণ কিছুমাত্র নেই, তৎসত্ত্বেও যদি উপদ্রব করে, সেটা বোকামি।" (৬ জানুআরি ১৯৩৫)। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' লিখে রাজরোষে নিষিদ্ধ 'পথের দাবী'র লেখক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একই আসনে বসতে চাননি। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য বিপ্লবপন্থা বিরোধী বা 'পথের দাবী' বিরোধী তাঁর মনোভাবকে গোপন ক'রে জানিয়েছেন, 'চার অধ্যায়ে'র মূল কথা ভাষার যাদুমাখা তরুণ-তরুণীর লিরিক প্রেমকাহিনী, বিপ্লবকাহিনী মূল কথা নয়।

বিচিত্র এই, হিজলী জেলে বিপ্লবীদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিয়েছেন, অবশ্য তাদের পথ সমর্থন না ক'রেই। তাঁর প্রতিবাদ ছিল নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলিচালনার জন্য (প্রসঙ্গটি অল্প আগে বিস্তারিত দেখেছি)। এবং তিনি বিনাবিচারে বকসা দুর্গে আটক বিপ্লবীদের উদ্দেশে প্রেরণাদায়ী কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন ('বকসাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি') :

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদী অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কি দিল পরিচয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখক হিসাবে ভারসাম্য রাখার প্রয়োজনে গান্ধী-আন্দোলন এবং বিপ্লব-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে পৃথক উপন্যাস শরৎচন্দ্র লিখবেন—এমন পরিকল্পনা তাঁর ছিল অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমে তিনি 'জাগরণ' উপন্যাস আরম্ভ করেছিলেন গান্ধী-প্রবর্তিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের পটভূমিকায়। কিছু ছেদসহ মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৩০ থেকে বৈশাখ ১৩৩২ পর্যন্ত উপন্যাসটির সাত কিস্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু লিখতে লিখতে শরৎচন্দ্রের মন সরে যায় সহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনে—বিপ্লব আন্দোলনের দিকে। তারই আগ্নেয় কাহিনী লেখেন 'পথের দাবী'তে। 'জাগরণে' গান্ধী-আন্দোলনের সহানুভূতিপূর্ণ কাহিনী রচনার উৎসাহ সম্ভবত হারিয়ে যায়। তাই 'জাগরণ' অসমাপ্ত পড়ে রইল, তারপরেও শরৎচন্দ্র একাধিক সৃষ্টি করলেন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৩৮—মাঘ ১৩৩৯), 'শেষ প্রশ্ন' ('ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শ্রাবণ-কার্ত্তিক মাঘ-চৈত্র ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১৩৩৫, বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৩৬, চৈত্র ১৩৩৭, বৈশাখ ১৩৩৮) এবং 'বিপ্রদাস' ('বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৬-১৩৩৮-এর মধ্যে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত, পরে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ—ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৯, বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন ১৩৪০, বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্ত্তিক-মাঘ ১৩৪১)।

রাজনীতির ছায়া : শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সৃষ্টিতে

শোষণের দুটি চেহারা—বৈদেশিক এবং ভারতীয়। 'পথের দাবী' ছাড়া শবৎচন্দ্রের অন্য লেখায় তা এসে গেছে। তা পাই 'শ্রীকান্ত'। 'দেনাপাওনা'তে আছে। আরও কোথাও কোথাও। অবশ্যই বড় আকারে পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেসব কথার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাযুক্ত এইসব রচনার বিষয়ে স্বয়ং রাজনীতিক শরৎচন্দ্র বসুর মন্তব্য স্মরণ করতে পারি :

"যারা সকলের অবজ্ঞেয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্ধকারে, চোরাগলিতে যাদের আনাগোনা, তাদের কথাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি বুঝেছিলেন আজকের সমাজ যাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায়না, যাদের মধ্যে সাধারণ চক্ষু গ্লানি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায়না, তারাই হলো সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড, তাদের প্রাণশক্তিতেই আজও সমাজ বেঁচে আছে। কিন্তু এই বিরাট অসংগতি, এই অর্থহীন অসামঞ্জস্য নিয়ে সমাজ কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারেনা—তাও এই সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকেনি, তাই তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখেছি ভাবী বিপ্লবের ইঙ্গিত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি নিয়ে এই বিপ্লবকে তিনি উপলব্ধি করেন নি, কেবলমাত্র বৈদেশিক শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযান সীমাবদ্ধ ছিলনা। সেখানে যে অন্যায়, যে অত্যাচার তাঁর লক্ষ্যপথে এসেছে তার বিরুদ্ধেই তাঁর লেখনী তীব্রতম ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। সর্বরকম অন্যায়, পাপ, অত্যাচারের সমাধির উপর তিনি গড়ে তুলতে

চেয়েছেন স্বাধীন, সুস্থ, সুন্দরতম সমাজব্যবস্থা, শোষিত জনতাকে অন্ধকার নির্বাসন থেকে তিনি আনতে চেয়েছেন আলোকোজ্জ্বল উন্মুক্ত সরণিতে।"[৫৭]

প্রথমে 'শ্রীকান্ত'র প্রসঙ্গ।

সেবাব্রতী বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী। কিন্তু সন্ন্যাসীর আত্মমুক্তির প্রয়াসকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি নেমে পড়েছিলেন অসুস্থ নিরন্ন মানুষের সেবায়। বয়স তাঁর অল্প হলেও দেশের জনসাধারণের চরম দুর্দশার অভিজ্ঞতা তাঁকে মনে প্রবীণ ক'রে তুলেছিল। কেন ঘব ছেড়েছি—রাজলক্ষ্মীর এই প্রশ্ন তাঁর মুখ থেকে টেনে বার করেছে সেইসব কথা যা ইংরেজ শাসকের বিষয়ে মুক্তদৃষ্টি না হলে বলা সম্ভব নয়। বজ্রানন্দ অকুণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কাহিনী :

"এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।" ('শ্রীকান্ত', তৃতীয় পর্ব, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

শোষণ ইংরেজ শাসনের আগে থেকেই বর্তমান ছিল—সামন্তশাসন, জমিদারীপ্রথার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষ বাদ দিলে তা লাগামছাড়া হয়নি প্রধানত দুটি কারণে—এক, যাঁরা জমিদারী চালাতেন তাঁরা এদেশেরই মানুষ। সৎভাবে অথবা অসৎভাবে লুণ্ঠিত টাকা দেশেই রয়ে যেত, দেশের বাইরে যাওয়ার প্রশ্ন ছিলনা। দুই, রাজা অথবা নবাবের রাজধানী ছাড়া শহর নামক ব্যাপারটি ছিলনা বলে (যে-শহর নাগরিক বিলাস এবং অর্থ অপচয়ের কেন্দ্রভূমি), জমিদারীদারদের পক্ষে তথাকথিত শহুরে বাবু হওয়াটাও সম্ভব হয়নি। তাঁরা গ্রামেই থাকতেন এবং কখনো কখনো প্রজাদের হিতসাধনের চেষ্টা করতেন। মোদ্দা কথা, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা কিছু পরিমাণে ছিল।

এই গ্রামীণ অর্থনৈতিক-বিন্যাস ইংরেজ নষ্ট করেছে লুঠের টাকা ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে। মন্বন্তর যে আসলে ইংরেজ-সৃষ্ট তা ইতিমধ্যে 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর মুখে শুনেছি। রাজস্বের বড় অংশ বাইরে চলে যাওয়াতেই প্রজাদের দুর্দশা শেষ হয়নি। গ্রামের জমিদার, যাঁরা এতকাল খাজনার একছত্র অধিপতি ছিলেন, তাঁরাও পুরনো হারে অথবা বর্ধিত হারে খাজনা দাবী করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যোগাযোগের সুব্যবস্থা রেলপথের সাহায্যে গড়ে উঠেছে। তৈরি হয়েছে নব্য ভোগকেন্দ্র শহর। সুতরাং জমিদারসম্প্রদায় শহরমুখী। সেখানে নাগরিক সভ্যতার বিলাসভোগের সমূহ আয়োজন। ফলে যে অর্থ-সম্পদ গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রে ছিল, তা এখন শহুরে অর্থনীতির বলসঞ্চয়ের কারণ। প্রজাদের শোষণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল আরো এই কারণে—শহরমুখী কিংবা শহরের পাকাপাকি বাসিন্দা জমিদার এসে মাঝে মাঝে খাজনা দাবী করতেন, মধ্যপর্বে জমিদারী চালানোর ভার ছিল নায়েব-গোমস্তা প্রভৃতির উপর। এবং লুঠেরা হিসাবে তারাও কম কিছু নয়। প্রজাদের রক্তমাংস শোষণের পর যে সাদা খটখটে কঙ্কালখানি পড়েছিল, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে যথা 'দেনাপাওনা'তে তাদের চেহারা দেখা যায়।

জমিদারের শহরমুখী হবার আরো কারণ আইন-আদালত। মামলা-মোকদ্দমা চলবে

আদালতে এবং সে আদালত শহরে। মামলা চালাবেন নব্য আইনজীবী সম্প্রদায়। তার খরচ আছেই এবং প্রায়শ তা বিপুল। অর্থাৎ জমিদারী রক্ষার দায়ও জমিদারকে বাধ্য হয়ে শহরমুখী করেছে। একদা যা বাধ্যতাঘটিত, ক্রমে তা-ই অচ্ছেদ্য প্রণয় কারণ। জমিদার তাঁর সন্ততিদের যুক্ত করেছেন শহরের সঙ্গে মুখ্যত পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের জন্য। অর্থাৎ জমিদার এখন নামত গ্রামের জমিদার, আসলে তাঁর শিকড় শহরের পাথুরে মাটিতে নেমে গেছে। এই বিপুল খরচ বহন করবে কে?—অবশ্যই হতভাগ্য এবং হতদরিদ্র প্রজারা।

বিভিন্ন উপন্যাস থেকে এসবের উদাহরণ আমরা পেয়েছি। 'শ্রীকান্ত'-এ গঙ্গামাটি গ্রামের অর্থনৈতিকভাবে পিষ্ট নিম্নবর্ণ মানুষের ছবি :

"গ্রামখানি ছোট এবং আমরা যাহাদের ছোটজাত বলি তাহাদেরই।...বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি ক'রে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মতো খড় এই সোনার বাংলাদেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। একছটাক জমিজায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙারি চুবড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দরে গ্রামান্তরে সৎগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি তো ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমন করিয়াই এই অশুচি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয়তো এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে, কিন্তু কোনোদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুক্কুর যেমন জন্মিয়া গোটা-কয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে, তাহার যেমন হিসাব কেহ কখনো রাখেনা, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার দৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড়ো লাঞ্ছনায় কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।" (ঐ, তৃতীয় পর্ব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

মানুষের হাতে মানুষেরই চরম অসম্মানের এই বর্ণনা পাঠকের শিউরে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। এসব লেখার সময় শরৎচন্দ্রের হয়তো রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ মনে পড়েছিল : "ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির/মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর/বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার/বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—/তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,/নাহি জানে অভিমান,/শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ/রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,/সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,/নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,/দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে/মরে সে নীরবে।"

প্রতিবাদের সামান্যতম ভাষা উচ্চারণ করা যে মহা অপরাধ, সেই ধারণা বঞ্চিত মানুষদের মনের গভীরে প্রোথিত। বজ্রানন্দ জানিয়েছেন : "দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন তো? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেচি? বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে ঋঁড়ে বার ক'রে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্ধা বলে মনে ক'রে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার ক'রে গিয়েছিলেন!" (ঐ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

এক্ষেত্রে শোষণ শুধু অর্থনীতিতেই আবদ্ধ নেই, মনস্তাত্ত্বিকও বটে যা তরান্বিত করেছে অর্থনৈতিক শোষণকে।

প্রজাদের প্রতি শহরমুখো জমিদারদের অবহেলা কিভাবে নায়েব-গোমস্তার হাতে তাদের চূড়ান্ত দুরবস্থার কারণ হয়ে উঠেছে তা বজ্রানন্দের কথায় স্পষ্ট : "এইসব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ-কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেচে। যখন কাছে ছিলে তখনো যে এদের কষ্ট তোমরা দাও নি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভারও তেমনি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধকরি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠেনা। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায়, তোমাদের শহরবাসের সর্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার।" (ঐ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

পৌষ ১৩২৭-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব শুরু হওয়ার দু' বছরের মাথায় ফাল্গুন ১৩২৯-এ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'পথের দাবী'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই দুই উপন্যাসের বিস্ময়কর চারিত্রিক ঐক্য লক্ষ্য করেছি। 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের রক্তশোষণ, তৎসহ ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ছবি ফুটেছে। অন্যদিকে 'পথের দাবী'তে সেই শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখা গেছে। অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্ব এবং 'পথের দাবী' রচনার মধ্যে আবশ্যিক যোগসূত্র ছিল। শরৎচন্দ্র নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে এই দুই উপন্যাস রচনা করেছেন—তা মনে করা যেতেই পারে।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে পূর্বে অত্যাচারী শোষক জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী পরিবর্তিত হয়ে নিজের গোমস্তা এককড়ি নন্দীর অত্যাচার ও অর্থলুণ্ঠনের চেহারা খুলে ধরেছেন। তাঁর শান্তিকুঞ্জ আগুনে ভস্মীভূত হবার পর সাগর সর্দারের উপর দায় চাপিয়ে এককড়ি তাকে 'আন্দামানে' পাঠাতে অতিব্যস্ত। তাকে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করেছেন জীবানন্দ :

"তাহলে তোমাকে তো এদের সঙ্গে [আন্দামানে] যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরির কাজে তুমি যাদের ঘরে আগুন দিয়েচ, সে খবর তো আমি জানি। আগুন লাগাতে কেউ তাদের চোখে দেখেনি, মিথ্যা সন্দেহের উপর পুলিশ যদি তাদের উপর অত্যাচার করে, সত্যি কাজের জন্য তোমাকেও তার ভাগ নিতে হবে।" ('দেনাপাওনা', ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

গোমস্তার দুর্বুদ্ধি শুধু পুলিশে খবর দেওয়াতেই আটকে থাকে না। অত্যাচারী পুলিশকে প্রজাদের উপর লেলিয়ে দিয়ে পয়সার খেলা শুরু হয়ে যায়। গোমস্তা-নায়েবকে উপযুক্ত দক্ষিণায় সন্তুষ্ট ক'রে তবেই পুলিশের হাত থেকে রেহাই মেলে হতদরিদ্র প্রজার। ঐ পয়সার কিছু অংশ যথারীতি পুলিশের পকেটেও পৌঁছায়। জীবানন্দ অন্তত একবারের জন্য এককড়ির এই পয়সা-লুঠের ব্যাপারটি প্রকাশ্যে এনে ফেলেছেন :

"আমাকে না জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। যা পুড়েছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু এর উপর যদি পুলিশের সঙ্গে ছুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু' পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা করো, তাহলে লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে।" (ঐ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

এখানে বলে নিতে পারি, মনিবের অনুপস্থিতিতে গোমস্তা এককড়ির ধারাবাহিক চুরির প্রসঙ্গটি ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সূচনাতেই এনেছিলেন। [জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী কর্তৃক] "তাহার অনেক গাফিলতি, অনেক চুরির এইবার...একটা কঠোর বোঝাপড়া সরজমিনে বসিয়া চলিতে থাকিবে।" এককড়ি গোমস্তা শ্রেণীর প্রতিনিধি। 'শ্রীকান্তে' গঙ্গামাটি গ্রামের গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীও এদের থেকে ভিন্ন হতে পারেন নি। কানাই বসাক তার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুকালে কুশারীর কাছে দেনার দায়ে বাঁধা রেখে যায়। বুদ্ধিমান কুশারী সে সমস্ত গ্রাস করতে বিলম্ব করেন নি। তারপর বাধা এসেছিল তাঁরই বাড়িব মধ্য থেকে—তাঁর ভ্রাতৃবধূ সুনন্দার প্রবল ধর্মবোধের জন্য। এখানে এটুকু যোগ কবা যায়, নিতান্ত দরিদ্র মানুষের পল্লী গঙ্গামাটির গোমস্তা কুশারী মশায়ের ভরা সংসার শ্রীকান্তের দৃষ্টি এড়ায় নি :

"কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা স্বচ্ছল তো বটেই, বোধহয় একটু বিশেষ রকমই ভালো। ...চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে একটা ধানের মরাই...ভিতরের প্রাঙ্গণেও...আরো গোটা দুই রহিয়াছে।...একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন তাহার কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুল্লী নিকান-মুছান ঝরঝর করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত স্থানটুকুর উপরে ছায়াতলে দুটি পরিপুষ্ট গো-বৎস ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে।...এটা বুঝা গেল কুশাবী পরিবারে অন্নের মতো দুগ্ধেরও বিশেষ কোনো অনটন নাই। দক্ষিণ বারান্দার দেয়াল ঘেঁষিয়া ছয়-সাতটা বড় বড় মাটিব কলসী বিড়ার উপর বসানো আছে।...যত্ন দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিংবা অবহেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেরা-সমেত পাট এবং শনের গোছা বাঁধা রহিয়াছে ; সুতরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়িদড়ার আবশ্যক হয়, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না"। ('শ্রীকান্ত', তৃতীয় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ)।

এই স্বচ্ছলতা নিঃসন্দেহে গোমস্তাগিরির সাধুপথে অর্জিত নয়। কেননা বৈষয়িক জীবন-প্রভাতে কুশারী মশায় নিতান্ত নিঃসম্বল ছিলেন।

গোমস্তা-রাজত্বে প্রজাশোষক হয়ে ওঠে সম্পদশালী প্রজাও। গোমস্তাও তখন তার হাতে ধরা। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের সূচনায় লেখক জানিয়েছিলেন : "...দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং...নিঃসহায় দেবতার ধন...জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে...।" চণ্ডীগড় গ্রামের অধিকাংশ সম্পত্তি জমিদারের দখলে যাবার পর জমিদারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যথেষ্ট সম্পদশালী হয়ে উঠেছেন জনার্দন রায়। বড় রাস্তার উপরে দেবত্র সম্পত্তির মাত্র কাঠাদশেক তিনি দখল করেছিলেন দোকান-ঘরকে ওখানে সরিয়ে আনার জন্য। শুধু ওটাই নয়, দেবত্র সম্পত্তির আরো দু-একশ বিঘে জমিও তাঁর অধিকারে এসে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর সঙ্গে ষড় ক'রে এক হাজার বিঘে দেবত্র সম্পত্তি তিনি জনৈক 'মান্দ্রাজী সাহেবকে' বিক্রি করেছিলেন (এক্ষেত্রে জমিদারও লুঠেরা, একই কাজের অংশীদার)। "অনেক টাকার ব্যাপার, অতএব এককড়ির সহযোগে অনেক ঢেরা-সই করিয়াছেন, অনেক বন্ধকী

তমসুক ও কর্জার খত প্রস্তুত করিয়াছেন—একের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিবার যতপ্রকার গলি-ঘুঁজি আছে অতিক্রম করিয়াছেন।" এই জনার্দন রায়ের "অনেক ধানের গোলা, অনেক খড়ের মাড়, শস্যসঞ্চয়ের বিপুল ব্যবস্থা।" বলা বাহুল্য এসবই দরিদ্র প্রজাদের দরিদ্রতর কিংবা নিঃস্ব ক'রে তাঁর সঞ্চয়। চোখের জল ঝরিয়ে ষোড়শীব কাছে স্বজাতির এই অর্থনৈতিক দুর্গতির বর্ণনা করেছে সাগর সর্দার : "তোমারই কি মনে পড়েনা ওই বেনে-ডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমিজমা-হালবলদ। দু-মুঠো ধানের সংস্থান তাদেব সব্বাযের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায়মশাযের।" (ঐ, ষোড়শ পরিচ্ছেদ)।

দায়িত্বহীন, বিবেকহীন অত্যাচারী জমিদারের জ্বলন্ত ছবি ফুটেছে 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ চৌধুরীর চরিত্রে। চণ্ডীগড় গ্রামে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেবল 'দিন-আষ্টেকে'র মধ্যে 'হাজার দশেক টাকা' 'তসিল' বাবদ আদায়ের হুকুম দেননি, একইসঙ্গে নিত্য নারীমাংসেব যোগানেব ভারও চাপিয়েছেন গোমস্তার উপরে। তাব ফল কি দাঁড়িয়েছিল উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রাবম্ভে লেখক জানিয়েছেন :

"জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে, তাহা জমিদার-সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কবাও পাগলামি।" (ঐ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। নারীলোলুপ এই মানুষটি 'গ্রামের বুকের মধ্যে বসে...রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান-ইজ্জত অপহরণ' করেছেন। লক্ষণীয় জমিদারের টাকা আদায়ের সময় জনার্দন রায়ের মতো সম্পন্ন ভূস্বামীর গায়ের হাত পড়েনা। গোমস্তা এককড়ি সামান্য সম্বলমাত্র-মানুষগুলিকে বাধ্য করে জনার্দন রায়ের কাছে সম্পত্তি বাঁধা রেখে জমিদারের টাকা যোগাড় করতে, যাতে ঐ সম্পত্তি দেনার দায়ে পরে জনার্দনই কিনে নিতে পারেন।

শরৎচন্দ্র অবশ্য জীবানন্দের পরিবর্তিত আকারও দেখিয়েছেন। কিন্তু পূর্বের রূপ তাতে মিথ্যা হয়ে যায়না।

জমিদারী পরিচালনায় গোমস্তার ভূমিকার সঙ্গে এসে যায় রক্তচক্ষু পাইক-বরকন্দাজের কথা। নমুনা, 'দেনাপাওনা'য় হিন্দুস্থানী নেশাখোর পাইকরা। চণ্ডীগ্রামের বাইরে থেকে আসা এই মানুষের প্রভুর সামান্য হুকুমে মানুষের বুকে বাঁশ ডলে দেওয়ার মতো কাজ স্বচ্ছন্দে ক'রে থাকে (শরৎচন্দ্র 'নিত্য অভ্যস্ত' শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন)। ফলে ষোড়শীকে অকথ্য অপমান করতে এদের এতটুকু সংকোচ হয়নি : "বহির্দ্বারে জন-চারেক হিন্দুস্থানী পাইক তাহার [ষোড়শীর] গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।...মুখে তাড়ির গন্ধ, চোখগুলো রাঙা—অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা। যে লোকটা বাংলা শিখিয়াছে, সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, শালা ঠাকুর মোশাই ঘরে আছে? শালা টাকা দেবে, না ভেগে ফিরচে।

"ষোড়শী চাহিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই। পাছে এই দুর্বিনীত মদমত্ত পশুগুলা হঠাৎ তাহাকেই অপমান করিয়া বসে, এই ভয়ে সে দুর্জয় ক্রোধ প্রাণপণে সংবরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, বাবা বাড়ি নেই।

"কোথা ছিপচে?

"আমি জানিনে, বলিয়া ষোড়শী পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা হাত বাড়াইয়া একটা অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, না আছে তো তুই চোল। গলায় গামছা দিয়ে খিঁচে লিয়ে যাবো।" (ঐ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

এ ছবি একদিনের নয়, কোনো বিশেষ জমিদারের পাইক-লেঠেলের ছবিও নয়। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারে অভ্যস্ত অজস্র লেঠেল-পাইকের চেহারা এখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

পিছুতে পিছুতে মানুষের পিঠ যখন দেওয়ালে ধাক্কা খায়, যখন তারা বোঝে শেষ মুহূর্ত এসে গেছে, ঠিক তখনই প্রাণপণ শ্বাসে তারা উঠে দাঁড়ায়, চেষ্টা করে প্রতিরোধের এবং এটা বুঝেই করে যে, হয় এই তাদের প্রথম ও শেষ প্রতিরোধ—ব্যর্থতায় চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে যাওয়া। প্রজাসাধারণের সেই প্রতিরোধের রূপও দেখি 'দেনাপাওনা'য়। জীবানন্দ এবং জনার্দন রায় বিশাল পরিমাণ দেবত্র জমি গ্রাস করেছেন, যে-জমি ষোড়শী সাগর সর্দারসহ অন্যান্য ভূমিজ বাউরীদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিল। এর প্রতিবাদ আইনসঙ্গতভাবে করেছে প্রজার দল, "আদালতের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, ভূমিজ ও অন্যান্য প্রজারা একযোগে জমিদার ও তাঁহার [জনার্দন রায়] নামে নালিশ রুজু করিয়াছে।...এই সকল হীন, মূর্খ, মৃতকল্প চাষীর দল এতবড় সাহস পাইল কি করিয়া যে, গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও এই দুর্দান্ত জীবানন্দ চৌধুরী ও জনার্দন রায়ের নামে নালিশ করিয়া বসিল। জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায়না, শীতের রাত্রে যাহারা বসিয়া কাটায়, মারীর দিনে যাহারা কুকুর-বেড়ালের মতো মরে, আবাদের দিনে এক মুষ্টি বীজের জন্য যাহারা ওই দরজার বাহিরে পড়িয়া হত্যা দেয়, তাহারা আদালতে দাঁড়াইবার টাকা পাইল কাহার কাছে? এ দুর্মতি তাহাদের কে দিল?" (ঐ, ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ)।

মার খেয়ে নিঃশব্দে মার হজম করাই যাদের স্বভাব, যখন তারা আইনের পথে প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, তখন তার পিছনে সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবিশেষের সহায়তা থাকতে পারে। কিন্তু তাতেও জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো প্রজাদের প্রবল নৈতিক সাহসের কথাটা স্মরণে রাখতে হবে। এই নৈতিক সাহসের অভাবে গঙ্গামাটি গ্রামের নিম্নবর্ণের প্রজারা মার খাওয়াটাই চির-ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। চণ্ডীগড় গ্রামের প্রজারা শেষত তাদের থেকে নিশ্চয়ই ভিন্ন।

সরাসরি কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ মিলেছে 'বিপ্রদাসে'। জমিদার-বাড়ির সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে "রক্তপতাকায় লিখিত নানাবিধ 'বাণী' ও বিপুল চিৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া" যাবার সাহস প্রজারা দেখিয়েছে। এর পিছনে শহুরে

নেতাদের প্ররোচনা থাকলেও দিনবদলের ছবিটাও কৃষকদের চোখের সামনে কম বড় হয়ে ওঠেনি। সেইসঙ্গে জমিদারীর ভাঙন চিহ্নিত করেছেন ঐ শাসনযন্ত্রের অন্তর্গত জমিদার-বংশের মানুষ দ্বিজদাস। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনেব কথা, যেখানে ইংরেজ-সৃষ্ট বিদ্যালয় ছাত্ররা বয়কট করেছে।

তবু 'বিপ্রদাস' উপন্যাস সূচনায় যা ছিল, সমাপ্তিতে তা থাকেনি। যে উপন্যাস 'পথের দাবী'র মতো দ্বিতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু সমাপ্তিতে তা হয়ে দাঁড়াল নরনারীর হৃদয়-বেদনাবিধুর কাহিনী। সূচনার সঙ্গে অন্তিমের এই ভাবগত পার্থক্য বেশ স্পষ্ট ছিল বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে। তিনি লিখেছেন :

"বেণুতে 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হওয়ার সময় আমরা যদি তখন জেলে না যেতাম, তাহলে বেণু বন্ধ হতো না। আর আমরাও দাদাকে [শরৎচন্দ্র] বলে তাঁর বিপ্রদাসকে আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাসে পরিণত করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জেলে যাওয়ায় সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।"[৫৮]

রাজনৈতিক উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র কি এখানে কেবল হৃদয়রহস্যের কথাকাব হয়ে উঠলেন? যে তিনি সরাসরি রাজনীতি করেছেন, লিখেছেন 'পথের দাবী'র মতো অসামান্য রাজনৈতিক উপন্যাস, সেই তিনি পরবর্তীকালে সাক্ষাৎ রাজনীতিকে উপন্যাসের বিষয় না করতে পারেন—কিন্তু তাতে তাঁর রাজনৈতিক মতে বদল ঘটেছে প্রমাণিত হয়না, কিংবা রাজনীতিকে তিনি জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চান, তাও না। মনে রাখা দরকার, শরৎচন্দ্র যা করেন নি, তার চেয়ে অনেক বড সত্য—যা তিনি করেছেন। কলম তাঁর অন্নসংস্থানের উপায়. সেই কলমকে পর্যন্ত কিছুকালের জন্য তিনি ছুটি দিয়েছিলেন দেশের আশু প্রয়োজনের কথা ভেবে। ইংবেজ শাসনযন্ত্র তাঁকে চূর্ণ করতে পারে—এই আশঙ্কা ছুঁড়ে ফেলার মতো সাহস কিংবা দুঃসাহস তাঁরই ছিল। সুতরাং শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক সাহিত্য পরিমাণে স্বল্প হলেও মাত্রাগত বিচারে বিপুল, তাতে সন্দেহের কারণ আছে কি?

পাদটীকা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১৬৮-১৬৯।

২. অসহযোগ আন্দোলনের সময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী শরৎচন্দ্রের একেবারে পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। সে ঘটনা স্মরণ ক'রে তিনি চিঠিতে লিখেছেন : "দু'বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলানটিয়ার—আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬/৭ জন যখন 'জান গিয়া' বলে গুলি খেয়ে পড়ে মরে গেল—তখন আমি পালাই নি, কিন্তু আমার [গুলি] লাগে নি। অনেকদিন আশ্চর্য হয়েছি সেদিন কি ক'রে মেশিনগানের গুলি লাগেনি?" (লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, ২৭ জুন ১৯২১, 'শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৯)। ১৯২১ সালে এই চিঠি লেখার দু' বছর আগে ১৯১৯-এ

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অমল হোমকে আরেকটি চিঠি লিখেছেন, যার মধ্যে ইংরেজের বর্বর অত্যাচারের ছবি অল্প কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে : " 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমার নাকি খুব ফাঁড়া গিয়েছে। ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছ থেকেই দেখে নিলে ভালো ক'রে।...আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কত পশু হতে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো। [রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধি ত্যাগের উল্লেখ ক'রে শরৎচন্দ্র গর্ব ভরে বলেছেন] আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন ক'রে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।...সি আর দাশ একদিন আমায় বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।" (অমল হোমকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০)।

৩. 'রবীন্দ্রজীবনী ও ববীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক' (২য় খণ্ড), প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৫৫, পৃ. ৪৫৬। অতঃপর 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'।

৪. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১১৪।

৫. ঐ, পৃ. ৯৭।

৬. ঐ, পৃ. ৯৫-৯৬।

৭. ঐ, পৃ. ৯৬।

৮. 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক' (৩য় খণ্ড), আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ. ১১৩।

৯. ঐ, পৃ. ১১৭।

১০. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১৩০-২০৩।

১১. 'তরুণের স্বপ্ন', পৃ. ৮১।

১২. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), ১৯৯৮, পৃ. ৩০৫।

১৩. ঐ।

১৪. দিলীপকুমার রাযকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৩৫।

১৫. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩১০।

১৬. কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৯২।

১৭. ঐ, পৃ. ২৬৯-৭০। এই ঘটনার বিবরণ অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের লেখাতেও পেয়েছি : "৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ (১৯৩২ খ্রী:) শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে কয়েকদিন ব্যাপী এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে মূল সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু অনুষ্ঠানের দু' একদিন পূর্বে সংবাদপত্রের মারফত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায় ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশনের সংকল্প করায় এ অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। আর এই সঙ্গে হিজলী দিবস যোগ ক'রে All Bengal Student's Association-এর পক্ষ থেকে বর্ধমানের শৈলেন চৌধুরী, ড: নলিনাক্ষ সান্যাল, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানের বিপক্ষতা ক'রে উক্ত দিনে টাউন হলের ভিতরে ও বাহিরে যে কাণ্ডটি বাধায় তা সত্যিই মর্মান্তিক। বলা বাহুল্য, *অনুষ্ঠানটি দক্ষযজ্ঞের মধ্যেই [অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের গহনাপত্র নাকি কেড়ে*

নেওয়া হয়েছিল, অবিনাশচন্দ্র জানিয়েছেন] বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র উপস্থিত হয়ে টাউন হলের বাইরে থেকেই ফিরে যান।..এ দিনের এ অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে গেলেও শরৎ-বন্দনা সমিতি আবার নূতন উদ্যমে একদিন পরেই টাউন হলে একটি দিনের জন্যে আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং তা সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়।" এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াও অবিনাশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। শরৎ বন্দনা সমিতির সমবেত সদস্যদের শরৎচন্দ্র বলেছিলেন : "তোমাদের ধারণা জন্মতিথি উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমার খুব মনস্তাপ হয়েছে, কিন্তু মোটেই তা নয়। কাল থেকে শুধু এটাই আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না, মেয়েদের উপর অমন অত্যাচার তারা করলে কি ক'রে? মেয়েদের গা থেকে গয়নাপত্র কেড়ে নেওয়ার খবর যদি সত্য হয় তাহলে এ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ আসতে পারেন নি। দেশের ছাত্রদের এ-ব্যবহার চোখের সামনে দেখলে তিনি একেবারে ভেঙে পড়তেন। তোমরা যে বলচ নলিনাক্ষর দলে চারুবাবুও ছিলেন, একথা যেন বিশ্বাস করতে মন চায়না।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ ৫৩ ৫৫)।

১৮ শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ ২৭০।

১৯ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি, ঐ, পৃ ২৬৬। টাউন হলে নিজ জন্মতিথির উৎসব পণ্ড হওয়াতে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রমথদের শরৎচন্দ্র তার 'মনস্তাপ' হয়নি বললেও (১৭ ফুটনোট দ্রষ্টব্য), অমল হোমকে পুনরায় একই প্রসঙ্গে (রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবের উল্লেখসহ) শরৎচন্দ্র লিখেছেন "তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পারোনি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল, রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময়ও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের আমি চিনি, তুমিও চেন। তারা সেবার পারেনি— এবার পেরেছে।" (ঐ, পৃ ২৭৯)।

২০ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ছদ্মবেশে শরৎচন্দ্রের কাছে আসতেন। তেমন একটি ঘটনার উল্লেখ শরৎচন্দ্র নিজেই অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের কাছে করেছেন "সেদিন বিপিন (বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) হঠাৎ মহিলার বেশে রাত্রে এসে উপস্থিত—সাতশ টাকার তার ভীষণ দরকার। ঘণ্টা কয়েক থেকে ভোররাত্রে সে চলে গেল। ওদের পিছনে তো পুলিস লেগেই আছে, তাই দু' পাঁচদিন আমার একটু সন্দেহের মধ্যে কেটেছিল। আর যদি [আমাকে] ধরেই নিয়ে যেত কি আর করতুম। তবে এ বিশ্বাস আমার বিপিনের উপর আছে যে, সে যদি নিজেও ধরা পড়ত, তাহলে পুলিস হাজার চেষ্টা ক'রেও তার কাছ থেকে আমার টাকা দেওয়ার খবর বার করতে পারত না। ওর মতো একটা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী খুব কমই আছে।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', প ২৮ ২৯)।

২১. 'স্মৃতিচারণ', হেমচন্দ্র ঘোষ, (আকর : 'The Golden Book of Saratchandra', p 251 253)।

২২. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৮। বিপ্লবী এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সত্যরঞ্জন বক্সী সাক্ষাৎকারে (২১.০৫ ১৯৬৯) শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে বলেছিলেন : "পথের দাবীর জন্য পুলিশ কমিশনার [চার্লস টেগার্ট] শরৎবাবুকে লালবাজারে ডেকে পাঠিয়ে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখেন। তিনি মানী লোক, তাঁর কোনো সম্মানই দেয়নি। তার উপর কড়াকড়া কথা। শরৎবাবু অত্যন্ত অপমানিত হন।" ('সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র', ২য় খণ্ড, পৃ ৩১৬)।

২৩. ঐ, পৃ. ২৯৭।

২৪. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ২৯৮-২৯৯।
২৫. ঐ, পৃ. ২৯৭।
২৬. ঐ, পৃ. ২৯৭-২৯৮।
২৭. 'স্মৃতিচারণ', হেমচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ২৫২।
২৮ক. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১৯০।
২৮খ. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪০৩।
২৯. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩১৬-৩১৭।
৩০. ঐ, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭। পেনাল কোডের ১২৪ ধারায় যে-কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে কিভাবে তাকে চূড়ান্ত অপদস্থ এবং নাজেহাল করা হতো, সে বিষয়ে স্বয়ং শরৎচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেছেন : "পেনাল কোডে কতকগুলি ধারা আছে যেগুলির জালে একবার জড়ালে কোনো আইনজ্ঞেরই সাধ্য নেই তা থেকে তাঁর ক্লায়েন্টকে মুক্ত করতে পারেন। এদের মধ্যে দুটি হচ্ছে একেবারে সেরা —অশ্লীলতা বাবদ ২৯২ ধারা আর রাজদ্রোহিতা বাবদ ১২৪ ধারা। ভাষার যে কত elasticity থাকতে পারে—এই ধারাদুটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরেজ সরকারের হাতে এ দুটি হাতিয়ারেরই সামিল।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ৫৫-৫৬)।
৩১. 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড), পৃ. ১৯৩।
৩২. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।
৩৩. ঐ, পৃ. ৩১৭-৩১৮।
৩৪. 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পরিশিষ্ট, পৃ. ২৩।
৩৫. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩১৭।
৩৬. দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৪২।
৩৭. শরৎসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অপ্রসন্ন, কিন্তু 'পথের দাবী' সম্পর্কে নয়। বাজেয়াপ্ত গ্রন্থটি পড়ে তার সমর্থনে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লিখবেন বলে তিনি সজনীকান্ত দাসকে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন গ্রন্থটির একটি কপি সংগ্রহের জন্য। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদের কাছে সজনীকান্তকে পুনরায় পাঠিয়েছেন একটি চিঠিসহ, যে-চিঠি পড়ে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত এবং প্রকাশকের ভাণ্ডারে নিঃশেষিত হলেও বিশেষ প্রয়োজনে দু'-এক কপি গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসত : "সজনীবাবু আমার চিঠি নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছেন একখানা বই পাবার আশায়। শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু বইখানা পড়তে চান মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ভালো ক'রে দেবার জন্য। যাই হোক যদি পারো দিও।" ('শরৎচন্দ্র', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪)। শরৎচন্দ্র অবশ্য আইন বাঁচিয়ে, নিজেকেও বাঁচিয়ে, চিঠির মধ্যে 'পথের দাবী' শব্দদুটির উল্লেখ কোথাও করেন নি।
৩৮. 'বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র', শরৎচন্দ্র বসু (আকর : 'শরৎপ্রসঙ্গ', অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত, ভাব ও লেখা, কলকাতা-৭০০০১২, পৃ. ২৪৬)।
৩৯. 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক', ৩য় খণ্ড, ১৩৫৯, পৃ. ৩০৫-৩০৬।
৪০. 'শরৎচন্দ্র', সুধী প্রধান (আকর : 'শরৎপ্রসঙ্গ', পৃ. ২৩০-২৩৫)। 'পথের দাবী'তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর দাবীর পক্ষে বৈপ্লবিক সমর্থন সোভিয়েত রাশিয়ার (ইউ এস এস আর) L. Strizhevaskaya-এর বিচারশীল পর্যালোচনার বিষয় হয়েছে। ('The Place held by Pather Dabi and Sesh Prasna

in the works of Saratchandra Chattopadhyay' Source : The Golden Book of Saratchandra')।

৪১. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪৫৫।
৪২. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩২৫।
৪৩. শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'শরৎচন্দ্র', (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৮৫-৩৮৬।
৪৪. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩২৭।
৪৫. শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৮৫-৩৮৬।
৪৬. বর্তমান লেখকের 'বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা' গ্রন্থের 'মোহিতলাল মজুমদার' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪৭. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্রের চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৪১৪।
৪৮. ঐ, পৃ. ৪১৬। রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং শরৎচন্দ্রের উত্তর উভয়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদের হাতে চিঠিদুটি তুলে দিয়েছিলেন। উমাপ্রসাদের প্রাসঙ্গিক স্মৃতি : "কবির এ চিঠির প্রচার হওয়াও ঠিক নয়। আমার [শরৎচন্দ্রের] চিঠিও [কবির কাছে] পাঠিয়ে দরকার নেই। এ চিঠি দুখানিই তোমারই কাছে থাক। কিন্তু কাউকে তুমি এগুলি দেখিও না—বিশেষত যতদিন রবীন্দ্রনাথ ও আমি আছি। এ চিঠির বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনাও কোরো না। আমি [উমাপ্রসাদ] সম্মতি জানিয়ে তখনি তাঁকে বলেছিলাম যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কথা রাখব।" উমাপ্রসাদ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করলেও শরৎচন্দ্র নিজের কথা রাখতে পারবেন কিনা, সে সন্দেহ তাঁর ছিল। তাই ঘটেছিল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে উমাপ্রসাদের কয়েকজন সাহিত্যিক-বন্ধু "শরৎচন্দ্রের...নিজের মুখে চিঠির বিষয় শুনে" তা পড়তে উমাপ্রসাদের কাছে যান। উমাপ্রসাদ অবশ্য নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রেখেছিলেন। ('শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩৬০)। দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে, যখন রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই লোকান্তরিত, কেন উমাপ্রসাদ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধে চিঠিদুটি (ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁর লেখা চিঠিটি প্রকাশিত হয়) প্রকাশ করলেন, তার কোনো কারণ তিনি নির্দেশ না করলেও সে প্রসঙ্গে গোপালচন্দ্র রায় কিছু কৃতিত্ব দাবী করেছেন : "উমাপ্রসাদবাবু আমার আগ্রহে 'শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে আমার হাতে দেন। ঐ প্রবন্ধটি এনে আমি ১৩৬০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশ করি।...ঐ প্রবন্ধেই উমাপ্রসাদবাবু শরৎচন্দ্রের সেই না-পাঠানো চিঠিটিও দিয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণে সেই চিঠির বিষয়বস্তু, এমন কি চিঠিটার কথাও জানতেন না।" ('শরৎচন্দ্র', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০-২৪১)।
৪৯. 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৭।
৫০. রাধারানী দেবীকে চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৩৮৪। শরৎচন্দ্রের ঐ চিঠি পড়ে রাধারানী তাঁকে চিঠিতে বা মৌখিকভাবে কোন্ উত্তর দিয়েছিলেন তা জানিনা, তবে তিনি 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প' গ্রন্থে 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন : "চিঠি ছাপাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেননি। [চিঠি ছাপাবার জন্য দিয়েছিলেন] এটি [শরৎচন্দ্রের] সঠিক কথা নয়।" অন্যদিকে 'পথের দাবী'র বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বলা কথাও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য : "রবীন্দ্রনাথের বিভ্রান্তি ঘটেছিল একটি জায়গায়। তিনি ইংরেজ-

রাজশক্তির সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন—শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ-রাজশক্তি হয়তো পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের চেয়ে সত্যই সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল—কিন্তু আমাদের দেশে যে-রাজশক্তি ঔপনিবেশিক ভিত্তিতে শাসনদণ্ড গায়ের জোরে তুলে নিয়েছে—তাদের সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যের প্রশ্নই ওঠে না। এখানে কবি খেয়াল করেন নি গোড়াতেই ঔপনিবেশিক শক্তিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে—যেটিতে মূলতই তাঁর প্রবল আপত্তি। শবৎচন্দ্রের ক্ষোভ এখানে অমূলক নয়।" ('শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প', পৃ. ১৬৯, ১৭১)। রাধারানীর বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে—চিঠি ছাপানোর ব্যাপারে শরৎচন্দ্রেব ওহেন ভুল ধাবণা হলো কেন? শবৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠ চাইছিলেন—যা তিনি প্রকাশ করবেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা প্রকাশ কবাব জন্যই প্রেরিত—শরৎচন্দ্রের এই ধারণায় কোনো ভুল ছিলনা। তাছাড়া প্রায় দুশো বছরের ইংবেজ শাসনে বহু অকথ্য অত্যাচার ঘটে গেছে। তার হিসাব রাধারানীর জানা ছিল বলে মনে হয়না।

৫১. রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের চিঠি, 'শরৎচন্দ্র' (৩য় খণ্ড), পৃ. ৫২৯-৫৩১। সমাজের সর্বস্তব থেকে 'পথেব দাবী' নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসুক—শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন। অল বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনেব পূর্বে অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে (অবিনাশচন্দ্র ঐ অধিবেশনের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন) শবৎচন্দ্র বলেছেন : "তোমরা একটা কাজ করো না, আর তোমাদেরই তো এটা কাজ। এই যে সরকার আমাব 'পথের দাবী'কে আটকে রেখেছে, এটা ছাড়াবার একটা প্রস্তাব সভা থেকে মঞ্জুর করাতে পারো না? প্রকাশ্য সভা থেকে এর একটা প্রতিবাদ হলে অনেক কাজ হবে—সরকারের একটু টনক নড়বে। আমার আর পাঁচখানা বই যদি সরকাব বাজেয়াপ্ত কবত, তাহলে আমার এত দুঃখ হতো না।" ('শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা', পৃ. ২৭-২৮)।

৫২. 'বিদেশী জাতীয় চেতনার উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, (আকব : 'এ মণিহার', শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৩৮৮, পৃ. ৪৯-৫৬)।

৫৩. 'সমকালীন ভাবতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩৪১।

৫৪. 'রবীন্দ্রজীবনী ও ববীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক' (৩য খণ্ড), ১৩৫৯, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

৫৫. 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে সমকালীন জনমতের উল্লেখ করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায : "['চার অধ্যায'] গল্পের বিষয়বস্তু বাংলার বিপ্লবসংক্রান্ত ; [একথা শুনিয়া] লোকে বলিল, বই গভর্নমেন্ট বাজেযাপ্ত করিবেন।...বই বাহির হওয়ামাত্র দেশের মধ্যে একটা ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই বই সম্বন্ধে যে পরিমাণ সমালোচনা হইয়াছে, তাহা 'ঘবে-বাইবে'র পব কবিব অন্য কোনো বই সম্বন্ধে হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে সকল কপি বিক্রীত হইযা যায়। লোকে বলিতে আরম্ভ করিল গভর্নমেন্ট এই বই কিনিয়া অন্তরীণাবদ্ধদের দিতেছেন, বিপ্লবদমনের জন্য এই বই সরকারের উপযুক্ত অস্ত্র হইয়াছে।...ইহা সরকারের বিপ্লবদমনের প্রচার-পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।" (ঐ, পৃ. ৩৮৩)।

৫৬. 'সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩৪২।

৫৭. 'বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র', শরৎচন্দ্র বসু, পৃ. ২৪৬।

৫৮. 'স্মৃতিচারণ', হেমচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ২৫১-২৫৩।

দ্বাদশ অধ্যায়

শরৎচন্দ্র : সীমানা পেরিয়ে

ভবভূতির মতো শরৎচন্দ্রকে এই আশায় ভর ক'রে বসে থাকতে হয়নি যে, তাঁর সাহিত্য 'নিরবধি কালের' মধ্যে কোনো না কোনো সময়ে সমাদর পাবে। শরৎচন্দ্রের মতো তাৎক্ষণিক ও বিপুল সমাদর খুব কম সাহিত্যিকই পেয়েছেন। কিন্তু তিনি কি একটি বিশাল হাউয়ের মতো সহসা বেরিয়ে পড়ে, চারিদিক আলোকিত ক'রে, অবিলম্বে বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেলেন? না এবং না। যদিও তিনি কোনো সাহিত্যকে, নিজ সাহিত্যকেও, 'চিরকালের সামগ্রী' ভাবেন নি, সাহিত্য বড় জোর আয়ুদীর্ঘ হতে পারে, তার বেশি নয়—সেই আয়ুদীর্ঘতা অবশ্যই তিনি পেয়েছেন। সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাবের পবে প্রায় শতাব্দীকালে কেটেছে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশিত)। সময়টা কম নয়। এর মধ্যে বহু 'যুগান্তকারী' সাহিত্যিকের উদয় এবং বিলয় ঘটে গেছে। এই প্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র এখনো কিভাবে সারা ভারতবর্ষে সাহিত্যিক হিসাবে বর্তমান আছেন, তা ঘোষণা করেছেন ভারতের প্রথম ইণ্টারনেট ইংরেজি মাসিক 'ডব্লু ডব্লু ডব্লু মেঘদূতম ডট কম'। এই পত্রিকাটি গত ১ মে–২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ইণ্টারনেটে পাঠকদের ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করে—শতাব্দীর সেরা ভারতীয় ঔপন্যাসিক নির্বাচনের লক্ষ্যে। পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক বেদব্যাস কুণ্ডু জানিয়েছেন, প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভোট পেয়ে শরৎচন্দ্র প্রথম স্থানে, দ্বিতীয় ভগবান গিদওয়ানি, তৃতীয় আর কে নারায়ণ, চতুর্থ মুন্সী প্রেমচাঁদ, পঞ্চম রবীন্দ্রনাথ।[১]

বাঙালি লেখক শরৎচন্দ্র প্রদেশের গণ্ডী পেরিয়ে প্রধান সর্বভারতীয় সাহিত্যিক। প্রায় সব কয়টি ভারতীয় ভাষায় তাঁর বইয়ের একাধিক অনুবাদ হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বইয়ের একাধিক অনুবাদও এবং প্রতিটি অনুবাদেরই বহু মুদ্রণ ঘটেছে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত *The Golden Book of Saratchandra* গ্রন্থে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের (যাঁদের মধ্যে আছেন, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, উমাশঙ্কর যোশী, জৈনেন্দ্রকুমার, ইন্দ্রনাথ মদন, বিষ্ণু প্রভাকর, হনসকুমার তেওয়ারি, কমলা সংস্কৃত্যায়ন, শচী রাউত রায়, তারসেম রাজ বিনোদ, টি এন কুমারস্বামী, জি ভি সুব্বাইয়া, আবদুর রউফ প্রমুখ) রচনা থেকে জেনেছি—অসমীয়া, গুজরাটি, হিন্দি, কানাড়ী, মালয়ালাম, মরাঠী, নেপালি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, তামিল, তেলুগু, উর্দু ভাষাভাষী মানুষেরা কোন আগ্রহ নিয়ে শরৎসাহিত্য পড়েন, এবং কিভাবে ঐসব ভাষার সাহিত্যিকেরা শরৎচন্দ্রের দ্বারা অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। হিন্দি সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ঢুকে পড়েছিলেন গত শতকের তিনের দশকের গোড়ায়। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত হিন্দি

প্রকাশনসংস্থা হিন্দিগ্রন্থ-রত্নাকর সমগ্র শরৎসাহিত্যের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেন ; এমন কি 'নারীর মূল্য'-সহ শরৎ-প্রবন্ধ, শরৎ-পত্রাবলীও। এলাহাবাদের কিতাবমহল, ইণ্ডিয়ান প্রেস, বারাণসীর সাহিত্যসেবক প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশকের নামও এই সূত্রে করা যায়। অনুবাদকদের মধ্যে বারো-চোদ্দজন সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যথা ধন্যকুমার জৈন, রামচন্দ্র বর্মা, রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়। শরৎচন্দ্রের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক জীবনী হিন্দিতে লেখা হয়েছে—বিষ্ণু প্রভাকরের 'আওয়ারা মসীহা'। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে অন্তত দশটি প্রবন্ধগ্রন্থ হিন্দিতে রচিত হয়েছে। এইসব তথ্য উপস্থিত ক'রে হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যে পারঙ্গম জনৈক সমালোচক বলেছেন : "[গত শতাব্দীর] পঞ্চম দশক থেকে হিন্দিতে উপন্যাসের আলোচনা বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পায় গবেষণাকর্মও। এসব ক্ষেত্রে লক্ষিতব্য—শরৎচন্দ্রের জয়জয়কার। তিনি বহু আলোচিত, স্বীকৃত এবং পূজিত। স্বীকৃতি যেমন সশ্রদ্ধ, গৌরবগানও তেমনি আন্তরিক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, শিল্প ও মানবতাবোধে অনেকে অনুপ্রেরিত, উদ্বুদ্ধ। সমসাময়িক হিন্দি উপন্যাসকারগণ এবং তরুণরাও। তার প্রমাণ ও স্বীকৃতি ছড়িয়ে আছে হিন্দি সাহিত্যের যত্রতত্র।" প্রভাবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন মুন্সী প্রেমচাঁদ, জৈনেন্দ্রকুমার, বানারসীদাস চতুর্বেদী, অজ্ঞেয়, যশপাল, অমৃত রায়, বৃন্দাবনলাল বর্মা প্রমুখ।[২] হিন্দি সাহিত্য সম্বন্ধে যা সত্য, অন্য ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে তা অল্পবিস্তর সত্য।

ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে কিন্তু দেখব, শরৎসাহিত্যকে নস্যাৎ করাই যেন আধুনিক কিছু বুদ্ধিজীবী লেখক এবং কথাশিল্পীর লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে শরৎচন্দ্রের সর্বভারতীয় কদর সম্পর্কে অবহিত, মননশীল জনৈক সাহিত্য-সমালোচক মনে করেছেন 'মানবহৃদয়ই শরৎচন্দ্রের সহৃদয়, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির বিষয়', সেখানে তাঁর কাছে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ঐসব কুঞ্চিতনাসা বুদ্ধিজীবী লেখক এবং তরুণ প্রজন্মের 'ঔদাসীন্য' ও 'শীতলতা' 'মর্মান্তিক'। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, জনসাধারণ যখন শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘকাল 'প্রিয়' লেখক হিসাবে চিহ্নিত ক'রে আসছে, তখন জনমতকে লাঞ্ছিত করার কারণ নেই, 'বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য সমস্যারূপে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।' সেই চ্যালেঞ্জের উত্তর : "অতি-আধুনিকমনস্ক উন্নাসিক পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, লেখক শরৎচন্দ্রকে শিল্পী হিসাবে তাঁরা যতটা উদাসীন বলে মনে করেন, শরৎচন্দ্র ঠিক তা ছিলেন না। ...তাঁর শিল্পবোধ ছিল যথেষ্ট প্রখর, লেখক হিসাবে তাঁর যে জয়জয়কার, তার কারণ, ঐ শিল্পবোধের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল জীবনবোধ।"[৩]

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনকালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিলেন। 'ব্ল্যাক উডস্' পত্রিকায় প্রকাশিত জেরিস ছদ্মনামে জনৈক ইউরোপীয় সমালোচকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞতাকে 'অভিজ্ঞতার অভাব' বলে চিহ্নিত ক'রে (জেরিস লিখেছেন : "একমাত্র স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত বর্তমান ভারতবর্ষে এমন একজন লেখকেরও নাম করা যায়না যিনি স্বদেশের অতীত সম্পদের ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"), ১১ জুলাই ১৯১৮-এ বিখ্যাত 'দি টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট' পত্রিকার জনৈক সমালোচক মোপাসাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে তুলনা করেছেন, অধিকন্তু এই আশ্বাস সেখানে ছিল, ফরাসী সাহিত্যের যৌন পঙ্কিলতায় শরৎসাহিত্য ভারাক্রান্ত নয়। 'দি টাইমস্

লিটারারি সাপ্লিমেন্ট' পত্রিকার উক্ত আলোচক গল্পকার রবীন্দ্রনাথের থেকে গল্পকার শরৎচন্দ্রকে উচ্চতর স্থান দিয়েছেন। 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'আঁধারে আলো' থেকে উদাহরণ তুলে তিনি লিখেছেন : "নারীচরিত্র ও শিশুমনের সুনিপুণ বিশ্লেষণে তিনি [শরৎচন্দ্র] যে অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ। ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের একান্নবর্তী সমাজের নারীর মুখে এমন সব মধুর ছোট ছোট বুলি শুনা যায় যাহা বড়ই মধুর। এই নারীদের মুখে মি. চ্যাটার্জী এমন সব অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা কেবল তাঁহার মতো প্রতিভাব পক্ষেই সম্ভব। আর কোনো ভারতীয় লেখক বাস্তব চিত্র অঙ্কনে এত অধিক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে কোথাও এতটুকু খুঁত পাওয়া যাইবে না। চরিত্রগুলি একেবারে জীবন্ত। সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ মি. চ্যাটার্জীর সাহিত্যিক দৃষ্টিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই।" ('বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)।

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ইতালীয় অধ্যাপক জি তুচ্চি এবং অধ্যাপক বি ফিলিপ্পি। সে প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "১৯২১-২৩ সালে ইটালি ভ্রমণকালে কালিদাস [নাগ], অধ্যাপক জি তুচ্চি ও অধ্যাপক বি ফিলিপ্পির সহিত শরৎচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ শেষ হইলে ফিলিপ্পি কালিদাসকে তাঁহার সহকর্মী হইয়া শরৎবাবুর কিছু গল্প অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন।" ('আলোচনা', 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৪৬)। সে ভার গ্রহণ করা কালিদাসের পক্ষে সম্ভব না হলেও ইতালী পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের বিস্তৃত খ্যাতির কথা জানা গেছে। পরে ১৯২৫-এ বি ফিলিপ্পি 'শ্রীকান্ত' অনুবাদ করেন। ১৯২৬-এ সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী-মনীষী রোমা রোলাঁর সঙ্গে মৌখিক আলাপে, 'শ্রীকান্ত' বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জেনেছেন। ফেব্রুআরি ১৯২৭-এর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এ সম্পর্কে রামানন্দের মন্তব্য ইতিমধ্যে একাদশ অধ্যায় 'শরৎচন্দ্র : রাজনীতি ও রাজনৈতিক সাহিত্যে' উল্লেখ করেছি।[৪] 'বাতায়ন' পত্রিকার সূত্রেও জেনেছি যে, রোমা রোলাঁ বলেছিলেন : "আমার কয়েকজন য়ুরোপীয় বন্ধু ভারতবর্ষের বর্তমান সাহিত্যের সহিত যোগসাধন করিতে চান।...শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সহিত পরিচিত হইলে আমরা খুশি হইব। কে সি সেন ও টমসন কর্তৃক অনূদিত তাঁহার শ্রীকান্ত (১ম ভাগ) বইখানি পড়িয়া তাঁহার অতীব ব্যক্তিত্বে ও লিপিকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছি।" ('বাতায়ন', শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুআরি ১৯৩৮)। ১৯২৭-এ রোমা রোলাঁ-কালিদাস নাগ পত্রবিনিময় থেকে দেখা যায়, 'শ্রীকান্ত' এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কালিদাস, রোলাঁকে একটি 'নোট' পাঠিয়েছেন। 'কৃতজ্ঞ' রোলাঁ ঐ 'নোট'টিকে শরৎ-আগ্রহী ফরাসী জনগণের সামনে উপস্থিত করতে ইচ্ছা করেছেন।"[৫]

একটি বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হলো। বর্তমান গ্রন্থ শুরু করেছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের নানা দিক স্পর্শ ক'রে। তাঁর কান্নাহাসির সুর বেজেছে সেখানে। অভাবনীয়ে দীপ্ত তাঁর জীবন—শূন্য থেকে শুরু ক'রে পূর্ণ হয়েছেন তিনি। আত্মভোলা, খেয়ালী,

উদাসী মানুষটি পরবর্তী জীবনে সযত্নরচিত সাহিত্য থেকে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি পেয়ে গেলেন। মৃত্যুর পরে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-পদসৃষ্টি, সাহিত্য-পুরস্কার প্রবর্তন—এসব শ্লাঘনীয় ব্যাপার ঘটেছে। সে তো এহো বাহ্য। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ ক'রে বলতে পারি, বাঙালির হৃদয়রহস্যে ডুব দিয়ে যে-সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা সর্বমানবিক। গভীরে বিশ্বমানব একতন্ত্রী। সমকালে এবং উত্তরকালে তিনি যতই সমালোচিত হন—একালে অনেক বোদ্ধা সমালোচক মনে করেন, নিছক আবেগে ভাসমান নয় তাঁর সাহিত্য, তা অন্তর্লীন যুক্তিবোধে গ্রথিত। সাহিত্য-পরিক্রমায় তিনি অভিজ্ঞতার বাইরে পা রাখেন নি, চলমান জীবন থেকে কখনো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি—তাঁর রাজনৈতিক জীবন তারই পরিচয়। এমন বিপুল অভিজ্ঞতার সম্ভার গত শতকের ক'জন বাঙালি সাহিত্যিকের আছে? সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে মত প্রকাশের সময় আকর্ষণ-বিকর্ষণে তিনি দোলায়িত। সেই তো প্রবহমান জীবনেব লক্ষণ!

এইসব মিলিয়েই শরৎচন্দ্র। আমাদের অস্তিত্বের নানা অংশে তাঁকে অনুভব করি। সেই অনুভব এই বোধে পৌঁছে দিয়েছে—বাঙালির হৃদয়াকাশের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শরৎ-চন্দ্র তিনি—এখনো যাঁর শুক্লপক্ষে কৃষ্ণপক্ষের ছায়া পড়েনি।